ভক্তি।

ভাদ্র মাস, ৫ম সংখ্যা—১০ম বর্ষ।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

প্রার্থনা।

নাথ যোনি সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষচলা ভক্তি রচ্যুতস্তু সদাত্বয়ি॥
যা প্রীতি রবিবেকানাং বিষয়েষনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ স্বামিন্ হৃদয়ান্নাপসর্পতু॥

হে নাথ! হেপ্রভাব শালিন্ নিত্য সত্য শ্রীহরে! আমি সংসারে সহস্র সহস্র যোনি ভ্রমন করি অর্থাৎ মনুষ্য কীট পতঙ্গাদি যে কোন যোনিতেই জন্ম গ্রহণ করিনা কেন; কেবল ইহাই প্রার্থনা, যেন [illegible] অচলা ভক্তি থাকে যেন কামনা শূন্য প্রাণে তোমাকে ভালবাসিতে পারি। হে স্বামিন্! বিষয়াশক্ত অজ্ঞান জনের বিষয়ের প্রতি যেরূপ ভালবাসা থাকে অর্থাৎ শয়নে স্বপনে যেমন-সে, বিষয় ভিন্ন আর কিছু জানেনা বা চাহেনা সেইরূপ আমিও যখন তোমায় স্মরণ করিব, যখন তোমায় ভাবিব তখন আমার মনও যেন এক তোমা-ধন ভিন্ন অন্য নশ্বর ধন-জনা-দিতে আশক্ত না হয়, যেন তোমা ভিন্ন আর কিছু চায় না, তোমাতে এইরূপ ভাবে আশক্তি জন্মাইয়া দাও যে, শয়নে স্বপনে সুখে দুঃখে কোন অবস্থাতেই যেন মন তোমায় না ভোলে।

লীলাময়! তোমার লীলা খেলা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র মানবের বুঝা ভার। তোমার লীলার কিঞ্চিৎ মাত্র ভাব বুঝা দূরে থাক, বুঝিবার চেষ্টা করিতে যাইয়াও বিমুগ্ধ হইয়া পড়ি। কেননা আমাদের যতটুকু জ্ঞান আছে তাহাও সীমাবদ্ধ, সুতরাং সীমাবদ্ধ অসম্পূর্ণ জ্ঞানের দ্বারা যে তোমার লীলার বিচিত্রতা ধারণা করা তাহা একেবারেই অসম্ভব।

আনন্দময়! তোমার অপরিসীম দয়াবলে ভক্তির ৯ম বৎসর শেষ হইয়াছে, যে রূপ ভাবে এই নয় বৎসর যাবৎ ভক্তগণকে আনন্দ দান করিয়া আসিতেছ, এই নূতন বর্ষেও সেইরূপ আনন্দ দান করিয়া ভক্ত পাঠক পাঠিকাগণের মনোভিলাষ পূর্ণ কর। যে ভাবে এতদিন শক্তি দিয়া আসিতেছ, এই নূতন বর্ষেও সেইরূপ নূতন করিয়া নূতন নূতন শক্তি দাও, যেন অহঙ্কার না আসে, আমার দ্বারা হইতেছে, আমি করিতেছি ইত্যাকার ভাব আসিয়া যেন হৃদয়কে কলুষিত না করে। দয়া করিয়া এমন শক্তি দাও যেন দ্বেষ, হিংসা, অভিমান, দুঃখ, দুরাশা এবং জড়তা দূর করিয়া মনকে সর্ব্বদা তোমারই কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে পারি। এমন শক্তি দাও যেন সুখ দুঃখ ভুলিয়া তোমার প্রেমে ডুবিয়া তোমারই গুণকীর্ত্তন করিয়া ধন্য হইতে পারি, এমন শক্তি দাও যাহাতে তোমার সেবা করিয়া এই পাপে তাপে জর্জ্জরিত প্রাণ শীতল করিতে পারি।

দীননাথ! দীন বড়ই দুর্ব্বল, যতই তোমার নিরপেক্ষ দয়া পাইব পাইব মনে হইতেছে, ততই যেন শক্তি বাড়িতেছে, জানিনা কৃপা পাইলে কি হইবে? তুমিই দীনের আশ্রয়, তাই কাতর প্রাণে প্রার্থনা করি ভাব দাও। তোমার ভাবে আসক্ত হইয়া বিষয় আশক্তি দূর করি, তোমার ভাবে মত্ত হইয়া মোহ মদিরা পান জনিত [illegible] করি, তোমার ভাবে মাতিয়া আমার আমি ভুলিয়া তোমার হইয়া পরমানন্দে কালাতিপাত করি। ভাবময়! ভাবদাও আর ভবের ভাবে ভুলাইয়া রাখিয়া যাতনা দিওনা, তোমার ভাব দাও। তোমায় ভাবে ভুলাইয়া রাখ, ইহাই আজ দীনের প্রার্থনা।"

দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

প্রার্থনা।

—:o:—

কালিন্দীর বিষ-জল পান করি যবে,
হ'য়েছিল জ্ঞানহত গোপ-শিশু সবে।
খণ্ডিতে ব্রজের ভয়, হে কৃষ্ণ তখন,
কালীয় নাগের শিরে করিলে নর্ত্তন;
ক্রোধাবেশে পদাঘাতে ফণা-ছত্র তার,
করিলে হে বিমর্দ্দিত চূর্ণ অহঙ্কার।
তবেত সমুদ্রে সর্প করিল পয়ান,
হইল কালিন্দী নীর অমিয় সমান।
আমার হৃদয় মাঝে হে করুণাধার!
কাতর বচনে ডাকি এস একবার।
হিয়ার মাঝারে দুষ্ট কাম বিষধর,
আস্ফালিয়ে, তনু মন করে জর জর;
চরণ প্রহারে তা'রে করগো দলিত,
হৃদিমাঝে প্রেমধারা হো'ক্ প্রবাহিত।
মনের হরষে আমি, প্রেমের সলিলে,
দিব ধোয়াইয়ে দু'টী চরণ কমলে;
ভক্তির প্রসূন দিয়া করিব অর্চ্চনা।
দীননাথ! পূর্ণ কর দীনের বাসনা॥

দীন—শ্রীশশিভূষণ সরকার,

সুখ।

—:o:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

"তন্ন তন্ন" দ্বিরুক্ত কথাটি সুখ সম্বন্ধেই সুন্দর খাটে। হে সুখ! তুমি কে? তোমার বসতি কোথায়? তোমার রূপ গুণ, আকার প্রকার আমরা জানিনা। তোমার কি কোন দেহ আছে, না কেবল নাম মাত্র? আমাদের বিবেচনায় তুমি শব্দরূপী। "সুখ" একটি ধ্বনি মাত্র, সতত বিকৃত হয়। এ ধ্বনির উৎপত্তি কোন সূত্রে, এবং কখন, তাহা আমরা অনবগত। মানব সমাজকে মাতাইয়া তুলিবার জন্যই এই "সুখ সুখ" রবের ইতস্ততঃ বিচরণ। যেমন কোকিলের কুহুধ্বনি শুনি, কিন্তু কোকিল দেখিনা—

"O cuckoo! shall I call thee Bird!

Or but a wandering voice ?

— Words worth.

কদাচিৎ কোকিল দৃষ্টও হয়, সুতরাং তাঁহার দেহময় অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তোমার তদ্বিধ অস্তিত্ব-লেশও এ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করিলামনা। নিবিড় অরণ্য মধ্যে বংশী ধ্বনি শুনা যায়, তদনুসন্ধানে ধাবিত হইলাম, ঘুরিয়া অবসন্ন হইলাম, কণ্টকাঘাতে তনু জর্জ্জরিত হইল, তথাপি বাদকের কোনই সন্ধান পাইলামনা, অথচ ধ্বনি শ্রুত হয়। Barisal gun (বরিশাল গান্) এর তুমুল-নির্ঘোষ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, অথচ এ ধ্বনির স্থান ও উৎপত্তির নির্ণয় করা যায় না। Barisal gun (বরিশাল গান্) যেমন কোন বস্তুতঃ gun (বন্দুক) নয়, সুখও তেমন একটা কিছু হইতে পারে। সুখ একটি পুষ্পিতা কথাও হইতে পারে। আমার সেই জিনিষটি কোন্ ঘরে জানিনা, সকল ঘর খুঁজি; তদ্রূপ সর্ব্ব বস্তুতে সর্ব্বক্ষণে সুখ খুঁজি, কারণ সুখ শুনি, জানিনা কোথায়, দেখিনা কোথায়। তবে সুখ শুনা সামগ্রী, চেনা নয়। আশার কুহকে জীবসত্ত্ব পরিচালিত ও জীবিত। আশার মত পথ্য আর দ্বিতীয় নাই। আশার বুকে সুখ পিপাসা অতি প্রবল। সুখ-আশা মরীচিকা সদৃশ। আমরা সংসার মরু-ভূমির মরীচিকামুগ্ধ উট। কেবল সুখের আশায় কণ্টক চিবাইয়া মুখ ক্ষত বিক্ষত করি, তবু চৈতন্য নাই।

কৈ, সুখের কোন সন্ধান তো এ যাবৎ পাইলামনা। বাল্য কালে শিশু-শিক্ষায় পড়িয়াছি "আরোগ্য সুখের মূল"। সুদীর্ঘকাল আরোগ্য দেহে বাস করিয়াছিলাম, তবু তৎকালে শান্তি উপভোগ করিতে পারিনাই। চন্দ্রোদয় বিনা যেমন সুধা-কিরণ বিতরিত হয়না, শান্তি ভিন্ন তেমন সুখ মিলেনা। আমার বিশ্বাস শান্তি-উদ্যানে সুখ-প্রসূন প্রস্ফুটিত হয়। স্বাস্থ্য সম্ভোগ করিতেছি, মনে করি, কিছু সুখ আগমন করিবেন; কৈ, অপর দিক্ দিয়া নানা গ্রহের উপদ্রব। জীবন গৃহের দ্বার এত অসংখ্য যে, একদিক্ বন্ধ করিতে করিতে অপর দিক্ দিয়া নানা বিঘ্নকর রিপু আসিয়া প্রবেশ করে। এতগুলি দ্বার সমাধান করা দুরূহ।

কিবা উচ্ছ্বাসময় আনন্দে, কিবা উল্লাসময় প্রমোদ ভরে আজি দোলায় চড়িয়া দুলিতে দুলিতে বিবাহ-মণ্ডপে চলিয়াছি, অদ্য আমার নবোদ্বাহ-বাসর

এমন সুখের দিন বোধ হয় জীবনে আর ঘটেনা। নূতন ভাব, নূতন সম্বন্ধ, এ অভিনয়ের আমিই নায়ক ; সব লোক আমারদিকেই তাকাইয়া আছে। নবরসের ঢেউ, আজ যেন আনন্দের হিল্লোল আর আঁটিয়া রাখা যায় না, উল্লা-সোহাগারে যেন ফাটিয়া পড়ে। জীবনের এই একদিন। মনে করিলাম ইহাকে সুখ বলা যায়। কিন্তু ভ্রম ? কালে বুঝিলাম, ঐ যে বিবাহের দিনটা ওটা গুলিভরা বন্দুক ; যখন গুড়ুম্ করিয়া ছুটিল, জীবন পথে বহুদূর সে দুঃখের গুলি ধূম্ররেখা করিয়া চলিল। বিবাহ বাসরটি ঠিক্ বাগানের আলবাল বেষ্টিত বেদিকা ; উহাতে দুঃখ লতিকার বীজ অতিযত্নে রোপিত হইল। এ তাহারই উৎসব।

সংসারের সাধারণ কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া কেবল আত্মসুখ বা স্বার্থের বিগ্রহ বিসম্বাদ। এক নৌকায় দশ জন চড়িলাম, নয় জন হস্তপদ প্রসারণ করিয়া শয়ন করিল, আমি বসিতেও স্থানটুকু পাইলামনা। লোক সমাজে শান্তি পাইলামনা, সুখ দূরের কথা। ভাল খাইয়া পড়িয়া দেখিলাম, দুই চারি দিন ভাল লাগিল, আবার তাও যেন নিম-নিসিন্দের তার ধরিল। গৃহে থাকিয়া ইচ্ছা হয় বাহিরে যাই, বাহিরে থাকিয়া ইচ্ছা গৃহে যাই ; শুইলে ইচ্ছা হয় বসি, বসিলে ইচ্ছা হয় শুই কি দাঁড়াই ; বাড়ী থাকিয়া ইচ্ছা বিদেশ যাই, বিদেশে থাকিয়া ইচ্ছা বাড়ী যাই ; স্থলে থাকিলে ইচ্ছা জলে যাই ; জলে গেলে ইচ্ছা স্থলে উঠি। হায়রে ! কোন অবস্থায়ই শান্তি নাই, কিছুতেই তৃপ্তি নাই, সন্তোষ নাই। কেবল অসন্তোষের গলাধাক্কা—অর্দ্ধচন্দ্র। ৩০৲ টাকা বেতন পাই, ৫০৲ টাকার লোভ ; সন্তোষ নাই, পাইলাম পঞ্চাশ, শতে লোভ।—

> ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
> হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥
>
> বিষ্ণুপুরাণম্।

হায়রে ! কোনওদিন "বর্ত্তমান" কে ভাল বাসিতে পারিলামনা। লক্ষ্য কেবল কুয়াসা আবৃত ভবিষ্যৎ পানে। আমার অতিবুদ্ধি আমারি সর্ব্বনাশের হেতু হইয়াছে। যাহা আছে ভাল নয়। যাহা নাই বড় ভাল। কেবল "নাই" এর পাছেই ছুটাছুটি। হায়রে ! বিষম দশা ! দুদিন দুগ্ধ খাইয়া বিরাগ, দুধের

উপর আরো চাহি। দশদিন সন্দেশ খাইয়া অরুচি, ওর চেয়ে ভাল কিছু চাহি। নিত্য উত্তরোত্তর অভিনবে লালসা। প্রাণ সদা চায় শুধু নূতন কিছু পরিবর্ত্তন। পরিবর্ত্তন—সোপানের ধাপ। কোন ধাপে তিষ্ঠিয়া সুখ নাই। সুখ শুধু ধাপে ধাপে পা দিতে, কিন্তু তাহা ইচ্ছামত সতত ঘটিয়া উঠে না, অসুখ—সুখ এমন যাহা নিয়ত ধাবমান। মানব ও সতত তাহার জন্য ব্যস্ত কিন্তু সে ধরা দেয়না। বিপথে নিয়া যাবে। সকল নৈবেদ্যেই ঠোক্ দিয়া দেখিলাম, কিন্তু পেট ভরিলনা। কাহারও মুখে বলিতে শুনিনা "আমি সুখী"—কপাল দোষ কোনক্রমে ছাড়েনা, শনির দৃষ্টি যায় না। প্রাণ যা চায়, কদাচিৎ তা পাই, তবু তৃপ্তি হয় না কেন? কেবল চাহিতে চাহিতে অন্ধ হইলাম। তৃপ্তির অন্তস্থলে কি এক পিপাসা থাকিয়া যায়। সেই টা বোধ হয় প্রাণের স্বভাব।—সেই স্বভাবে আমরা পৌঁছিতে পারিনা, তাই আমরা হয়রান্। তাই—আমাদের অভাব ঘুচেনা। যতকাল অভাব আছে, ততকাল "সুখ সুখ" করা বিড়ম্বনা মাত্র। বাসনায় অভাব সৃষ্টি করে। তাই একবার জ্ঞানের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করি।

"বিষয়ে যদি সুখ থাকিত তবে লালাজী ফকির হইতেন না।", বিষয়ে সুখ নাই এই নিশ্চিত জ্ঞান হইতে বৈরাগ্যোদয় হয়। গীতা বলেন:—

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥

শ্রদ্ধা হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে শান্তি সংলব্ধ হয়। সংশয় অশান্তি মূলক দুঃখের আকর। নদী স্রোতে ঐটি কি ভাসিয়া যায়, তাহা পরিষ্কার লক্ষিত না হওয়া পর্য্যন্ত চিত্তে সংশয় থাকে,—কাষ্ঠ খণ্ডকেও কুম্ভীর বলিয়া ভয় হয়। সংশয়ের তিমিরে ঘোর দুঃখ ভোগ করিতে হয়। জ্ঞানালোকে সংশয় দূরীভূত হয়, সত্য পরিস্ফুট হয়। সত্যের দীপ্তি—সুখ। সুতরাং সংশয়ের বিরতির নাম সুখ। সংশয়োচ্ছেদে চিত্ত শান্ত হয়, শান্তিই সুখের খনি অর্থাৎ শান্তি দেবীর স্তনক্ষরিত পীযূষকেই সুখ বলা যায়।

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥

(গীতা)

কর্ম্মযোগ ব্যতীত কেবল কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস দুঃখ জনক। যোগযুক্ত মুনি অক্লেশেই ব্রহ্ম লাভ করেন। ক্রমশঃ

শ্রীকালীহর বসু ভক্তিসাগর।

পাণ্ডব বর্জ্জিত অগঙ্গ প্রদেশে

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম পরিকর ও শ্রীনদীয়ায়

"শ্রীগৌর সুন্দর।"

—:০:—

কৃষ্ণ নাম ভক্তি শূন্য সকল সংসার,
কলির আরম্ভে হেরি ভবিষ্য-আচার ;
পাণ্ডব বর্জ্জিত মত গঙ্গাহীন দেশ,
নাহি নিষ্ঠা নাম প্রেম নাহি ভক্তি লেশ ;
শ্রীহট্ট, ত্রিহুত, ওড্র, রাঢ়, চট্টগ্রাম,
প্রভৃতি গ্রামেতে প্রভু দিতে প্রেম নাম ;—
অবতারি তথা সর্ব্ব প্রেম অনুচর,
নদীয়ায় অবতীর্ণ "শ্রীগৌর সুন্দর"
কলিযুগে মুখ্য যজ্ঞ নাম সঙ্কীর্ত্তন ;
নবদ্বীপে সাঙ্গোপাঙ্গ সবার মিলন ;—
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, পণ্ডিত শ্রীবাস,
বসুদেব, ব্রহ্মানন্দ, ব্রহ্ম হরিদাস,
শ্রীধর, মুরারি গুপ্ত, মকরন্দ কর,
গোপীনাথ, শ্রীনিবাস, প্রভু গদাধর,
পরম বৈষ্ণব সব প্রভু-পরিকর,

কৃপাসিন্ধু নিত্যানন্দ প্রাণেরি দোসর।
আচার্য্য প্রভুর প্রেমে বিশ্ব ভাসমান,
হরির হুঙ্কারে মোহে জগতের প্রাণ।
শ্রীনদীয়া ধাম অতি পুণ্যতীর্থ ময়;
যথায় বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়।
ত্রিহুতে পরমানন্দ পুরীর প্রকাশ;
শ্রীবাস অঙ্গনে সর্ব্বকীর্ত্তন বিলাস।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু করেন কীর্ত্তন,
চৌদিকে বেড়িয়া নাচে যত ভক্তগণ।
হরি বলি বাহু তুলি হুঙ্কার গর্জ্জন,
আছাড়ে আছাড়ে বিশ্ব হয় বিদারণ!
কভু হাস্য কভু কান্না মূর্চ্ছা ম্রিয়মাণ;
কভুদন্ত কড় মড়ি গড়া গড়ি যান।
শ্রীনিমাই বিনা শচী না জানেন আর,
যা কে তাকে কন "পুত্র কি হৈল আমার।
"কি জানি কেমন ব্যাধি হইল বাছার,
হরির কীর্ত্তনে এত হয় মূর্চ্ছা কার?
বিষম বায়ুতে বুঝি উন্মাদ করে,
পুড়িল কপাল মোর এতদিন পরে;
স্বামিসুত সুখযত ঘুঁচায়েছে বিধি;
নিমু মোর একমাত্র হৃদয়ের নিধি!"
চিন্তায় ব্যাকুল শচীমাতা ঠাকুরাণী;
বিষম বিষ্ণুর মায়া মোহে তাঁর প্রাণি!
সন্তান বৎসলা শচী জগতের মাতা,
না জানেন পুত্র তাঁর ত্রিলোকের পাতা।
ব্রহ্মাশিব সনকাদি বাঞ্ছয়ে যে রোগে,
স্নেহগুণে অন্ধ শচী হেন ভক্তি যোগে!
নিমাইর প্রেমনিষ্ঠা নিরখি অপার;

অদ্বৈত করেন সুখে হরির হুঙ্কার !
আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন প্রকাশ ;
সর্ব্ব বৈষ্ণবের দুঃখ হইল বিনাশ !
অঘ, বক, পুতনায় করিলা মোচন ;
বলিরে চরণ দিলা হইয়া বামন ;
সে নন্দ-নন্দন অধিষ্ঠান নদীয়ায় ;
কীর্ত্তন নর্ত্তন রসে ধরা ভেসে যায় !
জয় শ্রীচৈতন্য জয় পণ্ডিত শ্রীবাস
যাঁহার অঙ্গনে প্রভু নিত্য পরকাশ ॥

সুদীন—হরিচরণ দে।

সাধন তত্ত্ব বিচার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

হরিদাস—বিশ্বাসকে দৃঢ়ীভূত করিবার উপায় কি ?

গুরুদেব—জীবের এই ভীষণ ব্যাধি হইবে জানিয়াই পরম দয়ালু ভগবান তাহার ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। "তাবং কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে ॥" হে উদ্ধব! যতদিন নির্ব্বেদ (বিষয় ভোগে বৈরাগ্য) না জন্মিতেছে বা আমার বাক্যাদিতে অর্থাং শাস্ত্র ও মহাজন বাক্যে শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা শব্দে কহি বিশ্বাস সুদৃঢ় নিশ্চয়) না জন্মিতেছে ততদিন জোর করিয়া শাস্ত্রোক্ত শ্রবন কীর্ত্তনাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিতেই হইবে। তুলার বালিশ জলে ডুবিতে চাহেনা, জোর করিয়া ডুবাইতে ডুবাইতে ক্রমে যখন তুলা ভিজিয়া যাইবে, তখন টুপ করিয়া তলাইয়া যাইবে। ইহার নামই সাধন বা অনুশীলন।

আমার কথায় বিশ্বাস করিতে হইলে আমাকে ভালরূপ জানা চাই ; বিশেষতঃ একবার যখন সহজ বিশ্বাস টলিয়া গিয়াছে, তখন ভাল করিয়া

আমার তত্ত্ব না জানিলে মন ফিরিবে কেন? তুমি ছাদের উপর হইতে নামিতে চাও, আমি হাত উঁচু করিয়া দিয়া বলিতেছি আমার হাতের উপর সটান অঙ্গ ছাড়িয়া দাও, আমি নামাইয়া লইতেছি। তুমি আমায় দেখিতে পাইতেছ না। অথবা আমার হাতও দেখিতে পাইতেছনা কেবল আমার কথা শুনিতেছ, তাহাও কখন সত্য মনে হইতেছে কখন ও অশরীরিণী বাণী বোধ হইতেছে আবার কখন ও বা মরীচিকা ভ্রম বলিয়া প্রতীত হইতেছে, এ অবস্থায় তুমি কিরূপে আত্ম সমর্পন করিবে? "রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ" ইনিই রক্ষা করিতে সমর্থ এই দৃঢ় বিশ্বাস আগে আসিলে তবে গোপ্তৃত্বে বরণ অর্থাৎ রক্ষাকর্ত্তা জানিয়া আত্ম নিবেদন আসিবে। সর্ব্ব প্রথমে, আমাকে জানিতে হইবে, আমাকে সমর্থ বলিয়া বুঝিতে হইবে, তবেই আমার উপর পাকা বিশ্বাস আসিবে, আমার জানিতে হইলে আমার গুণ-কর্ম্ম দ্বারা জানিতে হইবে। যেহেতু আমি অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ীভূত নহি, কেবল মাত্র ভক্তি-যোগে শ্রবন কীর্ত্তনাদি দ্বারা আমার সাক্ষাৎ অনুভব হইয়া থাকে।

"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাং।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥

এক মাত্র শ্রদ্ধা যুক্ত ভক্তি দ্বারাই সাধুগণ আমাকে প্রিয় আত্মারূপে লাভ করেন, চণ্ডাল ও আমাতে নিষ্ঠা ভক্তি করিয়া জাতি দোষ হইতে পবিত্র হইতে পারে।

আমি বেদাদিতে দুর্লভ কেবল আমার ভক্তের নিকট সুলভ। "বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ" (ব্রহ্ম সংহিতা)। আর আমিই শ্রীভাগবত, "কৃষ্ণ তুল্য ভাগবত বিভু সর্ব্বাশ্রয়" ভক্তি পূর্ব্বক ভক্তি শাস্ত্র আলোচনা করিলে আমাকেই পাইবে, আবার "সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্" (শ্রীমদ্ভাগবত)। *সাধুগণ আমার হৃদয় আমি সাধুগণের হৃদয়*, সুতরাং সাধুসঙ্গ করিলে আমারই সঙ্গ করা হইবে এবং তাহাতেই আমাকে জানিতে পারিবে। আর "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" "গুরু কৃষ্ণরূপ হ'ন শাস্ত্রের প্রমাণে" অতএব শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করিলে আমাকেই জানিতে পারিবে।

জগজ্জীবের পরম সৌভাগ্য বলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেব মধ্যে একাধারে এই চতুর্ব্বিধ মুক্তির অদ্ভুত সমাবেশ হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেব স্বয়ং পূর্ণ-ব্রহ্ম ভগবান, তিনিই মূর্ত্তিমান ভাগবত, তিনিই ভক্ত রূপধারী আবার তিনিই জগদ্‌ গুরু।

সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্র কুমার।
আপনে চৈতন্য রূপে কৈল অবতার॥

শ্রীচরিতামৃত।

তাহা হইতেই সর্ব্ব শাস্ত্রের উৎপত্তি, তিনিই ভক্তি শাস্ত্রের জীবন্ত মূর্ত্তি আবার তিনিই ভক্ত রূপে ভগবান।

একলে ঈশ্বর তত্ত্ব চৈতন্য ঈশ্বর।
ভক্ত ভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর॥

শ্রীচরিতামৃত।

তিনিই আবার গুরুরূপে জগৎকে শিক্ষা দিতেছেন।

আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥

শ্রীচরিতামৃত।

তাই মানব জাতির অনন্তকালে সাধনের দিব্য ফল স্বরূপ সেই অপূর্ব্ব পরম সুন্দর বস্তু শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের উদয় হইয়াছে। যাহারা সেই দুর্ল্লভ চিন্তামণি ধনকে চিনিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে অন্যতম মহাভাগবত শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী সেইজন্য নিরুদ্ধাতিশয় সহকারে বলিতেছেন।

চৈতন্য সমান আর কৃপালু বদান্য।
ভক্তবৎসল নাহি আর ত্রিজগতে ধন্য॥

শ্রীচরিতামৃত।

বৎস! তিনিই কৃপালু, তিনিই বদান্য, তিনিই ভক্তবৎসল; তাহাকে আত্ম-সমর্পণ করিতে আর বিন্দু মাত্র দ্বিধা করিওনা বৃথা অবিশ্বাসী হইয়া অপরাধী হইওনা। আর বেশী বিচারের প্রয়োজন কি? একবার ভক্তিভাবে কর্ম্ম করিয়া দেখ তখন তুমিও ঐ বৃদ্ধ কবিরাজ গোস্বামীর সহিত এক কণ্ঠ হইয়া বলিবে—

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গোররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখি বারে পায়॥

কলিহত জীবের জন্য তিনি পরম ব্যাকুল তাই এখনও আমাদের দ্বারে দ্বারে যাইয়া করুণ-হস্ত তুলিয়া ডাকিতেছেন আর পরম-মঙ্গল হরিনাম বিলাইতেছেন। চক্ষে দেখিয়া ও যদি সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাকে আত্ম সমর্পণ করিতে না পার, তবে তুমি অপরাধী মন্দভাগ্য, তোমার শুভদিন এখনও বহুদূরে, জীব-দুঃখ-কাতর বৃদ্ধ ভক্ত কিছুতেই থাকিতে পারিতেছেন না। ৯০ বৎসরের জরাতুর বৃদ্ধ, তাই বারংবার উৰ্দ্ধ বাহু হইয়া দোহাই দিয়া বলিতেছেন—

অতএব পুন কহোঁ উৰ্দ্ধ বাহু হইয়া।
চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া॥ শ্রীচরিতামৃত।

কি আশ্চর্য্য পরহিতৈষণা! ভাইরে! প্রপন্ন হইয়া একবার নাম লইয়া দেখ সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের উদয় হইবে।

অদ্যাপিহ দেখ চৈতন্য নাম যেই লয়।
কৃষ্ণ প্রেমে পুলকাশ্রু বিহ্বল সেই হয়॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে ভজিলেই তিনি করেন উদ্ধার॥

জাতি কুল, ধনী দরিদ্র, মূর্খ পণ্ডিত, পাপী সাধু, কোনও বিচার নাই প্রাণ খুলিয়া ডাকিলেই হইল।

চিরাদদত্তং নিজগুপ্তবিত্তং স্বপ্রেমনামামৃতমত্যুদারঃ।
আপামরং যো বিততার গৌরঃ কৃষ্ণোজনেভ্য স্তমহং প্রপদ্যে॥

শ্রীচরিতামৃত।

তাঁহার নিজস্ব নামামৃত যাহা চিরদিন গুপ্তছিল, যাহা কোন অবতারে বিতরিত হয় নাই শ্রীকৃষ্ণ গৌররূপ ধারণ করিয়া সেই অনর্পিত দেবদুর্ল্লভ রত্ন অবিচারে বিতরণ করিলেন, এবং পামর পাপী হইতেই বিতরণ আরম্ভ হইল। এমন দয়ালু শ্রীচৈতন্য দেবের নিকট প্রপন্ন হইয়া আমি শরণ লইতেছি।

এমন দয়ালু আর হইতে নাই অতএব সংশয়শূন্য হইয়া নির্ব্বন্ধ সহকারে সেই জগদ্গুরু মহাপ্রভুর কথায় দৃঢ়-বিশ্বাস কর, একবার প্রাণ খুলিয়া বল—

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বাণী অমৃতের ধার।
তঁহো যে কহেঁন বস্তু সেই বস্তু সার॥ শ্রীচরিতামৃত।

বিশ্বাস কর—বিশ্বাস করিয়া তাহার নির্দ্দেশ মত কাজ করিয়া দেখ নিজেই তখন সব বুঝিতে পারিবে।

বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।

ক্রমশঃ

শ্রীবামাচরণ বসু দাস।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা।

:০:

যে মহাপুরুষের অপার করুণা-কটাক্ষে বিকৃত গৌড়দেশ মোক্ষ-ধর্ম্মের উন্নত চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিল, যাঁহার আদর্শ চরিতাবলী, বিশ্বপ্রেমিকতার অতুলনীয় চিত্র। যে আদর্শ অনুকরণে একদিন সমগ্র গৌড়ভূমি অলৌকিক ঈশ্বপ্রেম পরিপ্লুত জনানুরাগিতার উত্তাল তরঙ্গে নাচিয়াছিল। যিনি কলি জীবের কল্যাণ কামনায় অলৌকিক ত্যাগস্বীকার করিয়া এই আত্মম্ভরিতাময় উচ্ছৃঙ্খল গৌড় সমাজকে অভূতপূর্ব্ব একতা শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত ও একসূত্রে নাচাইয়া ছিলেন। যাঁহার নাম-গুণ-কীর্ত্তন করাল কর্ত্তরী সহায়ে কাম-কলুষিত কলি জীবও দুর্জ্জয় আধ্যাত্মিক মহাসমরে অনায়াসে বিজয় লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। যাঁহার ভক্তবাৎসল্য এই ঘোরাতিঘোর নাস্তিকতাময় কলিযুগেও তৎ পদাশ্রিত জনে এখনও প্রত্যক্ষ হইতেছে। সেই বিশ্বজনবন্ধু দয়াসিন্ধু শ্রীগৌরচন্দ্রের অজ-ভব-বাঞ্ছিত, ভববন্ধন-ছিদ, সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদ, অপার প্রীতিরস প্রদীপ্ত করুণামৃত চন্দ্রিকা এখনও যে অস্তমিত হয় নাই, নানা প্রকারে তাহা আমাদের অনুভব হয়।

এপর্য্যন্ত সামাজিক ধর্ম্মোন্নতির অবস্থা আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, পর্য্যালোচনায় ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, গৌড়ীয় ধর্ম্ম-সমাজে এখনও ঘোর দুর্দ্দিনের প্রবল প্রাদুর্ভাব সম্পূর্ণ অপনীত হয় নাই। কএক বৎসর মধ্যে যদিও পবিত্র সাত্বিক ভাবোদ্দীপ্ত বৈষ্ণব ধর্ম্মালোক পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক প্রদীপ্ত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু নিরক্ষর, কুসংস্কার, কুটিল কপটী, ধর্ম্ম-ধ্বজী দলে তাহার

বিমল জ্যোতী আদৌ পতিত হয় নাই, সে পবিত্রালোক পাশ্চাত্য বিদ্বৎসমাজেরই অতি অল্প হৃদয় সমুজ্জ্বল করিয়াছিল, তথাপি শত সহস্র সর্ষপ তৈল বর্ত্তিকা মধ্যে অল্প-সংখ্যক গ্যাসালোক অধিক কার্য্যকরী ও চিত্তগ্রাহী। নব্য সমাজের বিদ্বৎ শ্রেণী মধ্যে শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মালোক অল্প লোকের হৃদয় আলোকিত করিলেও সে আলোক গৌড় সমাজের প্রগাঢ় অবিদ্যান্ধকার বহুল পরিমাণে অপসারিত করিয়াছিল। বরং ঐ উচ্চস্তরের অপেক্ষা মধ্যস্তর-মণ্ডিত মণি-দর্পণে শত শত বিম্বানুবিম্ব প্রতিফলিত করিয়া সে ধর্ম্মালোক সমাজের এক অভিনব শোভা-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছিল। অধঃস্তর ঘোর মূর্খতার মসী মলিন মোহান্ধকার সমাবৃত থাকিলেও কথঞ্চিৎ ধ্বস্তদোষাতমঃ উষা প্রতীম ধূসরিম বিভা ধরিয়াছিল। হায়! কাল মাহাত্ম্যে অতি অল্প দিনেই সে পবিত্রালোক স্তিমিত, প্রায়ই নির্ব্বাপিত। এখন অতি অল্প হৃদয়েই সে উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছে, আর অধিকাংশই ঘণ-ঘটা-ঘটিত ঘোরান্ধকার কুহু নিশার দিশাহারা, কোথাও বা বেতাল তাণ্ডবিত কবন্ধ-করাস্ফোট নিনাদিত ভীষণ শ্মশানক্ষেত্র বিশেষ। হা গৌরাঙ্গের লীলাভূমি গৌড়মণ্ডল! তোমার বর্ত্তমান দশা দেখিলে বাস্তবই প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। যাহা দেখিতে চাই তাহা পাইনা, কেবল ধূ ধূ ধূ ধনাশাবিশুষ্ক মরুভূমি—যেন কামনা কলুষিত শত মৃগ-তৃষ্ণিকাপরিব্যাপ্ত ভীষণ—ভীষণ হইতেও ভীষণতর—কচিদ্বা ভীষণতম বিদ্বেষময় রাক্ষস রাজ্য—কচিৎ ঘোর নাস্তিকতাময়ী উষর ভূমি।

হা শান্তি! শান্তি!! কোথায় তুমি! তোমার সত্ত্বা কি চির দিনের মত তিরোহিত হইয়াছে! না! না! এখনও অনেক হৃদয়ে শান্তিময়ী প্রেম-ভক্তির সুশীতল পূতসলিলা প্রবাহিনী তর তর তরল প্রবাহে তীরবেগে ছুটিতেছে, কোথায় অলস বিবস মন্থর গতি, কোথাও বা উত্তাল তরঙ্গময়ী—উদ্দাম উৎসাহ মাতিন যেন হৃদয় ছাপাইয়া উল্লাসে উল্লম্ফন করিতেছে, আবার কোথাও ক্ষীণ ধারা, কোথাও পঙ্কিলা, কোথাও ফল্গু নদীর মত অন্তঃশীলা!! কিন্তু হায়! হায়! চারিদিকে দারুণ দিগন্তব্যাপী দগ্ধ মরু! ঘোর দ্বাদশাদিত্য প্রতাপ-প্রতপ্ত-বালুকারাশি ধূ ধূ ধূ ধূ করিতেছে। প্রচণ্ড প্রায় মার্ত্তণ্ডের অগ্নিময়ী ময়ূখ মালায় ত্রিতাপের ত্রিমূর্ত্তি মূর্ত্তিমান্ হইয়া বিকট বিশাল ব্যাদিতানন বিস্তার করিয়া ঝন ঝন ঝঞ্ঝা ঝম্পে লম্ফে লম্ফে নৃত্য করিতেছে,

তাই সে শান্তিময়ী প্রবাহিনী আর অগ্রগামিনী হইতে পারিতেছেনা, ক্রমেই কূলে কূলে আকুল স্মৃতির কলঙ্কে অঙ্ক অঙ্কিত করিয়া অকালে অবসান প্রাপ্ত হইতেছে।

হা গৌড়মণ্ডল ভূমি ! তোমার সে সুখময় শুভদিন কোথায় গেল ? তোমার সে ভুলোক দুর্লভ অপূর্ব্ব বৈষ্ণব বৈভব কে হরণ করিল ? তোমার সেই প্রেম প্রতিমূর্ত্তি গীত-কীর্ত্তি ভক্তসন্তানগণ কোথায় ? হা রত্নগর্ভে ! এখন এ কি প্রসব করিতেছ ? তোমার যে গর্ভে রূপ সনাতন জীব গোস্বামীর অভ্যুদয়, যে গর্ভে স্বরূপ রামনন্দ হরিদাস শ্রীবাস মুরারি মুকুন্দাদি অগণিত বৈষ্ণব রত্নের উদ্ভব, যে গর্ভে প্রতাপরুদ্র বসন্তরায় সন্তোষরায় রায়শেখর প্রভৃতি ক্ষিতিপতিগণ শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দাদি মহা প্রেমময়গণ, আরও কত কত শত শত সহস্র অর্ব্বুদ ভক্ত সন্তান প্রসবিত হইয়াছিলেন, সে রত্নগর্ভ কি কলি কলুষানলে দগ্ধ হইয়াছে ? তাই এখন সেই দগ্ধাবশেষে ভষ্মরাশি বিকীর্ণ করিয়া লজ্জায় পূর্ব্ব গৌরব আচ্ছন্ন করিতেছ। হা গৌড় ভূমি ! তোমার যে ভাগ্যাকাশে অপরূপ গৌরমেঘের উদয় হইয়াছিল। যাহার বিজুরী গদাধর, গর্জ্জন অদ্বৈত, বর্ষণ নিত্যানন্দ, যাহার প্রেম ধারায় তোমার সর্ব্বাঙ্গসিক্ত হইত, যুগল লীলারসের প্লাবন বহিত, হরিনাম সংকীর্ত্তনের উত্তাল তরঙ্গ উঠিত, আর অনন্তার্ব্বুদ কণ্ঠ নিনাদিত দিগন্তব্যাপী হরি হরি ধ্বনির কল-কল্লোলে কর্ণ জুড়াইত, বল দেবি ! কোন দুর্ভাগ্য ঝটিকায় সে অনুপম মেঘ উড়াইয়া দিল ? এখন আবার সেই আকাশে অকল্যাণ স্বরূপ এ অকাল ধূম কেতু কোথা হইতে আসিল। হা গৌড় মণ্ডল ভূমি ! হা চিন্তামণি ময়ি ! হা ভক্ত প্রসবিণি ! ভক্তিরস সরসে ! পরম প্রেমময়ি ! তুমিই না আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গের ক্রীড়াকানন ! তোমার পবিত্র বক্ষেইত শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীনবদ্বীপ, নিত্যানন্দের একচক্রা, শ্রীঅদ্বৈতের শান্তিপুর পুরী বিরাজিত ! তোমার সরস অঙ্গেইত আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু কলি-জীবের কল্যাণ কামনায় "অন্তরু অন্তরু, ভকত কলপ তরু রোপলি বামহি বাম।" আহা ! মনে করিতেও দেহ রোমাঞ্চিত হয়; এমন দয়ার সীমা কি কেহ কখন আর কোথাও দেখাইতে পারিয়াছ ! আমাদের অন্য মেই আমাদের দয়াবতার গৌরাঙ্গ প্রভু স্থানে স্থানে যে ভক্তকল্পতরু স্বহস্তে রোপণ

করিয়াছিলেন, যাহার প্রেমামৃতময় ফলাস্বাদনে গৌড়বাসী প্রেমময় হইত, যদিও সে সকল কল্পতরু অন্তর্হিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার বীজোৎপন্ন অসংখ্য কল্পতরু রাজি তোমার পবিত্র অঙ্গ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। হায়! কি কদর্য্য কাল প্রবাহ, কি আমাদের ভাগ্য বিপর্য্যয়, এখন সেই সকল কল্পতরু আর অমৃত ফল প্রসব না করিয়া এই বর্ত্তমান দুর্ভাগ্যের পল্লব বিস্তার করিতেছে। হায়! হায়! যাহার ছায়ায় জগৎ জুড়াইত, এখন তাহার ছায়া স্পর্শ করিয়া লোক শনির দশায় পড়িতেছে, তাই আজ গৌড়ক্ষোণি! তোমার এ দুরপণেয় দুর্দ্দশা; তাই আজ তুমি সধবা হইয়াও বিধবা, সুপুত্রা হইয়াও অপুত্রা, সচন্দ্রা হইয়াও চারু-চন্দ্র-গ্রাসিনী অমা-কলার-কালিমাময় তিমিরাবরণে লজ্জায় মুখাবরণ করিয়াছ। হে দেবি! শীঘ্র রসাতলে যাও, আর আমরা তোমার এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখিতে পারিনা।

হায়! হায়! যে দিকে চাই, সেই দিকেই হৃদয় বিদারক দৃশ্য! এক সময় অগণিত দেবালয়ে তোমার সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কৃত হইয়াছিল। প্রতি দেবালয়েই প্রতি নিয়ত ভক্তি উৎসবের উৎস ছুটিত, ভক্ত কণ্ঠের আবেগ মাখা মধুর সঙ্গীত, মৃদঙ্গ করতালের প্রাণোন্মাদী তালে প্রেমোন্মত্ত ভক্তগণের উদ্দাম উদ্দণ্ডনৃত্য, প্রেমানন্দ সঞ্চারিণী হরি হরি ধ্বনি, যুগল বিগ্রহের উল্লাসকর মধুর সজ্জা অভক্তেরও নীরস প্রাণ ভক্তিরসে ডুবাইয়া দিত। শত শত সংসারাবিষ্ট নর নারী সেই পরম মঙ্গল উৎসবাকর্ষণে আকৃষ্ট চিত্ত হইয়া ক্ষণকালের জন্যও সংসারের তীব্র তাপ ভুলিয়া আত্মহারা হইত। আবার অন্যদিকে ভোগ মহোৎসবের বিপুল পবিত্র সম্ভারে শত শত বুভুক্ষুর ক্ষুধাক্লিষ্ট প্রাণ আপ্যায়িত হইত। কালের পরিবর্ত্তন প্রভাবে এখন সেই সব দেবালয় বিজন, জঙ্গাল পূর্ণ দেহে যত্নহীন মলিন দেব বিগ্রহ বক্ষে লইয়া কালজীর্ণ বিদীর্ণ বিশাল ব্যাদিতাননে বিকট-দন্ত বিকাশ করিয়া যেন গ্রাস করিতে আসিতেছে। হায়! হায়! এদৃশ্য দেখিয়া কার নয়ন মুদিত না হয়?

শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদ বৈষ্ণব গুরুগণের যে শত শত শ্রীপাট তোমার অঙ্গে প্রেমভক্তির পবিত্র প্রস্রবণ প্রবাহিত করিত, এখন একি দেখি! সেখানে সংসারানলের ভীষণ আগ্নেয়গিরি উৎকট অগ্ন্যুৎপাতে দেশ উৎসন্ন করিতেছে।

গৌড়মণ্ডলের প্রতিগৃহে প্রতি জনেজনে যে সর্ব্ব কল্যাণ-মূলা গুরু-ভক্তির উজ্জ্বল দীপমালা পর্ব্বাঙ্গনের ন্যায় তোমার গৌরব-দীপিত অঙ্গ আলো করিয়া রাখিত, তাহা সমস্তই নির্ব্বাপিত; যে বস্তুশক্তিতে তাহা জ্বলিত সে বস্তুশক্তি চিরবিলুপ্ত, তাই এখন তাহা ঘোরান্ধকূপ, ভূত প্রেতের আনন্দ নিকেতন।

হা বিষ্ণুক্ষেত্র! তোমার ব্রাহ্মণ সন্তানগণ এখন বিষ্ণু পূজা কার্য্য অপমান জনক মনে করিয়া নীচ বৃত্তিকে সম্মানার্হ জ্ঞান করিতেছেন। কাযেই মনে করিতে হয় এখনও যে সব শ্রীচক্র ও শ্রীবিগ্রহ কষ্টে বা অযত্নেও সেবা পাইতেছেন, আর অন্ততঃ ১৫।২০ বৎসর বা তন্ন্যূন কাল মধ্যেই পূজকাভাবে তাহা সলিল গর্ভে চির বিসর্জ্জিত হইবে, কিম্বা ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসীর আখরায় স্তূপীকৃত হইবে।

হা দেবি! তোমার সর্ব্বাঙ্গ ভূষণ বৈষ্ণব সন্ন্যাস এখন বিকৃত, নানা সম্প্রদায়ে জাতিবৈষ্ণবে পরিণত। কোথাও সন্ন্যাসী প্রায়, কোথাও বা ভীতি জনক তৃণাচ্ছাদিত পঙ্কিল কূপ সদৃশ অজ্ঞাত চরিত্র। গৃহী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও যেন স্বেচ্ছাচারিতায় পঙ্কিল সরোবর: প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা এ বৈষ্ণব প্রবাদের প্রকৃতই অস্তিত্ব নাই, সর্ব্বত্রই এখন প্রতিষ্ঠার একাধিপত্য।

হা মাতৃভূমি! তোমার সন্তান সন্ততিগণের পঞ্চদশাংশ বৈষ্ণব, একাংশ অন্য দেবদেবী। তাই তোমার অপর নাম বৈষ্ণবীভূমি, তাই তোমার এত গৌরব। যদিও এখনও তাই আছে, নাই কেবল সে স্বধর্ম্মনিষ্ঠা। এখন তোমার একাংশ স্বধর্ম্মে কথঞ্চিৎ অবস্থিত, পঞ্চদশাংশ নাস্তিকপ্রায় শিশ্নোদর পরায়ণ বিকৃত সংসারী। হায়! যে দেশের নীচ জাতিয়া স্ত্রীগণও হরিনাম জপ না করিয়া জল গ্রহণ করিতনা, সেই দেশবাসী এখন অনেকেই আদৌ ভগবানের অস্তিত্বই অবগত নহে। এইরূপ অধম হিন্দুশ্রেণী কি যবন অপেক্ষাও নিকৃষ্ট নহে? যবনেও পাঁচবার নামাজ করে, একমাস রোজা রাখে, অষ্টমবর্ষীয় বালক হইতে বৃদ্ধ বনিতা সকলেই এক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত; মূর্খ, কৃষক, ভিক্ষুক, শ্রমজীবী, দরিদ্র, সকলেই সহস্র সহস্র সাংসারিক কার্য্য ফেলিয়াও নির্দ্দিষ্ট সময়ে পাঁচবার উপাসনা করে। আর হিন্দুগণ! তোমরা কি কর? ভ্রাতৃগণ, একবার মনে মনে ভাবিয়া দেখ, বলিয়া

আমি শক্র হইতে চাহিনা। উদয়াস্ত আহার চেষ্টায় বুভুক্ষু ব্যাদিতচঞ্চু কাক কাকা রবে ভ্রমণ করে; তাহার হা হা চেষ্টার ক্ষণকালও বিরাম নাই, কিন্তু কোকিল পর্য্যাপ্ত আহার সংগ্রহে রত থাকিয়াও প্রাণ খুলিয়া মিষ্ট গান করিতে যথেষ্ট সময় পায়। আবার লক্ষ্য করিয়া দেখিও, উষায় সন্ধ্যায় সকল পক্ষীই যখন প্রাণ খুলিয়া বিশ্বরঞ্জনের মনোরঞ্জন স্তুতিগান করে, কাক তখন নীরব। ভ্রাতৃগণ! নিরন্তর কাক্ চেষ্টাই কি কার্য্য কুশলতা? ভ্রান্তি, নিতান্ত ভ্রান্তি; সেই শান্তিময়ের উপাসনা ভিন্ন অশান্তির অবসান কিছুতেই নাই, কিছুতেই নাই। ভ্রাতৃগণ! দেখ যেখানে প্রান্তরবক্ষ বিধৌত করিয়া তরতর তরল তরঙ্গিনী প্রবাহিতা, তাহার উভয় কুল কেমন সরস, শ্যামল শস্য পূর্ণ; নবপল্লবিত তরু লতা গুল্ম ফল ফুল মুকুলে কত শোভাময়। আবার দেখ, সাহারামরু চিরদিনই হা হা রবে দগ্ধ হইতেছে, সেখানে যেই যায় সেই জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে, মায়া মরিচিকা বিভ্রান্ত অপথ প্রান্থ! বৃথা ক্লান্ত হইওনা ক্ষান্ত হও, মরীচিকার মঙ্গল নাই, মঙ্গল আছে মঙ্গলময়ের উপসনায়। বিমুখ হইয়া দুঃখ আনিওনা, উন্মুখ হও সকল সুখ সম্মুখে আসিয়া নৃত্য করিবে। হায়! হায়! কে শুনিবে? শব কর্ণ শুনে কি? গৌড় ভূমি! অগণ্য সংসারচিতায় শব সন্তান-সংহতি তোমার অনন্ত বক্ষে বেশ সাজিয়াছে? তাই বৈষ্ণবভূমি আজ তুমি আনন্দময়ী মহামায়ার মহাশ্মশান।

তবে আর কার মুখ চাহিব? কে তোমার এই দুরাবস্থা দূর করিবে? যে গৌরচন্দ্রের করুণামৃত চন্দ্রিকায় তোমার সৌভাগ্য কুমুদ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, সে চন্দ্র অস্তমিত, আর কি তাহা উঠিবেনা? অস্তের পর উদয় ইহাত নিশ্চিত! হা ভ্রান্তচিত্ত! চন্দ্রের কি উদয়াস্ত আছে? উহা আমাদের দৃষ্টির অবরোধ। সেই অপার করুণামৃত চন্দ্রিকারও কি অবসান আছে, না তাহার হ্রাস বৃদ্ধি আছে, কেবল আছে আমাদের অদৃষ্টে; তাই কেহ দেখে কেহ দেখেনা। নিদাঘ নিশীথে সুবাতাস সর্ব্বত্রই সমান বহে, কেহ নিদ্রায় অচেতন, সে অনুভব করিতে পারে না, কেহবা রুদ্ধ গৃহে এমন খিলকপাট মারিয়া আছে, সেখানে সে সুবায়ু প্রবেশ করেনা, যে তাপার্ত্ত হইয়া বায়ু সেবনের জন্য আগ্রহ সহকারে মুক্ত কক্ষে বসিয়া থাকে, সেই তাহর সুখস্পর্শ শৈত্যানুভব করিতে পারে। অতএব শ্রীগৌড়মণ্ডল এখনও শ্রীগৌর করুণামৃত চন্দ্রিকায়

বঞ্চিত নহে ; কেবল অজ্ঞান তিমিরে গৌড়বাসীর নয়ন আচ্ছন্ন হইয়া আছে, জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দ্বারা সে নয়ন উন্মীলন করাইবার কি কেহ নাই ? তা আছে বই কি ? কিন্তু থাকিয়াও নাই। কুলে অনেকেই আছেন কিন্তু মূলে নাই।

এক সময় যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের এত প্রসার হইয়াছিল, তাহার কারণ কি ? কারণ বৈষ্ণবী সিদ্ধি। হৃতরাজ্য রাজাকে যেমন প্রজাগণ কিছুদিন পূর্ব্বগৌরবে গৌরব করিয়া ক্রমে অনাদর করে, বর্ত্তমান অসিদ্ধ গুরুকুলেরও ঠিক সেই অবস্থা। সে কালের গুরুগণ নিজ সিদ্ধিপ্রভাবে পরিচিত ও গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন, একালের তদ্বংশীয় গুরুগণ সাধন বিমুখ ভোগ বিলাসী সুতরাং কেবলমাত্র বংশ গৌরবেই পরিচিত। এই কুল গৌরবই ক্রমে তাঁহাদিগকে সাধন পথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া এই এক প্রকার কুলক্রমাগত এক চেটিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করাইয়াছে, এখন কেবল মন্ত্রের ক্রয় বিক্রয় ব্যতীত দাতা গৃহিতার অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই। যাহা হউক ইহার মন্দের মধ্যেও একটা শুভফল এই যে মূলধন থাক বা না থাক টাট্‌ খানা বাহাল আছে। তাহা না হইলে শ্রীগৌড় মণ্ডলে যে, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের অবতার হইয়াছিল তাহার স্মৃতি চিহ্নও বোধ হয় থাকিত না। প্রায়ই বিলুপ্ত হইলেও এখনও অনেক শ্রীপাট বা শ্রীটাট্‌ আছেন, বৈষ্ণব সমাজেরও কতকটা অবয়ব স্থানে স্থানে আছেন। মালা, তিলক, ছাঁপা, মুদ্রা, শিখা, সদাচার, হরিনমা, গানকীর্ত্তন, নৃত্য, ভাবাবেশ, বিগ্রহসেবা, বৈষ্ণবসেবা, মহোৎসব, হরিবাসর, যাত্রাউৎসব, সবই আছেন। গোস্বামী, ঠাকুর, অধিকারী, মহান্ত, অভ্যাগত আখরাধারী, জাতিবৈষ্ণব, গৃহীবৈষ্ণব সবই আছেন। শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি এখনও এসব ভূষণ অঙ্গে পরিয়া আছেন নিরাভরণা হন নাই, কিন্তু অমার্জ্জিত মলাবৃত, তাই উজ্জ্বলতা নাই ; সেই জন্যই বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে যে, টাট্‌ বাহাল আছে মাত্র মূলধন নাই। সেই অমূল্য স্বদেশী দ্রব্যে যদি দোকান পূর্ণ থাকিত, তবে কি আর এই বিদেশী আমদানী হইত ? উন্মত্ত স্বদেশ-প্রেমিক ভাইয়াদের বয়কট বা বিদেশী বর্জ্জন এপথ দিয়া আইসে নাই। এই মুষ্টিমেয় বৈষ্ণব সমাজ এখন বর্ত্তমান সমাজে উপেক্ষার বস্তু, কিন্তু যদি সেই অলৌকিকী বৈষ্ণবী সিদ্ধি ঐ বৈষ্ণব সমাজে পূর্ণ থাকিত, তাহা হইলে সাধ্য কি কেহ উপেক্ষা করিতে পারে। ঘোর হিন্দু-ধর্ম্ম-দ্বেষী পাঠান রাজ্যাধিকারেই শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের দিগন্তব্যাপী বৈষ্ণবধর্ম্ম অবাধ প্রবাহে সর্ব্বত্র প্রভাব প্রকাশ

করিয়াছিল। গৌড়াকাশের শেষ নক্ষত্র রাধামোহন ঠাকুরেরও বৈষ্ণবী সিদ্ধি গৌড়াধিপর মুর্শিদাবাদের-নবাব যবনরাজকেও এককালে চমৎকৃত করিয়াছিল। এখনত সর্ব্বত্র শান্তিময়, তবে এ শান্তিময় রাজ্যে ধর্ম্মের এই অধঃপতন কেন? ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ সিদ্ধির অভাবেই এই অসুর লোক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আসুরী সিদ্ধির দিকেই লোক আকৃষ্ট হইতেছে, আসুর কাল প্রভাবেই ধর্ম্মে অর্থে ওতঃ প্রোতঃ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে আর সেই অসুরগ্রস্ত চিত্তের দোষেই এই ঘোর নাস্তিক ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু যদি এই সুপথভ্রষ্ট লোক সঙ্ঘের সম্মুখে বৈষ্ণব ধর্ম্মের সেই উজ্জ্বল আলোক আবার কেহ ধরিতে পারেন, যদি কেহ স্ব-সিদ্ধি বলে বলীয়ান্ হইয়া জ্ঞানাঞ্জন শলাকা হস্তে লোক লোচনের অজ্ঞান তিমির পটল অপনয়ন করিতে গুরু গৌরব শিখায় অবতীর্ণ হন, তবে ডাকিতে হয় কি? আপনিই এই জনসঙ্ঘ আবার পূর্ব্ব পথে প্রত্যাবর্ত্তন করে। কিম্বা যদি বর্ত্তমান সমাজের গৌরবান্বিত বাগ্মিগণ মুক্তকণ্ঠে বৈষ্ণব ধর্ম্মের পবিত্র মন্ত্র ঘোষণা করেন, বর্ত্তমান সমাজের উচ্চপদস্থ গণ্য মান্য কৃতি সন্তানগণ এই পবিত্রাদপিপবিত্র ধর্ম্মের মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া অনুষ্ঠান ও অনুশীলন করেন, আর যদি বর্ত্তমান সমাজের উচ্চ শিক্ষিত কৃতবিদ্যগণের বিজ্ঞান বিমার্জ্জিত তীক্ষ্ণবুদ্ধি সহায়ে বৈষ্ণব ধর্ম্মের পৃষ্ঠদণ্ড ভক্তি শাস্ত্র সমূহের সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মগভীর তত্ত্বগুলি আলোচিত হয়, আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে সুদক্ষ গুরুগণ শ্রীপাদ গোস্বামী গণের বিশুদ্ধ ক্রম ভজন পদ্ধতি প্রচার করিতে থাকেন, তবে এখনই সমাজের ভাগ্যস্রোত নিশ্চয় ফিরিয়া যায় সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হয় কৈ? প্রাচীনদল কতকটা ভজনাঙ্গে আছেন বটে, কিন্তু শাস্ত্রের কোনই আলোচনা রাখেননা, এই জন্য তাহাদের মধ্যে মূর্খতা সুলভ অনেক আবর্জ্জনা স্থান পাইয়াছে। নব্য দলও এখন অনেকে ভক্তি শাস্ত্রের যথা যোগ্য অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ভজনাঙ্গের মধ্যে নিবিষ্ট নহেন। এই জন্য উভয় দলই কর্ত্তব্যের পথ ধরিয়াও ধরিতে পারিতেছেন না। ভজন, অনুশীলন, দুইটি যতদিন একত্র না হইতেছে, ততদিন বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুদয় নাই। অতএব বৈষ্ণব ধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা বড় আশাপ্রদ নহে।

শ্রীরাম প্রসন্ন ঘোষ ভক্তিবিশারদ।

প্রার্থনা।

—:০:—

হে বিভো! করুণাময়!
দীননাথ ব'লে, চরণ কমলে,
শরণ লইলাম আমি।
'আমার' বলিবার, এজগতে আর,
কি আছে জগতস্বামি!॥
দারা পুত্র ধন, ছায়ার মতন,
আসে পুনঃ চলে যায়।
জলবিম্ব প্রায়, নিমেষের তরে,
ক্ষণে উঠে ক্ষণে লয়॥
আশার ছলনে, মোহের তাড়নে,
ভ্রমি, হ'য়ে পথ হারা।
মরীচিকা ভ্রান্ত, পথহীন পান্থ,
উদ্ভ্রান্ত পাগল পারা॥
দুদিনের তরে, সকলি সংসারে,
তবু নাহি মায়া ঘুচিল।
দিন চলে যায়, আয়ু হয় ক্ষয়,
তবু নাহি মন বুঝিল॥
ভবের সাগরে, তরা'বার তরে,
হরি! তুমি আছ কাণ্ডারী।
অনাথের নাথ! দিও হে আমারে,
অভয় চরণ তরী॥

শ্রীনিশিকান্ত ভৌমিক।

সংসার সন্তপ্তের

প্রার্থনা।

—:o:—

(বোঝা ধরে কে ?)

"দুর্গমেপথিমেহন্ধস্য স্খলং পাদগতেমুর্হুঃ।
স্বকৃপা যষ্টিদানেন সন্তঃ সন্তুবলম্বনং॥"

আঃ! কি ভয়ানক ভারী বোঝা! বোঝার ভারে আর সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছিনা। দিনে দিনে কুব্জা হইয়া গেলাম। আমার যে ঘাড় ভাঙ্গিয়া মরিবার যো হইয়াছে দেখিতেছি। এ তো আর কোন বোঝা নয়;—পাথরের বোঝা, লোহার বোঝা বা মাটীর বোঝা হইলেও কোনমতে বহন করা যায়, এ যে দারুণ সংসারের বিশাল বোঝা। মাথায় করিয়া ঠেকিয়াছি, এখন আর নামাইতে পারি না।

উঃ! বোঝার চাপে মাথার খুলী নড়িয়া গেল! তাপে মজ্জা জল হইয়া গেল!! উপায় কি? এই সংসারবোঝাটার ভিতর এত অসংখ্য দুর্ভাবনার পুটলী,—দুশ্চিন্তার কুথলী,—অগ্নিবং উত্তপ্ত দুর্দ্দশার পেটিকা আছে জানিলে আর এমন অসাধ্য সাধনে অগ্রসর হইতাম না।

হায়রে! এমন একজন ব্যথারব্যথী নাই যে, একেবারে না হউক, মুহূর্ত্ত কালের জন্য এই বোঝাটা আমার মাথা হইতে টানিয়া তাহার মাথায় করে।' কি এমন একটী জন প্রাণী দেখিনা যে, আমার দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া বোঝাটা ক্ষণ কালের জন্য ধরিয়া নামায়।

তবে যাহারা আছে, তাহারা প্রায় সকলেই আমার মত বোঝাওয়ালা। আমার মত ক্লান্ত ক্লিষ্ট। কে কার বোঝা ধরে, আর কে কা'র বোঝা ধরিয়া নামায়!! আপনার ভার বহনে অসক্তব্যক্তি পরের বোঝা ঘাড়ে করিবে এ আবার কেমন কথা।

তবে দুই চারিজন মানবরূপী দেবতাকে পরের বোঝা টানিয়া মাথায় করিতে পরের দুঃখ দুর্দ্দশার ভাগ লইতে, আপনার দুঃখ ভুলিয়া গিয়া, পরের দুঃখ

মোচনের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিতে, কি পরকে সাধ্যমত সুখে রাখিয়া, নিজে আজীবন দুঃখ দাবানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে দেখা না যায় এমন নহে। কিন্তু হইলেও এরূপ নররূপীদেবতার সাক্ষাৎ পাওয়া তো বহু তপস্যার ফল। আর পাইলেই বা কি ? আমি এমন দয়ার প্রকট মূর্ত্তিগুলির উপর আপন দুঃখ ভার চাপাইয়া দিয়া, নিজে খুসী হইতে কখনই সম্মত হইব না। তাঁহারা আপন মহত্ত্বতায় আমার মাথার বোঝা টানিয়া নিতে চাহিলেও আমি দিতে বাধ্য নই। মরিতে হইয়াছে, আমিই মরিব। আর শিখিয়া লইব যে নিজে কষ্টভোগ করিয়াও পরের দুঃখ মোচন করা কর্ত্তব্য।

এইত গেল এক শ্রেণীর লোক। আর অবশিষ্ট যাহারা সংসার বোঝা মাথায় করে নাই, কি অদ্যাপিও সংসার বোঝার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহারা আমার বোঝা ধরিয়া নামান তো দূরের কথা, আরও আমার ক্লিষ্টতা জনিত মুখের বিকট ভঙ্গী দর্শনে পিশাচের মত "হি হি" করিয়া হাসিতে থাকে।

পুত্র, কন্যা, ভাই, বন্ধু, আত্মীয়, স্বজন কেহই আমার দুঃখের দিকে চায় না, কান্নায় কাণ দেয় না। আমি যে বোঝার চাপে সোজা হইতে পারি না, ইহা যেন তাহারা দেখিয়াও দেখে না। হা কপাল !! উপায় কি ?

তাইতো নিরুপায় হইয়া ভাবিতেছি বোঝা ধরে কে ?

আমি দিন দিন যতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি, যতই অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি, বোঝার ভার ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। তায় আবার অনেকেই তাহাদের বোঝা হইতে দুই চারিটা কুচিন্তার কুণ্ডলী গুঁজিয়া দিয়া আমার বোঝার গুরুত্ব বাড়াইয়া দিতেছে। নিষেধ করিলেও মানেনা অথবা অনেক স্থলে নিষেধ করা ও যায় না। হা কৃষ্ণ ! কি বিপদ ! কি বিপদ !! বোঝা তো ক্রমেই ভারী হইয়া উঠিতেছে। এদিকে আমারও শক্তি সামর্থ্য ক্রমে কমিয়া যাইতেছে। বোঝাটা নামাইতেও পারিনা, মাথায় রাখিয়া ভার বহনও করিতে পারিনা ; এখন উপায় কি ? বোঝা ধরে কে ?

হায় হায়রে ! বোঝা মাথায় করিয়া মরিয়াছি। সংসারে যাহারা বুঝা, তাহারা বোঝা মাথায় করিবার পূর্ব্বেই বুঝিতে পারে যে, এ বোঝা মাথায় করিলে আর নামান যাইবে না। যাবজ্জীবন এই অসহ্য যন্ত্রণা দায়ক গুরু-

ভার বহন করিতেই হইবে। এবং ইহাও বুঝিতে পারে যে এই বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া কস্মিন্ কালেও অব্যাহতি পাইব না।

এই প্রকার চতুর লোকেরা বোঝার কাছ দিয়াও যায় না। তাঁহারা আশৈশব ভগবানের সেবাভার মাথায় করিয়া পরমানন্দে নিত্যধামের পথাবলম্বন করে।

মনে করিয়াছিলাম, জীবন ভরা কেবল হরিনাম কীর্ত্তন করিব, কীর্ত্তনে নাচিব। কিন্তু, আমার পোড়া কপালে আর তাহা ঘটিয়া উঠিল না। বোঝা মাথায় করিয়া কি নাচা যায়? নাচা না গেলেও যে নাচি, সে নাচটা মনের মত হয় না। সে নাচে আত্মার তৃপ্তি হয় না। বরং মনে অতিশয় কষ্ট হয়।

একবার ভাবি, হায়রে! যদি বোঝাটা নামাইতে পারিতাম, কি অন্য কাহার মাথায় চাপাইয়া দিয়া অবকাশ লইতে পারিতাম, তবে মনের সাধে খুব মনের মত নাচিয়া লইতাম, "হরি হরি" বলিয়া ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে পারিতাম, নাচিবার সময় বোঝাটা নামাইতে ইচ্ছা হয়, হইলে হইবে কি? বোঝা ধরে কে?

বিপদ কেমন! সংসারে সকলেরই এক বোঝা; আমার কিন্তু, দুই বোঝা এক তো সংসারের বোঝা, আর একটা পাপের বোঝা। এখন এক মাথায় দুই বোঝা লইয়া কেমন করিয়া কি করি? আমার পতন অনিবার্য্য!!

সংসারের বোঝাটা হয়ত ধরিলে কেহবা ধরিতে পারে, কিন্তু পাপের বোঝা তো কেহ স্পর্শও করিবেনা। এটা ভারীও তার মতন!! রত্নাকর নাকি পাপের বোঝার অংশ দিতে, স্ত্রী পুত্রদিগকে অনুরোধ করিয়াছিল, কৈ? কেহইতো সম্মত হইল না কেহইতো পাপ ভারাক্রান্ত রত্নাকরের দুঃখ মোচনে অগ্রসর হইল না। মোট কথা, পাপের বোঝা দেখিয়া সকলেই ভয় পায় চমকিয়া উঠে। তাই ভাবিতেছি, বোঝা ধরে কে?

সংসারের বোঝাটা মরিয়া গেলে পড়িয়া থাকে, কিন্তু, পাপের বোঝা ইহকালে পরকালে না নড়ে না সরে। ভুগিতে ভুগিতে বোঝা শেষ নতুবা নয়।

ভাবিয়াছিলাম, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা যাহাদিগকে আমি নিজজন মনে করিয়াছি, এই সংসার বোঝা একদিন তাহারা টানিয়া লইবে। একদিন আমি এই দারুণ যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিব। হা কপাল!! তাহারা এখন বোঝার

উপর চড়িয়া বসিয়াছে। বোঝার উপর বোঝা হইয়া আমার দফা রফা করিতে উদ্যত হইয়াছে। তাহারা একবারও আমার দিকে চায় না। আমি এই গুরু ভার বহন করিতে পারি—কি—পারি না, এদিকে ভ্রূক্ষেপও করে না।

হরি! হরি!! হরি!!! এখন আমার উপায় কি? এই দুর্দ্দিনে, নিদানে আমি কাহার শরণাপন্ন হইব? জীবের জীবনধন শ্রীগৌরাঙ্গ বিনে আর দুঃখ মোচন করিতে কে আছে?

বাবা শচীনন্দন! আমি আর কতকাল এই অসহ্য যাতনা ভোগ করিব? এই জ্বালা যন্ত্রণাময় সংসারবোঝা আর কতকাল বহন করিব?

প্রভো! এই ধরাধামে এমন কেহ নাই যে, আমার এই বোঝাটা ধরিয়া আমায় বা মাথায় করে। যে দিকে চাই, সেই দিকেই অন্ধকার। দশদিক শূন্যময় বোধ হইতেছে। প্রভু গো! এক্ষণে তোমার শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা এই যে, আমার এই বোঝাটা তুমি নামাইয়া দিয়া আমাকে অবসর করিয়া দেও। আমি দু'টা দিন মনের সাধে তোমার নাম গুণ গাহিয়া বেড়াই। তুমি বিনে আমার ঐ বোঝা ধরিতে কেহ নাই প্রভো!

দয়াময়! তুমি নাকি কলির দশা মলিন দেখিয়া সংসার সন্তপ্ত জীবের তাপ নিবারণের জন্য আসিয়াছ? তুমি নাকি দুঃখীর দুঃখ মোচনের জন্য পাপাচ্ছন্ন কলিতে অবতীর্ণ হইয়াছ?

প্রভো! আমি মহাপাপী হইলেও তোমারি নিজ জন, তোমারি শ্রীচরণের দাস। প্রভো! একবার এই ভজন বিহীন সন্তপ্ত দাসের প্রতি, কৃপা-নেত্রে চাহিয়া দেখ, ইহার দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। এ দীন বড়ই বিপদে পড়িয়া তোমার শ্রীপাদপদ্মে দয়া ভিক্ষা চাহিতেছে।

প্রভো! তুমি তো কত অসংখ্য জীবের সংসার ভার নামাইয়া, মায়া পাশ কাটিয়া, আপন শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দিয়াছ, আপন প্রেমামৃত সাগরে ডুবাইয়াছ, জ্বালা জুড়াইয়াছ, তবে এ দাস কি সে আশা করিতে পারে না?

প্রভো! তুমি তো পাপীরবন্ধু পতিতপাবন, দীন দুঃখী কাঙ্গালের অমূল্য ধন, নিরাশ্রয়ের পরমাশ্রয়, পিতৃহীনের পিতা, মাতৃহীনের মাতা।

প্রভো! আমি তোমার নিকট সংসার সুখের প্রার্থনা করিতেছিনা। আমি পুত্র, কন্যা, ধন, মান, বিষয়, বৈভব কি স্বর্গ, মোক্ষ, ঋদ্ধি সিদ্ধি কিছুই

চাহিতেছি না। কেবল সংসার ভুলিয়া তোমার পরম পবিত্র নবদ্বীপ লীলারসে ডুবিয়া থাকিতে চাই।

প্রভুগো! মনের সাধ মিটাইয়া তোমার নামগুণ কীর্ত্তন করিতে পারিলাম না, তোমার পাদপদ্মানুরক্ত ভক্ত ভ্রমরের সঙ্গ লাভ করিতে পারিলাম না, কেবল এই দারুণ সংসার বোঝার ভারে। কৃপাময়! প্রার্থনা করিতেছি, এই বোঝাটা নামাইয়া দাও। প্রভো! ধর, তুমি বিনে এত ভার বহনে আর কেহই সমর্থ নহে। তোমার ধরণীধর নিত্যানন্দের কৃপা হইলে আর আমার সংসারের ভার কত?

আমি তোমার শ্রীচরণে আত্ম সমর্পণ করিয়া বলিতেছি, প্রভু, একবার আমাকে অবসর কর। আমি পাপের বোঝা তোমাকে দিতে চাহি না। আছে, আমারই থাকুক। কেবল সংসার বোঝাটা নামাইতে পারিলেই হইল।

প্রভুগো! পাপের ফল ভুগিবার নিমিত্ত যেখানে, যে অবস্থাতেই আমার জন্ম হোক না কেন, কিন্তু প্রার্থনা,—প্রভো! তোমার শ্রীপাদপদ্ম যেন আমার মনে থাকে। তোমার ভুবন-মোহন মূর্ত্তিটী যেন আমার মানসপটে অঙ্কিত থাকে। আমি যেন তোমার প্রেমানন্দ পূর্ণ গৌরহরি নাম, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম, না ভুলিয়া যাই।

এই ক'রো নাথ! মানুষ, পশু, পক্ষী এমন কি কীট পতঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও যেন, তোমার অমৃতোপম প্রসঙ্গে আমার মতি থাকে।

"কিয়ে মানুখ, পশু, পাখী, জনমিয়ে অথবা কীট পতঙ্গে।
করম বিপাকে গতাগতি পুনঃ পুনঃ, মতি রহুঁ তুয়া পরসঙ্গে॥" বিদ্যাপতি।

প্রভো! বলিয়া জানাইব কি? আমার দুঃখের অবধি নাই। একে তো সংসার বোঝা, তায় আবার আশার প্রলোভনে পাগল হইয়া, পদে পদে প্রতারিত হইতেছি। ইহাও সামান্য মনে করি। কিন্তু, কামাদি রিপুগণের উৎপাতে আর তিষ্ঠিতে পারিতেছিনা, ইহারা (কামাদি) বড়ই নির্দ্দয়। সর্ব্বদাই আমাকে সংহার করিতে উদ্যত। আমি আর কত কাল পায় ধরিয়া প্রাণ বাঁচাইব।

এই রিপুর দেশে বাস করা, আমার পক্ষে বড়ই অসাধ্য হইয়াছে। প্রভু গো! এই দীনহীন পাতকীকে নিজগুণে দয়া করিয়া তোমার সদানন্দ পূর্ণ গৌর দেশে লইয়া চল। যে দেশে কামাদির গন্ধ বাতাস নাই। রিপুর অত্যা-

চার নাই, আছে কেবল সুধামাখা হরি নামের তুমুল তুফান, অনাবিল প্রেমের প্রবল প্রবাহ, সাধু বৈষ্ণবের আনন্দ কোলাহল। প্রভো! আমাকে সেই দেশে নিয়া চল। আমার আর এখানে থাকিতে ইচ্ছা নাই।

দয়াময়! আমাকে নদীয়ার নির্ম্মলানন্দে একবার ধুইয়া লও। আমি তোমার ভক্তগণের চরণতলে একবার লুটাইয়া মানব জীবন সার্থক করিয়া লই। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া আমার পরমাত্মা পরিতৃপ্ত হোক্। প্রাণ গৌর! আমার প্রাণধন! অপরাধ ক্ষমা করিয়া দাসকে একবার নদীয়ার চিন্ময় বিভূতি দর্শন করাও। প্রাণ খুলিয়া বলি,—প্রাণ গৌর! প্রাণ গৌর!! প্রাণ গৌর!!! হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!!

বৈষ্ণব দাসানুদাস—

শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য।

পাগলের প্রলাপ।

—:০:—

বিন্দুর সন্ধান।

"শুদ্ধ প্রেম সুখ সিন্ধু, পাই তার একবিন্দু,
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নয়, তথাপি বাউলে কয়,
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায়॥"

শ্রীচৈঃ মঃ ২য় পঃ।

কোথায় সেই বিন্দু মিলে?

এক বিন্দু! বেশী নয়—কেবল এক বিন্দু! কোথায় মিলে এই এক বিন্দু? হায়! কে আমায় বলিয়া দিবে,—এক বিন্দু কৃষ্ণপ্রেম কোথায় পাওয়া যায়? যে বিন্দুতে জগৎ ডুবে, সেই, এক বিন্দুর সন্ধান আমায় কে বলিয়া দিবে গো? এক বিন্দুর এত শক্তি-সামর্থ্য! বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না, অসম্ভব কথা

বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কবির মুখে, ভক্তের মুখে, —সাধন সিদ্ধ মহাপুরুষের মুখে, শুনিয়া থাকি "এক বিন্দু জগৎ ডুবায়।" বুঝিতে ত পারি না,—এ রহস্যের উদ্ভেদ করিতে আমি ত পারি না। এস, কে আমার বন্ধু আছ, বলিয়া দাও, বুঝাইয়া দাও, কিরূপ এ এক বিন্দু,—কেমন ইহার শক্তি, কোথায় তাহার সন্ধান মিলে ?

মেঘের কোলে থাকিয়া থাকিয়া পিপাসিত কণ্ঠে চাতক বলিতেছে "ফটী—ক জল" "ফটী—ক জল।" চাতকের এ আশা পূর্ণ হইবে। কেননা, সে এ মাটীর সংসার ছাড়িয়া, অনন্ত গগণে ছুটিয়া মেঘের কাছে গিয়াছে। শীঘ্রই তাহার সাধ পূর্ণ হইবে।

আমি ও এই চাতকের ন্যায় "প্রেম বিন্দু"—"প্রেম বিন্দু" রব তুলিয়া চীৎকার করিতেছি। তুলিয়াছি মধুর স্বর, কিন্তু গৃহবাসে আবদ্ধ থাকিয়া। অষ্টে পৃষ্ঠে বদ্ধ আমি; ঐ চাতকের মত মুক্ত পক্ষ হইতে ত আমি পারি নাই, পারিবার আর আশা ও নাই। পিঞ্জরে আবদ্ধ, বিমলিন চিত্ত পক্ষীর ন্যায় আমি গৃহ পিঞ্জরে বন্দী থাকিয়া অনন্তের স্বপ্ন দেখিতেছি, আর থাকিয়া থাকিয়া বলিতেছি,—"এক বিন্দু"—"এক বিন্দু"। কোথায় এক বিন্দু মিলে। অহো ! আমার এ আশা কি অপূর্ণই থাকিয়া যাইবে ?

কোথায় সেই বিন্দু মিলে ?
যে বিন্দুতে জগৎ ডুবে, হৃদয় সিন্ধু উথলে ॥
এক বিন্দু পাই যদি,
করি তারে হৃদয় নিধি,
পান করি ভাই নিরবধি,—
স্বর্গের সুধা ভূতলে।
ভক্ত আর শ্রীভগবান্।
জেনেছি উভয়ে সমান।
(হ'য়ে) তাঁদের কাছে আকুল প্রাণ,
এক বিন্দু চাই কুতূহলে।
তাঁরা যে অপার সিন্ধু ;
আমি চাই শুধু এক বিন্দু,

এ বিন্দু কি মিল্‌বে কভু,
কর্ম্ম গুণে, ভাগ্য ফলে ?
পিঁপড়ার পাখা হয়রে যেমন,
ছেঁড়া কাঁথায় টাকার স্বপন,
এ আশা মোর পক্ষে তেমন ;
ভুলে আছি মায়ার খেলে।
এ যে বিষম মায়ার বিকার,
এ ঘোর বিকার কাট্‌বে কি আর ?
দুর্দ্দিনের এ গভীর আঁধার
যাবে কি দূরেতে চ'লে ?
কোথায় সেই বিন্দু মিলে ?

হে আমার প্রেম-চিন্তামণির-ধনী দাতার শিরোমণি মহাপ্রভু! তোমার ভাণ্ডারে গুপ্ত ভাব সিন্ধু বর্ত্তমান। স্বয়ং ব্রহ্মা উহার একবিন্দু লাভ করিবার জন্য লালায়িত। অহো, এরূপ আনন্দের দিন অতিবাহিত হইয়াছে, যেদিন তুমি ধনী নির্দ্ধন নির্ব্বিশেষে,—ব্রাহ্মণ চণ্ডালে এ অপরূপ প্রেম সম্পত্তি অকাতরে বিতরণ করিয়াছ। দুর্দ্দৈব বশে, স্বকর্ম্ম জনিত নিদারুণ কর্ম্মফলে, তৎকালে জন্ম গ্রহণ না করিয়া, সেই পরম প্রিয় ভক্তজন মণ্ডলীর সুখাস্বাদ্য প্রেমসিন্ধুর এক বিন্দু পাইবার জন্য আমি আজ তৃষিত চাতকের ন্যায় উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া চাহিয়া আছি। বল মিলিবে কি ? যদি মিলিবে,—তবে কোথায়—কি উপায়ে ? বলিয়া দাও—প্রভো!

শ্রীভগবান পরম কল্যাণময়। তাই, দীনের পিপাসা বুঝিয়া বিন্দুর সন্ধান বলিয়া দিয়াছেন। গুরুরূপে, ভক্তরূপে তিনি আমার প্রতি অপার করুণা করিয়া, এ সন্ধান প্রকাশ করিয়াছেন। ধন্য তাঁর প্রেম। গুরুরূপে তিনিই সিদ্ধ-যুগল-মন্ত্র দিয়া, আমায় বিন্দুর সন্ধান বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু কলির চক্রে আর আমার কর্ম্মদোষে মন্ত্রের সাধন হইতেছে কই ?

আমি পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় গৃহ পিঞ্জরে আবদ্ধ আছি, আর বুটের ছাতু খাইয়া, অনন্তের স্বপ্ন দেখিতেছি। হায়! মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের ন্যায় স্বাধীন হইয়া অনন্ত সুখ, অনন্ত শান্তি উপভোগ করিবার সুবিধা আর কোথায়। এইরূপ ভাবিতেছি—

এমন সময়ে শিক্ষা শ্লোকের একটী শ্লোক স্মৃতিপথে উদিত হইল এবং প্রাণ স্পর্শ করিল। উহাতে হৃদয় আশ্বস্ত হইল। সেই প্রাণারাম, সুমধুর শ্লোক এই—

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তমেবাস্বদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নং ॥"

ইহার ভাবার্থ উপলব্ধি করিয়া বুঝিলাম, আমার চিন্তা অনর্থক। ইহাই আমার অভীপ্সিত বিন্দুর সন্ধান বলিয়া দিতেছে। ঠিক্ এই সময়ে, কোন মহানুভব, প্রেমিক ভক্ত, দীন হীনের এ কাতর ধ্বনি শুনিয়া প্রাণের আবেগে উপদেশচ্ছলে বলিয়া দিলেন "ভাইরে, পিঞ্জরে থাক, ক্ষতি নাই; বুটের ছাতু সময় মত খাইতে পাও, বা, না পাও, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু দেখো ভাই যেন বুলি ছাড়িও না। এই বুলি ধরিয়াই তোমার অভীষ্ট বিন্দুর সন্ধান পাইবে। সেই বুলি কি?

"হরে কৃষ্ণ হরে রাম। নিতাই গৌর রাধে শ্যাম ॥"

আর একজন পাগল ভক্ত বলিতেছেন, প্রাণ বল্লভের পদে প্রাণ-সঁপিয়া দেওয়াই যথার্থ স্বাধীনতা, যতদিন লোকে কৃষ্ণ ভুলে থাকে তত দিনই সে বদ্ধ, সম্বন্ধ পাতাইতে পারিলে আর সে পিঞ্জরের পাখীনয় সে মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গম। পাগলের এ কথায়ও বিন্দুর সন্ধান পাওয়া যায়।

আবার, গ্রন্থরূপে শ্রীভগবান্, স্বয়ং অধিষ্ঠিত হইয়া রাঙ্গা পা দু'খানি— প্রাপ্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়া বিন্দুর সন্ধান এই ভাবে বলিয়া দিতেছেন :—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ ॥
মালী হৈয়া সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন ॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায় ॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥"

চৈঃ চঃ মঃ ১৯ শ পরিচ্ছেদ।

হায়! বহির্ম্মুখজীব আমি; বিন্দুর সন্ধান পাইতেছি, কিন্তু কই, উহা তো হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না। জানি না, দুর্দ্দৈব ঘুচিবে কবে? কবে প্রভুর দয়া হইবে? এমন সন্ধান পাইয়া ও ধরিতে পারিলাম না,—ধরি, ধরি, সেই অধর চাঁদের ধরা পাইলাম না। কি কর্ম্মচক্র! অহো! লীলাময়ের ইহা এক বিচিত্র লীলা!! জানি না, বুঝি না কবে, কোন্ শক্তি বলে এই এক বিন্দুর অধিকার লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিব? পারিব কি? আকাশ-কুসুম স্বপ্নবৎ! পাগলের প্রলাপই বটে।

দীন—শ্রীরসিকলাল দে।

শমন।

হে শমন! তব ভয়ে ভীত ভুবতল।
অশান্তি কালিমায় আচ্ছন্ন সকল॥
"হতোহস্মি! হতোহস্মি! হতোহস্মি! কেবল।
চারিদিকে সদা রোদনের রোল॥
পুত্র শোকাতুরা দেখ অই মাতা।
কাঁদে দিয়া গালি ধূলি ধূসরিতা॥
প্রাণসম পতি বিয়োগ বিধুরা।
আঘাতি ললাটে কাঁদে পড়ি ধরা॥
হেরি হে হারক! বসুধা মাঝারে।
কোথাও কেহত তোমা না আদরে॥
কদাচিৎ কেহ আহ্বানে তোমায়।
জ্বলিয়া পুড়িয়া সংসার জ্বালায়॥
সে আহ্বান তবু হৃদয়ের নয়।
সে আহ্বান প্রভো! বোঝাতোলা প্রায়।
আমি কিন্তু তোমা ডাকি একমনে।
সানন্দ অন্তরে সাদর আহ্বানে॥

নামে কাজে ঐক্য পাই হেরিবারে।
সার্থক তোমার নামহে সংসারে॥
কে তুমি, কি কর, নাহি কেহ ভাবে।
শতানু-গতিকে দোষে তোমা সবে॥
আমি দোষ কিছু দেখিতে না পাই।
মহাত্মা যোগীন্দ্র তুমি হে গোঁসাই॥
হিংসা দ্বেষ আদি কুবৃত্তি নিচয়।
দমন কারণ "যম" নাম হয়॥
করহে বিনাশ বাসনা নিচয়।
তেঁই সে "অন্তক" তুমি সদাশয়॥
প্রকৃষ্ট প্রকারে, হয়েছে যে গত।
বাসনা বিহীন হৈল যাঁর চিত॥
অধিপতি তুমি তাঁর মহামতি।
সে কারণ তুমি দেব "প্রেতপতি"॥
কুৎসিতে সাজাও ধর্ম্ম অলঙ্কারে।
সে লাগিয়া "কাল" তুমিহে সংসারে॥
যাহার সহায়ে সংসার কণ্টকে।
অক্ষুণ্ন চরণে চলা যায় সুখে॥
একমাত্র সেই সুহৃদ ধরমে।
পাল, "ধর্ম্ম" নাম তব সেকারণে॥
সৃজিলা ভুবন সূর্য্য নারায়ণ।
সতত জীবের কল্যাণ কারণ॥
পুত্র তার, পিতৃ সম গুণযুত।
সর্ব্ব জীবে সদা পাল "রবিসুত"॥
মত্ত করী মনঃ করিলা দমন।
ক্ষমা দয়া মোক্ষ নিবৃত্তি সাধন॥
তেঁই নাম তব মহাত্মা "শমন"।
মহদ্‌গুণ বিমণ্ডিত মহাত্মন্॥

জীবগণ আশা করিতে পূরণ।
বিভিন্ন শরীর করাও ধারণ॥
তেঁই তব নাম, "মৃত্যু" এ ভুবনে।
মোক্ষ বিধায়ক ! বাসনা পূরণে॥
"পিতামাতা আদি সব ক্রীড়ণক"।
এই নিরবাণ জ্ঞান প্রদায়ক॥
আপন সুহৃদ্-ধরম রতনে।
দানিবারে দেব ! তব ভ্রাতৃগণে॥
আপন স্বমানী ভাবি সুপণ্ডিত।
ভাঙ্গা গড়া কাজ তোমার নিয়ত॥
হেরিয়া মৃতের মুরতি ভীষণ।
শাস্ত্রেতে অঙ্কিত "ভীষণ দর্শন"॥
দেখিনাই কভু ভীষণের লেশ।
প্রশান্ত গম্ভীর ধাম্মিকের বেশ॥
তুমি জগদীশ বিভিন্ন দুজনে।
এভাব কখন নাহি উদে মনে॥
কালরূপে তুমি নিত্য-নিরঞ্জন।
খেল তুমি দেব ! লয়ে জীবগণ॥
এস এস এস প্রভো দয়াধার।
চিরসঙ্গী মোরে করহে তোমার॥
সঙ্গ বশে দোষ গুণ লাভ বলে।
এ প্রার্থনা তব চরণ কমলে॥
নাহি কোন আশা, মাগি বার বার ;—
"কর কর মোরে সঙ্গীহে তোমার"॥
দেহ আলিঙ্গন এই অভাজনে।
কর ধন্য পাপ দেহ পরশনে॥
নিভাই পাপাগ্নি শান্তির সলিলে।
উড়াই পাতক-তুলা ধর্মানিলে॥

শ্রীবসন্তকুমার প্রামাণিক। হেঃ পঃ কালিকাপুর স্কুল।

শ্রীল রায়-রামানন্দ।

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সন্ধ্যার পর চন্দ্রদেব উদয় হইয়াছেন, মৃদুমন্দ কুসুম গন্ধবাহী বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, এমন সময় পুরীক্ষেত্রে বৈদিক ব্রাহ্মণ গৃহে, করুণাময় প্রভু শ্রী শ্রী চৈতন্য-দেব সুখাসনে উপবিষ্ট আছেন, আর শ্রীল রামানন্দ রায় উচ্চকণ্ঠে সুমধুর স্বরে শ্রীভগবানের নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। পরমদয়াল প্রভু আমার নিবিষ্ট মনে নাম সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেছেন। ভাবে বিভোর, বাহ্য জ্ঞান নাই, এবং দু-নয়নে প্রেমধারা, সে ধারার আর বিরাম নাই। এই ভাবে কিছু সময় অতীত হইলে পর, প্রভু রামানন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ রায়! ইহপরকালে মানবের পক্ষে, শাস্ত্রানুমোদিত, সুখকর যে সকল সাধন প্রণালী আছে, তাহা তোমার মুখে শুনিবার বড় ইচ্ছা; তুমি সংক্ষেপে তাহা বর্ণন কর"।

ইহা শুনিয়া রামানন্দ সবিস্ময়ে বলিতে লাগিলেন—

কহে রামানন্দ মনে সবিস্ময় মানি।
এহেন আশ্চর্য্য কথা কভু নাহি শুনি॥
সাধনের ধন যিনি জগৎ চিন্তামনি।
স্বয়ং গৌরাঙ্গরূপে উদয় আপনি॥
দীন স্থানে সাধ্য বিষয় শুনিতে বাসনা।
এহ'তে কৌতুক বড় কি আছে জানিনা॥

রামানন্দ কহিলেন "প্রভু আমি আশ্চর্য্য হইলাম, শিব বিরিঞ্চি অমর-বৃন্দ সতত যাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া থাকেন, যিনি কলির জীবের দুঃখে কাতর হইয়া নিজ সাধন সম্পত্তিরূপ ভক্তি পথ প্রচারের জন্য শ্রীনবদ্বীপধামে অবতীর্ণ, সেই কলিপাবন অবতার শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি আজ কিনা নীলাচলে ঘোর বিষয়ী, বৈশ্যধর্ম্মী অধম রামানন্দের নিকট, বিশুদ্ধ সাধন তত্ত্ব, জানিতে ইচ্ছুক? লীলাময়! ধন্য তুমি, ধন্য প্রভু তোমার খেলা, এ খেলার রহস্য বুঝিবার শক্তি রামানন্দের নাই।"

তখন, রায়প্রতি কহেপ্রভু মৃদু-মৃদু হাসি।
সাধন-ভজন নাহিজানি নবীন সন্নাসী॥

কোন্ পথে পাব সেই শ্রীনন্দনন্দন।
কহ রায় কৃপাকরি, স্বরূপ বচন॥
গৃহত্যাগী হয়ে,আমি ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
উপস্থিত হইয়াছি নীলাচল পথে॥

"দেখ রায়! আমি যুবক, সম্প্রতি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি, কি ভাবে ঈশ্বরের সাধন করিতে হয় আমাকে তাহা শিখাইয়া দাও, আর কোন পথে গেলে আমার হৃদয়বিহারী গোকুলানন্দ, সেই শ্যামতনু শ্রীরাধারমণকে পাব তাই বলিয়া দাও"। এই কথা শুনিয়া রামানন্দ বলিতেছেন—

ঈশ্বরের কৃপালেশ নাহিক যাহাতে।
কেমনে ঈশ্বর,তত্ত্ব সে পারে বর্ণিতে॥

"হে ভক্ত বৎসল! ঈশ্বরের কৃপা না হইলে কেহই তাঁহার তত্ত্ব বুঝিতে পারে না, আমি অতি মন্দ বুদ্ধি; আমি নিজে যাহা বুঝি না, তাহা অপরকে কিরূপে বুঝাইব। যদি দীনের নিকট একান্ত শুনিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে কৃপা করিয়া সেইরূপ শক্তি দাও যে শক্তি বলে মূর্খ কথা কহিতে পারে, যে শক্তি আশ্রয় করিয়া পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়। প্রভো! তোমার শক্তি ভিন্ন একটী বর্ণ উচ্চারণ করিবারওতো আমার সমর্থ নাই।

"রায় কহে ইহা আমি কিছুই না জানি।
যে তুমি কহাও সেই কহি আমি বাণী॥
তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুকের পাঠ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝিবে তোমার নাট॥
হৃদয়ে প্রেরণ করি জিহ্বায় কহাও বাণী।
কি কহিব ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥
কহিবার আমি নাট তুমি সূত্রধর।
যেমত নাচাও তৈছে চাহি নাচিবার॥
মোর জিহ্বা বীণা যন্ত্র তুমি বীণাধারী।
তোমার মনে যেই তাহা উঠয়ে উচ্চারী॥"

সকল ধর্ম্মই সত্য, আর সকল ধর্ম্মেরই লক্ষ্য শ্রীভগবানকে পাওয়া। সকল-ধর্ম্মের মূলীভূত কারণ এক শ্রীভগবান। তিনি সকলেরই উপাস্য দেবতা,

তিনি অনন্তরূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজমান। সেই সাধ্য বস্তু শ্রীভগবানকে পাইবার জন্য আর্য্য ঋষিগণ যে সমস্ত বিধি সঙ্গত সাধন প্রণালী প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে মানবের সহজ সাধ্য যে অষ্ট প্রকার সাধন প্রণালী আছে তাহাই এক্ষণে যথা সাধ্য বর্ণন করিতেছি। হে শচীদুলাল! তুমি ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু দেখ যেন দীনের বাসনা পূর্ণ হয়।

১। প্রথম আলোচ্য স্বধর্ম্মা-চরণ।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥
যো যস্য বিহিতো ধর্ম্মঃ স তজ্জাতিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
তস্মাৎ স্বধর্ম্মং কুর্ব্বীত দ্বিজো নিত্যমনাপদি ॥
ঋতে স্বধর্ম্মং বিপুলং ন তে যান্তি পরাং গতিং ॥
স্বধর্ম্মেণ তথা নৃনাং নর সিংহঃ প্রতুষ্যতি।
ন তুষ্যতি তথান্যেন বেদ বাক্যেন কর্ম্মণা ॥

সম্যক অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা, অঙ্গহীন স্বধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, কেননা স্বভাব বিহিত কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। যেমন ধূমরাশি দ্বারা হুতাশন সমাচ্ছন্ন থাকে, সেইরূপ সমস্ত কার্য্যই দোষ দ্বারা সংপৃষ্ঠ, এই জন্য শাস্ত্রে বলেন স্বাভাবিক কার্য্য দোষ যুক্ত হইলেও কখন পরিত্যাগ করিতে নাই। যিনি, যে জাতি ভুক্ত তিনি সেই জাতি-ধর্ম্মা-নুসারে সাধন ভজন করিবেন। যে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম আশ্রয় করে তাহার অন্তিমে অসৎ গতি হয়। নিজ ধর্ম্মের দ্বারায় পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবানকে সন্তুষ্ট করিতে পারা যায়, বেদ মন্ত্রই বলুন আর যাগ যজ্ঞাদিই বলুন, স্বধর্ম্ম আচরণে যেমন তাঁহার তৃপ্তি হয়, অন্য কিছুতেই ভগবানের সেরূপ তৃপ্তি হয় না। ক্রমশঃ

শ্রীমতিলাল চক্রবর্ত্তী।

সৎ প্রসঙ্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চ। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তত্ত্ব বুঝিলাম, কিন্তু যে হিন্দু-শাস্ত্রের ভক্তি মার্গে ব্রাহ্মণত্ব বা বৈষ্ণবত্ব লাভের পন্থা দ্বৈত ভাবে নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই শাস্ত্রেরই জ্ঞান মার্গে বিচারাদি সাধনার দ্বারা জগদ্ভ্রম নিরসন পূর্ব্বক অদ্বৈত ভাবে "আমিই ব্রহ্ম" এই জ্ঞান লাভ করিবার আদেশ আছে কেন? জ্ঞানী ও ভক্ত গণের মধ্যে এই বিষয় লইয়া যে বিরোধ আছে, শাস্ত্রই কি তাহার জন্য দায়ী নহে? তোমার মতে শাস্ত্রবাক্য মাত্রেই ভগবদ্বাক্য, যদি তাহাই হয়, তবে পন্থার এত বৈপরীত্য কেন?

র। ভাই! বৈপরীত্য কিছুই নাই, হিন্দু শাস্ত্রের বিভিন্ন পন্থার কথা দূরে থাকুক, জগতের সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রই ভগবদ্বাক্য, সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রেরই আধ্যাত্মিক ভাব এক, কেবল দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে ব্যবহারিক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় মাত্র। ভূতাবিষ্ট ব্যক্তি যেমন ভূতের কথা কয় সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশের মহাত্মাগণ ভগবদাবিষ্ট হইয়া ঐ সকল ভগবদ্বাক্য প্রচার করিয়াছেন, যদি উহা ভগবদনুমোদিত না হইত, তাহা হইলে কি এক একটি শাস্ত্র গ্রন্থের দ্বারা কোটি কোটি ব্যক্তির জীবন নিয়মিত হইত? এই জগতের নিয়ন্তা কি ঘুমাইয়া আছেন? তবে কথা এই যে, তাঁহার কৃপা ভিন্ন ঐ সকল বাক্যের প্রকৃত ভাব হৃদয়ঙ্গম হয় না এবং তিনিই এই কৃপা লাভ করিতে পারেন,—যিনি আন্তরিক আকুলতার দ্বারা চালিত হইয়া তাঁহাকে জানিবার, তাঁহাকে লাভ করিবার উপায় অনুসন্ধান করেন। ভাবময়ী চৈতন্য-শক্তি শব্দ-বরণে আবরিত হইয়া শাস্ত্র ভাণ্ডারে নিহিত আছে।

প্রকৃত সাধকগণ যখন শ্রীভগবানের কৃপায় জ্ঞানলাভ করেন, তখন সেই জ্ঞানরূপ কুঞ্জিকার (চাবী) দ্বারা ঐ আবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক ভাবসুধা পান ও বিতরণ করিতে সক্ষম হন. গানের মজলিসে তানপুরা, বেহালা, তবলা প্রভৃতির বাদ্য বিভিন্ন প্রকার হইলেও যেমন সুর এক, সেইরূপ এই ভাব গুলির রূপ

ভেদ থাকিলেও লক্ষ্য এক জানিও, ফলে শাস্ত্র নিহিত ভাব গুলির লক্ষ্যগত প্রভেদ নাই, শব্দরূপ আবরণের জন্য কেবল স্থূল দৃষ্টিতে প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়, বাক্স, সিন্দুক প্রভৃতির মধ্যে টাকা থাকিলে যেমন উন্মোচনে অক্ষম বালক কেবল ঐ আবরণ গুলির বিভিন্নতা দর্শন করে সেইরূপ স্থূল দৃষ্টি সম্পন্ন মানবগণ শাস্ত্রের শব্দা-বরণ উন্মোচন পূর্ব্বক উহার অন্তর্নিহিত তাবরত্ন লাভ করিতে না পারায় কেবল আবরণ গুলির বিভিন্নতা দৃষ্টে ভ্রান্ত হয় মাত্র, আবার যাঁহারা অর্থ সম্মানাদির আকাঙ্ক্ষায় শাস্ত্র শিক্ষা করেন, ধর্ম্মের প্রকৃত পন্থা ও শ্রীভগবানের তত্ত্ব জানিবার আন্তরিক আগ্রহ না থাকায় তাঁহারা বৃথা পণ্ডিতাভিমানি হইয়া অন্ধভাবে শাস্ত্রের শব্দা-বরণ গুলি লইয়া নাড়াচাড়া করেন ও ঐ আবরণ গুলির বিভিন্নরূপে মুগ্ধ হইয়া অপর অন্ধগণকেও বিপথে চালন করেন, এমন কি অনেক খ্যাতনামা সাধকেরও সাধন সংস্কার ভিন্ন পথে চালিত হওয়ায় তাঁহারা অপর পথের অন্তর্নিহিত ভাব অনুসন্ধান করিতে যত্ন করেন না, সুতরাং তাঁহাদের অনুগামীগণের পক্ষেও সে পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিয়া যায়, ফলতঃ শাস্ত্রোক্ত বিভিন্ন মতের-বিরোধ এইরূপ লোক-দিগের মধ্যেই আবদ্ধ, প্রকৃত সাধুগণের মধ্যে কোন বিরোধ থাকিতে পারে না, তাঁহাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির সংস্পর্শে তত্ত্ব সকলের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যায়, তাঁহারা জানেন যে, সাধকের ভাব ও অবস্থা ভেদে পন্থা ভেদের ব্যবস্থা থাকিলেও ঐ পন্থাগুলি একই লক্ষ্যে গিয়া মিলিত হইয়াছে।

এই পথগুলির সামঞ্জস্য সম্বন্ধে দৃষ্টান্তের দ্বারা তোমাকে পূর্ব্বে বুঝাইয়া দিয়াছি, সুতরাং এক্ষণে পুনরুল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই, কেবল মহর্ষি বেদব্যাস এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন শ্রবণ কর ঃ—

নালং স্ফুর্ত্তিং স্বয়ং কুত্রাপ্যনলঃ পরিতাপবান্।
যাবদ্ভবতি সংতাড্যো বায়ুনা মৃদু পূর্ব্বকম্॥
তথা কর্ম্ম বিনাশায় স্বয়ং জ্ঞানমপি প্রভু।
ভক্তিবায়ুং প্রতীক্ষেত প্রসারায় নিজস্য বৈ॥

পরস্পর সহায়েন বর্দ্ধতে চ পরস্পরম্।
পরস্পরং শুভং ভাতি পরস্পর সমাগমাৎ॥

ইহার ভাবার্থ এই যে অগ্নির সহিত বায়ুর ন্যায় জ্ঞানের সহিত ভক্তির নিত্য সম্বন্ধ, জ্ঞানাগ্নি স্বপ্রভাবে কর্ম্ম মালিন্য দহন করিতে সক্ষম হইলেও ভক্তি-বায়ু ভিন্ন পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না, ইহারা পরস্পরের সহায়েই পরস্পরে পরিবর্দ্ধিত হয়।

যাহাদের তিনকুলে আপনার বলিতে কেহ নাই তাহারা যেমন জেল হইতে মুক্ত হইলেও তাহাদের বন্ধন ও পরাধিনতা জনিত দুঃখ দূর ও স্বাধিনতার প্রশান্তি লাভ হয় মাত্র, ভাল বাসিবার অবলম্বন না থাকায় হৃদয়ে আনন্দের তরঙ্গ খেলেনা, সেইরূপ জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্মবন্ধন ও বিষয়ের দাসত্ব জনিত দুঃখ দূর ও স্বাধিনতার প্রশান্তি লাভ হইলেও ভক্তি ভিন্ন শ্রীভগবানের নিত্য সংসারে স্থান লাভ পূর্ব্বক নিত্যানন্দ সম্ভোগ করা যায় না। অতএব প্রকৃত ভক্তের মধ্যে ভগবৎ-প্রাপক জ্ঞান ও প্রকৃত জ্ঞানীর মধ্যে আত্ম-প্রাপক ভক্তি থাকিবেই এবং এই জন্যই জ্ঞানীগণ শিবারাধনা করেন, ভক্তগণ পরমাত্ম ভাবে ভগবদারাধনার ফলে চিন্ময় ভগবদ্ভাব লাভ পূর্ব্বক যে স্তরে উন্নীত হন, জ্ঞানীগণ আত্মভাবে শিবারাধনার ফলে শিবাত্মতা লাভ পূর্ব্বক সেই স্তরেই আরোহণ করেন জানিও, প্রথমাবস্থায় ইঁহাদের মধ্যে সাধনোপায়ের বিভিন্নতা দৃষ্ট হইলেও উদ্দেশ্যের কোন বিভিন্নতা নাই, ফলতঃ ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান না হইলে শ্রীভগবানের তত্ত্ব জানা যায় না ও শ্রীভগবানের তত্ত্ব জানিয়া ভক্তি পথে অগ্রসর না হইলে প্রকৃত অদ্বৈত তত্ত্বের বোধ হয় না, এবং এই বোধই চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবার প্রমান স্বরূপ জানিও।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে এই চরম লক্ষ্য কি? জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি পথের মিলন ভূমি কোথায়! গীতায় শ্রীভগবান এ বিষয় সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন ঃ—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোক্ষর উচ্যতে॥
উত্তমঃ পুরুষ স্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয় মাবিশ্য বিভর্ত্ত্য ব্যয় ঈশ্বরঃ॥
যস্মাৎ ক্ষর মতীতোহহমক্ষরা দপি চোত্তমঃ।
অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥

যো মামেব মসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমং।
স সর্ব্ব বিদ্ভজতি মাং সর্ব্ব ভাবেন ভারত॥
ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্র মিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্‌স্যাং কৃত কৃত্যশ্চ ভারত॥

ইহার ভাবার্থ এই যে চৈতন্যস্বরূপে সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা তিন ভাবে জগতে ব্যক্ত, ক্ষর, অক্ষর ও উত্তমপুরুষ বা জীবাত্মা শিবাত্মা ও পরমাত্মা। সমুদ্র, তরঙ্গ ও ফেনা যেমন একেরই ভাব ভেদ হইলেও ফেনা বিকার যুক্ত হওয়ায় পরিবর্ত্তন-শীল কিন্তু তরঙ্গ ও তাহার সমষ্টি সমুদ্রের পরিবর্ত্তন নাই, সেইরূপ জীবাত্মা বা মন মায়িক বিকার যুক্ত হওয়ায় ক্ষর বা পরিবর্ত্তন-শীল, কিন্তু শিবাত্মা কুটস্থ বা নির্ব্বিকার, ইনি জীবাত্মা কৃত কর্ম্ম সমূহের সাক্ষী ও ফলদাতা রূপে গৃহস্থিত আকাশের ন্যায় জীবাধারে বিদ্যমান আছেন, উত্তম পুরুষ এই শিবাত্মার সমষ্টি রূপে সর্ব্বব্যাপী হইয়া ত্রিলোক পালন করিতেছেন, সুতরাং উত্তম পুরুষ রূপী আমি অক্ষর হইতেও উত্তম ও ক্ষরের অতীত অর্থাৎ ক্ষর ভাবাপন্ন মন যাবৎ সাধানার দ্বারা শিবাত্মভাব লাভ করিতে না পারে তাবৎ আমার অনন্ত ভাবের ধারণাই করিতে পারেনা, বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ, যিনি মোহশূন্য চিত্তে আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন অর্থাৎ আমার তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন সেই জ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্বভাবে আমার ভজনা করেন অর্থাৎ বিষয় সকলের মধ্যে আমার সত্তা উপলব্ধি পূর্ব্বক ভক্তিময় প্রাণে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন। হে নিষ্পাপ! শাস্ত্রের এই যে গুহ্য রহস্য আমি তোমাকে বলিলাম, বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ ইহার তত্ত্ব বুঝিয়া কৃতার্থ হইবেন, অর্থাৎ ইহা মুগ্ধ চিত্ত অজ্ঞানীর বিকৃত বুদ্ধির গম্য নহে, সাত্ত্বিক কর্ম্মাদির দ্বারা যাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে সেই জ্ঞানী ব্যক্তিগণই আমার উপদেশের মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইবেন।

এক্ষণে বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ যে উত্তম পুরুষ সমষ্টি চৈতন্য, ইহা এক ও অদ্বিতীয়, ব্যষ্টি ভাবাপন্ন অক্ষর সমূহ উত্তম পুরুষেরই ইচ্ছা শক্তি প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ, সুতরাং সমুদ্রের সহিত তরঙ্গের ন্যায় ইহারা উত্তম পুরুষের সহিত অভেদ, ক্ষর জীবাত্মা বা মন এই অক্ষর হইতেই উদ্ভুত এবং অক্ষর ভাব লাভ করিয়া স্বরূপে উন্নীত হওয়াই ইহার চরম লক্ষ্য, কিন্তু

রূপ রসাদি বহির্বিষয়ে আসক্তি বশতঃ সেই লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হওয়াতেই জন্ম মরণাদি দুঃখ ভোগ করে, সাধনের দ্বারা বহির্বিষয় হইতে সেই আসক্তির প্রত্যাহার করিয়া উহা চিন্তা যোগে অক্ষররূপী আত্মার অভিমুখে চালনা করিলেই তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, চুম্বকের ভাবে লৌহের ন্যায় উহা অক্ষর ভাবাপন্ন হইয়া দুঃখ সমূহ হইতে মুক্ত ও কৃতার্থ হয়।

তেজ হইতে অগ্নির উদ্ভব হইলেও যেমন ইন্ধন না পাইলে পরিশেষে উহা তেজেই বিলীন হইয়া যায় সেইরূপ অক্ষর হইতে উদ্ভূত মন বিষয় পক্ষে অনাসক্ত হইলেই উহা স্বভাব-বশে উর্দ্ধগামী ও অক্ষর ভাবাপন্ন হইয়া আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এইরূপে শিবত্বে বা অক্ষর ভাবে যখন ক্ষর বা জীব ভাবের সমাধি হইয়া যায়, প্রকৃত মুক্তভাব বা অদ্বৈতাবস্থা তখনই লাভ হয় জানিও।

জ্ঞানীগণ সমদমাদি সাধনের দ্বারা রূপ রসাদি বিষয়ের আকর্ষণ হইতে বাসনাকে প্রত্যাহার পূর্ব্বক উহা অক্ষরের উদ্দেশে চালনা করেন অর্থাৎ "আমি ক্ষর নহি অক্ষর শিবস্বরূপ" এই চিন্তায় তন্ময় হওয়ার ফলে যখন অক্ষরত্ব লাভ করেন তখন উত্তম পুরুষের সন্ধান ভাব ও স্বরূপ তত্ত্ব প্রত্যক্ষপূর্ব্বক আপনাকে তাঁহার সহিত অভেদ বলিয়া বুঝিতে পারেন।

ভক্তগণ ভাবাশ্রয় পূর্ব্বক ভক্তিযোগে অক্ষররূপী শ্রীভগবানকে চিন্তা করেন ও আত্ম-সমর্পণের বিনিময়ে তাঁহার করুণা অর্জ্জন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা সাধনমার্গে দ্রুত অগ্রসর হন ও পরিশেষে অক্ষর ভাবাপন্ন হইয়া নিত্যানন্দপ্রদ উত্তম পুরুষকে লাভ করেন।

অনন্তবারিভূত যেমন সূক্ষ্ম ও স্থূল রূপে সর্ব্বব্যাপী, নদ নদী হইতে সরোবর, কুপ প্রভৃতি যেমন তাহারই প্রকাশ ভেদ, সেইরূপ এক ও অনন্ত উত্তম পুরুষ গুণাতীত ও গুণ মধ্যগত ভাবে সর্ব্বব্যাপী, অক্ষর ও ক্ষর রূপ তাঁহারই প্রকাশ ভেদ মাত্র। যেমন সূর্য্য হইতে তেজ ও তেজ হইতে অগ্নির উদ্ভব হয় এবং অগ্নি পরিবর্ত্তনশীল হইলেও মহা-কারণের সহিত স্বরূপত্ব অভেদ থাকায় তেজের যেমন পরিবর্ত্তন নাই, সেইরূপ ক্ষর পরিবর্ত্তনশীল হইলেও উত্তম পুরুষের সহিত স্বরূপত্ব অভেদ বশতঃ অক্ষরের পরিবর্ত্তন নাই, মহাকাশের সহিত গৃহাকাশের যে সম্বন্ধ, উত্তম পুরুষের সহিত অক্ষরের সেই সম্বন্ধ, আবার গৃহাকাশের সহিত গৃহভিত্তির যে সম্বন্ধ, অক্ষরের সহিত ক্ষরের সেই সম্বন্ধ জানিও, ধূম বা কর্দ্দম প্রভৃতির

সংস্পর্শে গৃহভিত্তি মলিন হয় কিন্তু গৃহাকাশ যেমন মলিন হয়না সেইরূপ জীবভাবাচ্ছন্ন মন অসদ্ভাবের দ্বারা মলিন হয় কিন্তু অক্ষরে সে মালিন্য সংযুক্ত হইতে পারে না। আকাশ হইতেই অপর চারিভূতের উৎপত্তি, অতএব যাহা কিছু ভৌতিক সংযোগ বা বিকার রূপ কার্য্য দেখা যায়, আকাশই তাহার মূল কারণ,গৃহভিত্তি যখন কারণে লয় বা আকাশে পরিণত হয় তখন উহা যেমন ক্ষিতি হইতে অপ্, অপ্ হইতে তেজ, তেজ হইতে মরুৎ ও এইরূপে ক্রমে সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর হইয়া পরে ব্যোমে পরিণত হয়, সেইরূপ সাধনের দ্বারা মন ক্রমশঃ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর হইয়া অজ্ঞান ভূমির তিন ও জ্ঞান ভূমির দুইস্তর অতিক্রম পূর্ব্বক পরিশেষে চৈতন্যময় হইয়া অক্ষরে পরিণত হয় জানিও, সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় অনন্ত আকাশ-সমুদ্রেরও তরঙ্গ আছে গৃহভিত্তি আকাশে পরিণত হইয়া যেমন আকাশের একটি তরঙ্গ রূপে পরিণত হয়, সেইরূপ মন অক্ষর ভাবাপন্ন হইয়া অনন্ত উত্তম পুরুষ রূপ সমুদ্রের তরঙ্গ রূপে পরিণত হয় মাত্র, উত্তম পুরুষ হইতে পারে না, তরঙ্গ যেমন সমুদ্রের সহিত অভেদ ভাবে সমুদ্রের শক্তিতে শক্তিমান হইয়া অনন্ত সমুদ্রের মধ্যে ক্রীড়া করে, অক্ষরও সেইরূপ অভেদ ভাবে উত্তম পুরুষের শক্তিতে শক্তিমান হইয়া চিদাকাশে নিত্যানন্দ ক্রীড়া করেন এবং এই জন্যই অদ্বৈত তত্ত্বের প্রচারক ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন :—

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বং।
সমুদ্রোহি তরঙ্গঃ ক্কচন সমুদ্রো ন তরঙ্গ॥
দামোদর গুণ মন্দির সুন্দর বদনার বিন্দ গোবিন্দ।
ভব জলধি মথন মন্দর পরমন্দর মপনয় ত্বংমে॥

অর্থাৎ তরঙ্গ যেমন সমুদ্রের অধীন, তরঙ্গের অধীন সমুদ্র নহে, সেইরূপ হে নাথ! তত্ত্ব বিচারে আমি তোমার সহিত অভেদ হইলেও আমি তোমার অধীন, তুমি আমার অধীন নহ, হে জ্যোতির্ম্ময়সুন্দর! হে অনন্তগুণময়-কমলবদন-দামোদর! তুমি সকলের আনন্দ দাতা ও ভবরূপ জলধি মথনের মন্দর স্বরূপ! তুমি কৃপা করিয়া আমার ভবভয় দূর কর।

ফলতঃ এই অক্ষর ভাবই দ্বৈত ও অদ্বৈত তত্ত্বের মিলন ভূমি, মন নির্ম্মল হইয়া বুদ্ধিতে পরিণত হইলে অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করিলে এই উত্তম পুরুষের তত্ত্ব জানিতে পারে বটে কিন্তু তাঁহার অনন্ত ভাবের ধারণা করিতে পারে না,

এজন্য তাঁহার কুটস্থ অক্ষর ভাবের চিন্তা পূর্ব্বক সাধন মার্গে অগ্রসর হইতে হয় এবং গৃহ আলোকিত করিবার জন্য যেমন লণ্ঠনের প্রয়োজন হয়, জল খাইবার জন্য যেমন গ্লাসের আবশ্যক, সেইরূপ জ্ঞানীগণ চিন্তার সুবিধার জন্য এই চিজ্জ্যোতির্ম্ময় অক্ষর পুরুষকে আপনার বা আপনার সহিত অভেদ ভাবে শিবরূপের আধারে আরোপ করেন ও ভক্তগণ গুরু, পিতা, মাতা বা সন্তান রূপের আধারে আরোপ পূর্ব্বক দাস্যাদি ভাবাশ্রয়ে সাধনা করেন, ফলে চুম্বকের ভাবে যেমন লৌহ চুম্বকত্ব লাভ করে, সেইরূপ জীব ভাবাপন্ন মন অক্ষর রূপী পরমাত্মার চিন্তার দ্বারা তাপ যোগে পারার ন্যায় স্তরে স্তরে উন্নীত হইয়া পরিশেষে অক্ষর ভাবাপন্ন হইয়া যায়।

অনুক্ষণ মাধব মধিব স্মরিতে,
সুন্দরী ভেলি মাধাই।

ভক্তিযোগে জীবাত্মা বা মন এইরূপেই অদ্বৈত ভাবাপন্ন হইয়া অক্ষর বা শিবাত্মায় পরিণত হয়, অতএব জ্ঞান ও ভক্তিমার্গের চরম ফল একই, অক্ষরত্ব লাভ উভয়েই লক্ষ্য, তবে ভক্তিমার্গ সরল ও দেশ-কালোপযোগী, বিশেষতঃ সংসারী ব্যক্তির পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠ পথ।

চ।—ক্ষর জীবাত্মা কি শ্রীভগবানকে লাভ করিতে বা তাঁহাতে লীন হইতে পারে না?

র।—ক্ষর জীবাত্মা যখন সাধনের দ্বারা অক্ষররূপী শ্রীভগবানকে লাভ করে, তখন সে নিজেই অক্ষর হইয়া যায় ও অদ্বিতীয় উত্তম পুরুষের অনন্ত ভাব উপলব্ধি পূর্ব্বক আপনাকে তাঁহার সহিত অভেদ বলিয়া জানিতে পারে, কিন্তু উত্তমপুরুষ হইবার অভিমান করিতে পারে না, সমুদ্র মধ্যে তরঙ্গের ন্যায় তাঁহার আশ্রিত হয় মাত্র, কেননা অক্ষর ব্যাষ্টি ও উত্তমপুরুষ সমষ্টি চৈতন্য।

চ।—অখণ্ড চৈতন্যের আবার ব্যাষ্টি সমষ্টি কি?

র।—ক্ষিত্যাদি ভূতগণ যেমন ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপে সর্ব্বব্যাপী, সেইরূপ ভূতগণের চালক ও প্রাণস্বরূপ চৈতন্যও ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাবে অখণ্ড, অক্ষর সমূহ তাঁহার ব্যক্ত তরঙ্গ মাত্র।

চ।—অক্ষরের ন্যায় ক্ষর ভাবাপন্ন জীব কি উত্তম পুরুষের আশ্রিত নহে?

র।—ক্ষর ভাবাপন্ন জীব অহঙ্কারের আশ্রিত ও তাহার বাসনার গতি সহস্র-মুখীন্ সুতরাং উত্তমপুরুষ জানিবে কিরূপে? ও না জানিলে আশ্রিত হইবে কাহার? মন বহির্ম্মুখীন্ হইয়া যাবং জড়-বিষয়ে আসক্ত থাকে তাবং চৈতন্যের উপলব্ধি করিতে পারে না, তাঁহার অব্যক্ত ভাবের মধ্যে অতৃপ্ত প্রাণে অন্ধের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়।

চ।—জড় কি চৈতন্যাতিরিক্ত বস্তু?

র।—চৈতন্যাতিরিক্ত কিছুই নহে, আলোকের অতি সূক্ষ্ম প্রকাশের নাম যেমন অন্ধকার, সেইরূপ চৈতন্যের অব্যক্ত প্রকাশের নাম জড়, অন্ধকারে যেমন দৃষ্টির উন্মেষ হয় না, বায়ুর মধ্যে সূক্ষ্ম ভাবে যে জলীয়াংশ আছে, তাহাতে যেমন পিপাসার নিবৃত্তি হয় না সেইরূপ জড়স্থ অব্যক্ত চৈতন্যে ত্রিতাপের শান্তি হয় না জানিও।

চ। জ্ঞান ও ভক্তি পথ সম্বন্ধে সন্দেহের মীমাংসা হইল, কিন্তু দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে সাংখ্য ও বেদান্ত প্রভৃতির মত ভেদ কেন? সাংখ্য বহু পুরুষ-বাদী ও বেদান্ত এক পুরুষ বাদী কেন?

র। গভীর ভাবে চিন্তা করিলে দেখিবে যে, সকল দর্শন শাস্ত্রেরই উদ্দেশ্য এক, তবে উপায় ভেদ আছে মাত্র, সাংখ্যর জ্ঞান চক্ষু উত্তম পুরুষরূপ সমুদ্রের উপরি ভাগে বহু অক্ষর তরঙ্গের ক্রীড়া দেখিয়া বিস্ময়ে ও আনন্দে স্তম্ভিত হইয়াছিল এবং ইহাই তাহার বহু পুরুষ বাদের কারণ; কিন্তু বেদান্তের অন্ত-দৃষ্টি আরও অগ্রসর হইয়া ঐ বহুত্বের মূলে পৌঁছিয়াছিল ও তাহার ফলে ঐ বহুত্বের মধ্যে একত্ব দর্শন এবং আপনাতে সেই একেরই প্রকাশ উপলব্ধি পূর্ব্বক অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছে, সাংখ্যের প্রকৃতি ও বেদান্তের মায়া একই, সাংখ্য বলিতেছেন যে "সাধনার দ্বারা প্রবৃত্তি প্রসূত রূপ রসাদি বিষয় হইতে পৃথক হইয়া আপন অক্ষর স্বরূপ প্রকাশ কর" আর বেদান্ত বলিতেছেন যে "বিচারের দ্বারা মায়িক বিষয় সকলকে মিথ্যা জ্ঞানে উহা হইতে নির্লিপ্ত হও এবং আপনার অক্ষর স্বরূপে অবস্থান কর" ফলতঃ সে পথ দিয়াই যাও না কেন, অক্ষরত্বে উন্নীত ও উত্তম পুরুষের সহিত অভেদ হইয়া নিত্যানন্দ সম্ভোগ করাই জীবের চরম উদ্দেশ্য জানিও।

ক্রমশঃ

শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

আগমনী।

—:০:—

এস এস ওমা দুর্গে, আমার এই ভাঙ্গা ঘরে।
আসাপথ চেয়ে আছি, পোড়া প্রাণে আশা ক'রে॥
হৃদয়ে রেখেছি আসন, আঁখি জলে ধোয়াব চরণ,
অর্ঘ্য দেবার তরেতে মন, রেখেছি মা যতন করে॥
স্নান তরে প্রেমবারি, রেখেছি ভৃঙ্গারে ভরি,
শ্রদ্ধা চন্দনাক্ত করি, জ্ঞান পুষ্পে সাজাই তোরে॥
ভক্তি সুধা নৈবেদ্যতে, বিবেক ধূপ জ্ঞান দীপেতে,
আত্মারাম পৌরহিতে, ব্রতী হবেন তোমার তরে॥
ষড়রিপু বলিদানে, তুষ্ট করব তোমায় উমে,
দেখা দিতে এ অধমে, এস গো মা দয়া করে॥
পদ্ম হবে দুনয়ন, শ্রীপদেতে কর্‌ব দান,
জুড়াইবে তাপিত প্রাণ, হেরে গো অভয়া তোরে॥
স্থান দিয়ে পদতলে, রাখিস্ গো মা পরকালে,
শচী বলে দুর্গা বলে, (যেন) প্রাণ পাখী যায় মা উড়ে॥

দীন—শ্রীশচীনাথ বন্দোপাধ্যায়।

অবাধ্য সময়।

—:০:—

সময়ের অবাধগতির অবরোধ করে এমন মহাশক্তি কাহারও নাই। মুক্তজীবে তাহা প্রকৃত জানিয়াও অকারণ সময় অতিবাহিত করিয়া থাকে। ইহার ন্যায় ভ্রম আর কি হইতে পারে? জীবের অবাধ্য সময়; পলকে পলকে পরমায়ু হরণ করিয়া পলায়ন করিতেছে। জীব। একবার ভাবিয়া দেখিলে কি? তোমার

পরমায়ু কতটুকু ?' ধর মোট একশত বৎসর সেই একশত বৎসরের মধ্য হইতেই অনুকলা, বিকলা, কলা, অনুপল, বিপল, পল, ইত্যাদি পলকে পলকে বিগত হইয়া দণ্ড, দিন, মাস বৎসর ক্রমে একবৎসর, দুইবৎসর, তিনবৎসর, এমন কতবৎসরই চলিয়া যাইতেছে, তাহাত ভাবিয়া দেখিলে না যে, যে সময় যতটুকু গত হইতেছে, ততটুকুই তোমার নিরূপিত আয়ু হইতেই হ্রাস পাইতেছে।

বল দেখি, যতটুকু সময় তোমার হ্রাস পাইল, ততটুকু তুমি ফিরাইয়া পাইবে কি ? সেই যে মেষাদি দ্বাদশ মাস, রব্যাদি সপ্তবার এবং একাদিক্রমে ত্রিশ দিন, ইহার কেহ সপ্তাহের পর, কেহ মাসের পর, কেহ বৎসরান্তে পুনঃ প্রত্যাগমন করিবে, কিন্তু তোমার যে হিসাবের দিন চলিয়া যাইতেছে এ আর ফিরিবে না। যতই দিন গত হইতেছে, ততই তোমার দেহের পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে।

বাল্য, পৌগণ্ড, যৌবন, মধ্য, বৃদ্ধ, তৎপরে অতিবৃদ্ধ হইলেই তোমার দেহ পতন হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিবে। তুমি কি আর এই দেহে বাল্য, পৌগণ্ডাদি ফিরাইয়া পাইবে ! তাহা আর পাইবেনা। আর কেবল যে সকল জীবেরই শত বৎসর পূর্ণ হইয়া মৃত্যু হইবে এমন নির্দ্দিষ্ট ও কিছুই নাই।

তোমার এইদেহ ব্যাধির মন্দির। ব্যাধিগণ তোমার বিনাশের নিমিত্ত শরীরের অন্তর্ব্বর্ত্তী ধমনী সমূহের মধ্যে থাকিয়া কৈশিকা নাড়ী দিয়া রক্ত সঞ্চালনের প্রতিপথে বিচরণ করিয়া সর্ব্ব শরীরাকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা সময়ে, সময়ে, নিজ নিজ উগ্রতা প্রকাশ করিয়া তোমায় বিকট বিভীষিকা দেখাইয়া না না ক্লেশ প্রদান করিতেছে। কখন যে তোমায় বিনাশ করিবে তারই বা স্থির সিদ্ধান্ত কি ? প্রদীপ জ্বলিতেছে ; বাতাস সংলগ্ন আছে, বাতাস প্রবল বেগে প্রবাহিত হইল সুতরাং সে যে নির্ব্বাপিত হইবে তাহার বিচিত্র কিছুই নাই।

তোমার এই দেহ দীপস্বরূপ। পরমায়ু তৈল দিয়া পরমপুরুষ ভগবান জীব অগ্নিদ্বারা আলোক জ্বালিয়াছেন, আলোক নির্ব্বাণ করিতে রোগগণ বায়ুরূপে আবহমান কাল ধীরে ধীরে চলিয়া দীপ শিখাকে হেলাইয়া দুলাইয়া নাড়া চাড়া দিতেছে। যখন প্রবল বেগে প্রবাহিত হইবে, তখন অবশ্যই নির্ব্বাণ হইবে।

তাই বলি জীব ! তুমি অস্থির, শত্রুগণ যখন তোমার বিনাশের জন্য অগ্রসর, সূর্য্যদেবের উদয়াস্তের সঙ্গে সঙ্গে তোমার আয়ু যখন বৃথা অতিবাহিত

হইতেছে. তখন তোমার অমৃতত্ব লাভের বাসনা ত্যাগ করিয়া অকারণ সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন কি?

অকারণ সময় অতিবাহিত কিসে হয় তাহা বুঝিয়াছ কি? তোমার ধারণা এই যে, আমার উপর সম্পূর্ণ সংসার ভার ন্যস্ত রহিয়াছে, আমি সর্ব্বেশ্বর কর্ত্তা, আমি না হইলে আমার সংসার কিছুতেই চলিবেনা।

এই ভাবনায় নিমগ্ন হইয়া চিরশান্তি প্রদায়ক হরিকথায় উপেক্ষা করিয়া না না কর্ম্মেব্যস্তও না না চিন্তায় উদ্ভাবিত হইতেছ। ইহা যদি তোমার প্রকৃত কর্ত্তব্য তাহা হইলে তুমি বলিতে পার? কাল তোমার সংসারে কি কি কার্য্য চালিত লইবে, কয়জন তোমার আশ্রয়ে আশ্রিত হইবে, কি কি খাদ্য তোমার প্রস্তুত হইবে এবং নিশ্চয়ই তাহা তোমার ভোগে আসিবে কি না? তাহা তুমি কিছুতেই বলিতে সমর্থ নও। যাহার কুক্ষিকা প্রমাণ ভার বহিবার শক্তি নাই তাহার গিরি কত ভার হইবে তাহা বুঝিবার আবশ্যক কি?

তোমার যাহা কর্ত্তব্য নয় তুমি তাহাই করিতেছ, তুমি যাহাদের একমাত্র ভরসার স্থল, তুমি যাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছ বলিয়া স্থির করিয়াছ, বল দেখি তুমি মরিয়া গেলে তোমার অভাবে তাহারা কেহ অনশনে মরিয়া যাইবে কি? করুণাময় জগদীশ্বর জীব সৃষ্টি করিয়া জীবের খাদ্য অবশ্যই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, এজগতে জীবগণ নিজ নিজ কর্ম্মফলানুসারে ভোগ্য-বস্তু ভোগ করিয়া থাকে। তুমি কেবল বৃথা আমি করিতেছি আমারই সকল এই রূপ অলীক চিন্তায় অকারণ সময় নষ্ট করিতেছ।

এইরূপ করিয়া তোমার নির্দ্দিষ্ট দিন কয়টা চলিয়া গেলে আগামী ঘোর-বিপদ যে মৃত্যু তোমার সম্মুখে বিকট বদন বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে সে তোমার স্বজনাদির পর্ব্বের পরিচয় ঘুচাইয়া বিস্মৃতি সাগরের গভীর গর্ভে নিমজ্জিত করিয়া রাখিবে, তুমি আর তাহা কখনই পাইবে না, একেবারে মহাশূন্যে বিলুপ্ত হইবে।

তুমি নিজ কর্ম্মদোষে শমনের প্রবল প্রতাপে পতিত হইয়া যখন অসহ্য যাতনা সহ্য করিয়া ঘোর আর্ত্তনাদ করিবে, তখন তোমার আত্মীয় স্বজন বান্ধবাদি দ্বারা সেই দণ্ডীর দণ্ড হইতে উদ্ধার সাধন হইবার উপায় থাকিবে না।

তাইবলি, অকারণ সময় অতিবাহিত করিয়া, কালনিবারণকারী আর্ত্তত্রাণকর্ত্তা করুণাময় চিন্ময় জগদানন্দের শ্রীচরণ স্মরণ করিতে অবহেলা করিওনা। তাঁহার শরণ লইলে তোমার অকারণ সময় নষ্ট হইয়া তোমাকে ঘোর মৃত্যু মুখে পতিত হইতে হইবেনা। পাপীর মৃত্যু ভয় হইয়া থাকে, কিন্তু সাধুর সে ভয় নাই। ইহা পণ্ডিতগণ অবশ্যই স্বীকার করিবেন। পাপীরাই মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে কিন্তু "হরিভক্ত সাধুগণের" সুশিক্ষা দিয়া জীবউদ্ধার ও জগৎ পবিত্রহেতুই নরাকারে এই জগতে আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে।

সময় থাকিতে অযথা কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সেই করুণহৃদয় মধুসূদনের শ্রীচরণ ঐকান্তিকমনে স্মরণ কর, তিনি অবশ্যই তোমায় চরণ সেবার দাস করিয়া লইবেন, তাঁহার দাস হইলে তোমার আর মৃত্যু ভয় রহিবে না, তুমি সাধু হইয়া অমরত্ব লাভ করিবে।

দেখ দেরি করিবার সময় নাই, কিজানি তোমার সময় টুকু যাইতে যাইতে একেবারে কখন চলিয়া যাইবে, তাহার স্থির নাই। অতএব বিলম্ব করিওনা, কেবল হরি হরি বলিয়া কালাতিপাত করিতে থাক। হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!!

শ্রীইন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য।

শ্রীমাধব সাধু।

—:০:—

মাধবদাস কৃষ্ণানুরাগী ভক্ত ছিলেন। কোন কোন ব্যক্তি বৈরাগ্যবশে সংসার বাসনা ত্যাগ করিয়া বাউল হন। কিন্তু ইনি অনুরাগের মধুময় প্রবাহে ভাসিয়া মায়াপারে উপনীত হইয়াছিলেন। মাধবের স্ত্রী, পুত্র গৃহ সবই ছিল, কিন্তু ব্রজেমাধবের মোহনমুরলীধ্বনি উহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে; তাই উনি প্রাণের গুপ্ত মধুর আবেগে নীলাচলধামে আগমন করিলেন। অপর লালসামগ্রী সম্ভোগ দূরে থাকুক, অবশেষ ভিক্ষাবৃত্তি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া ইনি অযাচকবৃত্তি দ্বারা তথায় জীবন রক্ষা করিতে থাকিলেন। অযাচক ভাবে সকলদিন অন্ন জুটেনা। দৈবাৎ কি হইল,—তিনি তিন দিনের উপবাসী; ভক্তদুঃখে-দয়াল জগন্নাথ

বড়ই উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং রাত্রির শয়ন কালে লক্ষ্মীঠাকুরাণীকে দিয়া এক স্বর্ণথালে নিজ ভক্তের জন্য প্রসাদ অন্ন পাঠাইলেন। মাধবদাস দেখেন নানা আভরণে বিভূষিতা এক পরমা রূপসী সোণার থালে অন্ন লইয়া আসিয়াছেন। ঠাকুরাণী মাধবের সম্মুখে থালী রাখিয়াই অন্তর্হিতা হইলেন। মাধব ক্ষণেক ভাবিয়া শ্রীজগন্নাথেরই এই কর্ম্ম স্থির করিলেন এবং প্রসন্নচিত্তে ও ভাবাবেশে মহাপ্রসাদ পাইয়া স্বর্ণথালা যত্নে ধৌত করিলেন এবং তাহা নিকটে রাখিয়া সুখে নিদ্রিত হইলেন।

প্রাতঃকালে স্বর্ণথালী না পাইয়া পাণ্ডাগণ চুরির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ইতস্ততঃ ঘুরিয়া শেষে মাধবদাসের নিকট স্বর্ণথালী প্রাপ্ত হইলেন। পাণ্ডাগণ মাধবকে বাঁধিয়া বেত্রাঘাত করিতে করিতে প্রকাশ্য স্থানে আনিলেন। মাধব অবাক্ নিস্পন্দ হইয়া কশাঘাত সহ্য করিতে লাগিলেন। তিনি যত নিগ্রহ সব পিঠ পাতিয়া লইতেছেন, প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতেছেন না, একেবারে নীরব!—প্রভু জগন্নাথের সহ্য হইলনা, তিনি আদেশ জানাইলেন, "সেবকগণ! দেখ এই মাধবকে মারিতে আমার গাত্রে লাগে, তোমাদের এই কঠোর বেত্রাঘাতে আমার পিঠ ফুলিয়া গিয়াছে; আমিই স্বয়ং ভক্ত মাধবকে স্বর্ণথালে প্রসাদ দিয়াছিলাম।" প্রভুর বাক্য শুনিয়া এবং প্রভুর পিঠে সত্য সত্যই বেত্রের দাগ বসিয়াছে দেখিয়া সেবকগণ হায় হায় করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন, "হায়! আমরা ভক্তের এত নিগ্রহ করিয়াছি! প্রভুকে এত ক্লেশ দিয়াছি!—হায়! আমরা ঘোর অপরাধী!"—জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে প্রহারের দাগ দেখিয়া সেবকগণের প্রাণ ফাটিয়া গেল। তখন তাঁহারা আর কি করেন, সাধুর নিকট ক্ষমা চাহিলেন। কিন্তু নিগ্রহে ও অনুগ্রহে মাধবের একই ভাব লক্ষিত হইল। তাহা দেখিয়া লোকে বিস্ময় সহকারে তাঁহার প্রভাব গাহিতে লাগিল।

কিয়দ্দিন পরে মাধব সাধুর আমাশয় পীড়া হইল। জল আনিয়া শৌচাদি সম্পাদনের শক্তি নাই। তদবস্থায় তিনি লোকের উদ্বেগ না হয় এজন্য বালুচড়ে যাইয়া পড়িয়া থাকিলেন। তুলিয়া তাঁহাকে শৌচাদি করায় এমন দ্বিতীয় জন নাই। সুতরাং মাধবের অবস্থা অতিশোচনীয়। মাধবের জন না থাকিলেও একজন আছেন। ভক্তের দুঃখ দেখিয়া ভক্ত-দুঃখহারী জগন্নাথ

থাকিতে পারিলেননা। ছদ্মবেশে ভৃত্যের ন্যায় আপনি জলপাত্র লইয়া মাধবদাসের সাহায্য করিতে থাকিলেন। মাধব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?—কি স্বার্থে কাঙ্গালে এত দয়া দেখাইতেছ ?"—প্রভু কহিলেন, "আমি জগন্নাথ।—মাধব শুনিয়া বলিলেন, তুমি এই নীতিবিরুদ্ধ কর্ম্ম কর কেন? তুমি সিংহাসনে বসিয়া থাক; নরে দেবে তোমার সেবা করে; কত রাজা মহারাজ দ্বারে খাড়া থাকিয়া তোমার চরণ সেবার প্রার্থী হয়। আমি নীচ, অজ্ঞান, আমার সেবা করা তোমার সাজেনা। ইহাতে তোমার ঈশ্বরত্ব থাকিবেনা, লোকে উপহাস করিবে; বিশেষতঃ লক্ষ্মীদেবীও তোমায় লজ্জা দিবেন।"—শ্রীজগন্নাথ কহিলেন, "আমার নিন্দাকলঙ্ক হউক্ সে ভাল, তবু তোমার দুঃখ আমি সহ্য করিতে পারিনা।"—জগন্নাথ কৃপায় মাধব সুস্থ হইলেন।

মাঘ মাসের রাত্রি, পুরীর ভিতর মাধবদাস শুইয়া আছেন; কিন্তু উপযুক্ত শীতবস্ত্র নাই, মাধব শীতে বড়ই কষ্ট পাইতেছেন। দেখিয়া দয়াসিন্ধু শ্রীজগন্নাথ স্নেহে নিজ শ্রীঅঙ্গের বহুমূল্য বস্ত্র মাধবের অঙ্গে উড়াইয়া ফেলিলেন। মাধব সুখে ঘুমাইয়া থাকিলেন। প্রাতঃকালে পাণ্ডাগণ দেখেন প্রভুর শ্রীঅঙ্গের বহুমূল্য শীতবস্ত্র মাধবের অঙ্গ ঢাকিয়া আছে। পাণ্ডাগণ ভয়ে কিছু বলিলেননা। মাধব জাগিয়া অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে এই বহুমূল্য বসন সজোরে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। শ্রীজগন্নাথের আনন্দ তাহাতে আরো বাড়িয়া গেল। জগন্নাথ ও মাধবের এই শুদ্ধ সখ্য এত মধুর যে এসব লীলাপাঠে চিত্ত বড়ই উল্লাসিত হয়।

একদিনের কাণ্ড বড়ই কৌতুক জনক,—জগন্নাথ পুনঃ পুনঃ মাধবকে বলিতেছেন, "মাধব! চল আমরা সত্যবাদী গোপালের বাগানে যাইয়া কাঁটাল চুরি করিয়া খাই।"—মাধব সম্মত হইলেন না, তবু শ্রীজগন্নাথ তাঁহাকে হাতে ধরিয়া নিয়া গেলেন। লম্ফ দিয়া বাগানে প্রবেশ করিয়া একখানা কাঁটাল নামাইতেই বাগানের মালী টের পাইল। চতুর জগন্নাথ অমনি প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া পলাইলেন, কিন্তু উদারস্বভাব মাধব বসিয়া থাকিলেন। মালীগণ আসিয়া তখন তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিল। মাধব বিনীত ভাবে বলিলেন, আমি চোর নহি, চোর পলাইয়া গিয়াছে। জগন্নাথই চোর, সে বলপূর্ব্বক আমাকে এখানে আনিয়াছিল এবং কাটাল পাড়িবার পর শঠতা পূর্ব্বক আমাকে বাঁধাইয়া দিয়া নিজে পলাইয়াছে। আপনারা চলুন, আমি দেখাইয়া দেই, প্রকৃত চোর কে?

ধরিয়া আনিয়া কাঁটালের উপযুক্ত মূল্য যাহা হয় আদায় করুন। যদি আমার কথার প্রত্যয় না করেন, তবে ঐ দেখুন পলাইতে কণ্টক ঝোপে চোরের পীত বসন আঁটকিয়া রহিয়াছে।"—মালীগণ বড়ই বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই লোকটী জগন্নাথকেই চোর বলিতেছে, একি প্রলাপবাক্য না সত্য ? প্রাতে পাণ্ডাগণ আসিয়া সাধুকে মুক্ত করিয়া নিল এবং সাধুর মুখে রাত্রিকার বৃত্তান্ত সব শুনিয়া চমৎকৃত হইল। মালীগণ পুলকিতচিত্তে পীতবসন খানি তুলিয়া আনিয়া সেই কাঁটাল সহ শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে অতি যত্নে পাঠাইয়া দিলেন।

মাধব যাইয়া সকোপে জগন্নাথকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন, হ্যারে দুষ্ট, ধৃষ্ট, শঠ, লম্পট চোরা ! ননীচোরা, মনোচোরা বলিয়া তোর যে সব অকীর্ত্তি অপযশঃ তার প্রমাণ আজ দেখাইলি। তুই নিজে কাঁটাল চুরি করিয়া আমাকে চোর বাধাইয়া লজ্জিত করিলি !"—সখ্যপ্রীতির কিবা অনুপম ভাবমাধুর্য্য ! মাধব জগন্নাথকে ও কত জোরের সহিত গালি দিতেছেন। তাহা শুনিয়া জগন্নাথের অধরে মুচ্‌কি হাসির মৃদু সুধাধারা ঝরিতেছে ! ধন্য মাধবদাস !

কিছু দিন গেলে মাধব জগন্নাথের অনুমতি লইয়া শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন, পথে এক শিষ্যপত্নীর গৃহে বিশ্রাম করিলেন। সেই ভাগ্যবতী নারী ভক্তি-পূর্ব্বক মাধবের বহুসেবা করিলেন। অতঃপর মাধব শিষ্যপত্নীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তথা হইতে গন্তব্য পথে চলিলেন। সেই রমণী তখন দেখিতে পাইলেন অনুপমরূপ লাবণ্যপূর্ণ অপূর্ব্ব এক বালক ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে হাটিতেছে। তদ্দর্শনে রমণী অতিশয় সুখ লাভ করিলেন, কিন্তু মাধব এসংবাদ রাখেন না। তিনি জানেন না যে, জগন্নাথ গোপাল বেশে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। জগন্নাথ কৃপাপূর্ব্বক রমণীকে চিনা দিলেন। রমণী গোপালের এই পর্য্যটন ক্লেশ দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন, কিন্তু মুখে কিছুই ব্যক্ত করিলেন না। ইহাই বিশুদ্ধ প্রেমের লক্ষণ।

পথে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে কতিপয় দিবসে মাধব শ্রীবৃন্দাবন ধামে উপনীত হইয়া একেবারে প্রেমবিহ্বল হইলেন এবং নানাভাবে নৃত্যগীত ও পর্য্যটন আরম্ভ করিলেন। প্রেমানন্দের উচ্ছ্বাসে মাধব ব্রজের ধূলিতে লোটাইয়া লোটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

নিধুবনে শ্রীমান্ বঙ্কবিহারীর রূপমাধুরী সন্দর্শনে মাধব অতীব সুখী হইলেন। শ্রীস্বামী হরিদাস বঙ্কবিহারীকে বহু প্রণয়ে সেবা করিয়া থাকেন। বঙ্কবিহারীর সাক্ষাতে মাধব প্রেমানন্দে বহুক্ষণ নৃত্য করিয়া যমুনাতটে বিশ্রাম লইলেন। উপবাসী মাধব যমুনাতীরে বসিয়া আছেন; দ্বিতীয় দিবস একব্যক্তি কিছু চানাভাজা উপহার দিলেন। মাধব তাহা দিয়া অতিযত্নে শ্রীবঙ্কবিহারীর ভোগ লাগাইয়া প্রসাদ পাইলেন এবং বসিয়া পরমানন্দে কৃষ্ণনাম গাহিতে থাকিলেন। এদিকে নিধুবনে বঙ্কবিহারীর নিয়মিত ভোগ লাগিল। মিষ্টান্ন পক্কান্নাদি নানা উপাদেয় সামগ্রীর ভোগ, শ্রীস্বামী হরিদাস নিজহস্তে ঠাকুরের সম্মুখে দিয়াছেন। দুইদণ্ডকাল ঠাকুর ভোজন করেন। দুইদণ্ড পরে মন্দিরদ্বার উদ্ঘাটিত হইল, কিন্তু অদ্য হরিদাস ঠাকুরের ভোজনের কোনও চিহ্ন পাইলেননা। অন্যান্যদিন ঠাকুর ভোজন করেন, পুনঃ শ্রীহস্তের অমৃত স্পর্শে পাত্র সকল পূর্ণ হইয়া থাকে কিন্তু অদ্য সমস্ত পূর্ণই বটে তবে অধরে ও শ্রীহস্তে ভোজনের কোন চিহ্ন নাই। সুতরাং অদ্য ঠাকুরের আচমনের প্রয়োজন হয়নাই। শ্রীস্বামীজী সন্দেহবশে অতি উদ্বিগ্ন হইয়া কৃতাঞ্জলীপুটে বঙ্কবিহারীকে অতি অনুরাগের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, অদ্য তোমার ভোজনের কি বিঘ্ন হইল তাহা আমাকে বল।" ঠাকুর কহিলেন, "আজ আমার ক্ষুধা নাই, জগন্নাথী মাধব যমুনাতীরে বসিয়া আমাকে অতি সুস্বাদু চানাভাজা খাওয়াইয়াছে। তাহাতে এমন উদরপূর্ত্তি হইয়াছে যে আমার লেশমাত্র ক্ষুধা নাই। শুনিয়া স্বামীজী মুচকি হাসিয়া বাহিরে আসিলেন। তখন তাঁহার চিত্তে হর্ষবিষাদ দুইই উপস্থিত হইল।

স্বামীজী মাধবকে মন্দিরে আনাইলেন। উভয়ের মিলনে নিবিড় প্রেমানন্দ উথলিয়া গেল। স্বামীজী বলিলেন, "মহাত্মন্। কৃষ্ণ আপনার একান্ত বশ! সতত আপনার হৃদয়ে বিশ্রাম করেন। আপনার ভক্তিগুণে চানাভাজাও অমৃত হইয়া কৃষ্ণের এতদূর তৃপ্তি সাধন করিয়াছে—আর এই দেখুন, মিষ্টান্ন পিষ্টক অন্নব্যঞ্জনাদি পড়িয়া রহিয়াছে। আপনার ভাগ্যের সীমা কে নিরূপণ করিবে? স্বামীজীর ঈদৃশ প্রণয়-মধুর-বচন শুনিয়া মাধব সহসা মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়া খেদ করিতে লাগিলেন, "হায় আমি কি কুকর্ম্মই করিয়াছি! আমার ন্যায় সেবাবাদী অপরাধী আর নাই। শ্রীশ্যামসুন্দরের যে কমল বদনে ক্ষীর, সর, ননী রুচেনা, আমি হতভাগ্য নরাধম সেই বদনে কঠিন রুক্ষ চানাভাজা দিয়া কৃষ্ণের কতই

ব্যথা জন্মাইয়াছি? মাধবের দুনয়নে অবিরল অশ্রুধারা বহিতে থাকিল। স্বামীজীও তখন তাঁহার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রেমের নদী বহিল!

এ আনন্দে কয়েকদিন অতীত হইল, একদিন মাধব ভাণ্ডীর বনে বেড়াইতে গেলেন। তথায় এক টিলার উপর একমূর্ত্তি ব্রহ্মচারী আছেন। তাঁহার গৃহ সকল নানা সামগ্রীদ্বারা পূর্ণ। সে সকলের বিন্দুমাত্রও দীনদুঃখীর ক্ষুন্নিবারণে কি সাহায্যে বা বৈষ্ণব সেবায় লাগেনা। ব্রহ্মচারী অতি কৃপণ, ঘোরবিষয়ী। কঠোর, ভক্তিলেশহীন। লোক দেখিলেই ব্রহ্মচারী "দূর দূর" করিয়া তাড়ায়েন। মাধব টিলার উপর উঠিয়া ঘৃত, তণ্ডুল, গুড়, চিনি প্রভৃতি ভক্ষ্য সামগ্রীর পূর্ণ ভাণ্ডার দেখিয়া ব্রহ্মচারীকে কহিলেন, "মহাশয়! আপনার স্ত্রী পুত্র পরিজনাদি কেহ নাই। আপনি একাকী, তবে আপনি এসব জিনিষের প্রহরিত্ব করেন কেন? আমি বলি, আপনি এসব সাধু বৈষ্ণবে বিতরণ করিয়া কৃষ্ণ ভজন করুন।"— মাধবের এসব কথায় ব্রহ্মচারী চটিয়া গালিবর্ষণ করিতে করিতে টিলা হইতে তাঁহাকে নামাইয়া দিলেন। মাধব নিম্নে আসিয়া ভাবিলেন ব্রহ্মচারীর হিতার্থে এক কৌশল করা যাউক—এই ভাবিতেই ব্রহ্মচারীর দ্রব্যাদি সব কীটময় হইল। বিপদ্ দেখিয়া ব্রহ্মচারী সাধু মাধবের পদানত হইলেন এবং তাঁহার উপদেশ মতে সব সামগ্রী ভক্তদের লুটাইয়া দিলেন। তখন মাধব তাঁহাকে সাংখ্যের যোগতত্ত্ব উপদেশ দিয়া তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তি সঞ্চারিত করিলেন। ব্রহ্মচারীর কৃষ্ণে প্রবলানুরাগ জন্মিল। এইতো সাধুসঙ্গের সিদ্ধফল।—

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সধু সঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

শ্রীবৃন্দাবন পরিভ্রমণ করিয়া প্রেমপুলকে বিভোর মাধব পুনঃ নীলাচলচন্দ্রের দর্শনে চলিলেন। পথে তাঁহার অপর এক শিষ্যের কৃষ্ণ ভক্তি ও আনন্দ কৌতুক কাহিনী শুনিয়া ছদ্মবেশে তাহার গৃহে উপনীত হইলেন। এই শিষ্য অতিবড় কৃষ্ণভক্ত। তাঁহার গৃহে সতত ভক্ত সমাগম হয়। দিবস কৃষ্ণ কথা আলাপরসে এবং যামিনী সঙ্কীর্ত্তন সুখ রঙ্গে কাটিয়া যায়। ছদ্মবেশী মাধব দেখিয়া শুনিয়া এত সুখী হইলেন যে তিনি কয়েক দিন তথায় বাস করিতে ইচ্ছুক হইলেন,

এবং নিজ শিষ্যকে অনুনয় করিয়া পেটে ভাতে তাঁহার গো রাখালী কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। এই ভাবে একমাস তথায় থাকিয়া ভক্তবৃন্দের কীর্ত্তনরসাস্বাদ করিলেন এবং অতঃপর নিজকে প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে একদিন গোশালার সম্মুখে ভাবাবেশে পড়িয়া থাকিলেন। সেইদিন তাঁহার আর একশিষ্য পরমার্থ ভ্রাতার গৃহে আসিয়াছিলেন। গৃহস্বামী শিষ্য রাখালের এভাব দেখিয়া তাহার বদন পানে চাহিলেন, ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিতেই দেখেন, তাহার গুরুর আকৃতি। অমনি তিনি ধাইয়া যাইয়া পরমার্থ বন্ধুকে আনিয়া দেখাইলেন। ইতি মধ্যে বহুলোক সমাগম হইল। শিষ্যদ্বয় চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। গৃহস্বামী শিষ্য বলিলেন, প্রভো! আমার কোন্ অপরাধে এ গুরু দণ্ড? কেন আমায় গৃহে এই হীন সেবা গ্রহণ করিয়া বহুক্লেশ দুঃখ ভোগ করিলেন? হায়! আমি মহাপাতকী, আপনি ক্ষমা না করিলে আমার দুর্গতির পরিসীমা থাকিবেনা।" গুরু মাধব কহিলেন, "বাছা, তোমার কোন অপরাধ নাই। তোমার ভজনাদি আনন্দ মহোৎসব দর্শন করিতেই ছদ্মবেশে তোমার গৃহে আছি। প্রকাশ্যভাবে আমি সাক্ষাৎ থাকিলে, তোমাদের উৎসবের অনেক বিঘ্ন হইত। তোমার প্রতি আমি অতীব প্রীত হইয়াছি, কিছু মনে করিওনা।

এই শিষ্যের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া মাধব নীলাচলাভিমুখে অগ্রসর হইতে পথে অপর এক বণিক শিষের গৃহে আগমন করিলেন শিষ্য গৃহে নাই, তাঁহার পত্নী গুরুকে যত্ন পূর্ব্বক পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাখিলেন এবং ভোজনের উদ্যোগ করিতে চাহিলেন। সেই বাড়ীর অপর এক প্রকোষ্ঠে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। বণিক পত্নী তাঁহাকে বলিলেন, "ঠাকুর, আপনি তো পাক করিবেন গৃহে এক বৈষ্ণব আসিয়াছেন, আমি কতকটা চাউল দেই, আপনি এক সঙ্গেই পাক করিয়া লউন্।" শুনিয়া ঠাকুরের রাগ হইল। তিনি বলিলেন, আমি কি রসুয়ে বামুণ্? তাকে দিয়েই পাক করাও গিয়ে। বণিক পত্নী ভয়ে কিছু না বলিয়া অগত্যা গুরুকে শুদ্ধ দুগ্ধসেবার আয়োজন করিয়া দিলেন। এই ব্রাহ্মণেও মাধব সাধুরই শিষ্য বটে। ব্রাহ্মণ শিষ্যের উত্তর মাধব নিজকর্ণে শুনিয়াছিলেন। সেবার পর বিশ্রাম করিয়া মাধব চলিয়া কিয়দ্দূর যাইতে, বণিক্ শিষ্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বণিক্ নিজগুরুকে পাইয়া আনন্দে তাঁহাকে পুনরায় গৃহে ফিরাইয়া আনিলেন। বণিকের আগমনবার্ত্তা পাইয়া সেই ব্রাহ্মণও তথায়

আসিলেন এবং আসিয়া দেখেন সেই বৈষ্ণব আর কেহ নয়, তাঁহারই গুরু। ব্রাহ্মণ গুরুকে প্রণাম করিতেই, মাধব বলিলেন, আমি তোমার মুখ দেখিতে ইচ্ছা করিনা; তুমি এখানে থাকিলে আমি চলিয়া যাইব। বণিকের স্ত্রী এক বৈষ্ণবের ভোজনার্থে এক মুষ্টি তণ্ডুল তোমার পাকপাত্রে দিতে চাহিল তুমি তাহা পারিলেনা? বৈষ্ণবে তোমার এত উপেক্ষা? আবার রাগও করিলে? হায়! তোমার এই চরিত্র? বুঝিলাম তুমি বৈষ্ণবে বহির্মুখ, কৃষ্ণভজনে তোমার অধিকার নাই।—"যাহাহউক্, ব্রাহ্মণের বিনয় বাক্যে সাধু প্রীত হইয়া শেষে অভয় দিলেন।

বণিক গৃহে কয়েকদিন থাকিয়া সাধু মাধব শ্রীশ্রীনীলাচল চন্দ্রের সম্মুখে উপনীত হইলেন। নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথ মাধবকে দেখিয়া অতীব আনন্দোৎফুল্ল হইলেন। মাধবের চরিত্র ও ভাগ্য বর্ণন করিতে যাওয়া আমার ন্যায় অধমের আস্পর্দ্ধামাত্র। শ্রীবৈষ্ণবকৃপায় চিত্তে এই দুরাশার উদ্রেক হইয়াছিল। প্রাণের আশা কথঞ্চিৎ মিটাইয়া সুখী ও তৃপ্ত হইলাম।

শ্রীবৈষ্ণবানুগ—শ্রীকালীহর বসু ভক্তিসাগর।

মিনতি।

—:০:—

হে গুরো আনন্দময় দীনায় হও হে কৃপাবান্,
কৃপণতা ত্যজে প্রভো কর জ্ঞানালোক দান॥
নিবিড় আঁধারময়, পথ দেখা নাহি যায়,
ভয়ঙ্কর ভয় নানা বিভীষিকাময় স্থান।
যেতে পথে পদে পদে, পড়িতেছি বিঘ্ন হ্রদে,
বেদনায় ব্যাথিত তনু হ'ল শ্রান্ত মন প্রাণ॥
তোমারি প্রশস্ত করে, ধর এই দুর্ব্বল করে,
ধীরে-ধীরে ল'য়ে চল, যথায় আনন্দ ধাম॥

শ্রীমতী জ্ঞানদা দাসী।

মহানুভব ৺ অধর চন্দ্র দে।

শীর্ষোক্ত মহানুভবের নিবাস বাঁকুড়া জেলার সোণামুখী গ্রামে। যে গ্রাম বাবা মনোহরেরলীলা ভূমি, প্রেমময় দাদা পাগল শ্রীল হরনাথ ঠাকুরের জন্মস্থান, বৈষ্ণব প্রধান সেই গ্রাম খানিতেই ৺ অধর চন্দ্র দে মহাশয় জন্ম গ্রহণ করিয়া আপন গৌরব মহিমা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইনি একজন আদর্শ গৃহী, আদর্শ প্রাচীন হিন্দু ও আদর্শ ধার্ম্মিক ছিলেন। সোণামুখী অঞ্চলে ইনি "দাতা অধর চন্দ্র" নামে খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন।

ইঁহার ন্যায় পরোপকার প্রিয়, দেব দ্বিজে ভক্তি পরায়ণ, সর্ব্বজীবে সমদর্শী, বিনয়ী, সহৃদয়, উদারচেতা, ধর্ম্ম-ভীরু, ঈশ্বর বিশ্বাসী, দরিদ্রের বন্ধু, মহানুভব ব্যক্তি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। চিরকাল সত্যপথে চলিয়া ইনি সত্যের এক জীবন্ত আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। কেহ বলেন ইনি শাপভ্রষ্ট লোক, কেহ বলেন ইনি প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি, কেহ বলেন, ইনি মহাপুরুষ যুধিষ্ঠির তুল্য ব্যক্তি, আবার কেহ বা বলেন ইনি সোণামুখীর দানবীর "বিদ্যাসাগর"। তাঁহার উদ্দেশে লিখিত একটী ভাবময়ী কবিতা নিম্নে প্রকাশিত হইল। তাঁহার ন্যায় আদর্শ গৃহের পবিত্র জীবনের কোন কোন কাহিনী, আমরা সুবিধা অনুসারে "ভক্তি"তে প্রকাশিত করিব, মানস রহিল। ("ভক্তি" সম্পাদক।)

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলী।

[পরমারাধ্য পিতৃদেবের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে লিখিত।]

(১)

পিতৃদেব! বরষ অতীত হ'ল, নয়নে না হেরি—
তব কমনীয় দিব্য সৌম্য মূর্ত্তি খানি।
যদিও মনোমন্দিরে নিত্য পূজা করি,
চিত্র পটে, পাদপদ্মে প্রীতি-অর্ঘ্য আনি।
আজি এ শ্রাদ্ধ বাসরে, আছি নতমুখে,
দাঁড়াইয়া একধারে, কৃতাঞ্জলি-করে,

তুমি গো গোলোক হ'তে চাহ অনিমিখে,
একবার, লহ শ্রদ্ধা, লহ প্রীতিভরে।
নিত্য বৃন্দাবন ধামে, যুগল-মাধুরী,
উচ্ছ্বাস ছুটিয়া যায় তর তর বেগে;
আজি সে গোলক হ'তে আশীর্ব্বাদ বারি,
বরষি দাসেরশিরে, দাও গো সোহাগে।
প্রেমোজ্জ্বল মূর্ত্তি যেন না ভুলি কখন।
শরণ হউক্ মোর যুগল চরণ॥

(২)

হে বরণ্যে! তোমারি ভাবেতে যেন থাকি বিভাবিত।
তোমারি পদাঙ্কে যেন হই অনুসৃত॥
তোমারি আদর্শ নিত্য হৃদয়ে গাঁথিয়া
কঠোর সংসার পথে যাই গো ছুটিয়া।
জীবহিত মহাব্রত ছিল গো তোমার।
জীবে দয়া ভাব মোর হউক্ সঞ্চার॥
ধর্ম্মের প্রোজ্জ্বল মূর্ত্তি ওহে মহাজন।
মনে পড়ে তোমার সে সত্য আচরণ॥
মনে পড়ে সর্ব্ব জীবে কিবা সমজ্ঞান।
মনে পড়ে সুপবিত্র অকপট প্রাণ॥
মনে পড়ে ভগবানে কি দৃঢ় বিশ্বাস!
বাহিরেতে প্রতি অঙ্গে যার সুপ্রকাশ॥
মনে পড়ে নাম মন্ত্রে কি সিদ্ধি তোমার।
মনে পড়ে চিত্রখানি প্রেমামৃতাধার॥
আজি এ শ্রাদ্ধ-বাসরে করিছি স্মরণ।
একে একে গুণ রাশি, বিমোহিত মন॥
অকৃতী সন্তান আমি, পাপেতে মলিন।
তাপেতে বিদগ্ধ হিয়া, চিন্তা জ্বরে ক্ষীণ॥

এ অধম তনয়ের ভক্তি পুষ্পাঞ্জলী—
লহ দেব! মহাহর্ষে, লহ স্নেহে তুলি।

প্রণত, দীন—রসিক লাল দে।

কি হবে আমার।

——:০:——

হ'য়ে মায়া দাস বেড়াই জগতে
ভুলেছি সকলি মায়ায় তোমার।
বলনা হে প্রভু! কি হবে আমার॥

২

হারায়েছি আমি গোত্র, কুল, নাম,
বৃথা অর্থ লোভে সর্ব্বথা অসার।
বলনা হে প্রভু! কি হবে আমার॥

৩

সাধন ভজন কিছু মোর নাই
আত্মেন্দ্রিয় সেবী আমি দুরাচার।
বলনা হে প্রভু! কি হবে আমার॥

৪

নাহিক আশ্রম নাহি আনুরাগ
ফিরি ঘরে পরে লালসা দুর্ব্বার।
বলনা হে প্রভু! কি হবে আমার॥

৫

ধীরে ধীরে আসে নিকটে শমন
ত্রাসে বুক পুরে হয় ছার খার।
বলনা হে প্রভু! কি হবে আমার॥

৬

যায় হে জীবন না হ'ল চিন্তন
"হরে কৃষ্ণ" নাম প্রেমের পাথার।
বলনা হে প্রভু! কি হবে আমার॥

৭

মায়া রঙ্গ বাড়ে কাটিল জীবন
হ'লনা বিশ্বাস গুরু কর্ণধার।
বলনা হে প্রভু! কি হবে আমার॥

৮

দিনে দিনে বাড়ে রতি রঙ্গ আশ
সাধের সংসার হয় হে প্রসার।
বলনা হে প্রভু! কি হবে আমার॥

৯

ডুবে যায় ওই জীব শুক্ তারা
ঘুচিল না মোর হৃদয় বিকার।
বলনা হে প্রভু! কি হবে আমার॥

১০

কভু মনে লয় সংসার স্বপন
ত'বু ভুলে থাকি মায়াতে তোমার।
বলনা হে প্রভু! কি হবে আমার॥

১১

যত দুঃখ পাই কেঁদে উঠে মন
তত তাহে হয় প্রেমের সঞ্চার।
বলনা হে প্রভু! কি হবে আমার॥

১২

ছাড়াইতে চাই পথ নাহি পাই
ঘেরে সদা আসি মায়ার আধার।
বলনা হে প্রভু! কি হবে আমার॥

১৩

মোর যারা হয় জীবনের সাথি

তারাও বিপক্ষ নাহিক বিচার

বলনা হে প্রভু ! কি হবে আমার ॥

১৪

পুত্র কন্যা রূপে বসিয়াছে ঘেরে,

সারাটি জীবন করিয়া আঁধার।

বলনা হে প্রভু ! কি হবে আমার ॥

১৫

পতিত পাবন গৌরাঙ্গ নিতাই

দেখাইয়া দিয়ে পথটি এবার।

এ মায়া আবর্ত্তে করহ উদ্ধার ॥

১৬

কোথা যাব আর প্রেমের দেবতা

দেহ শ্রীচরণ ওহে প্রাণাধার।

এদাস "নিতায়ে" করহ নিস্তার ॥

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভক্তিবিনোদ।

পরিণাম চিন্তা।

আমরা মায়িক জগতের মোহান্ধ জীব। মায়ার মোহিনী মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া সারাজীবন কেবল অনিত্য সংসারের বৃথা ভাবনাতেই ব্যতিব্যস্ত আছি। "কে আমি, কেন আমায় জারে তাপত্রয়।" এই গভীর তত্ত্বের গবেষণায় মনঃসংযোগ না করিয়া রক্ত মাংসে গঠিত এই ক্ষণভঙ্গুর মানব দেহের পরিণাম চিন্তায় বিরত থাকিয়া, দিবা রাত্রি অষ্ট প্রহর কেবল জঞ্জাল জড়িত মিথ্যা সংসারের অসার চিন্তা করিয়া মরিতেছি। রিপুর দাসত্ব করিয়া অতি সাধের মানব জীবনটা অকারণ কাটাইয়া দিতেছি।

কোথা হইতে কি উদ্দেশ্যে আসিয়া কোথায় চলিয়াছি, এবং কি কর্ত্তব্য ছিল আর কি করিতেছি, এ সম্বন্ধে বিন্দু বিসর্গও ভাবিবার অবকাশ নাই। সংসারে আসিয়া এমন ভাবে পরাধীন হইয়া পড়িয়াছি যে, হরিনাম কি পরিণাম চিন্তার জন্য একটুকু সময় পাইতেছি না।

পরের খাটুনী খাটিতে খাটিতে সোণার দেহটা মাটি করিয়া ফেলিলাম। সর্ব্বদা পরাধীন থকিয়া কোন্ কার্য্য সাধন করা যায়? দিবা রাত্রি চব্বিশ ঘণ্টা কেবল খাটিয়াই মরিতেছি! হয় কায়িক, নয় মানসিক, খাটুনী লাগাই আছে।

"আমি আমার" এইরূপ অহঙ্কার লইয়া শিশুকাল হইতে বাল্য, কৈশরের মধ্য দিয়া, প্রমোদময় যৌবন অতিক্রম করতঃ সম্প্রতি দুশ্চিন্তাদগ্ধ প্রৌঢ় ও শুষ্ক বার্দ্ধক্যের সন্ধিস্থলে উপনীত হইয়াছি। তথাচ আর কুচিন্তা কোলাহল-ময় অন্তঃকরণে আত্মতত্ত্ব কি পরিণাম চিন্তা ক্ষণকালের জন্যও জাগিতেছেনা।

নিদ্রাকে, কবিগণ সর্ব্ব-সন্তাপনাশিনী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। জানিনা, অন্যের পক্ষে এরূপ সম্ভব হইলেও আমার পক্ষে সম্পূর্ণ বিপরীত। একেইতো আমার কুচিন্তার উৎপাতে নিদ্রা দেবীর সঙ্গে প্রায় সাক্ষাৎ হয় না, যদিও কোন সময় কিছু হয়, তাহাও সুখকর নহে। সংসার সন্তপ্তের নিদ্রা, স্বপ্নময়ী ও ক্ষণ স্থায়িনী। এক আধ্ টুকু সময় দেখা দিয়াই সরিয়া পড়েন।

হায়! হায়!! নিদ্রাতেও নিস্তার নাই! চোক্ বুজিলেই, সেই রিপুর তাড়না, সেই কুচিন্তা, সেই জ্বালা যন্ত্রণা, সঙ্গে সঙ্গে আরোও কত অসঙ্গত বিভীষিকা!!

বিষয় বাসনে, কুচিন্তা আগুনে, দিবা রাত্রি ভাজা ভাজা হইয়াও তো আর আত্ম চৈতন্য লাভ করিতে পরিলাম না! সাধু সঙ্গে বসিয়া কৃষ্ণ কথা শুনিতে কাণ দিতে পারিলাম না।

এখন ভাবিতেছি, এই সারাটা জীবনের মধ্যে একবার আমি আমার হইয়া, আমাকে লইয়া আমার ভাবনা ভাবিতে পারিলাম না সময় তো অবিচ্ছিন্ন তৈল ধারাবৎ অনবরত অতীতের অতল স্পর্শ কুক্ষিতে প্রবিষ্ট হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও মহাশ্মশানের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশয্যার দিকে অগ্রসর হইতেছি।

এই যে "আমি আমি" করিতেছি, আমি কে? "আমি" তো একটা শব্দ মাত্র। আমি খুজিয়া তো "আমি"র একটা কিছু পাইতেছি না। এই "আমি"র

মীমাংসা করিতে আমার মত মোহান্ধ জীবের সাধ্য নাই। তবে মোটা মোটি এই বুঝি যে, "আমি" জীব। ভৌতিক দেহ আশ্রয় করিয়া, তাপত্রয় সংযুক্ত সংসার ক্ষেত্রে কর্ম্মফল ভোগ করিয়া বেড়াইতেছি।

এই প্রপঞ্চময় দেহ বিনষ্ট হইয়া গেলেই সম্প্রতি আমি নাই। আমি দেহ না। দেহও আমি না। আমি ও আমার দেহ ভিন্ন। দেহাত্মার এই ভিন্নত্ব বোধ বিহীন হইয়া, আমরা দেহকেই "আমি" বলিয়া বোধ করিতেছি। অবিদ্যা প্রসূত এই প্রকার দেহাত্মবুদ্ধি জীবের বন্ধনের কারণ হয়।

দেহ এবং আত্মা দুই হইলেও আমরা দ্বৈত জ্ঞান লইয়া রহিনাই। আমরা অদ্বৈত জ্ঞানের বশীভূত হইয়া, সর্ব্বদা দেহাত্মার একত্বানুভব করিয়া থাকি।

কালের প্রভাবে দেহাত্মার এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। দেহ হইতে আত্মা বিযুক্ত হইয়া পড়িলে, দেহ, রাসায়নিক বিশ্লেষণে বিকৃত হইয়া, পৃথক পৃথক রূপে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। আর আত্মা, আপন কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ নিমিত্ত দেহান্তরে অর্থাৎ আর এক নূতন দেহে প্রবিষ্ট হয়।

যে পর্য্যন্ত আত্মা, বাসনা বিহীন না হয়, কি ভগবানের ভজন সাধনে সিদ্ধি লাভ করিয়া মুক্ত হইতে না পারে সেই পর্য্যন্তই ভৌতিক দেহ ধারণ করিয়া এই দুঃখময় সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে থাকে। এই প্রকার আসা যাওয়ার নামেই, জন্ম মরণ"।

নিষ্কাম ভক্তি যোগে ভগবানের উপাসনা দ্বারাই জীবের জন্ম মৃত্যুরূপ আত্যন্তিক দুঃখ সকল নিবারিত হয়।

যদিচ দেহও জীব ভিন্ন, তথাচ কর্ম্ম ক্ষেত্রে ইহাদের এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, দেহত্যক্ত জীব কোন কার্য্যই সাধন করিতে পারেনা। এবং আপন অস্তিত্ব প্রকাশে অসমর্থ হইয়া পড়ে। এদিকে জীবের পরিত্যক্ত দেহও একেবারে কার্য্যের অনুপযোগী হইয়া, পঁচিয়া গলিয়া ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং ধরিয়া লইতে হইল, জীব ও দেহ এই উভয়ের সমষ্টিই "আমি।"

এস্থলে আর একটী কথার অবতারনা করিতে হইল। সংসারে যতগুলি আমি "আছে, সকল গুলি "আমি"ই কি এক "আমি"র অংশ, না, ভিন্ন ভিন্ন "আমি।" আমিতো ইহা বুঝিতে পারিতেছি না।

যদি এক "আমি" ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন দেহাশ্রিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ "আমি" রূপে প্রতীয়মান্ হয়, তবেতো আমিই সকল "আমি"। অথবা সকল "আমি"ই আমি।

যা'ক্, এসব বৃথা বিষয়ের চিন্তা করিতে গেলে আমার মাথা ঘুরিয়া যায়। সাদা সিধে ভাবে বুঝিয়া লইলাম, "আমি" সকল তত্ত্বতঃ এক হইয়াও বহু; যত দেহ, তত "আমি।"

এখন আমার কথা। ভাবিয়া দেখিলে, এই সংসার রূপ কর্ম্মক্ষেত্রে আমি একক। আমার দোসর নাই।

আমি একা আসিয়াছি, একা চলিয়া যাইব। যখন আমার এই প্রপঞ্চময় স্থূল দেহ স্বাভাবিক বিকার বিশ্লেষণে পঁচিয়া গলিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে, তখন আর আমি থাকিবনা। "আমি আমার" বলিয়া যে অহঙ্কার আছে, তাহাও আর থাকিবেনা।

স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয় স্বজন কি মান, মর্য্যাদা, বিভব, সকলি পড়িয়া থাকিবে, আমি চলিয়া যাইব। ধন, জন, কুল, মান কিছুই কিছু না। মাত্র দুটা দিন আমার, আমার করিয়া গেলাম।

আমি তো কেবল এই প্রকার পুনঃ পুনঃ যাওয়া আসার তালেই আছি। কত বার আসিলাম, আর কত বার চলিয়া গেলাম, কিন্তু একবারও তো সঙ্গী পাইলাম না! যেই একা, সেই একা। পথে দুদিনের জন্য যাহাদের সঙ্গে দেখা শুনা হয়, মোহ বশতঃ তাহাদিগকেই আপন জ্ঞানে আত্মহারা হইয়া পড়ি। এই অজ্ঞানতার বশে, পরিণাম চিন্তা ভুলিয়া, গিয়া যাবজ্জীবন পরের চাকুরী করিয়া, যাবার বেলা শুধু কর্ম্ম বোঝা ঘাড়ে করিয়া একাকী চলিয়া যাই।

এই যে যাইব, কোথায় যে যাইব, তাহারও নিশ্চয় নাই। কর্ম্ম সূত্রে যে দিকে যে স্থানে টানিয়া লয়, সেই দিকে, সেই স্থানেই যাইতে হইবে।

এখন তো রাজা সাজিয়া সিংহাসনে বসিয়া আছি, লোক জনের অভাব নাই, টাকা কড়ির অভাব নাই সকলে "মহারাজ মহারাজ" বলিয়া ডাকিতেছে, আর আত্মজ্ঞান হীন আমিও ভাবিতেছি, আমি তো একটা "মহারাজ।"

মোহাতিশয্যে বিন্দুমাত্রও বুঝিতেছি না যে, আমি কয় দিনের জন্য এই অলীক রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি? এই রাজ সিংহাসন আমার কয় দিনের জন্য?

রক্ত মাংসের একটা পঁচা গলা দেহ লইয়া, দু চারি দিনের জন্য আমি একটা কিসের রাজা! হায়! হায়রে! মানবাবয়ব বিশিষ্ট কতকগুলি রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জার সমষ্টি, মূর্ত্তি বিশেষের নামেইতো রাজা!!

এইরূপ শুধু রাজা বলিয়াত কথা নয়, সকলের পক্ষেই এই এক কথা। রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, সাধু, চোর, সুখী, দুঃখী এমন কি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সকলেই দেহ লইয়া আসিয়াছে, সুতরাং সকলের দশাই দেহ সম্বন্ধে এক। তবে আর আমি "রাজা" বলিয়া কি "পণ্ডিত" বলিয়া বৃথা অহঙ্কার করিয়া মরিতেছি কেন? কুলের গৌরবে, ধনের গৌরবে বিদ্যা বুদ্ধির গৌরবে সকলকে হেয় মনে করিতেছি কেন? আমি তো মরিয়া যাইব, আর আমার অহঙ্কারের সামগ্রী সকল পড়িয়া থাকিবে।

ভাবিয়া দেখিলে সংসারে সকলি সমান। তুমি রাজাও দু'দিনের রাজা, আর আমি ভিখারীও দু'দিনের ভিখারী। তোমার আমোদানন্দ যেমন দু'-দিনের জন্য, আমার দুঃখ দুর্ভোগও দু'দিনের জন্য। তুমিও মরিবে, আমিও মরিব। ঘুরিয়া হয়তঃ আর একবার তুমিও ভিখারী হইতে পার, আর আমিও মহারাজ চক্রবর্ত্তী হইতে পারি। মানুষ কর্ম্ম দোষে কুকুর হইতে পারে, কুকুর কর্ম্ম গুণে ঠাকুর হইতে পারে।

যখন আমরা দেহ ধারী জীব, অবিশ্রান্ত গতিতে মৃত্যুর দিকে চলিয়াছি, তখন আর আমাদের অহঙ্কারাভিমান করা সাজেনা। দু'টা দিন হাটিয়া খাটিয়া মরিয়া যাইব, শ্মশানানলে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইব, অথবা শৃগাল শকুনের উপাদেয় খাদ্যরূপে পরিণত হইব; এমতাবস্থায় আর আমাদের অসার ভাবনায় কাল কর্ত্তন করা সঙ্গত নহে।

আমরা মাত্র কয়েকটা দিন এই অসার সংসারের খেলা মেলায় ভুলিয়া আছি, হঠাৎ একদিন এই সাধের সংসার খেলা ফেলিয়া চলিয়া যাইব। পরি-ণামে কেহ কাহার সঙ্গী হয় না। সংসার স্বপ্ন সদৃশ মিথ্যা। এই মিথ্যা সংসারের দাসত্ব করিতে গিয়া আমরা আপন পরিণাম ভুলিয়া গিয়াছি। মরিব বলিয়া আর মনে হয় না। হরি! হরি!! যে ব্যক্তি দু'টাদিন পরে মুষ্টিমেয় ভষ্মরূপে পরিণত হইবে, তা'রই না এত অহঙ্কার! আহা! কি অসম্ভব ভ্রান্তিরে!!

শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য।

ভক্তি।

কার্ত্তিক মাস, ৩য় সংখ্যা—১০ম বর্ষ।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

প্রার্থনা।

নাহং বন্দে তবচরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতুং।
কুম্ভীপাকং গুরুমপিহরে নারকং নাপনেতুং॥
রম্যারামামৃদুতনুলতা নন্দনে নাপিরন্তুং।
ভাবে ভাবে হৃদয় ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তং॥

হে সর্ব্ব-সন্তাপ-হারিন্! শীত উষ্ণ লাভ অলাভ প্রভৃতি নিবৃত্তির জন্য অথবা কুম্ভীপাক নরক যন্ত্রণা ভোগ দূর করিবার জন্য কিম্বা সুন্দরী স্ত্রীও নন্দনকাননে বিহারাদি সুখ ভোগের জন্য তোমার শ্রীপাদ পদ্মে প্রার্থনা করিনা, কেবল ইহাই প্রার্থনা যেন সর্ব্বদা তোমার ভাবে থাকিতে পারি, যেন তোমার ভাবছাড়া না হই।

হে জগৎস্বামিন্! ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, মোহ ছুটিয়াছে, অলিক স্বপ্নের বিকার বিদূরিত হইয়াছে, এইবার তোমার কৃপাতেই বুঝিয়াছি যে, মোহজননী অঘটন-ঘটন-পটিয়সী বুদ্ধি শালিনী মায়া কর্ত্তৃক পরিভ্রামিত হইয়াই, "আমি তোমার" ও "তুমি আমার" এই নিত্য সম্বন্ধ ভুলিয়াগিয়াছি, এবং ইহা ভুলিয়া যাইয়াই নানা প্রকার জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছি। তোমায় ভুলিয়া ছিলাম বলিয়াই যাহা আমার নয় তাহার নিমিত্তও কত প্রকার শোক করিয়াছি, তোমার প্রদত্ত দুর্ল্লভ মনুষ্য

জীবনের কত অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট করিয়াছি, আমি তোমার তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলাম বলিয়াই মোহান্ধকারময় সংসারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানা প্রকার দুঃখ পাইয়াছি ও পাইতেছি।

প্রাণবল্লভ! বলিতে পারিনা প্রাণ কি চায়? কি পাইলে আর প্রাণের জ্বালা থাকেনা? তবে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ যে তোমায় ভুলিয়া, তোমায় না পাইয়া, তোমার ভাল বাসায় বঞ্চিত থাকিয়া প্রাণ কত কাতর, কত মলিন, কত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। কত ঘুরিলাম, কত ভাবিলাম, কত লোককে, কত দ্রব্যকে, কত স্থানকেই যে আপন মনে করিয়া ভাল বাসিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু নাথ! কৈ কিছুতেই তো প্রাণ জুড়াইল না। কিছুতেই তো তাপিত প্রাণে একবিন্দু শান্তিবারি পতিত হইল না।

হা জীবনের-জীবন! আমি তোমার হইয়া মায়াকুহকিনীর প্ররোচনায় এত কষ্ট পাইলাম ইহা বড়ই আশ্চর্য্য? তুমি হৃদয়ের দেবতা হইয়া কোন প্রাণে এতদিন পরের মত আমাকে মায়ার হাতে ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছ। আমার ন্যায় দীনহীন দুর্ব্বলের উপর তোমার ন্যায় দয়াময়ের এত পরীক্ষা এত বঞ্চনা এত লাঞ্ছনা কখনই খাটেনা, ভীষণ সংসার-সাগর-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত দেখিয়া কি একবারও তোমার মনে দয়ার সঞ্চার হয়না? না অন্যমনস্ক আছ? কিছুই যে বুঝিতে পারিতেছিনা। আমি যে তোমার ইহা তো কল্পিত সম্বন্ধ নয়, এতো নিত্য সম্বন্ধ, তবে কেন ভুলিয়া আছ? নাথ! যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, জীবনের যে অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট হইয়াছে তাহাতো আর ফিরিবেনা; এক্ষণে ইহাই প্রার্থনা যে, যদি দয়া করিয়া তোমায় আমায় কি সম্বন্ধ তাহা বুঝাইয়া দিয়াছ, যদি আয় আয় বলিয়া মধুর স্বরে ডাকিয়াছ তবে কাছে যাইয়া তোমার সেবা করিতে দাও। আর মুখ ফিরাইয়া থাকিওনা, দয়াময় হইয়া যেন আর নির্দ্দয়ের মত ব্যবহার করিওনা। আর যেন মায়া পিশাচী তাহারই বিলাস ভূমি মনে করিয়া হৃদয় মন্দির অধিকার করিয়া না বসে। হায়! হায়! বড় সাধ করিয়া হৃদয় কুঞ্জে আসন পাতিয়া ছিলাম আশাছিল হৃদয়ের-দেবতা প্রাণের-প্রাণ শ্রীগোবিন্দ তোমাকে বসাইব, কিন্তু আমার কর্ম্মদোষে মায়া পিশাচী আসিয়া তাহা অধিকার করিয়া বসিয়াছে। শক্তি-দাও প্রভো! তোমার নামগানে হৃদয় পবিত্র করি, আর তোমাকেই হৃদয়

আসনে বসাইয়া জীবন ধন্য করি। তুমি আমার হৃদয় আসনে উপবেশন কর আমি সাধ মিটাইয়া তোমার সেবাকরি এবং মানস নয়নে অন্তরে বাহিরে তোমার ভুবন মোহন শ্যামসুন্দর যুগল মূর্ত্তি হেরিয়া সাধের মানব জন্ম সার্থক করি। আর তোমার ভালবাসায় বিভোর হইয়া প্রেমানন্দে বলি "তুমি আমার আমি তোমার আর সকলি তোমারি" প্রভো! শক্তিদাও যেন "আমি তোমার ও তুমি আমার" এই নিত্য সম্বন্ধ আজীবন কাল ঠিক রাখিতে পারি। যেন রোগ, শোক, দুঃখ দরিদ্রতা বা অন্য নানা প্রকার বাধা বিঘ্নতেও এই সম্বন্ধ বিস্মৃত না হই।

অন্তর্য্যামিন্! অন্তরের কথা সকলই বুঝিতেছ, দীন তোমার ঐ রাতুল পদ যুগলে একমাত্র ভাবধন প্রার্থনা করিতেছে, যেন সে ধনে বঞ্চিত করিয়া বাঞ্ছা-কল্প-তরু নামে কলঙ্ক করিওনা। দীন হীন আজ তোমার শ্রীচরণে সকাতরে ইহাই প্রার্থনা করিতেছে।

দীন—দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

শ্রীধরের-শ্রীমন্দির।

শ্রীধরের-মন্দির সোণামুখীর একটী সুদৃশ্য ও প্রাচীন মন্দির। অতীত গৌরবের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ অনেক গুলি দেব মণ্ডপ সোণামুখী গ্রামের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীধরের মন্দির সর্ব্বাংশেই সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উহার গঠন প্রণালীতে যেরূপ সৌন্দর্য্য পরিলক্ষিত হয়, স্থাপত্যের সুকৌশল ও বৈচিত্র্যভাবও তদ্রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহার গঠন প্রণালী এরূপ বিচিত্র এবং ছবিগুলি এরূপ নিপুণতার সহিত খোদিত এবং চিত্র সমূহ এরূপ দক্ষতা সহকারে অঙ্কিত যে ভিন্ন ভিন্ন জেলার অনেক ব্যক্তি উহা দর্শন করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকেন। বর্দ্ধমান জেলার পশ্চিম অঞ্চলে এরূপ সুন্দর দেব মন্দির আর আছে বলিয়া আমাদের বোধ হয়না।

সোণামুখী চৌমাথা রাস্তার সন্নিকটে এই মন্দির স্থাপিত। মন্দিরটী পঞ্চবিংশ চূড়া বিশিষ্ট। এইরূপ পঞ্চবিংশ চূড়া বিশিষ্ট মন্দির সোণামুখীর মধ্যে আর নাই। মন্দির প্রতিষ্ঠাতার নাম—৺ কানাই চন্দ্র রুদ্র; সন ১২৫২ সালে উহা প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরটীর পশ্চাৎদিকে যে কয়েকটী কথা লিখিত আছে তাহা পাঠেই মন্দির নির্ম্মাতা ও প্রতিষ্ঠাতার নাম, নির্ম্মাণের তারিখ প্রভৃতি জ্ঞাত হওয়া যায়। উৎকীর্ণ বাক্যের দুই একটী অক্ষর যদিও মুছিয়া গিয়াছে, তাহা হইলেও উহা পাঠে অর্থ সম্যক উপলব্ধি হইয়া থাকে। উৎকীর্ণ বাক্যগুলি আমরা নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"শকাব্দা ১৭৭৩ বাং ১২৫২ সাল।
শ্রীধর মন্দিরং সম্পূর্ণং। পঞ্চবিংশ চূড়কং।
কানাই চন্দ্র রুদ্রেন তন্তুবায়েন যত্নতঃ নির্ম্মায়িতং।
বরসোধ নানা-চিত্র-সমন্বিতং।
হরি সূত্রধরেন নির্ম্মিতং চ তদা"

সোণামুখী বাসিগণ এক সময়ে বৈষ্ণবধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন। দেব-দ্বিজে তাঁহাদের অসীম ভক্তি ছিল। ভক্তি প্রেমের চিহ্ন স্বরূপ, সোণামুখীর নানা স্থানে দেব-দেবীর মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রেম ভক্তির নিদর্শন শ্রীধরের মন্দিরও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রতিষ্ঠাতা ৺ কানাই চন্দ্র রুদ্র নিজ জাতি-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিতেন। তাঁহার এমন কোন বিষয় সম্পত্তি ছিলনা যে দুই চারি হাজার টাকা ব্যয় করিয়া তিনি একটী সৎকার্য্য করিতে পারেন। কিন্তু সৎসঙ্কল্প থাকিলে, ভগবদ্-কৃপায় সাধারণতঃ সে সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়া থাকে। কেননা, সৎইচ্ছার পূর্ণকারী শ্রীভগবান।

কানাই রুদ্র একটী মন্দির স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। ক্ষুদ্র ভাবেই কার্য্য আরম্ভ হইল। যে সময়ে মন্দির নির্ম্মিত হয়, সেই সময়ে প্রধান ভাস্কর ছিল ৺ হরি মোহন মিস্ত্রী; তখন হরি মিস্ত্রীর প্রশংসা এ অঞ্চলের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হরি মিস্ত্রীর দ্বারা কার্য্যের অনুষ্ঠান হইল।

সামান্য টাকায় একটী মন্দির প্রস্তুত হয় কানাই রুদ্রের বরাবর এই রূপই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নিম্নের অংশ প্রস্তুত হইতেই বহু টাকা ব্যয়

হইয়া পড়িল। কানাই রুদ্র ক্রুদ্ধ হইলেন এবং হরি মিস্ত্রীকে বলিলেন "তুমিত বড় কারিকর দেখিতেছি; ইহারই মধ্যে আমাকে অনেক টাকা খরচ করাইলে; আচ্ছা, তোমার যতদূর সাধ্য সুন্দর করিয়া মন্দির তৈয়ার কর,—তোমার যতদূর কারুকার্য্য জানা থাকে, পরিচয় দাও,—আমি অর্থব্যয়ে কদাপি কুণ্ঠিত হইব না।" শুনিতে পাই হরি মিস্ত্রী তদুত্তরে তাহাকে বলে "তাঁতির পো, আমার কারু কার্য্যের সম্যক পরিচয় দিতে হইলে যে তোমার মাকু পর্য্যন্ত বিকাইয়া যাইবে।

পরস্পরের এইরূপ জিদে, মন্দির তৈয়ার হইয়া থাকে। হরি মিস্ত্রী প্রধান ও বিচক্ষণ কারিকর; সে বিশেষ যত্নের সহিত এক এক খানি ইষ্টকে, ছবি খোদিত করিয়া মন্দিরে বসাইতে লাগিল। এইরূপে খোদিত ইষ্টকের উপরে বিচিত্র ভাবের ফল পুষ্প তৈয়ার করিতে এবং অন্যান্য না না ভবের চিত্র উৎকীর্ণ করিতে যে যত্ন, যে পরিশ্রম ও যে গুণপণার প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা মন্দিরটী একবার না দেখিলে উপলব্ধি করা সু-কঠিন। মন্দির এভাবে নির্ম্মাণ করাইতে যে ব্যয় হইয়াছিল, তাহাতেই কানাই রুদ্র একরূপ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়া ছিলেন।

মন্দিরের চতুষ্পার্শে যে সকল ছবি খোদিত হইয়াছে, তাহা যে কেবল নয়নের তৃপ্তিকর, তাহা নহে। এ ছবি গুলি হিন্দুর একান্ত শিক্ষাপ্রদ; রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবতাদির মহৎ ভাব, দর্শকের মনে অঙ্কিত করিবার জন্যই যেন হিন্দুর গ্রন্থোক্ত আখ্যান অবলম্বন করিয়া এই গুলি সন্নিবেশিত করা হইয়াছিল। ছবিগুলির মধ্যে কতকগুলির নামোল্লেখ করিতেছি—(১) শিবের বিবাহ,—ব্রহ্মা বিষ্ণু নারদ প্রভৃতি আসীন (২) কালী মূর্ত্তি, (৩) রামরাজা (৪) রাই রাজা (৫) অশ্বমেধ যজ্ঞ (৬) অনন্ত-মূর্ত্তি (৭) জগন্নাথের রথযাত্রা—বৈষ্ণবগণের সঙ্কীর্ত্তন (৮) মান (৯) কংস বধ (১০) কমলে কামিনী (১১) দশভুজা (১২) দশ মহাবিদ্যা (১৩) কৃষ্ণ কালী (১৪) রাধাকৃষ্ণ লীলা।

এইরূপ না না স্থানে ছোট বড় নানা ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে। কালের আবর্ত্তনে, দুই চারিটী একেবারেই ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, কাহারও বা মুস্তক কাহারও বা হস্ত—কাহারও বা পদ ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সংস্কার অভাবে, বৃষ্টির প্রভাবে, মন্দিরের উর্দ্ধ দেশের অনেকাংশ কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত

হইয়াছে, স্থানে স্থানে বিকৃত হইলেও; মন্দিরটী এখনও সোণামুখীর মধ্যে একটী প্রধান দর্শনীয় বস্তু।

কানাই রুদ্রের উত্তরাধিকারী কর্তৃক শ্রীধরের নিত্য সেবা হইয়া থাকে। অর্থাভাবে কোন প্রকার উৎসব সম্পাদিত হয় না। শ্রীধরের এই মন্দির সম্বন্ধে নীচের কবিতাটী লিখিত হইল।

১

অভ্রভেদী নগ্নকায় অতি মনোহর।
শ্রীধর-মন্দির তুমি শোভার আকর॥
পঞ্চবিংশ চূড়া ল'য়ে, কিবা শোভা বিকাশিয়ে,
বিরাজ করিছ তুমি নেত্র তৃপ্তিকর।
শ্রীধর মন্দির তুমি, মহান্ সুন্দর॥

২

মরি তুমি কি সুন্দর, কারু কার্য্যময়।
স্থপতির স্থাপত্যের সার পরিচয়॥
কিবা বাহিরের শোভা, জগজন মনো লোভা,
কত ছবি, কত চিত্রে অঙ্গ শোভা হয়।
'জীব, জন্তু ফল পুষ্প তরু আঁকা রয়॥

৩

খোদিত তোমার অঙ্গে দেবতা মহান্।
দেবভাব শিক্ষাদানে যেন অধিষ্ঠান॥
পুরাণোক্ত দেব কত, দেহে শোভে নানা মত,
খুলিয়া জ্ঞানের রাশি শিক্ষার ভাণ্ডার।
সুখের অতুল রাজ্য করিছ বিস্তার॥

৪

শ্রীধর মন্দির তুমি সৌন্দর্য্য আধার।
নীরবে পুরাণ কথা, করিছ প্রচার॥
প্রাচীন গৌরব চিহ্ন,　　　তব অঙ্গে রহে লগ্ন,
প্রাচীনের কীর্ত্তি হেরি মানস আমার।
বিপুল পুলকে পূর্ণ হয় অনিবার॥

৫

দেখি তব অঙ্গে নানা ছবি সুশোভন।
খোদিত বিচিত্র ভাবে বিচিত্র গঠন॥
সম্মুখে পশ্চিম পার্শ্বে,　　　কহিতে আনন্দ বর্ষে,
শিবের বিবাহ হর্ষে মত্ত মুনিবর।
রাম রাজা রাই রাজা মূর্ত্তি মনোহর॥

৬

হেথা শোভে ভগবান গরুড় উপরে।
হোথায় কালীর মূর্ত্তি নরমুণ্ড ধ'রে॥
রাম রাজা রাই রাণী,　　　কিবা ধনী সুবদনী,
অশ্বমেধ যজ্ঞ শোভা কোথাও বিকাশ।
অতীতের স্মৃতি রাশি করিছে প্রকাশ॥

৭

কোথাও যশোদা ক্রোড়ে শোভে ভগবান।
আবার কোথাও দেখি শ্রীরাধার মান॥
কোথাও অনন্ত মূর্ত্তি,　　　প্রকাশে ব্রহ্মাণ্ড স্ফূর্ত্তি,
কোথাও শিবের দেহে তৈল বিমর্দ্দন।
আবার কোথাও দেখি মহীর নিধন॥

৮

এদিকে উত্তর পার্শ্বে কা'র সঙ্কীর্ত্তন?
রথ যাত্রা হেরি সবে আনন্দে মগন॥
বৈষ্ণবের নানা দল,　　　করি কত কোলাহল,

খোল করতাল সহ জগন্নাথে ঘেরি।
প্রেমেতে বিভোর হ'য়ে নাচে সারি সারি॥

৯

কোথাও বা কৃষ্ণ কালী গিরি গোবর্দ্ধন,
কোথাও বা রাধাকৃষ্ণ অপূর্ব্ব দর্শন।
কমলে কামিনী আর, দশভুজা মা আমার,
কোথাও বা দশভুজে ধরি প্রহরণ,—
মন্দিরের শোভা যেন করিছে বর্দ্ধন!

১০

এই রূপ কত ছবি অঙ্গেতে ধরিয়া—
শ্রীধরের শ্রীমন্দির আছ দাঁড়াইয়া।
কত ঝঞ্ঝা কত বায়, বহিয়া গিয়াছে গায়,
রৌদ্র জলে উৰ্দ্ধ অংশ কালিমা আকার।
বিশেষ অনিষ্ট কিন্তু করেনি তোমার॥

১১

এত দিন ছিলে তুমি উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে।
কিন্তু ঘেরা পড়িয়াছ প্রাসাদ বেষ্টনে॥
প্রাসাদ প্রাচীর প্রায়, ঘেরিয়া আছে তোমায়,
মেঘে ঢাকা শশী প্রায় আছে সে কারণে।
নাহি পড়ে শোভা তব লোকের নয়নে॥

১২

ভালবাসি শ্রীমন্দির প্রাণের সহিত।
তোমারে হেরিলে প্রাণ পুলকে পূরিত॥
বাল্য কালে ক্রীড়া ছলে, মাতি কত কুতুহলে,
যাইতাম তব কাছে "ছাঁচ" তুলি বারে।
সে ভাব, সে স্মৃতি এবে জাগিছে অন্তরে॥

১৩

সে ভাব, সে স্মৃতি ক্রমে জাগিছে অন্তরে।
বাল্যের এ ভাব সম, কি আছে সংসারে॥
গুটাইয়া পাততাড়ি, করি সবে হুড়াহুড়ি,
আসিতাম তব কাছে হাতে মাটি ল'য়ে।
থাকিতাম অন্তরালে যেন কত ভয়ে॥

১৪

ছিল এক তাঁতিবুড়ি, ভীষণ, ভীষণ!
আমাদের এই চুরি করি' দরশন॥
করেতে লগুড় ল'য়ে, "রে" শব্দে আসিত ধেয়ে,
পলাতাম উর্দ্ধশ্বাসে ব্যথিত অন্তরে।
এখনো বুড়ীর সেই মূর্ত্তি মনে পড়ে॥

১৭

ক্ষুদ্রাদপি অতি ক্ষুদ্র এ সোণামুখীর,
গৌরবের শুভ চিহ্ন তুমি হে মন্দির॥
অতীত গৌরব রেখা, তব অঙ্গে রহে লেখা,
অতীতের কারুকার্য্য দেখায়ে সংসারে।
থ'ক তুমি চিরক'ল সমুন্নত শিরে॥

দীন— শ্রীরসিকলাল দে।

সাধনতত্ত্ব-বিচার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

—:০:—

হরিদাস— সর্ব্বশাস্ত্রেই ঐ কথা বলিতেছে, যীশুখ্রীষ্টও বলিয়াছেন—'Believe me I will lead you to Heaven"

"আমাকে বিশ্বাস কর ঈশ্বরপুত্র বলিয়া বিশ্বাস কর আমি নিশ্চয়ই তোমাদিগকে স্বর্গে লইয়া যাইব।

গুরুদেব—সত্য দেশকালপাত্র ভেদে বিভিন্ন হয় না, উহা একজনেরই কথা, ভিন্ন ভিন্ন আধার হইতে উচ্চারিত হইতেছে মাত্র। শ্রীগুরু স্বয়ং চৈতন্যস্বরূপ তাই মোহান্ধ জীবকে জ্ঞানাঞ্জনশলাকাদ্বারা চৈতন্য দান করেন। সুতরাং গুরুদেবই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকাশমূর্ত্তি, যেমন শালগ্রামশিলা সেই অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরের মুদ্রা, শ্রীগুরুদেবও তদ্রূপ, জগদগুরুর প্রতিবিম্ব, তাঁহার আশ্রয় লও, তিনিই পাপরূপ কংস ধ্বংস করিয়া, তোমাকে ভব কারাগার হইতে মুক্ত করিবেন। তিনিই কংসারি, তিনিই কৃষ্ণ, এখন বুঝিলে কি না? "যেই গুরু সেই কৃষ্ণ সেই সে গৌরাঙ্গ" সাধক জীবনে প্রতিফলিত উদাহরণ দ্বারা বোধহয় আরও বিশদরূপে বুঝিতে পারিবে, তবে শুন—

মহা প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ প্রিয়ভক্ত শ্রীমান্ রঘুনাথদাস গোস্বামী। তাঁহাকে তিনি নিজ হাতে গড়িয়া ঠিক মনের মত করিয়া লইয়াছিলেন। রঘুনাথ সপ্তগ্রামের দ্বাদশলক্ষের অধিপতি গোবর্দ্ধন দাসের একমাত্র পুত্র। রঘুনাথ বাল্যে পরমভাগবত হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গ পাইয়াছিলেন, তাই বিষয়ভোগ লালসা কখনই তাঁহাকে আঁটিয়া বাঁধিতে পারে নাই। সঙ্কীর্ত্তনানন্দে যখন শ্রীনবদ্বীপ শান্তিপুর টলমল করিতেছিল, যখন নানা দেশবিদেশ হইতে ভক্তমহাজনেরা অদ্ভুত বেণুরবে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীবাস-অঙ্গণে ছুটিতে ছিলেন, বালক রঘুনাথও ঠিক সেই সময়ে সেই মহাসমুদ্রের প্রবলটানে পড়িয়া গিয়াছিলেন, তিনি অভীষ্টদেব সন্দর্শন জন্য নানা ছলে কৌশলে ছুটিতে লাগিলেন, কিন্তু বিষয়-সুখাভিলাষী পিতা বার বার তাঁহাকে ধরিয়া আনিতে লাগিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যখন শ্রীধাম শান্তিপুর শ্রীঅদ্বৈতমন্দিরে উদিত হইলেন, যখন দেশের আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলেই একেবারে পাগল হইয়া নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিতে ছুটিল, সেই সময়ে বালক রঘুনাথও নিতান্ত আকুল হইয়া উঠিলেন; তাঁহার মন কিছুতেই আর ধৈর্য্য মানিতেছে না, রঘুনাথ পিতৃদেবের শ্রীচরণে পতিত হইয়া, করযোড়ে আদেশ ভিক্ষা চাহিলেন, গোবর্দ্ধন সানন্দে অনুমতি দিলেন, রঘুনাথের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। চিরবাঞ্ছিত মনের দেবতাকে

সাতদিন ধরিয়া দর্শন করিলেন কিন্তু পিপাসা মিটিল না, সান্নিপাতিক বিকার-গ্রস্ত রোগীর ন্যায় জল খাইয়া দুর্ব্বার পিপাসা আরও শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। দারুণ পিপাসায় বালক পাগল হইয়া উঠিল, আবার ছুটাছুটি আরম্ভ হইল, ঘরে আর কিছুতেই মন তিষ্টিতেছে না, বিষয় একেবারে বিষ হইয়া উঠিল। রঘুনাথ মহেন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্য এবং অপ্সরাসদৃশ সুন্দরী স্ত্রীকে মলবৎ ত্যাগ করিয়া, মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় জন্য ছুটাছুটি আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তখনও কর্ম্মবন্ধন ছুটে নাই, তাই সংসারের পিতামাতা রঘুনাথের ইষ্টপথের বিষম শত্রু হইলেন। তাঁহারা রঘুনাথকে নজরবন্দী কয়েদ করিলেন। কড়া পাহারার বন্দোবস্ত হইল। আটজন প্রহরী ও পাঁচজন পরিচারক দিবানিশি রঘুনাথকে ঘেরিয়া রহিল। অনন্যোপায় রঘুনাথ তখন প্রপন্ন হইয়া, সেই অগত্যেকগতি ভক্ত-বৎসল শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের পদচিন্তা করিতে লাগিলেন—"প্রভো আর ত বাঁচিনা প্রতি মুহূর্ত্তে আমাকে শতবৃশ্চিকে দংশন করিতেছে, চরণাশ্রয় দিয়া আমাকে সংসার-কারাগার হইতে উদ্ধার করুন" রঘুনাথের কাতর ক্রন্দন এতদিনে বুঝি প্রভু-চরণে পৌঁছিল। যিনি ভবপারাবারের কর্ণধার—কখন ভবজলধি পাড়ি দিতে হইবে, তাহা তিনিই উত্তম জানেন, সে সব ব্যবস্থা তিনিই করিবেন, তোমাকে কেবল ডাকিতে হইবে। তাই একদিন রজনীশেষে প্রহরীবেষ্টিত চত্বরমধ্যে আর্ত্ত রঘুনাথ একটী সুদীর্ঘ মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। ঐ মনুষ্য-মূর্ত্তি ক্রমে রঘুনাথের সমীপস্থ হইতে লাগিল। বিস্মিত রঘুনাথ যাহা দেখিলেন তাহাতে একেবারে স্তম্ভিত হইলেন, ভাবিলেন তিনি বোধ হয় স্বপ্ন দেখিতেছেন, কিন্তু মৃদুপাদবিক্ষেপে ঐ মূর্ত্তি রঘুনাথের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। রঘুনাথ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইলেন। চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া রহিলেন। বিহ্বল রঘুনাথ বুঝিলেন না, কেমন করিয়া রুদ্ধ লৌহদ্বরজা উন্মুক্ত হইল। কি অদ্ভুত! অমানুষিক মন্ত্রপ্রভাবে অষ্ট প্রহরী ও পঞ্চ পরিচারক একসময়ে নিদ্রায় অচেতন রহিল, কিরূপেই বা এই রজনীর শেষভাগে তাঁহার ভবপারের কর্ণধার, তাঁহার শিয়রে উপস্থিত হইলেন। সমস্তই রঘুনাথের নিকট প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। "রঘুনাথ আইস" বলিয়া তিনি রঘুনাথের হস্ত ধরিয়া চলিলেন। সুদীর্ঘবপু উজ্জ্বলমূর্ত্তি শ্রীগুরুদেব যদুনন্দন আচার্য্য অগ্রে, আর বিস্ময়বিহ্বল

শিষ্য বালক রঘুনাথ পশ্চাতে। কিরূপে ভবসংসার কারাগার হইতে গুরুদেব শিষ্যকে হাতে ধরিয়া উদ্ধার করিতেছেন। একবার মানসনেত্রে দেখ, যেন স্বর্গ হইতে দেবাদিদেব মহাদেব ত্রিশূল হস্তে কারাগারে প্রবেশ করিয়া শরণাগত গয়াসুরকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইতেছেন।

হরিদাস! শ্রীগৌরাঙ্গই বল, আর শ্রীকৃষ্ণই বল, স্বয়ং তিনি ইষ্টদেবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া শরণাগত ভক্তকে উদ্ধার করিলেন। গুরুদেব যদুনন্দনের এমন কোন কার্য্য ছিল না, যাহাতে তাঁহাকে অত গভীর রাত্রে রঘুনাথের কাছে আসিতেই হইবে। ১২।১৩ জন লোক ঠিক্ তন্মুহূর্ত্তে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত আবার ঠিক্ তৎসময়ে ভুলক্রমে সদর দরজা উন্মুক্ত; ইহার কোন পার্থিব হেতু নাই, এ সমস্তই সেই লীলাকল্লোল-বারিধির অপূর্ব্ব লীলা, সেই চক্রীর চক্র, মহাপ্রভুর ভঙ্গী। বলা বাহুল্য এইবার রঘুনাথ যে গৃহত্যাগ করিলেন, কেহই আর তাঁহাকে ধরিতে পারিল না। এইবারে তিনি তাঁহার প্রাণারাম পরমদেবতা শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের শ্রীচরণান্তিকে যাইয়া আশ্রয় পাইলেন।

হরিদাস! তুমি বলিবে উদ্ধারকর্ত্তা গুরুদেব যদুনন্দন আচার্য্য, সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে তাই বটে, কিন্তু যদি যদুনন্দনের সাক্ষ্য লও, তিনি বলিবেন "রঘুনাথের উদ্ধার কল্পে আমি যে কিছু করিয়াছিলাম, তাহা আমি জানিনা"। স্বয়ং রঘুনাথের স্বীকারোক্তি বিচার করিলে অন্যরূপ পাইবে। রঘুনাথ নিজকৃত গৌরাঙ্গস্তবে বলিয়াছেন—

মহাসম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।
উরোগুঞ্জাহারং প্রিয়মপিচ গোবর্দ্ধন-শিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্ মাং মদয়তি॥

যিনি কামিনী-কাঞ্চন-ভোগ-লালসা হইতে এই চরণাশ্রিত জনকে কৃপাপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়া স্বকীয় অভিন্নরূপ শ্রীলস্বরূপ দামোদর হস্তে অতি কুজন যে আমি, আমাকে ন্যস্ত করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। যিনি নিজ বক্ষের অতি প্রিয় গুঞ্জামালা উদ্ঘাটন করিয়া তাহা এবং তাঁহার শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলা আমাকে

অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গসুন্দর আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দ দিতেছেন। শ্রীযুক্ত কবিরাজ গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথদাসের অতি অন্তরঙ্গ শিষ্য, তিনি সব শুনিয়া বুঝিলেন এ সমস্তই মহাপ্রভুর ভঙ্গী, তাই বলিলেন—

কৃপাগুণৈর্যঃ কুগৃহান্ধকূপাদুদ্ধৃত্য ভঙ্গ্যা রঘুনাথদাসম্।
ন্যস্য স্বরূপে বিদধেঽন্তরঙ্গং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে ॥

যিনি ভঙ্গী করিয়া নিজ কৃপারজ্জু দ্বারা রঘুনাথ দাসকে কুগৃহরূপ অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার করিয়া নিজস্বরূপ শ্রীদামোদরের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে অন্তরঙ্গ করিয়া লইয়াছিলেন, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শরণাপন্ন হইলাম।

এইখানেই এই রহস্য শেষ হইল না, যখন বালক রঘুনাথ শ্রীগৌরাঙ্গ চরণাশ্রয় লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, তখন স্বয়ং মহাপ্রভু বলিলেন—

প্রভু কহে "কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে।
তোমাকে কাঢ়িল বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্ত হৈতে ॥"

শ্রীগৌরাঙ্গনিষ্ঠমন রঘুনাথ ঐ কথায় সায় পুরিলেন না, মনে মনে বলিলেন—

রঘুনাথ মনে কহে "কৃষ্ণ নাহি জানি।
তোমা কৃপা কাঢ়িল আমায় এই আমি জানি ॥"

রঘুনাথের জীবনের এই সত্যঘটনা হইতে আমরা দেখিতেছি, রঘুনাথের উদ্ধারকর্ত্তা তাঁহার গুরুদেব যদুনন্দন আচার্য্য। রঘুনাথ নিজে ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিতেছেন, উদ্ধারকর্ত্তা শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর।

আবার স্বয়ং গৌরাঙ্গদেব বলিতেছেন, উদ্ধারকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ। কোনটাই মিথ্যা নহে, একই বস্তুর ত্রিবিধ প্রকাশ, তাই "যেই গুরু—সেই কৃষ্ণ—সেই সে গৌরাঙ্গ।"

হরিদাস গুরুপাদমূলে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইলেন, বলিলেন—"কৃতার্থোঽহম্"।

শ্রীবামাচরণ বসু।

অকূলে।

—:০:—

[গীতিকা]

দয়া কর দীনে, দীনবন্ধু হরি,
পতিত পাবন করুণা ধান।
আমি, অকূল পাথারে ভাসিছি নিয়ত,
চিন্তার অনলে দহিছে প্রাণ ॥
হেরিয়ে ভবের তরঙ্গ ভীষণ,
ভয়ে কাঁপে হিয়া সদা সর্ব্বক্ষণ,
ও রাঙ্গা চরণে লইনু শরণ,
দাও এ প্রপন্নে অভয় দান।
তোমা বিনে হরি এ দীন জনার,
এ তিন ভুবনে কেহ নাহি আর,
দিয়ে পদতরি, করুণা-আধার,
এ ঘোর তুফানে করহ ত্রাণ।
এমনি তোমার চরণের গুণ,
বারেক স্মরিলে হিয়ার আগুন—
নিবিয়ে যে যায়, প্রাণ, মন কায়,
পরমানন্দে হয় ভাসমান।
সকাতরে তাই করি নিবেদন,
এই কর নাথ, যেন মম মন,—
বিষয় বাসনা করি' বরজন,
অহরহঃ করে চরণ ধ্যান ॥

দীন—শ্রীশশিভূষণ সরকার।

প্রার্থনা।

—ঃ০ঃ—

হে বিভো ! আমি একজন অজ্ঞান লক্ষচ্যুত পথিক। তোমার মহিমা, তোমার শক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে আমি অক্ষম। হে দীনবন্ধো ! যাহাতে তোমাকে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া বিভোর হইয়া বাহ্যিক জগৎ বিস্মৃত হইতে পারি, কৃপা করিয়া এ দীনজনকে সেই শক্তি দানে বঞ্চিত করিও না। কারণ, যে সূর্য্যের অভাব নিবন্ধন হাস্যময়ী ধরণীর যাবতীয় সুখকর ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, যে সূর্য্যের ময়ূখানু প্রবেশ-হেতু সুধাংশু জ্যোতির্ম্ময় হৃদয় হারিণী বেশ ধারণ পূর্ব্বক অমাসমাচ্ছন্ন রাত্রিকালকেও পরম শোভন জ্যোৎস্নালঙ্কারে বিভূষিত করিতেছে, সেই সূর্য্যাভাব হেতু সমস্ত জগৎ যেরূপ গাঢ়তম তিমিরাবৃত ও অসহনীয় ক্লেশ স্থল হইত, যে ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় তোমার মহাশক্তির অলৌকিকত্ব স্বকীয় মানস পটে চিত্রিত করিয়া উহার মাধুর্য্য উপভোগ করিতে অসমর্থ, তদীয় জীবনও তদ্রূপ অশেষ ক্লেশের নিকেতন হইয়া থাকে। সূর্য্যাভাব হেতু অপরাপর পদার্থ বিদ্যমান সত্ত্বেও যেমন কোনও পদার্থ হইতে কিঞ্চিন্মাত্র সুখোপলব্ধি হইত না এবং অন্যবিধ যাবতীয় সুখোপকরণ বর্ত্তমান সত্ত্বেও পৃথিবী যেমন ঘোরতর দুঃখ স্থান হইত, তদ্রূপ প্রভূত জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়াও যে ব্যক্তি মুহূর্ত্তের নিমিত্ত তোমার অমানুষী দিব্য শক্তি উপার্জ্জন করিতে সচেষ্ট নহে, তাহারই জীবন বৃথা অতিবাহিত হইতে থাকে।. একটী মাত্র জ্ঞানাভাবে তদীয় সমক্ষে সকলই অস্পষ্ট ছায়া সদৃশ প্রতীয়মান হয়। কোন বস্তুর অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া উহার প্রকৃত নিগূঢ় তত্ত্বাবলোকনে সে চিরকাল বঞ্চিত থাকে। অহো ! সেই ব্যক্তি কি দুর্ভাগ্য, দয়াময় ! তন্নিমিত্ত প্রার্থনা করি, আমার তিমিরাচ্ছন্ন হৃদয়া-ভ্যন্তরে আলোক রশ্মি আনয়ন কর। ঈপ্সিত কোনও পদার্থ আমি সুস্পষ্ট রূপে দেখিতে পাইতেছি না। কারণ, যে যে দিকে অগ্রসর হই সর্ব্বত্রই অন্ধকার। এই আঁধারে পতিত হইয়া আমি পথভ্রষ্ট হইয়াছি, সুপথাবলম্বনে নিয়ত কুপথাবলম্বন করিতেছি। হে রসিক

শেখর! জ্ঞান-প্রদীপ হস্তে পথ প্রদর্শক হইয়া অগ্রসর হও। আমি তোমার প্রদর্শিত পথাবলম্বনে এই ভীতিপ্রদ ও তমিস্রাপূর্ণ স্থান হইতে পলায়ন করি।

হে দীনতারণ! মোহান্ধ হইয়া তোমার মায়াঘোরে অবিরত ঘুরিতেছি, তথাপি তোমার মায়ার অন্ত পাই নাই। এই জীবলোকে যে কারণে আশানুরূপ সর্ব্বোচ্চ নগশিখোপরি আরোহণ পূর্ব্বক আশাতীত সুখালিঙ্গনে রত রহি, আবার সেই কারণে পরমুহূর্তে শিখরচ্যুত হইয়া গভীরতম গিরি কন্দরে নিপতিত হইয়া বেদনা জনিত অস্ফুট ও অব্যক্ত কাতর ধ্বনি উত্থিত হইয়া ক্রমশঃ বিমান পথে লীন হইয়া যায়। যে কারণে তোমার নাম শ্রবণে পাষাণও এককালে দ্রব হইয়া যায়, সেই কারণে আবার তোমার নাম ক কুহরে প্রবিষ্ট হইলে অনেকের প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। যে কারণে সুখ সেই কারণে দুঃখ, যে কর্ম্ম পাপ উৎপন্ন করে সময় বিশেষে আবার সেই কর্ম্ম পুণ্যও প্রসব করিয়া থাকে। ধন্য তোমার লীলা! তোমার অনন্ত শক্তি, অনন্ত ভাব কে বুঝিতে পারে? আমি ভূমিষ্ঠ হইয়াই তোমার মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়াছি। ক্রমে পরাধীনতায় বাল্য, ক্রীড়ায় পৌগণ্ড, বিলাস লালসায় কৈশোর হেলায় অতিবাহিত করিয়াছি। এখন সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি লাভাশায় প্রাণ বড়ই উদ্বিগ্ন। দয়াময়! শান্তি বারি বর্ষণ করিয়া দগ্ধ প্রাণ শীতল কর। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যাদি ব্যালাক্রান্ত হইয়া আমি সতত ভীত ও ত্রস্ত। হে দয়াল কাণ্ডার! কর প্রসরণ পূর্ব্বক এই ভয়াবহ মহা বিপিন হইতে আমাকে উত্তোলন পূর্ব্বক রক্ষা কর। দেখিও যেন তাহাদের ভয়ে ভীত হইয়া তাহাদের হস্তে আজীবন ক্রীড়নক হইয়া জীবনাতিপাত না করি। যদ্যপি কখনও মোহমত্ত হইয়া ধরাকে সড়া জ্ঞান করি, তখনই প্রভু! শ্মশানস্থিত, সেই—সেই চিতোপরি অর্দ্ধ-দগ্ধ নগ্ন রকঙ্কাল আমারন নেত্র-সম্মুখে ধারণ করিয়া কহিও,

কি দৃশ্য সম্মুখে তব,
হের শান্তমনে।
তবে কেন অভিমানী,
বৃথা অভিমানে?

অহো! কি দুঃসহনীয় যাতনা! আর কত কাল বিছিন্ন হৃদয়াভ্যন্তরে দুর্দ্দান্ত, দুর্দ্দমনীয় শোকবহ্নি নীরবে বহন করিব? করুণাময়! করুণা বারি সিঞ্চনে আমার সন্তপ্ত হৃদয়কে সরস কর। দীনবন্ধো! শুনিয়াছি যেজন যদবধি গদ্গদাশ্রু নয়নে একান্ত চিত্তে তোমার ভাবে বিভোর হইয়া থাকেন, সেই মহাত্মা তদবধি সংসার জ্বালা হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া তোমার প্রেম-সাগরে সন্তরণ করিতে থাকেন। আমাসম হতভাগ্যের সে আশা ক্ষমতার বহির্ভূত। কারণ, যখনই তোমাকে ভাবিব বলিয়া মনে করি, তখনই সংসারের বহুবিধ দুঃশ্চিন্তা আমাকে আক্রমণ করিয়া আমাকে তোমার নিকট হইতে বহুদূরে লইয়া যায়। দূরস্থ তীর্থ গমনে বিভিন্ন স্থানে তোমার বিভিন্ন মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া নয়ন ও হৃদয়ের প্রীতি লাভ করি এমন উপায়ও আমার নাই। কিন্তু তথাপি তোমার কৃপালাভাশায় সম্পূর্ণরূপে হতাশ হই নাই। কারণ তুমি স্বমুখে নারদকে বলিয়াছিলে

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥
বৈকুণ্ঠ নিলয়ে মোর বসতি না' হয়,
যোগিদের হৃদয়েতে কভু নাহি রহি।
আমার ভকতগণ গাহিছে যথায়,
শুনহ, নারদ, মম বাস তথা কহি॥

হে পতিত পাবন! তাই কাতর প্রাণে তোমায় দিবানিশি স্মরণ করিতেছি। দেখো নাথ! অন্তিম কালে আমাসম হতভাগ্য কীটানুকীট তোমার চরণ প্রান্তে স্থান লাভে যেন বঞ্চিত না হয়। হে প্রভো! আমার এই প্রার্থনা যে, তোমার আত্মপ্রসাদ ভিন্ন অপর কিছু লাভ করিবার আশা আমার হৃদয়ে ক্ষণিকের নিমিত্ত যেন জাগরিত না হয়; শত সহস্র বিপদেও তোমার প্রতি নির্ভরতা যেন না হারাইয়া ফেলি, এবং জীবনে, মরণে তোমার চরণ সেবা করিতে যেন মুহূর্ত্তের নিমিত্ত বিস্মৃত না হই।

যদাপি কদাচ প্রভো! ভব পারাবারে,
বহে যাই যথা তথা কালের জোয়ারে।

ধ্রুব-তারা হ'য়ে তুমি উঠো নেত্রপটে,
স্থির লক্ষে পারি যেন উতরিতে তটে ॥

শ্রীচুনী লাল চন্দ্র।

সান্ধ্য ভজন।

—:০:—

আকাশের গায়ে কে ওই দাঁড়ায়ে
ভকত ভয় ভঞ্জন।
আহা কি সুন্দর রূপ মনোহর
নয়ন মন রঞ্জন ॥
কে তুমি মহান্ হ'য়ে জ্যোতিষ্মান
একেলা দাঁড়িয়ে রও।
বারেক হাসত অমিয় ঢালত
মন্ খুলে কথা কও ॥
(তুমি) যোগীর ভূষণ ভকত জীবন
প্রেমের পবিত্র খনি।
তুমি ভালবাসা ভবের ভরসা
অন্ধের নয়ন মণি ॥
(তুমি) স্নেহের পুতুল পুত্র সমতুল
এসত আমার কোলে।
(তুমি) জনক সমান মঙ্গল নিদান
ডাক বাপধন ব'লে ॥
(তুমি) সুহৃদ আমার প্রাণের আধার
তোমা বিনা নাহি জানি।
এস দেখি তবে, ডাকি যেই ভাবে
মিশায়ে হৃদয় খানি ॥

নব বেশে ধরা হইয়ে বিভোরা
প্রেম মালা শিরে ধরি।
গম্ভীর ভাবেতে সুসংযত চিতে
হীয়ায় তোমারে স্মরি॥

এদিকে তারকা স্বরগ বালিকা,
গগন গবাক্ষ দিয়া।
মিটি মিটি চায় দেখিতে তোমায়
সরস তাদের হিয়া॥

শশীখুসী হ'য়ে ঘোলবধুনিয়ে
সোহাগে পড়িছে ঢলি।
অতি সমাদরে তুমিও তাদেরে
করিতেছ কোলাকুলি॥

বিমল রজনী নাচিছে ধমনী
কতই কল্পনা বুকে।
পাবনা কি আর চরণ তোমার
ভজিবারে মনসুখে॥

হৃদয় সরোজে ও নবীন সাজে
ব'স দেখি বনমালী।
ভকতি প্রসূনে তুলি সযতনে
দিবহে তোমায় ডালি॥

শ্রীশরচ্চন্দ্র মিশ্র।

সুখ।

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কর্ম্ম না করিয়া কর্ম্মে অনাসক্ত হওয়া দুঃখের নিদান। দুঃখ বলিয়া যাহা একটা আছে, জীবের যাহা একান্ত পরিহেয়, তাহা কর্ম্মে আলস্য জনিত

বিভ্রাট। অলস লোকেরা কর্ম্ম করেনা, তাহাদের কর্ম্ম সঞ্চিত হইয়া পর্ব্বত প্রমাণ হয় এবং তাহাদের পথ বন্ধ করিয়া দেয়। আর তাহারা ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে পারেনা তখন ভয়ে জড়সড় নৈরাশ্যে মর মর হইয়া হাত পা ছাড়িয়া দিয়া যেখানকার সেখানে পড়িয়া লম্বমান হয়, আর কূল পায়না, হাইলের বৈঠা ছাড়িয়া দিয়া ভরাডুবি করে। জগতে এহেন মনুষ্যই দুঃখী। দুঃখ বল, নরক বল, আঁধার বল, সব এদের ঘেরিয়া ফেলে। ঋণ যার দুঃখ তার। কর্ম্মগুলি আসিয়া নিজ নিজ প্রাপ্য টাকার দাবী করে। উহারা উত্তমর্ণ। যে অধমর্ণ মানব তৎক্ষণাৎ ঋণের টাকা পরিশোধ করিতে পারে, সে অঋণী—সুখী। মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিব কিন্তু ধন্যবাদের প্রতীক্ষা করিবনা, তবে আমি শান্ত হইয়া সুখের অধিকারী হইতে পারিব। সেকেণ্ডের কাঁটা যেমন টক্ টক্ বাজিতেছে, কর্ম্মের পর কর্ম্মও তেমন মাথা তোলা দিতেছে। তুমি প্রস্তুত থাক, এক এক মুষ্টি অন্ন সবার মুখে ফেলিয়া দাও, তাহারা সন্তুষ্টচিত্তে তোমাকে বিদায় দিয়া যাইবে। না দাও, তোমাকে ঘেরিয়া কাঙ্গালীগণের ন্যায় 'ট্যাক্ ট্যাক" করিবে, তোমাকে পাগল করিয়া তুলিবে। —এই অবস্থার নাম দুঃখ। কর্ম্ম সরাইয়া দিলে, পরিষ্কার হওয়া যায়, শান্তি লাভ হয়।

Drive business but let not business drive thee.

এই স্থলেই তোমার জীবন পথ দুটি শাখায় বিভক্ত হইয়া সুখ ও দুঃখ দুটী নগরাভিমুখে গিয়াছে।

কর্ম্ম সাধন পথে নানা বিঘ্ন বিপত্তি প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়। এগুলি দুঃখ বলিয়া গণ্য হইবেনা। কর্ম্ম পথে অনুকূল প্রতিকূল অনেক ঘটে; তাহাদিগকে সাধারণতঃ আমরা সুখ দুঃখ মনে করিয়া অভিভূত হই; সাবধান, সে সবে অভিনিবিষ্ট না হইয়া কেবল তোমার কর্ম্ম কর। রামকৃষ্ণ গিরিশৃঙ্গ হইতে লম্ফ দিয়া দ্বারকায় পলায়ন করিয়াছেন, শ্রীরামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে বাস করিয়াছেন; কর্ত্তব্যানুরোধে প্রাণ প্রতিমা সীতাকে অরণ্যে বিসর্জ্জন দিয়াছেন; তন্নিবন্ধন বহু দুঃখ বুক পাতিয়া বহন করিয়াছেন। সীতাকে লোকে জনমদুঃখিনী বলে; শ্রীরাধা শতবর্ষ বিরহে কাঁদিলেন। আদর্শ পুরুষ রমণীগণ সকলেই সোজা বিচারে দুঃখী দুঃখিনী। ইহাঁরা

সুখী সুখিনী, না দুঃখী দুঃখিনী? সীতা রাধা দুঃখিনী বল, বল; কিন্তু তাঁহারা ত্রিভুবন ধন্যা, ত্রিভুবন মান্যা! যীশু বলিয়াছেনঃ—

"Thrice was I beaten with rods once was I stoned, thrice I suffered ship wreck, a night and a day I have been in the deep."

"In journeyings often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils by mine own countrymen, in perlls by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethnen."

"In weariness and painfulness, in watchings often, in hunger and thurst, in fastings often, in cold and nakedness."

অর্থাৎ আমি তিনবার যষ্টি প্রহৃত, একবার লোষ্ট্রাহত হইয়াছি। তিনবার পোত নিমজ্জনে, অষ্ট প্রহর সমুদ্রে ভাসিয়াছি।

অনুদিন পর্য্যটনে, সিন্ধুনিমজ্জনে, দুর্দান্ত দস্যুকরে, স্বদেশ বাসীর অত্যাচারে, বিধর্ম্মীর অবিচারে, বন্ধু জনের বিশ্বাসঘাতকায় মুহুর্মুহুঃ লাঞ্ছিত ও বিপন্ন হইয়াছি।

গ্লানি ক্লেশ, আত্মরক্ষার প্রয়োজন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, উপবাস, শীত, ক্লেশ এবং নগ্নতা যেন আমার চির সহচর।"—

পাঠকগণ, যীশুকে কি সত্যসত্যই দুঃখী বলিবেন?—স্বীকার করুন্ পদ্ম পত্রে বারিবৎ এসব মহৎকে স্পর্শ করিতে পারেনা। এসব শ্রেষ্ঠত্বের, মহত্ত্বের, ও সুখিত্বের লক্ষণ। গঙ্গা পথে কখন উত্তরবাহিনী কখন পূর্ব্ববাহিনী, কখন দক্ষিণবাহিনী, কখন বা পশ্চিমবাহিনীও হইয়াছেন; কিন্তু মোটের উপর তিনি পূর্ব্ববাহিনী। তন্নিয়মে দুঃখময় জীবনও মোটের উপর সুখময়। সমস্ত গ্লোব খানি (পৃথিবী) পর্ব্বতাদির উচ্চতা, গহ্বরগর্ত্তাদির নিম্নতা সত্ত্বেও গোল। অগ্নি হইতে শিখা ও ধূম নির্গত হয়, কিন্তু তথাপি অগ্নি—পাবক—পবিত্রকারক। যে মানব বা মানবীর লক্ষ্য উচ্চ, উন্নত, তাঁহার জীবন সুখ-

ময়। দুঃখ ক্লেশ তাঁহার নখকেশ, কর্ত্তিত হইলেও কিছুতে তাঁহাকে ক্লিষ্ট করিতে পারেনা।

স্থূলদর্শী অবিবেকী বিষয়িনিকর।
নিরানন্দ দীন মোরে ভাবে নিরন্তর॥ সদ্ভাবশতক।

যিনি দুঃখের কণ্টক-কানন ভেদ করিয়া চলেন, তিনি সুখী; যিনি কণ্টকের আঁচড় ভয়ে ফাঁক ফাঁক দাঁড়াইয়া থাকেন, তাহার গতি কাজেই রুদ্ধ হইল, কণ্টক লতা পদদলিত হইল না; সুতরাং উহা বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া তাহাকে সেখানেই সম্যক্ জড়াইয়া ফেলিল। তুমি মাটিতে শুইয়া আছ, তাই ধূলায় তোমার অঙ্গ কুটু কুটু করে; দাঁড়াও কুটু কুটু দূর হইবে। তুমি মনে করিতেছ দুঃখ, হৃদয়ে জোর কর, দুঃখ বলিতে খুঁজিয়া পাইবেনা। চিত্ত দৌর্ব্বল্যই দুঃখ। তোমার লক্ষ্য সাধনের জন্য সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পার, তোমার বিন্দুমাত্র ভয় হইবেনা। অভীষ্টের সাধন সিদ্ধিতে তোমার রস, অনুরাগ, প্রাণের টান রহিয়াছে; সমুদ্র ঝম্প তোমার সুখদ সম্পদ, অপর লোকে দেখিয়া উহাকে ভীষণ মৃত্যুস্বরূপ মনে করিবে।

উদ্দেশ্যকাছি ধরিয়া লটকিয়া গেলে আর পথের কণ্টক পদবিদ্ধ হয়না। মৎস্যলোভে বড়শী ফেলিয়া ফাতনা পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আছ, মশক দংশনে তোমার চৈতন্য আছে কি? তোমার সুখ দুঃখ সব এক মৎস্যের খোটে। অতএব সিদ্ধান্ত করি, যাহার জীবন উদ্দেশ্যবিহীন দোদুল্যমান, তাহার সুখ দুঃখ সবই দুঃখ।

জীবের লক্ষ্য কি?—এস্থলে ত্রিতত্ত্বের উল্লেখ আবশ্যক।— (১) আমি কি? (২) ঈশ্বর কি? এবং (৩) আমি ও ঈশ্বরে সম্বন্ধ কি?—এস্থলে "ঈশ্বর কি?" এ প্রশ্ন আইসে কেন আপত্তি হইতে পারে। তন্মীমাংসায় বলি, "লক্ষ্য" বলিতেই ঊর্দ্ধ ও শ্রেষ্ঠ পানে বোধগতি হয়। অইটি নদী, তার যেমন উদ্ভব কোনও পর্ব্বত বা হ্রদ হইতে ঘটিয়াছে, সুখ সরিতেরও একটা উৎপত্তি ধাম আছে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ সংস্কার যে সুখ বস্তুটি পরম পবিত্র উত্তম পদার্থ। সুতরাং উহার ধারাও উত্তম পরম পবিত্র ধাম হইতেই বর্ষে! উত্তম ধাম প্রতি দৃষ্টি করিতে আমরা বুঝি ওটি ঈশ্বর ধাম। জগতে জীবকে ঈশ্বর কর্ম্ম সাধন যোগ্য সব দিয়াছেন। এসব দিয়াও

কিন্তু সারবস্তুটি মুঠে রাখিয়া হাসিতেছেন, "কার করে দিব!"—রঙ্গচ্ছলে বলিতেছেন, "তোরা কে নিবি, কে নিবি?" আর হাসিতেছেন।—এ এক রসের খেলা। জীব-বালকগণ মধ্যে যে যে তাঁহাকে নাচিয়া, গাহিয়া, কাঁদিয়া, লোটাইয়া সন্তুষ্ট করিতে পারে, তিনি তাহাদিগকে মুঠ খুলিয়া বাঁটিয়া দেন, কিন্তু সে মুষ্টি অফুরন্ত ভাণ্ডার! যে মাটির দিক্ না চাহিয়া সেই মুষ্টি পানে উর্দ্ধ মুখে থাকে, সেই কাঙ্গাল বালক সেই মুঠের সন্দেশ খাইতে পারে। মাটি বা সংসার যাহার স্বার্থ নয়, শ্রীপদ্ম হস্তরূপ গগনচাঁদে যাঁর দৃষ্টি, তিনি সে চাঁদের চকোর, সুধা পান করিতে পারেন। এই মুঠের বস্তুটি—"ভক্তি", যারে তারে ঠাকুর ভক্তি দেননা। ভক্তিই সুখের পুণ্যোৎস।

জ্ঞানতঃ সুলভা ভুক্তির্মুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা॥

যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মের ফলস্বরূপ ভুক্তি সংলব্ধ হয়। জ্ঞান দ্বারা তদ্বিরতি বা মুক্তি সংসাধিত হয়। সুতরাং এসব লোকসাধ্য কিন্তু সাধন সহস্র দ্বারাও হরিভক্তি লাভ করা যায়না। ভক্তি ভুক্তি মুক্তিবৎ সাধ্য নয়, সিদ্ধ। উহা ভগবৎ কৃপাকুলে ফলে। অতএব আমরা যে "সুখ সুখ" করিয়া অন্বেষণ করি, ইতস্ততঃ ধাবিত হই, শুধু ঘর্ম্মাক্ত হই, পরিচয় পাইনা, সন্ধান পাইনা। কিন্তু উহার পরিচয়—ভগবৎকৃপারই অভিধান বিশেষ—সুখ। শ্রীভগবৎকৃপা তথাকথিত সুখও তথা কথিত দুঃখকে দলিত করিয়া, সমভূমি করিয়া, সুখের শীর্ষ ভাঙ্গিয়া, দুঃখের গর্ত্ত ভরিয়া, সমান করিয়া দেয়। এই সমতল ভাবটী সুখ, আদত সুখ। উহা সুদুর্লভ। জলে ডোবা—ভুক্তি; স্থলে উঠা—মুক্তি; জলস্থলের অতীত বিমানে উড্ডীন হওয়া—ভক্তি। ভক্তি-পাখা উদ্‌গত হইলে, জীবের ভুক্তি মুক্তির—জলস্থলগতাগতির—সম্বন্ধ ও হেতু থাকেনা।

অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো।
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্॥

শ্রীভাগবতে।

উপাসককে ঠাকুর পরীক্ষা করিবার জন্য ভুক্তি মুক্তিরূপ মেওয়া দিয়া ভুলাইতে চাহেন। তেমন ভক্ত তাহাতে ভুলেননা তিনি দাস্য মধুর না

করাইয়া লইয়া, মেওয়ার মেওয়া ভক্তি না লইয়া নিরস্ত হয়না। সুচতুর ভক্ত শুদ্ধ ভক্তি মাগেন, ভক্তি বা ভোগ অতিক্রম করার নাম মুক্তি। ভোগে জীবের বন্ধন ঘটে; এই বন্ধনের নাম দুঃখ। বন্ধন মোচন না হইলে, জীবের সুখ ঘটেনা। মুক্তাবস্থার নাম সুখ, মুক্তি কিসে সংলব্ধ হয়?— ভগবদ্দাস্য ভিন্ন শান্ত মুক্তি হয়না। অতএব ভগবদ্দাস্যই সুখের মন্দির দ্বার। পরবর্ত্তী রস সমূহ সুখের তরঙ্গ।

সুখ—ধামের ভাব, সে ভাব কখন কাহার ভাগ্যে অবতীর্ণ হয়, তৎসংবাব পূর্ব্বে পৌঁছেনা, উহা স্বাতিনক্ষত্রের ধারাসিক্ত শুক্তির মুক্তা। সুখকে এমনি দুর্লভ বলিয়া জানিবেন, সুবহু জন্ম-খনিত সুকৃত সরসীতে ভগবৎকৃপা-মৃণালে ভক্তি পদ্ম বিকসিত হন। সুখ এই অপ্রাকৃত পদ্মের মকরন্দ। সুখের লেশ যিনি সম্ভোগ করিয়াছেন, তাহাকে বলিয়া দিতে হইবেনা যে সুখ বস্তুটি রস—দাস্যদ্বার অতিক্রম করিয়া প্রবেশ করিলে শ্রীমন্দিরের তিন কুঠরী মধুর-ভাণ্ডার। শ্রীভগবান্ সর্ব্বমাধুর্য্যসিন্ধু, সে সিন্ধুর মাধুর্য্যশীকর রসাস্বাদ করার নাম সুখ। ভগবৎ প্রেমরসাস্বাদ ভিন্ন জীবের সুখ—নাই নাই—নাই। জীব যদি সুখের মধুময় কপোল চুম্বন করিতে চাহ, যদি সুখের শান্তি বারিতে স্নান করিয়া দেহ প্রাণ শীতল করিতে চাহ তবে অন্য কর্ম্ম পরিহরি একবার শ্রীভগবানে প্রেম কর, শ্রীভগবান্‌কে ভালবাস তাঁহার জন্য সর্ব্বদুঃখবিপদকেও আলিঙ্গন কর, দেখিবে সেই সব দুঃখবিপদ কেমন স্নিগ্ধ সুখের রঙে রঞ্জিত হইয়া তোমাকে কেবল বিশুদ্ধ সুখের সলিলে ডুবাইয়া ফেলিবে। নির্ম্মল সুখ আর কিছু নয়। সুখের সন্ধান পাইতে চাও, সুখ চিনিতে চাও,—উহা শ্রীভগবদঙ্ঘ্রি-কমলের মকরন্দ সুধা। বাঁচিতে চাও, চিরজীবী হইতে চাও, অমর হইতে চাও, অপুনর্ভব হইতে চাও, অপুনর্ভব হইয়া অনন্তকাল অনন্ত সুখের শীতল সুধা পান করিতে চাও, তৃপ্ত হইয়াও অতৃপ্ত থাকিতে চাও, আনন্দ সিন্ধুতে নিমগ্ন হইতে চাও, বিভোর হইতে চাও, বিহ্বল হইতে চাও, পাগল পারা হইতে চাও, যাঁহা চাওয়ার চাও, যাহা প্রাপ্তব্য পাইতে চাও, স্বর্গেও তুচ্ছ জ্ঞান করিতে চাও, নির্ভীক নিশ্চল হইতে চাও, সদানন্দ হইতে চাও, নিত্যশিশুর স্বভাব ধরিতে চাও, তবে অন্য কছুরই আকাঙ্ক্ষা রাখিওনা। সর্ব্ব বাসনায় আগুন দিয়া কেবল সর্ব্ব

মাধুর্য্য-সীধু সিন্ধুস্বরূপ শ্রীশ্রীভগবানের শ্রীরাঙ্গাপদযুগলে সমস্ত লোভ লালসা স্থাপন কর, ভয় থাকিবেনা, চিন্তা থাকিবেনা। সুখ বল, সুধা বল, অমৃত বল, এসব অপর কিছু নয়, "একমাত্র" ঐ রাতুল চরণ যুগলের পরাগরাগরঞ্জিত মধু। যিনি ও পাদপদ্মের ভ্রমর হইয়াছেন," তিনিই সুখী ; এ ভিন্ন যদি কেহ সুখী বলিয়া গণ্য বা অনুমিত হন, তাহা ভ্রান্তি,—তিনি দুঃখী, দুঃখী, দুঃখী। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু কলিতে অবতীর্ণ হইয়া যাহা কৃপাদর্ব্বীতে বিলাইয়াছেন, তাহাই সুখ। তাই বলি, জীব, যদি সুখ চাহ, গোরাচাঁদের কাছে তা কাঙ্গাল চকোর হইয়া মাগ। কলি-নৈশাকাশে সমুদিত অকলঙ্ক গোরাশশীর চকোর হওয়াই জীবের গতি—সুখ। গোরাচাঁদের একচেটিয়া সুধাসামগ্রী, তিনি একমাত্র ভাণ্ডারী। তাঁহার চরণাশ্রয় কর, সে চরণে ভিক্ষা মাগ, তিনি অকাতরে, অকার্পণ্যে সুখ বিতরণ করিবেন। গৌর বিনে গতি নাই-- গতি নাই— !

শ্রীকালীহর দাস বসু ভক্তিসাগর।

কানুর দশা।

—:-:—

কানাই কেন ডাকিলে শুন না কাণে ?
কেন বদন নলিন হেরি আজি বিমলিন
কাঁপ খেয়ে আছ কি ধেয়ানে ?
বনমালা নাহি গলে তাই খুজি অলিদলে
গুণ গুণি করল কি কালা।
না, নয়ন তারা দুটি থির উরধে উঠি
কিবা নাগিনী দংশল কালা॥

চূড়'পরে শিখিপুচ্ছ তারে কেন এত তুচ্ছ
ভূমে পড়ি গড়াগড়ি যায়।
অধরে ইক্ষুবং কানু চুমিতে সদা যে বেণু
তার মিষ্টি ফুরা'ল কি হায়॥
রাধা নেত্র ভ্রমর ভ্রমণ ভঙ্গিম'পর
করল বিহ্বল হেন মান।
কি হবে নোড়ালে মাথা বুঝেছি সকল কথা
রাধারূপে গরাসিল প্রাণ॥
কত হি সুন্দরী নারী রাজে বরজ উজারি
তাহে কেন চিত্ত নাহি যায়।
কি মোহিনী জানে ছোরী তোমারে এমন করি
কর-বেণু খোয়া'ল ধরায়॥
কালীহর দাসে কয় অনুরাগে সব লয়
রহে শুধু পিপাসার জ্বালা
তবু যার যথা ভাব অবশেষঃ তথা লাভ
তাই বলি ঝুরিওনা কালা॥

শ্রীকালীহর দাস বসু ভক্তিসাগর

ভক্তের পত্র।

—:*:—

ভক্তের কাছে ভক্তের পত্র বড়ই উপাদেয় সামগ্রী; ভক্তসঙ্গ যেরূপ প্রাণারাম, ভক্তের পত্রও তদ্রূপ। ভক্তি সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ লেখক ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত কালীহর বসু ভক্তিসাগর প্রেমময় দাদা মহাশয় সোণামুখী নিবাসী আপনাদের চিরপরিচিত সুলেখক কবি শ্রীযুত রসিক লাল দে মহাশয়কে যে স্নেহ মাখা উপদেশ পূর্ণ দুই খানি পত্র লিখিয়াছিলেন, উহা পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি, তাই ভক্তির পাঠকগণকে উহা উপহার না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। আশা; করি ইহা পাঠে সকলেরই আনন্দ-বর্দ্ধন হইবে। আমরা মাঝে মাঝে

আপনাদিগকে এইরূপ সুধুর উপদেশাবলী উপহার দিতে প্রয়াস পাইব। বিধি হইতে অনুরাগের উদ্ভব ঘটে এবং নাম মাহাত্ম্যাদির কথা, দ্বিতীয় পত্র খানিতে সুন্দররূপে আলোচিত হওয়ায় উহা পরম সুস্বাদু প্রদার্থ হইয়া উঠিয়াছে। ("ভক্তি" সম্পাদক)।

ভ্রাতৃমণি রসিকলাল।

তোমার পত্র পাঠে, * * * * * * * *

তোমার বর্ত্তমান ঘোর দুরবস্থার একচিত্র আমার অশ্রুময় চিত্তে ফলিত হইল। পাঠে চিত্ত বড় বিচলিত হ'য়ে পড়েছে। প্রায় একমাস অবধি তোমার মুখখানি যেন বিষাদের কালিমা মাখাই লাগিতেছে। আমার উপায় কেবল তোমাদের স্নেহ ও ভালবাসা; এই অমৃতের জোরে জীয়া আছি, আনন্দে আছি। ভাই, তোমার পাদুকা নাই আক্ষেপ; দেখ, আমার পা নাই। তোমার চশ্‌মা নাই; দেখ আমার চোখ নাই, অন্ধ। শান্তি লাভ কর। শ্রীভগবানের লীলা ও কৃপায় বিশ্বাস কর। টলিও না। নামে দৃঢ় বিশ্বাস রাখ। তুমি যাকে শত্রু বল, তিনি পরম মিত্র, বিভিন্ন মূর্ত্তিতে বর্ত্তমান। তোমার জটিলা কুটিলার প্রতি এত বিদ্বেষ কেন?

বর্ত্তমান দুঃখ সহ্য করিলে আর দুঃখে ডর থাকিবে না। সাবধান, পরীক্ষায় কাতর হইও না। বুক পাতিয়া দাও। তবে দুঃখ পরীক্ষিত হইতে পারিবে। তুমি এত দিন সুখে ছিলে, তোমার হৃদয়ে ঐ যে, "রাঙ্গা পা দুখানি" বিরাজিত ভয় নাই, ভয় নাই পিরিতি পথে যাবার যদি যথার্থ বান্ধব কেউ থাকেন, তবে জানিবে তাহারা অন্য কেউ নয়, জটিলা কুটিলা। তোমার প্রাণ বল্লভের কথা ব'লেছ, তা, তারাই লীলা ছলে ঐ দুটী প্রেম-বাদিনী খাড়া হয়েছে। এসব জটিলা কুটিলা শত্রু আছে। সব শ্রীভগবানের—আমাদের প্রাণনাথেরই—জীব। তাহারা কৃষ্ণেরই সৃষ্টিতে চলে কাহারো দোষ নাই। "দোষ কারো নয়গো মা"; সব কর্ম্ম দোষ। তা' কর্ম্ম নামের জোরে নীমাস্রে কেটে যাবে। মা ভৈ। তোমার মস্তকের উপর অনন্ত ফণাবৎ যে অভয় শ্রীপদ্ম-হস্ত সম্প্রসারিত, তা' সদা মনে রাখ, দুঃখ ভয় দূরে স'রে যাবে। শরীরের রোগ বলেছ, নাম জপিবে, মস্তিষ্কের ভিতর একটা রসের ঝরণা খুলিয়া যাইবে। উহা প্রেমামৃত, রোগ

থাকে কি? রোগনাশের সঙ্কল্প করিয়া নাম করিও না, নামের জন্য গান করিও; দেহ সুখের জন্য নাম হইবে কেন?

নির্হেতুক জপ হউক। নামে নিশ্চয় রোগ যায়; কিন্তু রোগ যাওয়ার জন্য নাম করিও না। বরং ঔষধ সেবন করা ভাল; তবু স্বার্থের জন্য নাম করিও না। দেহ যাউক বা থাকুক, এই ভাবে নাম করিবে। এসব ইতর উদ্দেশ্য নাম শক্তিতে আপনিই সিদ্ধ হয়। ভার দিয়া ব'স। তোমার ঘরের বান্ধব সব যদি প্রতিকূল হন, তবে তাদের চরণে শতবার প্রণাম কর। তোমার জন্য প্রকৃত বৈরাগ্য আসিতেছে। যদি প্রতিবেশী বিপক্ষ হ'য়ে থাকেন, তবে ভালই; সে বিপক্ষতা বিষয় পত্রে স্থিতি করে। সে বিষয়ের সেবালাভে মন শিথিল কর। মুক্ত হইবে, শান্ত হইবে, আনন্দের রশ্মি খুলিবে। তোমারই কালীহর।

(২)

প্রেমময় ভ্রাতৃজীবন রসিক লাল!

কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ ক্রিপায় পায় ভক্তি লতা বীজ॥
মালী হয়ে সেই বীজ করোয়ে রোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন জল করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ কল্প বৃক্ষে করে আরোপণ॥
তাহা বিস্তারিত হইয়া ফলে প্রেম ফল।
ইঁহা মালী সেচে নিত্য শ্রবণ কীর্ত্তন জল॥
যে রূপে লইলে নামে প্রেম উপজয়।
তার লক্ষণ শ্লোক শুন স্বরূপ রামরায়॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

হরি "যদুসমুদ্ভব"

আমি ছিলাম, আমি আছি, আমি থাকিব। তবু আমার জন্ম আছে। শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রাহ্মণ কুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। প্রভুর আবির্ভাব আছে, প্রকাশ আছে, বিলাস আছে। প্রেম নিত্য, স্বতঃসিদ্ধ। তবু তার জন্ম হয়। প্রেম অখণ্ড রূপে নিত্য বিদ্যমান, কিন্তু খণ্ডরূপে অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভাবে সাধকের জন্য উহার উৎপত্তি সম্ভবে। সিদ্ধের পক্ষে অনুরাগ নিত্যস্বপ্রকাশ কিন্তু সাধকের পক্ষে উহার উদ্ভব হয়। কৃষ্ণ নিত্য স্ফূর্ত্ত, তবু ভক্তচিত্তে ভাগ্যবশে কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি ঘটে। গর্ভি বা (গর্ভস্থ সন্তান জীব ছিল; অথচ গর্ভসঞ্চার প্রেমসঞ্চার বা উৎপত্তি। উদ্ভব শব্দের অর্থ উদয়; কারণ উদয় বা প্রকাশ ভিন্ন জন্ম অন্য কিছুই একটা নাই। সবই বিকাশ, "বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মে একথা ভুল; বস্তুত বীজ হইতে বৃক্ষের বিকাশ হয়। কাজেই বীজে সূক্ষ্মভাবে বৃক্ষ নিহিত আছে। নামে প্রেম সূক্ষ্মভাবে আছে, শ্রবণাদি দ্বারা উহার বিকাশ হয়; সুতরাং নাম হইতে প্রেম উপজয়। প্রেম স্বপ্রকাশ নিত্য বস্তু, অথচ সাধকের পক্ষে নাম হইতে প্রেম জন্মে, তুমি "উদ্ভব" শব্দের অর্থ জন্ম মনে কর, কিন্তু জন্ম, উদ্ভব সব কথারই উদয় বা প্রকাশ আছে, ঈশ্বর স্বপ্রকাশ, তবু সাধক, সাধন বলে তাহাকে প্রকাশিত করে। অর্থাৎ কারো কারো ভাগ্যে তিনি প্রকাশিত হন। মধু একটা জিনিষ আছে, অথচ ফুল না ফুটিলে মধু পাও কি? অতএব ফুলে মধু জন্মে। তাই "সাধক ও সিদ্ধ" এই দুইটীকে এক করিয়া ফেলিয়াছ, উহাই গোল। ইহাতে ধৃষ্টতা নাই। অধিকারী ভিন্ন প্রশ্ন করিবার অধিকার আর কাহারো নাই। তোমার সূক্ষ্ম দর্শিতায় আমি আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু দার্শনিক বিচারে মানিতে হইবে যে "বিকাশ প্রকাশ আবির্ভাব" প্রভৃতিই "উৎপত্তি" বলিয়া ধৃত হয়, উহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। উপরের উদ্ধৃত অংশ গুলি পাঠ কর। নিকটে একখানি নৌকা থাকিলে মনের শান্তি থাকে। নাম ফল প্রেম ফল কি কেবল শান্তি মাত্র? হায় হায়! একথা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিলেও হয় যে রাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ ঈশ্বর থাকুক বা না থাকুক, আছে বলিয়া বিশ্বাস থাকিলেই হইল। এতদ্বারা কি শুধু বিশ্বাসের অস্তিত্ব ও বিশ্বাসের মাহাত্ম্য স্বীকার করা হয় নাই? নামের প্রেমের লীলার মাহাত্ম্যাদি এত সব প্রেম ভক্তির ঘটা উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছেনা কি? ধর্ম্ম শব্দের অর্থ

ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্য সব কৃষ্ণ সেবায় ঘুচিয়া যায়। আত্ম সুখের ঘরেই পাপ পুণ্য থাকে। যদি পাপ পুণ্য গেল তবে কর্ম্মফল গেল। কর্ম্মফল ভোগ জন্য পুনর্জন্ম তাহার থাকেনা। সুতরাং কর্ম্মের ক্ষয় আছে। নামে কর্ম্ম বন্ধন ঘুচে, ইহা শাস্ত্রের বচন, ফাঁকী নয়, "কর্ম্ম বন্ধন ঘুচে," ইহা নামের আনুষঙ্গিক ফল।

"এক নামাভাসে তোর পাপ দোষ যাবে।
আর নাম লৈতে কৃষ্ণ চরণ পাইবে॥"
কৃষ্ণ চরণ যদি নাম যোগে প্রাপ্ত হওয়া যায়,
তবে আমার কর্ম্ম ক্ষয় না হইল কিসে?
"ন কর্ম্ম বন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে"।
পদ্ম পুরাণ।
"আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপনাশ"।

বাল্মীকি ও জগাই মাধাইর কি কর্ম্ম ক্ষয় হইয়াছিল না? জগাই মাধাই কি কিছু দিনের জন্য বৈষ্ণব হইয়াছিল? মাটি দিয়া সন্দেশ, কিছুকাল পরে যে মাটি সে মাটি, ভোজের বাজী যেন। তাই কি?

নিতাই গৌরাঙ্গ কি বাজীকর? জগাই মাধাই কি জন্মান্তরে পাল্‌টি আমাদের মত কীট হইয়া আবার পূর্ব্বার্জ্জিত দস্যুতাদি পাপের ফলভোগ করিয়াছিলেন? তবে নিতাই গৌরাঙ্গের মহিমায় ধিক্! শ্রীভগবানেরও তাঁহার নাম প্রেমের অনন্ত শক্তি, অনন্ত মহিমা উহাতে স্বীকার করা হয় নাই, এবং মহিমার খর্ব্বতা করা হইয়াছে। শান্তিকেই চরম লক্ষ্য ধরা হইয়াছে। ঈশ্বরকে সত্য বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। ঈশ্বর আছেন এই ধারণাটীকে কেবল বলবতী রাখা হইয়াছে। এখন তুমি ভাব, বিচার কর। আমি কিন্তু উহার পাঠে ঐ স্থলে ওরূপ দৃষ্টান্ত দর্শনে ব্যথিত হইয়াছি। পাঠমাত্র স্বতঃই প্রাণে ব্যথা লাগিয়াছে। আমার নামতরী সম্বল হাতে আছে, তাই শান্তিতে ভবনদী সন্তরণ করি। এই শান্তিটুকুই বিশেষ হইল। ইহার পরেই কি আর কিছু নাই। ইহার সঙ্গে কি আর কিছু নাই। তোমার নাম সম্বল নাই, তুমি অশান্তিতে সন্তরণ কর। আমিও সন্তরণ করি শান্তিতে, কারণ আমার কাছে নামের নৌকাখানা ভাসে। এই কি ভক্তি রাজ্যের

ম্যাপ্ (নক্সা) এই কথায় তুলিয়াছ, অথচ, অনুরাগের "উদ্ভব" দেখিয়া অবাক্ হইয়াছে। নামে "প্রেম ফলে," "প্রেম জন্মে," "প্রেম সঞ্চার" হয়। শাস্ত্রেও ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। শ্রীভগবানের যদি উদ্ভব থাকে অনুরাগেরও ঘটে।

ভাই? তাপ—রোগ শোক জঞ্জাল শ্রীধামের বাতাসে ঘুচে যাবে। দীর্ঘকাল সাধুসঙ্গ না হ'লে এ সব দুর্দ্দৈব ঘটে। আমি এর ভুক্তভোগী। সৎসঙ্গাভাবে চিত্তে মরুভূমির প্রদাহ হয়। আমি অধমের ঘোর দুর্দ্দশা দুর্দ্দৈবের কাহিনী জীবন ভ'রে কত, তার ব্যাখ্যা নাই। জীবনটী আমার দুঃখই। কিন্তু, কেবল তোমাদের প্রণয়-পিরিতি-রসামৃতে সুখে সঞ্জীবিত আছি। আমার তোমার প্রাণের কথা গাহিলাম; তোমার আমার প্রাণ এক যে। আমার মত মানুষের হরিনামে চিত্ত ভিজে না, চোক্ ভিজে না। বুক ভাসা দূরে থাকুক্। যেদিন অশ্রু প্রবাহে বুক্ ভাসিবে, বসন তিতিবে,—সেদিন সব্ কাঁদিবে,—স্থাবর জঙ্গম আমার লাগি কাঁদিবে। শত্রু মিত্র সব একরঙ্গী হবে। চিন্তা কি?—নাম কর, কাঁদ। কাঁদ, আর একটু কাঁদ; বুক্ ভেসে যাক্,—কাঁদিতে শিখ নাই,—কাঁদাইতে এ দুঃখ জঞ্জাল। * * * *

তাই "ভক্তিতে" মালাতিলকের যে উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়াছ, উহা Disparagement বটে, মায়ের বাক্যের শক্তিতে ব্যাসকাশীতে মরিলে গাধা হইবে। স্থানের শক্তি নয়। শ্রীভগবান্ মালা তিলকে অর্থাৎ তুলসী ও গোপী মাটিতে চিৎ শক্তির force ও right ভরিয়া দিয়াছেন। তুলসী কাষ্ঠ নয়, গোপী চন্দন, মাটি নয়। শ্রীকৃষ্ণের রূপলাবণ্যের ঝিকি মিকি উহাতে খেলে। ধারণ করিয়া দেখিও। কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি পাইবে। ঐ সব, দ্রব্যেরই শক্তি। ইক্ষুতে যতটুকু মধুরত্ব, অন্য উদ্ভিদ্ গুল্মে তা' নাই। সেই রূপ চিৎপদার্থ গোপী মাটিতে যতটুকু, অন্য মাটিতে তা' নাই। কথাটা ভাবিয়া দেখ। জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি হইতে ওরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছ। * * *

তোমারই প্রেমময় দাদা

শ্রীকালী হর—

গীত।

সংসার তরঙ্গে আমার, ডুব্‌লো গো, মা জীবন তরি।
দিনে দিনে দিন ফুরাল, বল্‌মা তারা কিবা করি॥
ভব নদীর তুফান ভারি, কিসে পারে যাব ও শঙ্করি।
ছিদ্র তাহে দেহ তরি, মন মাঝি বড় আনাড়ি॥
প্রেমের শিকল দিয়ে, হাল্ বাঁধিনু যতন করে।
কুচিন্তা প্রবল ঝড়ে, দিল তাহে ছিন্ন করি॥
মিলে ষড়রীপু গণে, জোরেতে কুপথে টানে।
তুমি কর্ণধার বিনে, বল্ মা তারা কিসে তরি॥
শোন গো মা ভবদারা, দীনের প্রতি কর্ মা দয়া।
(নৈলে) মাঝ তুফানে গেলাম মারা, (তোরে) ব্যাটা থেকো মাতা করি॥
মহা পাপী দেখে মোরে, গুরু ত্যেয়াগিলেন দূরে।
কার্ বলেতে যাব পারে, তাইতে সদা কেঁদে মরি॥
আগে নাহি জেনে শুনে, গুরু ব্রহ্ম নাহি মেনে।
মোহ মদ সদা পানে, অচেতনে রৈনু পড়ি॥
ঘুরে মরি পরবাসে, স্থান পেলাম না আপন বাসে।
মত্ত থেকে বিষয় রসে, কর্‌লাম ব'সে দিন আখিরী॥
কৃত কর্ম্ম দোষ রাশী, আর ধরোনা এলোকেশী।
দিয়ে তোমার জ্ঞান অসি, দাও, মন মসীরে বিদায় করি॥
হতভাগা ছেলে হ'লে, মা কভু না দেন ফেলে।
শচী তোমার তেম্‌নি ছেলে, ত্বরাও দিয়ে পদ তরি॥

দীন—শ্রীশচীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গীত।

ওহে! দীনবন্ধু, দয়াময় নামে যেন কলঙ্ক না হয়।
তুমি অধম তারণ পতিত পাবন, জগন্ময় বলে সবায়।
হরি ভজন সাধন যে জন জানে,
সে তরে আপনগুণে ব্যাক্ত ভুবনে।
অধম পতিতেরে না তরালে পতিতপাবন কেবা কয়॥
হরি কে জানে তব মহিমা, বেদে নারে দিতে সীমা, নাহি উপমা,
তুমি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারী, তুমি হরি সর্ব্বময়॥
আমি মূঢ়মতি ভক্তি হীন, বৃথা কাজে গেল দিন, তাই ভাবছি রাত্র দিন।
দীন 'জলধরে' কৃপাকরে, রেখ দুটি রাঙ্গাপায়॥

শ্রীজলধর জোয়াদ্দার।

ভক্তি।

অগ্রহায়ণ মাস, ৪র্থ সংখ্যা—১০ম বর্ষ।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

প্রার্থনা।

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈক সিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদানু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥

প্রভো! তুমি নিকট হইতেও নিকটে আছ, তথাপিও বাহ্য বস্তুতে আসক্ত ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হওয়াতে মুগ্ধ হইয়া তোমা হইতে বিমুখ হইয়া রহিয়াছি। তুমি আলোকেও যেমন আছ, সেইরূপ অন্ধকারেও আছ। তুমি আকাশে, বায়ুতে জলে, তেজে, সত্ত্বাস্বরূপে বিদ্যমান। তোমার সত্ত্বাদ্বারাই পঞ্চমহাভূত শক্তিমান, হে জগদীশ্বর! তুমি সম্যক প্রকারে আপনাকে সর্ব্বত্র প্রকাশ করিতেছ; তোমার বিভূতি সর্ব্বত্র দীপ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু প্রমাদী ও অবিবেকী মনুষ্য মোহ আবরণের দ্বারা আপন জ্ঞান নয়নকে আবৃত করায় তোমাকে উপলব্ধি করিতে পারে না। পঞ্চভূতময়ী প্রকৃতি নিয়ত তোমার পবিত্র নাম গান করিতেছে, কিন্তু আমরা এতই মূঢ় যে, সেই মহান সঙ্গীত শুনিবার চেষ্টাও করি না। তুমি আমাদের অন্তরে রহিয়াছ, কিন্তু আমরা তোমার অধিষ্ঠানকে অনুভব না করায় তোমা হইতে বহুদূরে রহিয়াছি, সম্মুখে আলোক থাকিতেও চক্ষু মুদিয়া

অন্ধের ন্যায় অন্ধকারে ভ্রমণ করিতেছি। প্রতিক্ষণে পদস্খলন হইতেছে, তথাপি চৈতন্য হইতেছে না। হে পরমাত্মন্! হে জ্যোতীও সৌন্দর্য্যের অনন্তোৎস! যাহারা আপনাদিগের অন্তরে তোমার অনুসন্ধান করে, তোমাকে দর্শন করিবার জন্য তাহাদিগের যত্ন ও ব্যাকুলতা কখনও বিফল হয় না। কিন্তু হে ভক্তবৎসল! হে বাঞ্ছা কল্পতরু! কয়জন তোমার অনুসন্ধান করে? কয়জন তোমায় চায়? আমাদের বাসনা ও কর্ম্মের অনুকূলে যে সকল বস্তু তুমি আমাদিগকে প্রদান করিয়াছ, তাহারা আমাদিগের মনকে এত আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে যে, প্রদাতা যে তুমি, তাহা অনুভব করিতে দেয় না। দত্ত বস্তু লইয়া আমরা এতই উদ্‌ভ্রান্ত যে, দাতাকে স্মরণ করিবার অবকাশ পাই না। তোমাকে অবলম্বন করিয়া জীবিত রহিয়াছি, কিন্তু তোমাকে বিস্মৃত হইয়া সেই জীবন যাপন করিতেছি, সুতরাং জীবনের জীবন স্বরূপ তোমার সহিত যোগ না থাকায় তৈলহীন দীপের ন্যায় মৃত্যুর অন্ধকারে লীন হওয়াই আমাদের নিয়তি? বিষয় আমাদিগকে যে সুখ প্রদান করে তাহা তোমরই সত্ত্বার আভাস মাত্র, কিন্তু সেই সত্ত্বার দিকে লক্ষ না রাখিয়া উহার বাহ্য সৌন্দর্য্য উপভোগ করায় উহা কেবল দুঃখের জনক হয় মাত্র। আমরা কি দুর্ভাগ্য, আমরা ছায়াকে সত্য ও সত্যকে ছায়া বলিয়া মনে করি, যাহা কিছুই নহে তাহাই আমাদের সর্ব্বস্ব ও যাহা সর্ব্বস্ব তাহা আমাদের নিকট কিছুই নয়। হে প্রভো! যে তোমার আস্বাদ পায় নাই সে এজগতের কিছুরই আস্বাদ পায় নাই, অতৃপ্তানলে সে সদাই দহ্যমান, সুতরাং তাহার অস্তিত্ব বৃথা। অহো! সেই জীব কি অসুখী, তোমার জ্ঞান অভাবে যাহার সুহৃদ্ নাই, আশা নাই, বিশ্রাম স্থান নাই, এবং সেই জীব কি সুখী, যে তোমার অনুসন্ধান করে, তোমাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল; কিন্তু পূর্ণ সুখী সেই ভাগ্যবান যাহার নিকট তুমি প্রকাশ হইয়াছ, তোমার অভয় হস্তদ্বারা যাহার চিরদিনের অশ্রু মুছিয়া গিয়াছে, যে আপ্তকাম হইয়াছে। হায়! প্রভু কতদিন— আর কতদিন আমি সে দিনের জন্য অপেক্ষা করিব, যেদিন আমি তোমাকে লাভ করিয়া আনন্দময় হইব, তোমার সহিত একযোগে অপার আনন্দ সম্ভোগ করিয়া ধন্য হইব।— বলো—বলো নাথ সেই দিনের আর কয়দিন বাকী॥

শ্রী:—

চল যাই নির্জ্জনে।

(১)
জুড়াইতে চাও যদি মন!
চল গিয়া নিরজনে,
লক্ষ রাখি' শ্রীচরণে,
নাম-রস করি আস্বাদন॥

(২)
হরিনাম অমিয় পূরিত।
খাইলে তারক পার
ভুলিতে নারিবে আর
পি'তে সাধ হবে অবিরত॥

(৩)
ত্রিতাপ-পূরিত ধরাধামে—
জুড়া'তে তাপীর প্রাণ,
কৃপা করি ভগবান,
দিয়াছেন সর্ব্বশক্তি নামে॥

(৪)
শ্রীনামে সঁপিয়া দিলে প্রাণ।
রবেনা সংসার ভয়,
দূরে যাবে তাপত্রয়,
সর্ব্ব দুঃখ হ'বে অবসান॥

(৫)
কাম ক্রোধ আদি রিপুগণ
যাবে দূরে পলাইয়া,
পবিত্র হইবে হিয়া
নিত্যানন্দে ভাসিবে জীবন।

(৬)
হৃদে হবে শকতি সঞ্চার।
যক্ষ, রক্ষ, নাগ নর,
না থাকিবে কা'রে ডর,
অধীনতা ঘুচিবে তোমার॥

(৭)
নাম নামী অভেদাত্মা মানি—
জপিলেরে সুবিশ্বাসে,
লভিবিরে অনায়াসে,
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত প্রেম-মণি॥

(৮)
দিব্য চক্ষু ফুটিবে তখন
দেখিতে পাইবে হৃদে,
ভুবন-মোহন সাজে,
বিরাজিত শ্রীরাধারমণ॥

(৯)
প্রেমানন্দে হইবে বিহ্বল।
ভাবের প্রসূন তুলি,
দিবে পদে পুষ্পাঞ্জলি,
হবে তাহে জনম সফল।
তাই বলি নিরজনে চল॥

প্রার্থনা।

যত দিন দেহে রহিবে জীবন,
ভুলিনাকো যেন তোমারে।
ও দু'টী চরণ যেন দরশন—
পাই সদা হৃদি-মাঝারে॥
ভাবের প্রসূনে, ভকতি চন্দনে,
যেন ঐ চরণ দু'খানি—
পূজিয়ে মানসে, প্রেমের হরষে,
মগ্ন থাকি দিবা যামিনী॥
রসনা আমার, যেন অনিবার,
করে তব নাম কীর্ত্তন।
শ্রুতিযুগ যেন, তব কথা বিনা,
নাহি করে আন শ্রবন॥
বিষয়ীর সঙ্গ, করি পরিহার,
যেন তব ভক্ত সদনে—
করি সদা বাস, ওহে পীতবাস,
এই ভিক্ষা মাগি চরণে॥

দীন—শ্রীশশি ভূষণ সরকার।

পাগলের প্রলাপ।

[১]

গৌর হে!

এ সংসারে যে সকলেই অর্থের দাস। অর্থ না থাকিলে সংসারী লোকের ভালবাসা পাইবার আশা বিড়ম্বনা। আমি গৃহী,—গ্রাসাচ্ছাদনের

জন্য কিছু অর্থ আবশ্যক। তাহা একরূপ হইয়া যাইবে,—বহু উপায় করিয়াছি,—সদ্ব্যয়েই অর্পণ করিয়াছি এক্ষণে ভালবাসাচ্যুত হই, অশ্রদ্ধাভাজন হই, ক্ষতি নাই। তুমি নির্গুণ, পতিত পাবন পরমেশ্বর,—তুমি কিন্তু আমাকে ভুলিও না। যে দিন তুমি আমাকে ভুলিবে, সেই দিনই আমার মৃত্যুর দিন,—এভাবে যেন মরণ না হয়। তুমি পরম দয়াল,—তাহা হইলে দয়াময় নামে কলঙ্ক হইবে।

[২]

তোমায় তুষিতে পারিনা। আমি নিজ কর্ম্মফলে এ যন্ত্রণা সহ্য করিব। প্রকৃতির দাস হইয়া কর্ম্মফল বাড়াইয়া ফেলিয়াছি। জানি না, ইহা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া একেবারে কখনও ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে কি না? তোমার ইঙ্গিত বুঝিতে পারি নাই,—না তাহা কেন? বুঝিতে পারিয়াও, মায়ার প্রভাব অতিক্রম করিতে না পারিয়া তোমার কৃপাদেশ লঙ্ঘন করিয়াছি। প্রভো! আর যেন এ মহাভুলের দাস না হইতে হয়। দয়া কর,—ক্ষমা কর,—আমায় শক্তি দান কর। আমি সেই শক্তিবলে দিগ্বিজয়ী হইয়া তোমার গৌরব-গাথা কীর্ত্তন করিয়া ধন্য হই। দয়া কর,—দয়া কর,—দয়াময়!

[৩]

এ সাংসারে (ভক্তি জগতে নহে) আমার আপনার বলিতে আর কেহ নাই। ছিলেন একদিন—তুইজন! অহো নিঃস্বার্থ প্রত্যক্ষ দেবতাদ্বয়! আজ তাঁহারা কোথায়? একবার তাঁহাদের প্রত্যেকের চরণ যুগল ধ্যান করা যাউক্।

ধ্যান।

দাঁড়াও দেখি যুগল-রূপে, দেখি কেমন সাজে
হৃদাসনে, সুমিলনে, মলিন হিয়া-মাঝে॥
বিদায়ের দিন হ'তে বড়, পরাণে মোর বাজে।
দুঃখের কথা, বল্‌বো কা'রে আর,—
মরমে মরি লাজে॥

এক জনের কথায় মনে পড়ে—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ 'পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে'প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা" ॥"

আর এক জনের কথায় মনে হয়—

"কিসের পিসী, কিসের মাসী, কিসের বৃন্দাবন?
এত দিনে জানিলাম ভাই, মা বড় ধন ॥"

[৪]

দীনবন্ধো! আমায় ভাব দাও, সেই ভাবে ডুবিয়া থাকিয়া দুর্ভাবনা ভুলিয়া যাই। তোমার ভাবে ভাবিত হইলে প্রাণে অসীম আনন্দের সঞ্চার হইবে। তাহা বড় সুখ-প্রদ,—বড়ই শান্তি-প্রদ। দেখো যেন, কৃপাময়, এ ভাব হইতে আমার বিচ্যুতি না ঘটে। ভাবিতে ভাবিতে তোমার ভাবময় রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হই। তথায় দেখি কেবল আনন্দ। আনন্দই তোমার স্বরূপের একাংশ। তাহারই মধ্যদিয়া তোমার আনন্দ পূর্ণ মূর্ত্তিখানি দেখিয়া ধন্য হই। ইহা কি দুরাশা, প্রভো! তোমার কৃপা থাকিলে জগতে কিছুই দুরাশা বলিয়া থাকিতে পারে না। কৃপা হবে কি? একবার অন্তরটা পরীক্ষা করিয়া দেখ দেখি, আমি বাস্তবিক কৃপার পাত্র হইয়াছি কি না? কঠোর পরীক্ষা আর কতকাল করিবে? হে চতুরচূড়ামণি! তোমার চাতুরী ভেদ করিবার শক্তি আমার নাই। পরীক্ষক ও তুমি, পরীক্ষার্থী ও তুমি, পরীক্ষার বিষয় গুলাতেও তোমারই জটীল প্রশ্ন সকল মাখা। এ সব প্রশ্নের উত্তর দিবার সাধ্য আমার নাই। সাধন ভজন, যোগ যাগ কিছুই জানি না, এবং কিছুই বুঝি না। এখন চাতুরী ছাড়িয়া বল, তোমার কৃপা হবে কি না? যদি একটু আশা পাই, তবে সেই ক্ষীণ আশার আলোকে পথ দেখিয়া,—তোমার নামটী করিয়া কেবল ছুটিতে থাকি। তার পর, যা করিবার ভার তোমার উপর।

[৫]

দিনে দিনে দিন চলিয়া যায়, আয়ু ফুরাইয়া আসিল কই তোমার দয়া ত হইল না। প্রাণের বেদনা ত তোমার চরণ স্পর্শ করিল না। নাথ! আর কত কাঁদ

এ ভাবে, এ ভবে চলিব? কাঁদিতে কাঁদিতেই কি দিনগুলি অতিবাহিত হইবে? এ কান্না ভাল লাগে না,—এ কান্না কাঁদিতে আর চাহি না। একটু প্রেম দাও,—সেই প্রেমের কান্না কাঁদিতে কাঁদিতে—"হা প্রাণ-বল্লভ, হা প্রাণ-বল্লভ" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে সাধন পথে অগ্রসর হই। দীনে কি দয়া হবে না,—

হে দয়াময়! "যাবে কি জীবন আমার বিফলে চলিয়ে?"

হে প্রাণ বল্লভ! কিন্তু যাহাই ঘটে ঘটুক, যেন তোমাকে না ভুলি। ইহাই প্রার্থনা।

[৬]

"বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি ন সংশয়ঃ।
বিশ্বং গৌর-রসে মগ্নং স্পর্শোঽপি মমনাভবং॥

—:০:—

আমি, আর কত কাল এ দুঃখ সব।
আর কতকাল, সহিব জঞ্জাল, প'ড়ে রব যেন শব॥

বল আর কত সব অপমান?
এ দুর্গতির কবে হবে অবসান?
কবে, আঁধারের মাঝে মেলিয়া নয়ন,
ওরূপ মাধুরী-ছটা নিরখিব!

হ'ল না হ'ল না, কিছুই হ'ল না,
পুরিল না মোর প্রাণের বাসনা,
হৃদয়ে কেবল পাই যে বেদনা,
(আর) দুঃখে কতকাল ডুবিয়ে রহিব।

শবোপরে রাঙ্গাচরণ কমল,
বড় শোভা পায়, শোভে বড় ভাল,
তবে কেন বৃথা হরণ কর কাল,
দেখা দাও দেখি, ওহে শ্রীমাধব॥

সহেনা, সহেনা, আর এ যাতনা,
যাতনার মাঝে ভাব আর বাঁচেনা,
কি লইয়ে তোমার করব উপাসনা,
বলে দাও দেখি শ্রীরাধাবল্লভ॥

কাঁদিতে কাঁদিতে দিন কি যাবে ভবে,
তা'হলে কলঙ্ক নামে পরশিবে,
কলঙ্ক মোচন, হে মধুসূদন
কর, প্রকাশিয়া করুণার লব।

দীন শ্রীরসিক লাল দে।

শুভ-অধিবাস।

(“শ্রীঅদ্বৈত চরিতামৃত” ম্যানস্ক্রিপ্ট হইতে।)

বিশ্ব চিন্তামণি ধাম স্বয়ং বৃন্দাবন।
রতন বেদীর পরে লক্ষ্মী নারায়ণ॥
বৈকুণ্ঠ সম্পদ মর্ত্ত্যে নিত্য শোভমান;
সার্থক নয়ন দোঁহে যে দেখে সমান।
নয়নের অশ্রু নিত্য সেবা বিঘ্ন রোগ;
শ্রীপাদ অর্চ্চনা. বিনা সব কর্ম্ম ভোগ।
হৃদয় রাসমন্দিরে বসায়ে দু'জন,
শ্যাম অঙ্গে দিব শুভ সুসিত চন্দন।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বূল,
সখী সঙ্গে দিব অঙ্গে সুপীত দুকূল।
“প্রাণ নাথ” বলি প্রাণ সঁপি পদতলে;

সুরভি মালতী-মালা দিব শ্যামগলে।
চৌদিকে ছুটিবে চুয়া চন্দনের বাস;
দাসী হয়ে চামর ঢুলাবে এই দাস।
দুঁহ মুখ চন্দ্র শোভা দিবানিশি চাব,
দোঁহারি চরণ সেবি দিব্যসুখ পাব।
"গোবিন্দ গোকুল-চন্দ্র" গোপীসঙ্গে গাব
মরণ সমান দুঃখ, দিলে মোক্ষ পাব।
অদ্বৈত প্রভুর হ'য়ে দাস-অনুদাস;
বৃন্দাবন স্মরি, করি "শুভ-অধিবাস॥"

(১)

জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় শান্তিপুর চাঁদ।
সার্থক তোমারি জল তুলসীর ফাঁদ॥
তোমারি সাধন-বলে,
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে,
হইয়াছে হরিনাম সুধার সম্ভাষ।
শ্রীপদ পঙ্কজে করি শুভ-অধিবাস॥

(২)

তুলসী গঙ্গার জলে করিয়া সাধন,
আনিয়াছ সাঙ্গোপাঙ্গ ব্রহ্ম সনাতন;
তব প্রেম যোগবলে,
স্বর্গের আসন টলে,
'গৌর" রূপে ছাড়ি বিষ্ণু শ্রীবৈকুণ্ঠধাম,
নদীয়ায় অবতীর্ণ বিলাইতে নাম।

(৩)

মহাবিষ্ণু হরিহর ভক্ত অবতার।
ত্রৈলোক্য বিজয় তব হরির হুঙ্কার॥
করিতে কলুষ-ক্ষয়,
বিশ্বে যাতে সুধা বয়,

"নিত্যানন্দ" রূপে আনি ব্রজ বলরামে ;
প্রচারিলে প্রেম সিন্ধু সর্ব্ববিশ্ব ধামে।'

(৪)

গৌরাঙ্গের মুখ্য অঙ্গ তুমিগো গোঁসাই ;
প্রাণের দোসর তাঁর প্রেমের নিতাই।
শ্রীবাস প্রমুখ কত,
ভক্ত পরিকর যত,
সবাই উপাঙ্গ, শক্তি স্বয়ং গদাধর।
বিশ্বে যাঁর কত কোটী প্রেমের কিঙ্কর ॥

(৫)

শান্তিপুরে গঙ্গাতীরে হ'য়ে অধিষ্ঠান।
সুধার সাগরে সবে করাইলে স্নান ॥
হরির হুঙ্কারে কাঁদি,
ব্রজেন্দ্র নন্দনে বাঁধি,
আনিলে ; প্রেমের গুণে আচার্য্য গোঁসাই।
গোলোক-সম্পদ যাতে দেখিল সবাই ॥

(৬)

সর্ব্ব পরিকরে করি নাম-সঙ্কীর্ত্তন,
ভাসালে স্বর্গের সুখে শ্রীবাস অঙ্গন।
তব প্রেমে গৌরহরি,
সন্ন্যাস গ্রহণ করি,

আচণ্ডাল দ্বিজ শূদ্রে দেখি এক প্রাণ।
হরির নামেতে সবে করিলেন ত্রাণ ॥

(৭)

তব প্রেমে পূর্ণ কাম শ্রীশচীনন্দন।
তুমিই এনেছ মর্ত্তে নন্দন কানন॥

প্রেম যোগে প্রাণ রাখি,
দেখে নিত্য তব "আঁখি,"
মদে, শান্তিপুর আর নীলাচল ধাম।
সার্থক তোমার প্রেম "শ্রীঅদ্বৈত" নাম॥

(৮)

অনন্ত তোমার শক্তি অদ্বৈত গোঁসাই।
প্রাণ শক্তি রূপে আছ সর্ব্বজীব ঠাঁই॥
বিতরি ভক্তির রস,
ব্রহ্মাণ্ড করিয়া বশ,
"আচার্য্য" সংজ্ঞায় সিদ্ধ কর সর্ব্ব কাম।
কৃষ্ণের অভিন্ন তেঁই "কমলাক্ষ" নাম॥

(৯)

হৃদয়-আসনে মোর হয়ে "অধিষ্ঠান;"
ভাসাও প্রেমের রসে প্রভু মোর প্রাণ।
প্রাণের সামগ্রী তুমি,
ব্যাপি আছ বিশ্বভূমি,
পরাণ বুঝেনা, করি বৃথা আড়ম্বর।
চরিতার্থ কর দিয়া চরণের ভর॥

(১০)

আবাহনে করি পূর্ণ প্রাণ ভরা আশ;
সার্থক করহ প্রভু শুভ-অধিবাস।
"ভক্ত কল্প বনে তুমি,
বিশ্ব চিন্তামণি ভূমি,"
মঙ্গল অদ্বৈত মুঁই এই ভিক্ষা চাই।
কর কৃপা "কাব্যরসে তব গুণ গাই॥"

শ্রীহরি চরণ দে।

সৎপ্রসঙ্গ।

—:•:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চ।—অক্ষরত্বে উন্নীত হইলে যখন উত্তম পুরুষের সহিত অভেদ জ্ঞান হয়, তখনও কি সেব্য সেবক ভাব থাকিতে পারে?

র।—কেন থাকিতে পারিবে না। মন যতদিন দেহের সহিত অভেদ ভাবে থাকে, ততদিন যেমন মনের দ্বারাই দেহের সেবা হয়, আবার দেহের সেবায় মনের সুখ বোধ হয়, সেইরূপ উক্ত অবস্থায় পরমাত্ম সেবা কেবল আত্মানন্দের উচ্ছ্বাস বৃদ্ধি করিবার নামান্তর মাত্র, এই সেবা ভাবযোগে হয়। তরঙ্গের ভিতরে বাহিরে যেমন সমুদ্রের জল, সেইরূপ উত্তম পুরুষের শক্তিতে অক্ষরের ভিতর বাহির পূর্ণ, বায়ুর আলোড়নে তরঙ্গের দ্বারা সমুদ্র বারি আকর্ষিত হইলে যেমন তরঙ্গের উচ্ছ্বাস বৃদ্ধি হয় সেইরূপ ভাবের আলোড়নে উত্তম পুরুষের শক্তি অক্ষরে সঞ্চারিত হইলে অক্ষরের আনন্দোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি হয় মাত্র, কিন্তু এ সকল বহু উচ্চস্তরের কথা, সেই স্তরে উঠিলে আপনা হইতে এই তত্ত্বের ধারণা হয় নচেৎ অবিবাহিত কুমারীকে স্বামী সহবাসের সুখ বুঝাইবার ন্যায় কেবল বাক্যব্যয় সার হয় মাত্র।

চ।—অক্ষর শক্তির কি হ্রাস বৃদ্ধি হয়?

র।—বায়ুর তরঙ্গ সর্ব্বস্থানেই আছে, এবং প্রত্যেক তরঙ্গ অনন্ত বায়ু সমুদ্রের সহিত অভেদ ও তৎশক্তিতে শক্তিমান, কিন্তু একটি তরঙ্গ আলোড়িত হইলে তাহার আকর্ষণে অনন্ত বায়ু সমুদ্র হইতে শক্তি সঞ্চারিত হওয়ায় ঐ তরঙ্গ নিহিত শক্তির যেমন উদ্দীপনা হয়, সেইরূপ ভাবের আলোড়নে অক্ষর নিহিত সচ্চিদানন্দ শক্তির উচ্ছ্বাস হয়, এবং তরঙ্গের উচ্ছ্বসিত বারি যেমন সমুদ্রেই বিলীন হয়, অক্ষরের উচ্ছ্বাসরূপ অর্ঘ্য সেইরূপ উত্তম পুরুষের সেবাতেই নিয়োজিত হয়, যাহা হউক এ সকল উচ্চ তত্ত্ব তুমি এখন বুঝিতে পারিবে না,

অতএব তোমার ধারণার উপযোগী প্রশ্ন কর, অক্ষরত্বে উন্নীত হইবার পক্ষে যে সকল সংশয় আছে তাহারই নিরসন করিয়া লও।

চ।— তুমি বলিতেছ যে, বহির্বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহার করিলে উহা স্বভাব বশে অক্ষরাভিমুখে ধবমান হইবে, ইহা কিরূপে হইতে পারে? লক্ষ্য স্থির না করিলে অলক্ষ্যে ধাবমান হইয়াই বা মন কিরূপে লক্ষ্য সংযুক্ত হইবে?

র।— আবর্জ্জনার দ্বারা লৌহ আবরিত থাকিলে উহাতে চুম্বকের আকর্ষণ কার্য্যকারী হয় না কিন্তু আবর্জ্জনা হইতে মুক্ত হইলে যেমন ঐ লৌহ স্বভাব বশে চুম্বকে সংযুক্ত হয়, সেইরূপ মন বহির্বিষয়ের আবরণ হইতে মুক্ত হইলে স্বভাববশে অক্ষরাভিমুখে ধাবমান হয়, জ্ঞানের দুইটি স্তর আছে, একটি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত সুতরাং বহির্মুখ আর অপরটি আত্মাধিষ্ঠিত সুতরাং অন্তর্ম্মুখ; বহির্ম্মুখ জ্ঞান সীমাবদ্ধ ও অন্তর্ম্মুখ জ্ঞান অসীম, দর্পণে সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হইলে গৃহমধ্যে উহার যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহা সীমাবদ্ধ, কিন্তু উহার বহির্ভাগে সূর্য্যরশ্মি যেমন অসীম, সেইরূপ জ্ঞান স্বরূপিণী চৈতন্যজ্যোতি চিত্তে প্রতিফলিত হইয়া যখন ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া বহির্বিষয়ে প্রতিবিম্বিত হয় তখন উহা সীমাবদ্ধ, কিন্তু চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে যখন মন বিক্ষেপশূন্য হয় তখন সে অতীন্দ্রিয় ভূমিতে উন্নীত ও অক্ষরে সংযুক্ত হইয়া অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী হয় জানিও।

এই অক্ষর জ্ঞান বা চৈতন্য লাভ করিতে হইলে সন্ন্যাসী হইতে হয় বটে কিন্তু সংসার ত্যাগ করিবার প্রয়োজন হয় না, গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন:—

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ। ১৮ অঃ

অর্থাৎ জ্ঞানীগণ কাম্যকর্ম্মের ত্যাগ কেই সন্ন্যাস বলেন। ফলতঃ বিজ্ঞানে অনুভূতির পরে আসক্তির জনক স্বরূপ কাম্যকর্ম্ম ত্যাগ ও গ্লানি যুক্ত "আমি আমার" ভাবটী নষ্ট হয় মাত্র, সাধক তখন শ্রীভগবানকে যন্ত্রী বোধে যন্ত্রভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক প্রারব্ধ ক্ষয় করেন, এরূপ ভাবে চলিলে বহির্বিষয়ের মধ্যেও অন্তর্ম্মুখ জ্ঞান অব্যাহত থাকে ও চৈতন্যানুভূতির ব্যাঘাত হয় না জানিও।

কিন্তু হায়! প্রতিবিম্বিত ও সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত জ্ঞান লইয়াই দেহাত্ম বুদ্ধিতে ভ্রান্ত মানবগণ বহির্ম্মুখ ভাবে সংসারে লিপ্ত থাকে, সুতরাং স্বরূপ ও অসীম আত্মাধিষ্ঠিত জ্ঞানের অনুসন্ধান করিবার আগ্রহ না থাকায় ত্রিতাপের জ্বালা হইতে মুক্ত হইতে পারে না, ভাগ্যবান বিবেকীগণই কেবল বিচারের দ্বারা মনকে বহির্বিষয়ের আসক্তি হইতে প্রত্যাহার করিবার জন্য সাধনা করেন এবং প্রত্যাহৃত হইলেই উহা আবরণ মুক্ত লৌহ খণ্ডের চুম্বকাভিমুখে গতির ন্যায় অক্ষরাভিমুখে ধাবমান হয় ও ক্রমে চুম্বক সহবাসে লৌহের চুম্বকে পরিণত হওয়ার ন্যায় ক্ষর জীবাত্মা অক্ষর ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া শিবত্ব লাভ করে। গীতার শ্রীভগবান বলিয়াছেন ঃ—

আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।

অর্থাৎ মন আত্মাতে সংযুক্ত করিয়া অপর কোন বিষয় চিন্তা করিবে না, আবার ইহার সত্য যে অপর কোন বিষয় চিন্তা না করিলে মন স্বভাবতই আত্মসংস্থ হয়, কেননা আত্মা সর্ব্বদাই মনকে আকর্ষণ করেন বলিয়া তাঁহার অপর নাম "কৃষ্ণ"; মন বহির্বিষয়াসক্তিতে আচ্ছন্ন না থাকিলে কিরূপে ঐ আকর্ষণ কার্য্যকারী হয় তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে কিন্তু অজ্ঞানীর পক্ষে চিন্তাশূন্য হওয়া অসম্ভব; কোন রূপে সম্ভব হইলেও আত্মাকে জানিবার অভাবে তাহার মন আত্মসংস্থ হইতে পারে না, অতএব অজ্ঞানীর কথা দূরে থাকুক যাহার জ্ঞান হইয়াছে সে আরও অগ্রসর হইয়া যতক্ষণ না বিজ্ঞানে আত্মাকে অনুভব করিতে পারে ততক্ষণ বহির্বিষয় চিন্তার প্রতিঘাত হইতে তাহার নিস্তার নাই জানিও, জ্ঞানের পরিপক্কাবস্থায় নশ্বর পদার্থকে মিথ্যা ও চৈতন্যকেই সত্য বলিয়া ধারণা হইলে মন বিজ্ঞানের অধিকারে প্রবিষ্ট হইয়া যখন চৈতন্যানুভব করিতে সক্ষম হয় তখন ঐ অনুভূতিকে স্থায়ী করিবার জন্য অভ্যাসের দ্বারা মনস্থির পূর্ব্বক ধ্যান যোগে আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা আবশ্যক, অতএব প্রথমতঃ জ্ঞান লাভ করিয়া পরে বিজ্ঞানের দ্বারা অনুভূতি হইলে তবে ভক্তি সংযুক্ত ধ্যান যোগে প্রত্যক্ষ করা সহজ হয় জানিও। অনুভূতি হইলে প্রথম তিনভূমি (ভূ, ভুব, স্ব) অতিক্রম পূর্ব্বক ক্রম-মুক্তির অবস্থা লাভ হয় কিন্তু শ্রীভগবানকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে সাধক সপ্তম ভূমি অতিক্রম পূর্ব্বক পরমপদ লাভ করিতে সক্ষম হন জানিও।

চ।— জ্ঞানের ভাব অনেকটা বুঝিয়াছি, কিন্তু বিজ্ঞানে যে অনুভূতি হয় তাহা কোন্ প্রমাণের দ্বারা বুঝা যায়?

র।— সমুদ্র-বারির প্রতি পরমাণুতে যে লবণ আছে তাহা জানার নাম জ্ঞান ও আস্বাদের দ্বারা ঐ লবণের অস্তিত্ব অনুভব করার নাম বিজ্ঞান, ফলতঃ জ্ঞান লাভের পরে চিচ্ছক্তির সর্ব্ব ব্যাপিত্ব বোধ হইলে সেই শক্তিকেই নিয়ামক জানিয়া যখন সাধকের অহঙ্কার রূপ কুম্ভ শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ ভাব সাগরে নিমজ্জিত হয়, তখন সাধক কার্য্য কারণের সম্বন্ধ দৃষ্টে চৈতন্য-রসের আস্বাদ অনুভব করেন, এই অনুভূতির ফল স্বরূপ হৃদয়ে যে নির্ভরতা, আনন্দ ও শান্তির উদয় হয় তাহা অপার্থিব ও অনির্ব্বচনীয়, সাধক কেবল নিজেই তাহা বোধ করিতে পারেন মাত্র, এবং এই বোধকরাকেই চৈতন্যানুভূতির প্রমাণ বলিয়া জানিও।

ক্রমশঃ—

শ্রীহরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

চরিত্র শ্রীহরিব্যাসজী।

—:০:—

শ্রীভক্তমাল গ্রন্থের বর্ণিত চরিত্র সকলে আমরা অল্প কি অধিক অলৌকিকত্ব মিশ্রিত দেখিতে পাই। এই আলৌকিকত্ব বা ঐশ্বর্য্যের রঙ্ না থাকিলে পাঠকের চিত্ত এত মুগ্ধ হইত না এবং ভক্ত হওয়ার পিপাসাও লোকের প্রাণে জাগিতনা। সুতরাং এই শ্রীগ্রন্থ ঐশ্বর্য্যলবণ মিশ্রিত হইলেও সুধাসিন্ধু। তা কেন, যিনি পাঠ করেন, তাহা তিনিই অনুভব করেন। বিশেষতঃ শ্রীভক্তমালে যে দোষারোপ হইল, উহা আপাত দৃষ্টিতে; মূলে এই সুধাসিন্ধুতে বিশুদ্ধ অনুরাগেরই খর প্রবাহ। নচেৎ এই শ্রীগ্রন্থের প্রাণ মাতান, মন গলান শক্তি থাকিতনা। অল্প কথায় তাহার প্রমাণ করিব।—ভক্তমালের অমৃতোজ্জ্বল ভক্তমণিগণ সকলেই অনুরাগী; তাঁহারা ভগবৎসেবা ভিন্ন অন্য কিছু

জানিতেন না। তাঁহাদের অচলা নির্ম্মলা রাগময়ী ভক্তির জোরেই তাহাদের যে সব আলৌকিকী শক্তির সঞ্চার ও প্রকাশ হইয়া ছিল, তাহা অনুরাগেরই আনুষঙ্গিক ফল। সে সব ভক্তবৃন্দ ঐশ্বর্য্যের উপাসনা করেন নাই, রাগের ফলে আপনা আপনি ঐশ্বর্য্য তাঁহাদের সেবায় আসিয়াছে। ভক্তমাল রচয়িতা সে সকল বর্ণন না করিয়া পারেন নাই; কারণ, সে সব ভক্তের মহিমা, ভক্তির মহিমা,—ভক্তির অযাচিত ফল।

"মা-পূজায় আমরা দুটি ভাব গ্রহণ করিতে পারি" ঃ—

১। শক্তি-পূজা। "শক্তিমানে" বাদ দিয়া শক্তি-পূজা লক্ষ্য ভ্রষ্ট জীবের নিষ্ফল আড়ম্বর মাত্র।

২। শ্রীভগবানের মাতৃভাবে অর্চ্চনা। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু এই মাতৃভাবের সিদ্ধ অমৃতত্ব নাট্যাভিনয়ে সুন্দর ফলিত দেখাইয়াছিলেন। এই মাতৃ ভাবের তুলনা নাই,—উহা কহিবার নয়!

এখন, কোন বৈষ্ণব যদি শক্তি-পূজায় দোষারোপ করেন, তাহাতে বিজ্ঞ-জন বুঝিবেন যে তদ্দ্বারা শক্তিতে (মায়ের প্রতি) দোষারোপ হয়না, কেবল রাজসিক, ততোধিক তামসিক, পূজায় দোষারোপ করা হয়। সত্ত্বময়ী, চিণ্ময়ী মাকে বাদ দিলে কিছুই থাকেনা, সকলেই স্বীকার করেন। মলিন ভজনেরই নিন্দা, মায়ের নিন্দা হয়না, মায়ের পূজা বন্ধ হয়না। মা বিনা লীলা হয়না, ভজন পদ্ধতি থাকেনা। মায়ের কৃপাবিনা ভক্ত নিজ-প্রাণ বল্লভকে যে পাইতে পারেনা তাহাই এই শ্রীহরিব্যাসজীর চরিত্রে প্রমাণিত হইবে।

হিন্দুর ছেলেদের মধ্যে একটা রোগ তাহারা ধর্ম্মশাস্ত্র অদবে পড়ে না, কিন্তু অবসর মতে দু'চার জন একত্র হইলেই তাহাদের মধ্যে আমোদচ্ছলেও ধর্ম্ম-কথা কখন কখন উঠে। তখন যার বুদ্ধিতে যা যোগায়, সে তাহাই বলে। শাস্ত্রের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। শাস্ত্রে সকল সিদ্ধান্ত থাকিতেও নিজ কপোল-কল্পিত ভ্রান্ত যুক্তি দ্বারা একপক্ষ অপর পক্ষকে পরাস্ত করিতে চেষ্টা করিয়া কতকক্ষণ সকলে হাবুডুবু খায় মাত্র। তর্কযুদ্ধের সিদ্ধান্ততো ভস্ম!—এই হইল তাহাদের ধর্ম্মচর্চ্চা। উচ্ছৃঙ্খল বালকবৃন্দ নিজবুদ্ধির বাহাবা দিয়া অহঙ্কারে মজে। যাহারা শাস্ত্র মানেনা, তাহারা গুরুও মানে না। এই চাপল্যবৃত্তি হই-তেই গুরুকরণ বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। বিলোপের অন্য হেতু এই :—

আগে ঠাকুরাণী রাঁধিতেন, চাকরাণী যোগাইতেন; ইদানীং বিপরীত, এখন চাকরাণী রাঁধেন, ঠাকুরাণী যোগাড় দেন। আগে শিষ্য হইবার জন্য কেহ খুজিয়া গুরু পাইতেন বা না পাইতেন; এখন গুরু নিজে শিষ্য যোগাড়ের জন্য বেড়ান, সেই জন্য ভাগ্যেও দু একটি জুটে। আবার বহু জুটিলেও সব শিষ্য নয়। গুরু যে স্বয়ং উপনীত হন, যথার্থ তাহা তত্ত্ব বটে, সে যথার্থ গুরুর কথা; তাহা সর্ব্বকালেই সত্য; কিন্তু এখন গুরু গুরুত্ব বহন করিতে ক্লিষ্ট হন। এ দুর্দ্দশার হেতু অপর কিছু নয়, কেবল আলস্য, অর্থলিপ্সা ও বিলাসিতা। গুরু লঘু হইয়া পড়িয়াছেন। তাহাতেই গুরুপ্রণালী বিলুপ্ত প্রায়। যাহা হউক, দীক্ষা শিক্ষা ভিন্ন জীবের উত্তমগতি অসম্ভব। জগদ্‌গুরু শ্রীগৌরাঙ্গ নিজে মন্ত্রদীক্ষা ও নামদীক্ষা নিয়াছেন। গয়ার দীক্ষায় প্রভুর পূর্ব্বরাগ, সন্ন্যাস দীক্ষায় বস্ত্র-হরণ লীলা প্রকটিত হইয়াছে। সন্ন্যাস ও বস্ত্রহরণ এক কথাই। লোকশিক্ষার জন্য প্রভু নিজে দীক্ষিত হইয়াছেন। এই আলোচ্য চরিতেও দীক্ষার সারবত্তা সুন্দর প্রতিপন্ন হইবে।

সর্ব্বজ্ঞ নিস্পৃহ জিতেন্দ্রিয় ভক্তরাজ শ্রীহরিব্যাসজী একদা ভ্রমণ ব্যপদেশে চটকবান গ্রামের (চট্টগ্রামও হইতে পারে) এক উদ্যানে আশ্রয় লইলেন। উদ্যান মধ্যে মহাদেবীর মন্দির ছিল। মায়ের পূজা হইতেছে, সম্মুখে ছাগ-বলি সাধুকে দেখিতে হইল। তিনি চমকিত হইলেন; তিনি দয়াময় বৈষ্ণব, জীবহিংসা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ বড়ই ব্যথিত হইল। রুষ্ট হইয়া সাধু মাকে বলিলেন, "মা! তোমাকে কি জগন্মাতা বলিব? তুমি কাহাকেও কৃপা কর, আবার কাহারও বা মুণ্ড কাটিয়া রক্তপান কর। ইতরের মত তোমার এই নিন্দিত নিষ্ঠুর কর্ম্ম দেখিয়া আমি নিতান্তই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছি।" দেবী লজ্জিতা হইলেন এবং উপবাসী ভক্তের হৃদয়বেদনা দ্বারা নিজে মর্ম্মাহত হইয়া এক মানবকন্যার বেশে রন্ধনের নানা সামগ্রী হস্তে তাঁহার সমক্ষে প্রকট হইলেন। করযোড়ে কহিলেন, "মহাশয়, আপনি দয়া করিয়া আমাকে কৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা দিয়া আপনার এই আশ্রিতার বাঞ্ছা পূর্ণ করুন।" সাধু কন্যার বাক্যে তুষ্ট হইয়া তাঁহার সকল প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। ভগবান্ চিরদিনই ভক্তের মান বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। আজ জগন্মাতা নিজে দীক্ষিতা হইয়া দীক্ষার মহিমা ও আবশ্যকতা জীবে প্রচার করিলেন।

রাত্রিতে দেবী গ্রামে প্রবেশ করিয়া হুহুঙ্কার রবে লোকের উপর উপদ্রব আরম্ভ করিলে, তাহারা ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া দেবীকে বলিলেন, "তুমি কে, আমাদিগকে রক্ষা কর।" দেবী বলিলেন, "আমি বালিকা, উদ্যানে যে সাধু আছেন, প্রাতে সকলে তথায় যাইয়া সেই সাধুর চরণে কৃপাভিক্ষা মাগ এবং কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হও, নচেৎ আমার হস্তে এখনই তোমাদের প্রাণ যাইবে।" মায়ের বাক্যে সকলে বলিলেন, "মা, মা, রক্ষা কর, রক্ষা কর তোমার যা আজ্ঞা তাহাই করিব, মারিওনা। আমরা প্রাতেই যাইয়া সাধুর চরণে নিপতিত হইব। মা, তোমার মঙ্গলময়ী ইচ্ছা কভু নিস্ফলা নয়, কভু অসম্পাদিতও থাকেনা। তোমার ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর।" মা বলিলেন, "তবে যাও, আমি যাঁর চরণের দাসী হইয়াছি, যাঁর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি তাঁর নিকট দীক্ষা গ্রহণে তোমাদের আপত্তি থাকিবেনা। অদ্যাবধি সবে জীবহিংসায় বিরত হও; ইহাই সাধুর ইচ্ছা, জীবহিংসায় সাধুর বড় দুঃখ। সাধুর সুখ-সম্পাদনে তোমরাও ইহপর কালে সুখী হইবে।" এদিকে বালিকা রূপিণী মাতা সাধুকে আসিয়া অতি বিনীতভাবে বলিলেন "শ্রীপাদ্ প্রভো! আপনার চরণে আমার অপরাধ হইয়াছিল, আপনার চিত্তে দুঃখ দিয়াছিলাম। সেই অপরাধ ক্ষমা করুন। অদ্যাবধি আর এখানে জীবহিংসা দেখিবেন না। কাল গ্রামবাসী সব আপনার চরণে পড়িয়া কাঁদিবে এবং বৈষ্ণব হইবে। আমাকে যেমন দাসী বানাইয়াছেন, তাহাদেরও সেইরূপ কৃপা করিবেন।"

সর্ব্বজ্ঞ শ্রীহরিব্যাসজী দেবীর লীলা বুঝিলেন। এবং পরমানন্দে দেবীকে লইয়া কৃষ্ণ কথায় নিশা যাপন করিলেন। প্রাতে সাধুর পাদপদ্ম গ্রামবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে ভ্রমর দলের ন্যায় ঘেরিয়া ফেলিল। বহু আর্ত্তি কাকুতিরপর দীক্ষার হুলুস্থুলু পড়িয়া গেল। এস্থলে আমরা উপদেশ পাই যে, ঈশ্বরাদিষ্ট ভক্তই গুরুগিরির অধিকারী, আর যে সে লোকের গুরুগিরি বিড়ম্বনা মাত্র, এবং জগতের ঘোর অনিষ্টকর। মায়ের আজ্ঞায় সাধু শিষ্য করিলেন, ইহাতে শিষ্যের মঙ্গলই হইবে। মায়ের আজ্ঞায় গুরু শিষ্যোদ্ধারে অধিকতর শক্তিশালী হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

দেবী জগদম্বা স্বয়ং কৃষ্ণমন্ত্রের মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিলেন এবং তামসিক ও রাজসিক পুজোপাসনার হীনত্ব সপ্রমাণ করিয়া দিলেন এবং সত্ত্ব

প্রধান বা নিগুর্ণ ভজন-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

চটকগ্রামীদের এই দীক্ষা উপলক্ষে বিরাট মহোৎসব সম্পাদিত হইয়াছিল, সর্ব্বত্র কৃষ্ণনামের সুধাতরঙ্গে নাচিয়া উঠিয়াছিল। আমাদের চিত্তেও চটকগ্রামের একজন হইতাম ইত্যাদি লোভ জন্মিল, এবং না পারিয়া ক্ষোভ রহিল।

শ্রীকালীহর দাস বসু।

পান্থ।

—:০:—

চাতক চাহিছে নব জলধর-জল,
মধু আশে মত্ত হ'য়ে ছুটে অলিদল।
কুলু কুলু রবে নদী নাচিয়া নাচিয়া,
সাগর সঙ্গম চাহে হিল্লোল তুলিয়া।
দারিদ্র পীড়িত দীন কত আশাকরি,
ধন জাত সুখ চায় দুই কর যুড়ি।
অনিদ্রা পীড়িত ধনী ধন বিনিময়ে,
চাহিতেছে সুখ নিদ্রা দীন যা' ভুঞ্জয়ে।
পথ শ্রান্ত পান্থ আমি কিবা বস্তু চাই,
দৃষ্টি হারা, আত্মহারা যথা তথা ধাই?
তৃষিত দর্শন মোর হেরিয়ে কাহারে,
পেয়েছি পেয়েছি কহি, যায় ধরিবারে?
ক্লান্ত পদ, শ্রান্ত তনু চলিতে না পারি,
কেমনে তাঁহারে পাব যাঁর তরে ঝরি?

শ্রীনীলাল চন্দ্র।

শ্রীলরায় রামানন্দ।

—— ঃঃ ——

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

পরদিন দিবাবসানে সন্ধ্যা সমাগত প্রায় ; এমন সময় শ্রীমন্ রামানন্দ রায় আসিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের শ্রীপাদ পদ্মে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। প্রভু সস্নেহে রামানন্দের হস্ত ধারণ করিয়া উঠাইলেন এবং নিজপার্শ্বে বসাইয়া বলিতে লাগিলেন। দেখ রায়! তোমার শ্রীমুখ-বিনিসৃত পবিত্র স্বধর্ম্মাখ্যান শ্রবনে যারপর নাই সুখী হইয়াছি। ভাষা প্রাঞ্জল, এবং সহজেই সাধারনের বোধগম্য হয়। ধরাতলে সাধন-তত্ত্ব প্রচারের জন্যই তোমার জন্ম, তোমায় আমায় অভেদাত্মা। আজ তোমার সঙ্গ লাভ করিয়া আমি ধন্য হইলাম। হে ভক্ত চূড়ামণে! অবশিষ্ট সপ্তপ্রকার সাধন প্রণালী আমার নিকট ক্রমে ক্রমে বর্ণন কর।

হাসি হাসি মুখে চাহি রামানন্দ পানে।
কহিতে লাগিলেন প্রভু অমিয় বচনে॥

কহ কহ রামানন্দ সাধ্যের ব্যাখ্যান।
পর পর আর যাহা আছয়ে বিধান॥

তব কণ্ঠ-নিঃসৃত বাণি অমৃতের ধারা।
শ্রবনে কৌতুক বাড়ে হই আত্মহারা॥

প্রভু-প্রমুখাৎ স্বীয়-প্রশংসাবাদ শুনিয়া, পরম ভাগবত রামানন্দ মস্তক অবনত করিলেন এবং বিনীত ভাবে বলিতে লাগিলেন, হে ভক্তাধীন ভগবন্! এতো তোমারই খেলা; গুরুর আজ্ঞাপালন করা তো সর্ব্বোত ভাবেই কর্ত্তব্য, তোমার আদেশ পালন করিবার নিমিত্ত যথা সাধ্য স্বধর্ম্ম আচার বর্ণন করিলাম। ইহাতে আমার কোন পাণ্ডিত্য বা কৃতিত্ব নাই ; তবে দীনের প্রতি যে প্রশংসাবাদ এ সকলের দ্বারা কেবল দাসের প্রতি ভবদীয় করুণাই প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রভো! আমি জীব ক্ষুদ্র বুদ্ধি সহজে অস্থির।
ঈশ্বরের লীলা কোটি সমুদ্র গম্ভীর॥
তুমি সেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ জান নিজ-কর্ম্ম।
যারে জানাও সেই জানে তোমার লীলা-মর্ম্ম॥
অগাধ ঈশ্বর তত্ত্ব কিছুই নাহি জানি।
তুমি যা কহাবে মোরে তাই কব আমি॥

দ্বিতীয় পন্থা অর্পণ॥

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥ গীতা। ৯।২৭

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, হে সখে! তুমি যাহা যাহা করিবে অর্থাৎ যাহা আহার করিবে, যাহা হোম করিবে, ও যাহা দান করিবে, এমন কি তপস্যা প্রভৃতি যে সমস্ত কর্ম্ম করিবে, সেই সকল কার্য্যই ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া, অহঙ্কার শূন্য হইয়া প্রীতি পূর্ব্বক আমার (কৃষ্ণের) প্রতি অর্পণ করিবে।

তপস্যা জপ ও আত্মার প্রিয় যে সকল সদাচার এবং স্ত্রী, গৃহ এমন কি পুত্র, প্রাণাদিকে ও শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে একান্ত মনে অর্পণ করিবে। কেবল যে বিধি বিহিত কর্ম্মদ্বারাই অর্পণ করিতে হইবে, এরূপ নহে; স্বভাবানুসারে লৌকিক ও শরীর, বাক্য, মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা যাহা যাহা করিবে, তৎ সমুদায়ই পরমেশ্বর নারায়ণে সমর্পণ করিবে ইহাকেই প্রকৃত অর্পণ বলিয়া কথিতহইয়া থাকে।

তৃতীয় সোপান স্বধর্ম্মত্যাগ॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ গীতা। ১৮।৬৬

অর্জ্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, হে সখে অর্জ্জুন! তুমি বৃথা শোক করিওনা। সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র আমার (ভগবানের) শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে রক্ষা করিব, তোমার কোন চিন্তা নাই।

অজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥ ভাঃ ১১।১১।৩২

শ্রীভগবান বলিয়াছেন;—আমাকর্ত্তৃক ধর্ম্ম শাস্ত্রে যে সকল বিধি ব্যবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার দোষ গুণ বিচার করত, তৎ সমস্ত ও পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি কেবল আমারই ভজনা করে, তিনিই উত্তম সাধক।

কিন্তু প্রভো! ত্যাগ মনেকরিলেই কি সকলে করিতে পারে। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করা সহজ কথা নহে; তাহাতে বিশেষ শক্তির আবশ্যক, এবং ভগবানের কৃপা সাপেক্ষ। কেমন করিয়া শ্রীভগবানের জন্য সকল ত্যাগ করিতে হয়। তাই জীবকে দেখাইবার জন্য, আদর্শ রূপে, শ্রীশ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র শচীদুলাল স্বয়ং বৃদ্ধা জননী ও প্রণাধিকা বিষ্ণুপ্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া কঠোর সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ সন্ন্যাসীর বেশে পুরীক্ষেত্রে উপস্থিত। দয়াময় শুধু মুখের কথায় ত্যাগ হয়না; বহু সাধন বলে ত্যাগ শক্তিকে লাভ করা যায়; সাধন চাই, কঠোর সাধন চাই, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আপনার (ভগবৎ) কৃপার উপযুক্ত হওয়া চাই।

চতুর্থ ভক্তি মার্গ॥

ভক্তিঃ সা প্রকৃতির্নিত্যা ব্রহ্মসম্পৎ প্রকাশিতা।
শিববিষ্ণুব্রহ্মরূপা বেদাদ্যানাং বরাপি বা॥ কল্কিপুঃ। ৩।১১।৪৪

ব্রহ্মসম্পৎস্বরূপা যে নিত্যা প্রকৃতি, তিনিই ভক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন; এই ভক্তিই বেদাদির মধ্যে বরিষ্ঠা, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব স্বরূপা।

দৃঢ়া জনার্দ্দনে ভক্তির্যদৈবাব্যভিচারিণী।
তদা কিয়ৎ স্বর্গসুখং সৈব নির্ব্বাণহেতুকী॥ গরুড়পুঃ ১।২১৯।২২

যখন এই অব্যভিচারিণী ভগবদ্ভক্তি মানবের অন্তঃকরণে দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হয়, তখন তাঁহার পক্ষে স্বর্গ সুখ ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। এবং তিনি সেই সুদৃঢ় হরিভক্তি দ্বারাই নির্ব্বাণ পদ লাভ করিতে পারেন।

ধর্ম্মার্থকামঃ কিন্তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
সমস্তজগতাং মূলে যস্য ভক্তি স্থিরা হরৌ॥ গরুড় পুঃ। ১।২১৯।৩০

সমুদায় জগতের মূল স্বরূপ ভগবান হরিতে যাঁহার স্থিরতর ভক্তি হয় তাহার ধর্ম্ম, অর্থ, ও কামে কোন প্রয়োজন থাকেনা; কারণ তাহার করতলে সর্ব্বদা মুক্তি বিরাজমান থাকে।

কিন্তু প্রভো! ভক্তি প্রাকৃতিক গুণ ভেদে তিন প্রকার; তামসী ভক্তি, রাজসী ভক্তি, এবং সাত্বিক ভক্তি; যথা—

অভিসন্ধায় যদ্ধিংসাং দম্ভংমাংসর্য্যমেব বা।
সংরম্ভী ভিন্ন দৃগ্‌ভাবং ময়ি কুর্য্যাং স তামসঃ॥ ভাগ। ৩।২৯।৭

যে ব্যক্তি হিংসা, গর্ব্ব ও মাৎসর্য্যের বশবর্ত্তী এবং ভেদদর্শী হইয়া জীব ও আমায় ভিন্ন ভাবে দর্শন করিয়া আমায় পূজা করে তাহাকে তামসী ভক্তি বলে।

বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা।
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদ্‌ যোমাং পৃথগ্‌ভাবঃ স রাজসঃ॥ ভাগ। ৩।২৯।৮

পুত্র কলত্র, ধন, জনাদি, বিষয় ঐশ্বর্য্য এবং যশঃ কামনা করিয়া প্রতিমাদিতে যে আমায় অর্চ্চনা করে, তাহাকে রাজসী ভক্তি বলে।

কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্‌ বা তদর্পণং।
যজেদ্‌যষ্টব্যমিতি বা পৃথ্‌গ্‌ ভাবঃ স সাত্বিকঃ॥ ভাগ। ৩।২৯।৯

পাপক্ষয় ও ভগবানে কর্ম্ম সমর্পণের উদ্দেশে "অথবা যাগ যজ্ঞাদি অবশ্য কর্ত্তব্য" এই মনস্থ করিয়া যে মানব ভেদ-দর্শন-পূর্ব্বক আমার পূজাদি করে, তাহার নাম সাত্বিকী ভক্তি॥

ভক্তি ফল রূপত্যাং—

সকল সাধন মার্গ অপেক্ষা ভক্তি পথ প্রধান, কারণ উহা আশু ফলপ্রদ। কর্ম্ম এবং যোগ, ভক্তিপ্রদানে অক্ষম; তবে কর্ম্ম ও যোগ দ্বারা মনের মালিন্য দূর করিতে পারা যায়। চিত্ত শুদ্ধ বা নিরুদ্ধ হইলে জ্ঞানের উদয় হয়। ভগবৎ কৃপা না হইলে কেবল জ্ঞানে কিছুই ফলোদয় হয় না। ভগবৎ কৃপাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেই কৃপা বলে ভক্তির উন্মেষ হয়, এই জন্য ভক্তি সকলের ফলস্বরূপা।

শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তি জন্মিলে, স্বভাবতই ইন্দ্রিয় বৃত্তি সকল শান্ত হইয়া আইসে; চিত্ত পরিশুদ্ধ হইলে, তখন প্রিয়াপ্রিয় বৈষম্য ভাব থাকেনা। তখন ভক্ত আপনার আত্মাতে সর্ব্বব্যাপি আত্মাকে দর্শন করে; সঙ্গ রহিত, হেয় উপাদেয় বর্জ্জিত সর্ব্বত্র সমদর্শী হয়; আর "আমিই" পরমানন্দ স্বরূপ এই জ্ঞান লাভ করত ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন॥

ক্রমশঃ—

শ্রীমতিলাল চক্রবর্ত্তী।

অভিষেক মহোৎসব।

——:◦:——

মহামহিমান্বিত সম্রাট ও সম্রাটমহিষীর উদ্দেশে দীন কবির ক্ষীণ ভাবোচ্ছ্বাসময়ী প্রীতি-অঞ্জলি।

আজি বড় শুভদিন। আসমুদ্র-হিমালয় ভারতবর্ষের একছত্র সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ এবং রাজ রাজেশ্বরী মেরী ভারতে পদার্পণ করিয়াছেন। আজ এই পুণ্যভূমি ভারতের প্রাচীন নগরী ইন্দ্রপ্রস্থে ব্রিটীশ রাজ রাজেশ্বরের অভিষেকোৎসব। তখন কার ইন্দ্রপ্রস্থ, এখনকার দিল্লী। এই ইন্দ্রপ্রস্থে কত নরাধিপের অভিষেক দরবার হইয়াগিয়াছে, কিন্তু রাজ চক্রবর্ত্তী সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের অভিষেক দরবার আজ বিপুল আনন্দবহ, ইতিহাসে ইহা অভূত পূর্ব্ব ঘটনা, ইহা সম্পূর্ণ বৈচিত্র্য পূর্ণ।

এই মহা মহোৎসব উপলক্ষে আজ দশ দিক আনন্দে মুখরিত,—নবীন আলোকে সর্ব্বস্থান সমুজ্জ্বল। কেনই বা না হইবে? ভারতের প্রজামণ্ডলী চির রাজভক্ত; তাহারা, রাজাকে নররূপে দেবতা বলিয়া মনে করে।

"ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্"।

"মহতী দেবতাহ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি"।

ইহা ভারতীয় শাস্ত্রের উক্তি। বিধাতা, সমুদয় চরাচরের রক্ষার জন্য ইন্দ্রাদি অষ্টদিক্‌পালের সারাংশে রাজার সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা হিন্দু সংহিতাকার মনুর বাক্য। তাই, চির রাজভক্ত ভারতের অধিবাসী প্রজা অভিষেক আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। সাধ্যানুসারে, সকলেই আজি এই অভিনব আনন্দে যোগ দান করিয়াছে। ভারতের পক্ষে, তাই বলি, আজ মহা আনন্দের দিন। এই শুভদিনে, আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ব্যক্তি হইলেও, একত্র সমবেত হইয়া আমাদের হৃদ্গত আনন্দ প্রবাহের ক্ষীণ অভিব্যক্তি করিতে অগ্রসর। এস ভাই, সকলে মিলিয়া, সমস্বরে সার্ব্বভৌম সম্রাটের মঙ্গল আরতি গান করিয়া ধন্য হই,—

"শ্রীমন্মহারাজ রাজরাজ অধিরাজ!
স্বাগত ভারত মাঝ অভিষেক দিনে॥

প্রতাপ-দৃপ্ত সপ্ত বারিধি,
কল কল্লোলে ঘোষে নিরবধি,
তোমার প্রবল প্রতাপ গৰ্ব্ব,
খৰ্ব্বিত করি অরাতিগণে॥

কীৰ্ত্তি কাহিনী কীৰ্ত্তন রত,
চির সুশাসন সুখ বিমোহিত,
অগণিত দেশে উঠিছে নিয়ত,
তব জয় রব গগনে গগনে॥

অস্ত হীন তপন কিরণ,
পুলকিত করে কোটী কোটী জন,—
আলোকিত তব বিজয় কেতন,
তরুণ-অরুণ-বরণ রঞ্জনে॥

(সুঃ সঃ।)

এস ভাই, সমকণ্ঠে বলি—"জয় ভারতেশ্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের জয়. জয় ভারতেশ্বরী সাম্রাজ্ঞী মেরির জয়"।

অভিষেক-গীতিকা।

কি আনন্দ আজ এ ভারত ভূমে,—
দুঃখিনী জননী হাসিল রে।
বালার্কের ফোঁটা, ঊষারাণী ভালে,—
মধুর উজ্জ্বলে শোভিল রে॥

কেন এ বিপুল পুলক-উচ্ছ্বাস,—
প্রেমের প্রবাহ বহিল রে।
দুঃখিনী জননী, কিসের লাগিয়ে,
মহানন্দে আজি মাতিল রে॥

বুঝেছি, জেনেছি, বহু গুণান্বিত,—
(হেথা) ভারত-ঈশ্বর এসেছে রে।
(তাই) সম্রাটের জয়, হইয়ে নির্ভয়,
এক তানে সবে ঘুষিছে রে॥

শুধু একা নহে, সঙ্গেতে সঙ্গিনী
"মেরী" মহারাণী শোভিছে রে।
(যেন) রাম, সীতা-সনে, মধুর মিলনে,—
কিবা শোভা পরকাশিছে রে॥

হে ভারতবাসী, এস হাসি' হাসি',
এস এক প্রাণ হইয়ে রে।
দুঃখ, তাপ ভুলি সকলেতে মিলি,—
প্রেমানন্দে যাই ভাসিয়ে রে॥

বলি একতানে, এক মন-প্রাণে,
ভারতাধিপতির জয় রে।
গাহি জয়'গান মহারাণী মা'র;
শোক, তাপ হউক্ লয় রে॥

এস সবে মিলে, আজি কুতুহলে,
ভকতি-চন্দন লইয়ে রে।

ষোড়শোপ চারে, দিব প্রীতিভরে,—
শ্রীপদ-কমলে ঢালিয়ে রে ॥

ভাবের উদ্যানে, তুলিয়ে যতনে,—
প্রেম ফুলহার গাঁথিয়া রে ;
সুখে অরপিব উভয়ের পদে,—
বিপুল পুলকে মাতিয়া রে ॥

যত নর নারী, সবে সারি সারি,
বালক বালিকা মিলিয়া রে।
এস শুভক্ষণে, সুমধুর স্বনে,—
"জয় জর্জ্জ মেরি" বলিয়া রে ॥

জলদ নির্ঘোষে কর জয় জয়,
উভয়েরি জয় ঘোষণা রে।
প্রজাহিত ব্রত, হোক্ ভূপতির,—
বিভু কাছে কর কামনা রে ॥

দীন—"ভক্তি সম্পাদক"।

আনন্দ গীতিকা।

—:০:—

(সম্রাটের অভিষেক উপলক্ষে)

[বাঁকুড়া সোণামুখী উচ্চইংরাজি বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণ কর্তৃক গীত]

(আজি) কি শোভা হেরি ভারত ভুবনে।
মরি একি শোভা, অতি মনোলোভা, নব আলোপ্রভা
আসে জীবনে ॥
আজি, উজ্জ্বল মধুর কি প্রীতি—মিলন,

সম্রাটের সাথে সাম্রাজ্ঞী ভূষণ ;
আশে পাশে কত রাজা সুশোভন
দিল্লী আজ ফুল্ল নব আয়োজনে ॥
রাজ ভক্ত প্রজা ভারত বাসীর
ভকতি অতুল, প্রেম সুগভীর,
কি হিন্দু খৃষ্টান, কিম্বা মুসলমান,
এস সবে ভাই জনাই সুদিনে ॥
হেন শুভদিন আর কি হইবে ?
এস কুতুহলে, এস ভাই সবে,
"জয় সম্রাটের," "জয় রাণী"রবে
মুখরিত করি ভারত গগনে ॥
সকলেতে হ'য়ে পুলকিত মন,
দ্রব্যের সম্ভার, পূজা আয়োজন,
ল'য়ে প্রীতি পুষ্প, ভকতি চন্দন,
চল যাই ভাই রাজার সদনে ॥
মঙ্গল নিদান বিশ্ব-অধিপতি —
বিভুর সমীপে, করিব মিনতি—
"রাজা রাণী মার সৌভাগ্য উন্নতি,
হোক্ সদা কীর্ত্তি প্রজার পালনে ॥"

দীন—ভক্তি সম্পাদক।

আমি কিছুনয়।

—:০:—

"আমি আমি আমার আমার" "আমি"র দেখা নাই, কিন্তু "আমার আমার"। বহুবিধ পার্থিব পদার্থে অধিকার আমার, আমার আনন্দের অভাব কি ? আমি "আমির" দোলায় উঠিয়াছি, দুলিতে দুলিতে, দিনরাত কেবল "আমি আমি

আমার আমার" ডাক্ ছাড়িতেছি। "আমি" দোলার দুলনে আনন্দ কত? মন আর নামিয়া নীচেরদিকে তাকাইতে চায়না।

চতুর্দিক "আমি" পূর্ণ, যেদিকে চাই; সেই দিকেই দেখি সকলেই "আমির" দোলায় উঠিয়া "আমি আমি আমার আমার" শব্দে উন্মত্ত হইতেছে। জীবদেহে যেন "আমি" মাখা হইয়া রহিয়াছে, হস্ত পদাদি বিশিষ্ট জীবদেহ একেবারে আমি হইয়া গিয়াছে। "আমি কি একা আমি? জগৎ ময় "আমি" ছড়াইয়া রহিয়াছে। হায়! "আমি" তোমাকেত একদিনও দেখিতে পাইলামনা। আমার দেখিতে, কতলোক "আমি আমি আমার আমার" করিয়া চলিয়া গেল, কৈ? তাহাদের চিহ্নমাত্রও ত পুনর্ব্বার দেখিলাম না। তাই দেখিয়া ভাবিলাম "আমি" কিছুনয়। কিন্তু তাহাও অবিদ্যার পরতন্ত্র হইয়া বুঝিতে পারিলাম কৈ! "আমি" কিছুনয় মুখে বলিতেছি, কিন্তু মন শুধু "আমি আমার" ভিন্ন কিছুই দেখিতেছেনা।

মন! তোমায় একটী আমির পরিচয় বলি। "আমি" বলিয়া কে একজন বলিতেছে, সে "আমিকে" কখনও দেখিনা। সে বলিতেছে, আমার হৃদয়, আমার হস্ত, আমার পদ, আমার চক্ষু, আমার কর্ণ ইত্যাদি অবয়ব সকল আমার। এক একটী করিয়া সকল যদি আমার হইল, আহা হইলে "আমি" হইল কৈ? যেমন একটী নারিকেল, নারিকেলের খোসা, নারিকেলের শস্য, নারিকেলের জল, ভিন্ন ভিন্ন, করিয়া দেখিলাম "নারিকেল" খণ্ড খণ্ড করায় তাহার শস্য খোসা, খোলা প্রভৃতি হইল, নারিকেলের অস্তিত্ব কিছুই রহিলনা, তাহা হ নারিকেল বলিয়া কিছুই নয় শব্দমাত্র।

সেই কতকগুলি খোসা, খোলা প্রভৃতি একত্র সংযোগ থাকিলেই যেমন সেই সমষ্টির নাম (চিহ্ন) নারিকেল। তেমনি জীব দেহ যতক্ষণ অন্যান্য অবয়ব সংযোগে জীবাত্মা সহ থাকে, ততক্ষণ জীবের আমি শব্দ থাকে, অবয়বের বিচ্ছেদ হইলেই "আমি শব্দ দূর হইয়া যায়।

মর্ত্ত্যমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া দেবতা হইলেও মরণের পথ অবশ্যই দর্শন করিতে হইবে। তাই বলি "আমি আমি আমার আমার" করিয়া যদি দেহ পতন হইল, তাহা হইলে মানব দেহ ধারণের স্বার্থকতা সম্পন্ন হইলকি?

মুগ্ধ জীব কেবল যেকোন কার্য্য আমি করিয়াছি, আমি করিতেছি, আমি করিব, আমার সম্পত্তি, আমার ঘর, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার স্বজন ইত্যাদি সকল, এই আত্ম জ্ঞান ভাবিয়াই মুগ্ধ হইতেছে, জীবের নিজ সাধ্যে কি কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে? তাহা কখনই নয়। দরিদ্র ইচ্ছা করিয়া কি বহু সম্পত্তির অধীশ্বর হইতে পারিবে? রোগী ইচ্ছা করিয়া কি রোগ তাড়াইয়া দিতে পারিবে? জীবের স্বজনের মধ্যে কেহ মুমূর্ষু অবস্থায় উপস্থিত, জীব কি তাহার মৃত্যু নিবারণ করিতে পারিবে? না নিজে ইচ্ছা করিয়া মরিব না বলিয়া অমরত্ব লাভ করিতে পারিবে? তাহা কখনই পারিবেনা। সেই জগৎপতি পরমেশ্বর যাহা করিবেন তাহাই হইবে।

এই জগৎ, জগদীশ্বর জগদানন্দ ভগবানেরই লীলা ভূমি। জীবগণের কর্ম্ম ক্ষেত্র। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ রঙ্গমঞ্চে জীব পুতুলকে কর্ম্ম সূত্র সঞ্চারে নানারূপ অঙ্গ ভঙ্গি করাইয়া নাচাইতেছেন জীবগণ তাই নাচিতেছে। আর বাক্‌শক্তি সম্পন্নাবাণীকে জীহ্বাগ্রে স্থাপন করিয়া নানারূপ বক্তৃতা করাইতেছেন, তাই জীবগণ বাক্‌বিন্যাস করিতেছে। পুতুলকে না নাচাইয়া কথা না বলাইলে, পুতুলের নাচিবার বা কথা কহিবার শক্তি কি! জীবের নিজসাধ্যে হস্ত প্রসারণ বা পদ সঞ্চালন করিবার একটুও ক্ষমতা নাই, ভগবানের কৃপা ব্যতিত তৃণও নড়িতে পারেনা, তিনি সকল স্থানে, সকল জীবেও সকল বস্তুতেই আছেন, তাঁহা ব্যতিত কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারেনা। ইহা ভগবানেরই শ্রীমুখ বিনির্গত বাক্য।

মায়া মুগ্ধ জীব কেবল "আমিও আমার" ভুলিতে পারিতেছেনা। যতক্ষণ জীবের দেহ বর্ত্তমান থাকিয়া "আমিও আমার" দূরীভূত না হইবে, ততক্ষণ জীব আমার ভুলিয়া অহৈতুকী ভক্তির পথে অগ্রসর হইতে উদ্যত হইবেনা। জীবের "আমি আমার" ভাবইত সর্ব্বনাশের মূল, কারণ; "আমি আমার" এই আমার আমার মোহজালে জীবকে আবদ্ধ করিয়া বৈরাগ্যের পবিত্র পথকে পঙ্কিলও পিচ্ছিল করিয়া তুলিতেছে।

"আমির" পরিণাম শূন্য, ইহা যতক্ষণ জীবও দেহের সহিত কোনও সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকিবে, তত ক্ষণ "আমি"র পরিচয় প্রদান করিবে, জীবও দেহের ভেদ হইলে দেহ পচিয়া যাইবে, জীব অন্য ঘট আশ্রয় করিবে, "আমি" বলিয়া আর

কিছুই থাকিবেনা। মন! তুমি, শব্দরূপী অহঙ্কার বিনিঃসৃত ধ্বনি পরিত্যাগ করিয়া, চির সত্ত্বা ভগবানের অক্ষয় চরণকমলে "আমিও আমার" বলিয়া যাহা আছে, তাহা সমর্পণ কর। বৃথা কেবল "আমি আমি আমার আমার" করিয়া, সাধের মানব জনমটী একেবারে হারাইওনা।

শ্রীইন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য।

প্রাণের কথা ॥

ভাল না বাসিয়ে এবার, গৌরাঙ্গ নাগর বরে।
অবোধ মন তুই বোকামীতে, পড়্‌লি গিয়ে
ফাঁকের ঘরে ॥
হেন অবতার কভু, হয় নাই আর হবে নারে।
(তোর) বাঁচা চেয়ে মরাই ভাল তারে যদি থাকিস্ ছেড়ে ॥
তিন যুগের জীব যত, জুড়াইল পেয়ে তারে।
ধিক্ তোরে তায়্ এখনও তুই, ছেরে আছিস্ কি বিচারে ॥
(সে যে) সকল হতে হ'য়ে বড় আপন স্বরূপ গোপন করে।
(তার) চাতুরীতে ভুলনামন ভাল করেই ধর তারে ॥
দেখ্‌রে ভেবে অপরাধী জীবে দয়া কে আর করে।
তুই বুঝেও তা বুঝিসনা মন্ বল্ কি বেশী বলি তোরে ॥
সর্ব্বধামের শক্তিভরা আছে সে নদীয়াপুরে।
সর্ব্ব অবতারের শক্তি আছে নবদ্বীপেশ্বরে ॥
যেভাবে যেতারে ভাবে সেই ভাবে সে পাবে তারে।
ভাব্‌বার আগে ভেবেনাওমন্ কোন ভাবেতে থাকি ধ'রে ॥
যার যে ভাব তার সেইত ভাল, ধন্য সেও ভজে তারে।
তর তম আছে কিন্তু নিরপেক্ষ সুবিচারে ॥

মধুর ভাবে ভজ যদি গৌরাঙ্গ নাগর বরে
এহেন সুখ সম্পদ কোথাও খুঁজে পাবেনারে॥
নব হরির ভাবে থাক গোরাধন ভিতরে ভরে।
তার সুখেতে হ'য়ে সুখী ভাসবে তবে সুখ সাগরে॥
রামানন্দের মূর্চ্ছা যাওয়া রূপ যে থাকে বুকে ধ'রে।
তাবিনে আর গৌর স্বরূপ ভালকে দেখাতে পারে॥
গৌর চাঁদের কান্তাহ'য়ে থাক গোরায় কান্ত ক'রে।
পাড়াপড়শী ননদিনী মরুক্না কেন জ্বলে পুরে॥

শ্রীগৌরগুণানন্দ ঠাকুর॥

মন্তব্য।

শ্রীভগবানের অপরিসীম দয়া এবং ভক্ত গ্রাহকগণের কৃপা দৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া আমরা আজ ১০ বৎসর যাবৎ পত্রিকা পরিচালনরূপ গুরুতর কার্য্য যথা সম্ভব ভাবে চালাইয়া আসিতেছি। যদিও আমাদের এইরূপ গুরুতর কার্য্য পরিচালনের যোগ্যতা নাই, তথাপি কয়েক বৎসর যাবৎ ভক্ত গ্রাহক মহোদয়গণের অনেক প্রকার অযাচিত কৃপালাভে আমরা অনেকটা নির্ভয় হইয়াছি। আশাকরি এইরূপ কৃপা চিরকালই থাকিবে। ছাপাখানার নানা প্রকার অনিবার্য্য কারণ বশতঃ কয়েক মাস যাবৎ যথা সময় পত্রিকা প্রকাশ হইতেছেনা। অতঃপর যাহাতে নিয়মিতরূপে প্রকাশ হয় তজ্জন্য বিশেষ যত্ন লইব। যে সকল সহৃদয় ভক্ত গ্রাহকগণ বর্ত্তমাণ বৎসরের সাহার্য্য প্রেরণ করিয়াছেন বা ভিঃ পি গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আর যাহারা পূর্ব্বে সংবাদ দেওয়া সত্ত্বেও ফেরৎ দিয়া অনর্থক ক্ষতিগ্রস্থ করাইয়াছেন তাঁহাদিগকে আমাদের বলিবার কিছু নাই, কারণ তাঁহারা বোধ হয় জ্ঞাত আছেন যে বর্ত্তমান সময় এইরূপ ব্যবহারকেই ভদ্রতা বলে। অলমিতি।

বিনীত—"সম্পাদক"।

ভক্তি।

১০ম বর্ষ
১৩১৮ সাল। | পৌষ ও মাঘ। | ৫ম ও ৬ষ্ঠ
সংখ্যা।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্‌॥

প্রার্থনা।

ভবজলধিগতানাং দ্বন্দ্ববাতাহতানাং।
সুতদুহিতৃ কলত্রত্রাণ ভারার্দ্দিতানাং॥
বিষমবিষয়তোয়ে মজ্জতামপ্লবানাং।
ভবতু শরণমেকো বিষ্ণুপোতো নরাণাং॥

হে বিপদবারণ! আমি সংসারজলধিতে, বিষয়ভোগরূপ জলে নিমজ্জিত এবং সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বরূপ বাতাসে আন্দোলিত হইয়া, স্ত্রী পুত্রাদি পরিজনবর্গের পোষণে অতিশয় কাতর, অথচ তরনী বিহীন, এরূপ অবস্থায় আমাকে রক্ষা করিতে একমাত্র তুমি ভিন্ন আর কেহই নাই। তাই একান্তমনে তোমার শ্রীচরণে শরণ লইলাম, তুমি কৃপা করিয়া চরণতরি দানে আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর।

হে বিপন্নবন্ধো! আর যে পারি না, দুর্ব্বল—অতি দুর্ব্বলহৃদয়ে আর যে সংসার-সমুদ্রের নানা প্রকার বিপদাপদরূপ তরঙ্গাঘাত সহ্য করিতে পারি না।

কি করিয়া যে এই ভীষণ তরঙ্গাঘাত হইতে রক্ষা পাইব তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না।

প্রভো! এক একবার যেমন একটু স্থির হইব মনে করি, অমনি তরঙ্গাঘাতে কোথায় চলিয়া যাই। অনন্তকাল এইভাবে আঘাত সহ্য করিয়া সংসার সমুদ্রে ভাসিতেছি, তবু কুল পাইলাম না, তবু আঘাত কমিল না, আর কুল পাইব কি না তাহাও বুঝিলাম না। তরঙ্গাঘাতে প্রপীড়িত হইয়া একটু স্থির হইব ভাবিয়া যাহাকে ধরিতে যাই, আমার ভাগ্যদোষে দেখি তাহাও আমার ন্যায় চঞ্চল এবং আমা অপেক্ষাও অধিক বিপন্ন। মনে করি স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজনগণ আমাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিবে কিন্তু যেমনই বিপন্ন হইয়া ধরিতে যাই, অমনি রক্ষা করা দূরে থাকুক আরও বিপন্ন করিয়া ফেলে। হে বিপদবারণ দীনশরণ! আমার তুমি ভিন্ন আর উদ্ধারকর্ত্তা কেহ নাই, তাই সকাতরে প্রার্থনা, আমাকে তোমার শান্তিময় সুশীতল অভয় পদে আশ্রয় দিয়া এই ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা কর, তোমার চরণে আশ্রয় পাইয়া আমার সংসার-চক্রে ঘোরাফেরা বন্ধ হইয়া যাউক, এবং মনভ্রমরা তোমার শ্রীপাদপদ্মের মধুপানে মত্ত হইয়া সকল ভুলিয়া সদানন্দে থাকুক।

নাথ! যদিও আমার সাধন ভজন নাই, সেই জন্যই আমি দুঃখ ভোগ করিতেছি, তথাপি তুমি যে পতিতোদ্ধারণ, তুমি যে সাধনভজনহীন দীনজনের একমাত্র বন্ধু এবং যাহার কেহই নাই কেবল তুমিই যে তাহার আছ, এই ভরসা করিয়াই আমি তোমার শরণ লইলাম। দে'খ—দে'খ! নাথ আমা হইতে যেন তোমার দীনবন্ধু নামে কলঙ্ক না হয়।

প্রভো! আর কতকাল,—আর ত পারি না। কতকাল এ ভাবে ঘুরিলাম, কত বিষয়েরই ভাবনা করিলাম, কত কর্ম্মই করিলাম এবং কত কর্ম্মফলই ভোগ করিলাম, কিন্তু তথাপি কৈ ঘোরা তো শেষ হইল না, ভাবনা তো গেল না, কর্ম্মের বা কর্ম্ম-ফলভোগের তো শেষ হইল না। এক্ষণে প্রভো! আমার আর বলিবার কিছুই নাই, সকলই জানিতেছ, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। তবে আমার এই মাত্র প্রার্থনা যেন বিপদে অথবা সম্পদে কোন অবস্থাতেই তোমাকে না ভুলি। যে ভাবেই থাকি যেন তোমাতে সম্পূর্ণ নির্ভরতা থাকে, যেন তোমার

ভাবে থাকিয়া, তোমার নাম গান করিয়া, আমার ভুলিয়া, তোমার হইয়া তোমারই জয় দিয়া জীবন ধন্য করিতে পারি। দীনের আশা পূর্ণ কর।

দীনের আশা কর পূরণ।
ওহে দীনদয়াময় দীনশরণ ! ॥

বড় আশা আছে মনে, হে দীনশরণ !
দিবানিশি তোমার ভাবে, রহিব মগন ;—
(আশা পূরাও হরি) (প্রাণে প্রাণে ভাব দিয়ে)
(আমি) বিষয়বাসনা বিষের জ্বালায় জ্বলিতেছি অনুক্ষণ ॥

ভাবিতে পারি না নাথ ! তব ভালবাসা,
অহর্নিশি আসে মনে কতই দুরাশা ;—
(আর আশা নাই) (সাধন ভজন করি এমন)
(বৃথা) ধনজনের ভালবাসায়—হ'তেছি পাপে মলিন ॥

ভুলায়ে রেখনা হরি ! মায়াময় সংসারে,
ঘুরে ঘুরে জনম গেল পরকে আপন ক'রে ;—
(দিন গত হ'ল) (সাধন হ'লনা)
(তুমি) আপন গুণে এ নির্গুণে আপন ক'রে দাও প্রেমধন ॥

যেমন ক'রে ভালবাসি অসার সংসারে,
তেমন ক'রে কবে নাথ ! ভাবিব তোমারে ;—
(আশা পূরাও হরি) (তোমার হ'য়ে ভবে থাকি)
(আমি) ডুবে প্রেম-সিন্ধুনীরে জুড়াব তাপিত প্রাণ ॥

দীনহীন—দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ভিক্ষা।

—:০:—

(শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে।)

দাও মোরে দিব্য দৃষ্টি হে গৌরসুন্দর !
(আমি) আঁখি ভরি হেরি তব রূপ মনোহর ॥
দাও কলকণ্ঠ তুলি সুধামাখা ধ্বনি।
তোমার গুণের গাথা গাই গুণমণি ॥
দাও দাও শুদ্ধচিত্ত তাহে ভাবরাশি।
(আমি) সে ভাব-প্রসূনে তব পূজা ভালবাসি ॥
(দাও) ভকতি-চন্দন আর প্রেম-অশ্রুজল।
(দিব) অলক তিলক ভালে ধোয়াব পা'তল ॥
(দাও) অনুরাগের কুঙ্কুম সে কুঙ্কুম দিয়া—
রাতুল চরণ দুটী দিব হে রঞ্জিয়া ॥
দাও দাও পদধূলি মাখিব সর্ব্বাঙ্গে।
আনন্দসাগরে আমি ডুবে যাব রঙ্গে ॥
তুমি হে করুণাময় দাও কৃপাকণা।
সেই কৃপাবিন্দু পেয়ে পূরুক বাসনা ॥
পরাণ উদ্যমশূন্য হিয়া হতবল।
শকতি সঞ্চারে কর দুর্ব্বলে সবল ॥
তোমার করুণা হ'লে মূক কথা কয়।
অন্ধ পায় দৃষ্টি শক্তি ওহে দয়াময় !
সেই ধন দাও মোরে বেশী নহে অল্প।
যাহার প্রভাবে ইন্দ্র দাস কোটী কল্প ॥
তুমি নাথ প্রেমময় ওহে প্রেমসিন্ধু !
কর সাধ পূর্ণ মোর দিয়ে একবিন্দু ॥

শুদ্ধ প্রেম একবিন্দু কর বিতরণ।
সে বিন্দুতে আত্মজয় লাগে কতক্ষণ॥
বিন্দুবলে দিগ্বিজয়ী হয় পদানত।
সহস্র ধরণী হয় করতল গত॥
দাও ভক্তি দাও শক্তি হে অন্তরযামী।
(যেন) "তোমার গরবে হই গরবিণী" আমি॥

দীন—শ্রীরসিক লাল দে।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব।

হরিদাস—প্রভো! শ্রীভগবত্তত্ত্ব কিছু শুনিবার বাসনা হইতেছে, কৃপা করিয়া বর্ণন করুন।

গুরুদেব—হরিদাস! অচিন্ত্যশক্তি শ্রীভগবান্ অবাঙ্মনসগোচর—জীবে তাঁহাকে কি বুঝিবে? তবে তাঁহার বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত মহাজনেরা যেরূপ বুঝাইয়াছেন, আইস তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক। যে সিদ্ধান্ত পুস্তক পাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রেমানন্দে অধীর হইয়াছিলেন, যাহা সেই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী দাক্ষিণাত্য হইতে নিজে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মসংহিতার আদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। মহাভক্ত অদ্বিতীয় দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীজীবগোস্বামী তাহার বিচার করিয়াছেন, আইস তাঁহার চরণধূলি লইয়া আমরা সঙ্ক্ষেপে তাহা বুঝিবার চেষ্টা করি। মহারত্ন পাইলে দরিদ্রের যেরূপ আনন্দ হয়, প্রেমাবতার মহাপ্রভুর উক্ত পুঁথি পাইয়া তদপেক্ষা অধিক আনন্দ হইয়াছিল।

পুঁথি পাইয়া মহাপ্রভুর আনন্দ অপার।
কম্প অশ্রু স্বেদ স্তম্ভ পুলক বিকার॥
সিদ্ধান্তশাস্ত্র নাই ব্রহ্মসংহিতার সম।
গোবিন্দ মহিমা জ্ঞানের পরম কারণ॥

অল্প অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।
সকল বৈষ্ণবশাস্ত্র মধ্যে অতি সার ॥

বুঝিলে ? ব্রহ্মসংহিতার ন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রন্থ আর নাই এবং শ্রীজীবগোস্বামী অপেক্ষা যোগ্যতর মীমাংসকও আর জন্মে নাই সুতরাং ইহার উপর সুদৃঢ় আস্থা করিতে পার।

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণং ॥"

ব্রহ্মসংহিতা ১।১।

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
সর্ব্বঅবতারী সর্ব্বকারণ প্রধান ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার ॥
সচ্চিদানন্দ তনু ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরসপূর্ণ ॥

শ্রীচরিতামৃত।

বৈষ্ণবের শ্রীকৃষ্ণ এই। তাঁহাকে কেবল ভারতের খণ্ডরাজ্য দ্বারকার অধিপতি ভাবিলে অথবা অর্জ্জুন-সারথি ভাবিলে চলিবে না. তিনি কি বস্তু বুঝ—

কৃষ্ণ (কৃষ + ণ) "কৃষি র্ভূবাচক শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥"

কৃষ্ ধাতু ভূ অর্থাৎ সত্তাবাচক, সুতরাং সৎ. ণ=নিবৃত্তি—উপসর্গরাহিত্য—আনন্দ; যিনি সৎস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ, তিনিই পরমব্রহ্ম। সদানন্দযুক্ত হইলে "চিৎ" আপনিই জন্মে।

সত্তাস্বানন্দয়োর্যোগাৎ চিৎ পরং ব্রহ্ম চোচ্যতে।

বৃহৎ গৌতমীয়তন্ত্র।

কৃষ্ ধাতুর অন্য অর্থ, আকর্ষণ, তাহাতেও বুঝা যায় তিনি সর্ব্বাকর্ষক।

"পুরুষ যোষিৎ কিম্বা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন॥"

পরম ঈশ্বর অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর, সকলের প্রভু ও কর্ত্তা। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অর্থাৎ তাঁহার প্রাকৃত কোন মূর্ত্তি নাই, তবে তিনি অপ্রাকৃত ও ঘনীভূত সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি। অনাদিরাদি অর্থাৎ নিজে অনাদি অথচ সকলের আদি। গোবিন্দ অর্থাৎ জগৎপালক। সর্ব্বকারণ কারণ অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান সৃষ্টির মূলকারণ প্রকৃতি, সেই মূলপ্রকৃতিরও যিনি কারণ তিনিই কৃষ্ণ। শ্রুতি-কথিত "একমেবাদ্বিতীয়ম্" তিনি। যিনি অণু হইতে অণু, অথচ মহৎ হইতেও মহৎ, সেই পরমবিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয় বস্তুই শ্রীকৃষ্ণ, তিনি এক, বশী (বশে আনিতে সমর্থ) সর্ব্বগ ও স্তবনীয়—"একোবশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্যঃ" (গোপালতাপনী শ্রুতি)।

হরিদাস—আমাদিগকে তবে সাহেবেরা বহু দেবোপাসক ও মূর্ত্তি-পূজক বলিয়া ঘৃণা করে কি জন্য?

গুরুদেব—গায়ের জোরে ঘৃণা করিলে তুমি কি করিবে? তোমাকে মানুষ না বলিয়া যদি ভূত বলে, তাহাতেই বা তুমি কি করিতেছ? সাহেবেরা বিজাতীয়, তাহাদের কথা তবু গায়ে সয়, কিন্তু তোমরা যে কিছু না দেখিয়া শুনিয়া যা' তা' বল, তাহাই বিশেষ দুঃখের কথা।

হরিদাস—আচ্ছা! তবে ব্রহ্মা, শিব, দুর্গা, কালী ইত্যাদি বহু দেবতার উদ্ভব হইল কিজন্য?

গুরুদেব—ব্যস্ত হইও না, ক্রমে সবই আলোচিত হইতেছে। উহা দুই রকমে হইয়াছে, (১) একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন নাম; (২) নাম বহু হইলেও বস্তু মূলত একই বটে। তোমাকে আমি 'হরিদাস' বলি, তোমার পিতামাতা "খাঁদু" বলেন, মামার বাড়ীতে "কানাই" বলে, তাই বলিয়া কি তুমি তিনটী পৃথক্ পরিচ্ছদ পরিতে পার, আর সেজন্য তোমাকে পৃথকরূপ দেখাইলেও তুমি একই বস্তু।

"মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ॥"

লঘু ভাগবতামৃত।

একই মণি যেমন বর্ণভেদে নীলকান্ত, হেমকান্ত, অয়স্কান্ত প্রভৃতি নাম হইয়াছে, সেইরূপ একই "অচ্যুত" ভক্তের ধ্যান-অনুসারে বিভিন্ন নাম ও ভিন্ন রূপ হইয়াছে।

হরিদাস—তবে শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব ইত্যাদির মধ্যে এত ঝগড়া কিজন্য?

গুরুদেব না বুঝিলেই ঝগড়া ও অপরাধ। পরমোদার শ্রীমন্ মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যবাসী লক্ষ্মীনারায়ণসেবী ভট্টকে বুঝাইলেন—

"কৃষ্ণ নারায়ণ যৈছে একই স্বরূপ।
গোপীলক্ষ্মী ভেদ নাই হয় একরূপ॥
গোপী দ্বারা লক্ষ্মী করে কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ।
ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ॥"

সর্ব্বকারণকারণ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ইত্যাদি পূর্ব্বকথিত লক্ষণান্বিত বস্তুকে আমি শ্রীকৃষ্ণ বলি, তুমি যদি ঠিক সেই বস্তুকেই শিব বল, সাহাবেরা যদি তাহাকেই গড্ (God) বলে, তবে আমাদের আর বিরোধ কিসে? নাম বিভিন্ন, কিন্তু ধারণা এক, বস্তুও এক।* প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেব শিব-দর্শনে হউক বা কালী-দর্শনে হউক প্রেমবিহ্বল হইতেন।

হরিদাস—কেহ কেহ বলেন শিব তমোগুণাত্মক, সুতরাং কৃষ্ণের সহিত এক হইতে পারে না।

গুরুদেব—ইহাও সত্য বটে; ইহাই দ্বিতীয় প্রকার। গুণকর্ম্মানুসারে বিভিন্ন স্বরূপের বিভিন্ন নাম হইয়াছে, অথবা মূলাধার শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্যশক্তিবলে বিভিন্ন স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া বিভিন্ন গুণ প্রকাশ করিয়া বিভিন্ন নাম ধরিয়া আছেন।

---

* তত্ত্বগত এক হইলেও নামনামির অভেদত্ব থাকে না ও কৃষ্ণনামের যোগ রূঢ়িবৃত্তি রক্ষিত হয় না।

বৈষ্ণবেরা বহুতত্ত্ব আলোচনা করিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বেশ্বর পূর্ণানন্দ মায়াধীশ ব্রজেন্দ্রনন্দন করিয়া ও সর্ব্বোপরি বলিয়া মীমাংসা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে সৃষ্টি স্থিতি সংহারাদি বিবিধ কার্য্য, শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার বা অংশাবতার দ্বারা হইয়াছে। সুতরাং যে শিব সংহারের কর্ত্তা তিনি শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার মাত্র, পূর্ণব্রহ্ম নহেন, কাজেই পার্থক্য।

শিব-মায়া শক্তি যুক্ত তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত গুণাতীত বিষ্ণু পরমেশ॥

মাধুর্য্য বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ অতুলনীয়, অন্য স্বরূপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুতরাং পূর্ণতম। স্বয়ং মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

কৃষ্ণ মাধুর্য্যসার অন্য সিদ্ধি নাই তার
তেঁহো মাধুর্য্যের গুণখনি।
আর সব প্রকাশে, * যার দত্ত গুণাভাসে
যাহা যত প্রকাশে কার্য্য জানি॥

দধি, দুগ্ধের বিকার হইলেও দধিকে ঠিক্ দুগ্ধ বলিয়া তর্ক করা বাতুলের কার্য্য।

অদ্বয় তত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
স্বরূপ শক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান॥

বেদের একেশ্বরবাদই অদ্বৈতবাদ, বৈষ্ণবশাস্ত্র তাহা গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ তাহাকে বিশ্লেষিত করিয়া আরও পরিষ্কার করিয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেন, তাঁহার সদৃশ বা সমান, অন্যবস্তু নাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ এক বস্তু বটেন, কিন্তু অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত হইয়া নিত্যকাল অবস্থিত আছেন, ইহাই রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা।

হরিদাস—ঠিক্ বুঝিলাম না, "একমেবাদ্বিতীয়" আবার দুইটী হইলেন কিরূপে?

---

* প্রকাশ অর্থাৎ শিবপ্রভৃতি স্বরূপে।

গুরুদেব—তেঁতুলের বীচি একটী বটে, কিন্তু উহার অভ্যন্তরে গেলেই দেখিবে দুইটীতে মিলিত হইয়া এক হইয়া আছে; ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। (অপ্রাকৃত রূপগুণাদি বিশিষ্ট হইয়াও তিনি এক)।

মৃগমদ তৈছে গন্ধ নাহি কোন ভেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহিক প্রভেদ॥

অগ্নি হইতে জ্বালাকে কথনও বিচ্ছিন্ন করা যায় না, ইহাকেই বলে "অচিন্ত্যভেদাভেদ"। শক্তি ও শক্তিমানের পৃথক্ প্রতীতিও চিন্তার অতীত, উভয়ের একত্ব জ্ঞানও চিন্তার অতীত। শক্তি ও শক্তিমানের লীলা, প্রকৃতি পুরুষের খেলা।

একাঙ্গো স্থিতনোর্ভেদো দুগ্ধধাবল্যয়োর্যথা॥

দুগ্ধ ও ধবলতার ন্যায় রাধাকৃষ্ণ অভিন্ন হইয়াও বিভিন্নতনু।

সৃষ্টিলীলার অভ্যন্তরে ঈশ্বরতত্ত্ব অতি নিভৃতভাবে নিহিত রহিয়াছে। সৃষ্টিতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিলে আমরা সর্ব্বপ্রথমে শক্তিকেই দেখিতে পাই, একটু ভিতরে প্রবেশ করিলে তখন শক্তিমানের সহিত দেখা হয়, তিনিই বীজস্বরূপ "তেজস্তেজস্বিনামহম্"। আর দেখিতে পাই মহামিলন ও মহাবিচ্ছেদের অবিশ্রান্ত লড়াই। সমগ্র সৃষ্টি ত্রিবিধ অবস্থায় অবস্থিত। অসৎ, সদসৎ ও সৎ, ইহাকে শাস্ত্রে মায়াশক্তি, জীবশক্তি ও চিচ্ছক্তি অথবা বহিরঙ্গা, তটস্থা ও অন্তরঙ্গা শক্তি বলে।

অনন্তশক্তি কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান।
চিচ্ছক্তি জীবশক্তি মায়াশক্তি নাম॥

শ্রীচরিতামৃত।

চিচ্ছক্তি শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্যরূপিণী স্বরূপশক্তি, ইহার নাম যোগমায়া "যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ সত্ত্বপরিণতি" (শ্রীচরিতামৃত)। এইশক্তি জীবকে কেন, জগতের সমস্ত বস্তুকেই অবিরাম সেই মহাচৈতন্যের দিকে টানিতেছেন। শ্রীভগবানের সহিত ভক্তের যোগ করিয়া দেওয়াই যোগমায়ার কার্য্য, ইনিই শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলন করাইয়া দিতেছেন, তাই এই শক্তির নাম অন্তরঙ্গা শক্তি।

মায়াশক্তি বহিরঙ্গা, মায়া জীবকে কেন? সমগ্র সৃষ্ট বস্তুকেই সেই শুদ্ধসত্ত্ব চৈতন্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে দূরে—অতিদূরে লইয়া যাইতেছে। জীবকে শ্রীকৃষ্ণ

হইতে বিচ্ছিন্ন করাই ইহার ধর্ম্ম। অসত্যকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে বলিয়াই ইহার নাম, দর্শনে অবিদ্যা, পুরাণে মায়া (ভেল্কী) বা জগৎ-প্রসূতি প্রকৃতি।

অনাত্মনি দেহেন্দ্রিয়াদৌ আত্মধীরবিদ্যা। (যোগবৃত্তিঃ)।

মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরং। (সাঙ্খ্যপ্রবচনং)।

জীবশক্তি তটস্থা অর্থাৎ স্থল ও জলের সীমান্তে, আলোক ও অন্ধকারের সন্ধিস্থলে, চিৎও জড়ের সম্মিলনস্থানে অবস্থিত। বিশুদ্ধাত্মাই জড়দেহাচ্ছন্ন হইয়া জীবোপাধি ধরিয়াছে, (যেমন জবাকুসুমাদি সন্নিহিত রক্তাভ স্বচ্ছ স্ফটিকমণি)। সন্ধিস্থানে পড়িয়াছে, তাই জীবের ইন্দ্রিয়োপহিত শক্তিবিশেষের মহাসঙ্কটাপন্ন অবস্থা, কারণ উপরে পরমাত্মা, মধ্যে ইন্দ্রিয়, নীচে বিষয় বাসনা। উভয়াকৃষ্ট ঘোটকের মত বিষম বিপদাপন্ন। যে দিকে জোর বেশী হইবে সেইদিকেই আকৃষ্ট হইবে। একদিকে অত্যুচ্চ উৎকর্ষ স্থান অন্যদিকে অতলস্পর্শী রসাতল, একদিকে উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ গৌরীশঙ্কর, অন্যদিকে ঘোর তমসাচ্ছন্ন গভীর হিমাদ্রি গহ্বর। বুদ্ধির একটুকু বিপর্য্যয় হইলেই জীব তন্মুহূর্ত্তে নষ্ট হইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীরামাচরণ বসু।

"পাগল্-মানুষের কথা।"

(ইনি পাগল হরনাথ নহেন, আর এক নূতন পাগল। এক্ষণে আমরা ইঁহার পরিচয় দিব না, ভক্তপাঠকগণের আগ্রহ বুঝিলে ভবিষ্যতে দিবার ইচ্ছা থাকিল। ভক্তি-সম্পাদক)

বহুদিন হইতে এক পাগল মানুষের সহিত আমার পত্র লেখালিখি হইতেছে, পত্রে আমি তাঁহার মনের ভাব সম্যক বুঝিতে পারি নাই। সেদিন তিনি স্ব-শরীরে আমার নিকট আসিয়া অযাচিতভাবে প্রেম বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গ-সুখ বিশেষ ভাবেই উপলব্ধি করিয়াছি, বাস্তবিকই ইনি একজন প্রেমপাগল, রাগ মার্গের সাধক। ভাবময় প্রফুল্লতাময় তাঁহার মুখখানি, তাঁহার মূর্ত্তিখানি দেখিয়াই মনে হইল—

"পাগল মানুষ দেখ্‌লে চেনা যায়।
ও তাঁর হাসি হাসি মুখশশী, খুসি ফুটে চেহারায়।
ও সে জানেনা দুনিয়াদারী, ভালবাসে দুনিয়ায়।"

পাগলের দুই চারিটী কথা শুনিয়া বোধ হইল, ইনি শুধু পাগল নহেন। বড়ই তেজস্বী লোক। ভক্তের হৃদয় স্থলবিশেষে "কুসুমাদপিকোমল," আবার অন্য স্থলে "বজ্রাদপি কঠোর," ইঁহারও তাই।

পাগল, একনিষ্ঠ গৌরভক্ত হইলেও, রামপ্রসাদের তেজোব্যঞ্জক বহু গীত তাঁহার কণ্ঠস্থ। কোন্ দেশের লোক জিজ্ঞাসা করিলে পাগল বলিলেন—

"যে দেশে রজনী নাই, আমি সে দেশের এক লোক পেয়েছি।
ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই, যুগে যুগে জেগে আছি॥"

পাগল বিধি-নিষেধের অতীত পুরুষ। বিধির কথা জিজ্ঞাসা করিলে পাগল বলেন—

"যদ্যপি ভকত কভু হয় বলবান্।
বিধির কলম কাটি করে খান্ খান্॥"

"এক বিন্দু জগৎ ডুবায়"—একথার মর্ম্মার্থ জিজ্ঞাসা করিলে পাগল বলিয়া উঠিলেন—"উহা আমাতেই দেখিতে পাইবেন।" কি উচ্চ কথা। এত উচ্চ কথা তাঁহার মুখে শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়াছি। প্রেমের কথা কহিতে কহিতে পাগল শেষে বলেন—

"কহিবার যোগ্য নয়, তথাপি বাউলে কয়, কহিলে বা কেবা পাতিয়ায়।"

সহজ বস্তুর ব্যাখ্যা করিতে গিয়া পাগল আবেশ ভরে কহিলেন—"কি আর বুঝাইব? যদি হয় রাগোদ্দেশ, তাঁহা হয় আবেশ, সহজ বস্তু না যায় লিখন।" তাঁহার মতে রাগ দ্বেষ নহে,—রাগোদ্দেশ,—রাগের উদয়।

আমরা বিধিনিষেধের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছি। পাগলের উহা অসহ্য তাই মধ্যে মধ্যে বলিতেছিলেন ;—

"ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগ মার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম॥"

সাধারণতঃ যে ভাবে নাম সঙ্কীর্ত্তন হইয়া থাকে, তাহাতে প্রেমের উদয় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে শ্রীনামের উপর ঘোর অপরাধ হইতেছে, ইহাই পাগলের মত। প্রকৃত নাম সঙ্কীর্ত্তন কি, জিজ্ঞাসা করিলে পাগল শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অনুসৃত পথে চলিতে বলেন। আমি পাগলকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তিনি অতীব আগ্রহের সহিত সে গুলির উত্তর দিয়াছিলেন। প্রশ্নোত্তর গুলি নিম্নে লিখিয়া ভক্তমণ্ডলীকে উপহার দিতেছি।—

প্রশ্ন। ধর্ম্ম জগতে সার সত্য কি ?

উত্তর। মহাপ্রভু পতিতপাবন নির্গুণ পরমেশ্বর ; সগুণ পুণ্যবানের নাম সঙ্কীর্ত্তনে ও সেবায় দশটী নামাপরাধ এবং বত্রিশটী সেবাপরাধ হয়। যে পর্য্যন্ত বিধি আছে, সেই পর্য্যন্তই বাসুদেবে সেবাধিকার। এই জ্ঞানই ধর্ম্ম জগতে সার সত্য।

প্রশ্ন। পতিত কে ? পুণ্যবানই বা কে ?

উত্তর। অপরাধ যে স্বীকার না করে সে পতিত। আর শুভকর্ম্মকারী, কামনামুক্ত ব্যক্তিই পুণ্যবান।

প্রঃ। চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ কি সকলেই পাঠ করিতে পারেন ?

উঃ। না, রাগমার্গের ভক্তগণই উহার যোগ্য পাঠক। ব্রজের নির্ম্মল রাগে অনুপ্রাণিত না হইলে উহা পাঠে প্রকৃত অধিকার জন্মে না।

প্রঃ। রাগের উদয় হয় কিরূপে ?

উঃ। সাধুসঙ্গে,—শ্রবণে ও কীর্ত্তনে।

প্রঃ। বিধি কাহার জন্য ?

উঃ। অজ্ঞান জীবের নিমিত্ত।

প্রঃ। জীব পাপ পুণ্যের জন্য দায়ী কত দিন ?

উঃ। যতদিন শ্রীভগবানে আত্মসমর্পিত না হয় ততদিন্।

প্রঃ। জীবের কোন স্বাধীন শক্তি বা ইচ্ছার উদ্ভব হইতে পারে কি না?

উঃ। পারে, শ্রীভগবানকে পাইবার ইচ্ছা না হইলে প্রেম হইবে কিরূপে? আর পাইবার যে ইচ্ছা সেই লালসাই স্বাধীন শক্তি।

প্রঃ। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাপ কি?

উঃ। নিজে আত্মতত্ত্ব না জানিয়া অন্যকে উপদেশ দিতে যাওয়ার ন্যায় পাপ আর দ্বিতীয় নাই।

প্রঃ। মহাপ্রভুর সেবায় কাহার অধিকার?

উঃ। আত্মসমর্পণকারী ভক্ত ব্যতীত আর কাহারও মহাপ্রভুর সেবায় অধিকার নাই।

প্রঃ। ভারতের অবনতির কারণ কি?

উঃ। বুদ্ধ ও চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষদিগকে আচ্ছন্ন করাই এ অধঃপতনের কারণ।

প্রঃ। উজান গতি কি?

উঃ। বিপরীত দিকে রস ও রক্তের গতিকে উজান গতি বলে।

(দাদা কালীহর বসু বলেন,—"বহির্ম্মুখ প্রকৃতিকে অন্তর্ম্মুখ করার নাম উজান গতি।" সুন্দর উত্তর বটে। লেখক।)

প্রঃ। সিদ্ধাবস্থা কাহাকে বলে?

উঃ। মহাভাবের অবস্থাই সিদ্ধাবস্থা।

প্রঃ। আশ্চর্য্য কি?

উঃ। বর্ত্তমানে মহাপ্রভুর ভক্তই অধ্যাত্ম জগতে থাকিয়া জানাইতেছেন, "অনাহারে প্রাণ যায়।" কিন্তু পাষণ্ডীর দল ঐ ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়া তামসিক সুখে উন্মত্ত। ইহাই আশ্চর্য্য।

প্রঃ। ভারতে ধর্ম্মের গতি এক্ষণে কোন দিকে?

উঃ। সকল দেশেই ধর্ম্ম আছে ভারতে কিন্তু উহার সম্পূর্ণ অভাব। আমার জীবনেই তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যিনি দিবা ও রাত্রির মধ্যে প্রায় সমস্ত সময় শ্রীভগবানের ভাব-সাগরে ডুবিয়া জগতে মহা মঙ্গলের পথ দেখাইতে ইচ্ছুক, ভারতে তাঁহার সাহায্যকারী লোক দেখিতে পাইলাম না। ইহাই কি "জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন?"

প্রঃ। আপনি যে ভাবে কথা কহিতেছেন তাহাতে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ প্রকাশ পায়।

উঃ। কেন? মহাপ্রভুর শ্রীচরিতামৃতের উক্তি স্মরণ করুন—

"ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীগণের করিতে সর্ব্বনাশ।
নীচ, শূদ্র দ্বারে করেন ভক্তির প্রকাশ॥"

একথা বলিয়া তবে কি স্বয়ং প্রভুও ব্রাহ্মণদ্বেষী হইয়াছেন? আমার বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবেন। (এখানে ভ্রষ্টাচারী ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী।)

প্রঃ। "বিবর্ত্ত বিলাস" গ্রন্থ কি মহাপ্রভু অথবা তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের অনুমোদিত?

উঃ। ছিঃ ও কথা মুখেও আনিবেন না।

প্রঃ। আপনার সহধর্ম্মিণী আছেন, আপনি কি তাঁহার সহিত দৈহিক সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছেন?

উঃ। নিশ্চয়ই আমি এক্ষণে পুরুষ নহি, সর্ব্বদাই প্রকৃতি ভাবাপন্ন। আপনি যে কোন ভাবে আমার পরীক্ষা করিতে পারেন।

প্রঃ। আপনি সর্ব্বদাই ভাবসাগরে নিমগ্ন, আপনার পত্নী আছেন—একটি পুত্রও আছে। সংসার চলে কিরূপে? ভিক্ষা দ্বারা কি?

উঃ। "ভিক্ষাবৃত্তিকে আমি ঘৃণা করি"

এই বলিয়া তিনি—"মাগ্‌নে ভালা নাহি বাপ্‌সে;
দুহিতা ভালা নাহি এক্।
চল্‌নে ভালা নাহি কোশ ভোর
যব্ বিধি রাখে টেক্॥"

এই দোঁহাটী এবং—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"

এই শ্লোকটীর আবৃত্তি করিলেন।

এই পাগলটীর "বাহিরে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়" এই ভাব! কৃষ্ণ কথার আলোচনার সময়ে মধ্যে মধ্যে তাঁহার পুলকাশ্রু দর্শন করিয়া পুলকিত হইয়াছি।

প্রঃ। আপনার আবার দুঃখ কি ?

উঃ। দরিদ্র জীবের জন্য ও স্ত্রীলোকের সতীত্ব-নাশ দর্শনেই আমার দুঃখ হয়।

প্রঃ। পূর্ব্বপত্রে লিখিয়াছিলেন "আমি অবতার নহি"—এবারে লিখিয়াছেন "আমি করুণাময় অবতার।" ইহাতে কি অহঙ্কার প্রকাশ হয় নাই ? "অবতার নহি কহে আমি অবতার।"

উঃ। আমি স্বতন্ত্র নহি, সদা পরাধীনা কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ, মহাপ্রভু আবেশ কালে বলিতেন, "আমি নারায়ণ" এবং ঐশ্বর্য্য প্রকাশ কালে সেই দেহ, ষড়্ভুজ, চতুর্ভুজ, বিশ্বরূপ, ভক্তের ধ্যান অনুযায়ী মূর্ত্তি দেখাইতেন।

প্রঃ। শ্রীভগবান ও ভক্ত স্বপ্রকাশ। আমার সাধ্য কি আপনাকে প্রকাশ করি ? তবে শক্তিসঞ্চারে সকলই সম্ভবে।

উঃ। যেদিন এই মহাশব্দ জগতে প্রচার হইয়াছে, সেই দিন হইতেই মহাপ্রভু আমাদের নিকট প্রকাশ হইয়াছেন। অনেকেই স্বীকারও করিয়াছেন, যে প্রচারকদের দোষে অনেক ভক্ত জানিতে পারিলেন না।

প্রঃ। যুগল মন্ত্র ও গৌর মন্ত্র অভেদ বস্তু, একবার গুরুদেবের নিকট যুগলমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি তবে আবার গৌরমন্ত্র কেন ? ইহাতে কি নিষ্ঠা কমিবে না ? ইহাতে কি দ্বিচারিণী ভাব প্রকাশিত হইবে না ?

উঃ। যুগলমন্ত্র ও গৌরমন্ত্র অভেদ হইলেও "কৃষ্ণ নাম করে অপরাধের বিচার।" নিতাই চৈতন্য নামে এ সব বিচার নাই। "নাম লইলেই প্রেম দেন বহে অশ্রুধার।" দীক্ষা গুরু শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য; তিনি সাধুসঙ্গ দ্বারা তত্ত্ব জানিবার অনুমতি দিয়াছেন। "শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্ত স্বরূপ॥" সাধুসঙ্গ না করিলে তাঁর আজ্ঞা হেলন করা হয়।

প্রঃ। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জন্ম কি শূদ্রের বংশে ? প্রমাণ কোথায় ?

উঃ। না শ্রীচৈতন্যভাগবতে অদ্বৈতআচার্য্যের নিকট প্রভু বলিয়াছেন,

"অদ্বৈত বলেন বাপ্! তুমি কোন্ জন।
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী তুও হেন লয় মন॥
বলেন ঈশ্বরপুরী আমি শূদ্রাধম।
দেখিবারে আইলাম তোমার চরণ॥"

শ্রীচৈঃ ভাঃ আদিঃ ৭ম অঃ।

প্রঃ। মহাপ্রভু ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন, ইহার প্রমাণ চরিতামৃতে কোন্ স্থানে আছে? যদি ব্রাহ্মণগণের দর্প চূর্ণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, তবে তাঁহাদের গৃহে ভিক্ষা লইতেন কেন?

উঃ। পতিত ব্রাহ্মণ সনোড়িয়ার গৃহে প্রভু ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া, ভণ্ড কেবল নামধারী ব্রাহ্মণদিগের দর্প চূর্ণ করিয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণ করিয়াছেন; তিনি আগে জ্ঞান দিয়া ব্রাহ্মণ করিয়া পরে মন্ত্র দান করিতেন। পতিত ব্রাহ্মণ শূদ্রবৎ।

প্রঃ। সার্ব্বভৌমাদি কি উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন?

উঃ। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রাতে বিছানায় মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিয়াছিলেন এবং শিক্ষা সূত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন।

প্রঃ। আপনি খাস তালুকের চৌকিদার পুলিস, আপনার কার্য্য কি তবে পাষণ্ডদলন মাত্র; প্রেম বিতরণ বা গূঢ় রস আস্বাদন নহে? খাস তালুকের পুলিস মাত্র হইয়া আপনি অন্য স্থানে লিখিয়াছেন "আমার প্রচার কার্য্য নহে, উহা আপনাদের কার্য্য স্বয়ং ভগবানের ভারহরণ বা ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য নহে।"

উঃ। আমি খাস তালুকের চৌকীদার, জীবের মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিয়া জাগরিত করা ও অনুগত পিপাসু ভক্তদিগকে প্রেমামৃত, অভয় দানই আমার কার্য্য। তজ্জন্য সাধ্যমত পত্র দ্বারা বংশীধ্বনি সহ আহ্বান করিয়াছি; ইহা মনুষ্য সাধ্য নহে, কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত; ভগবানের নাম ভিন্ন আমার কোন কর্ম্মই নাই, আমার লাভ পূজা, প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজন নাই; প্রতিষ্ঠার ভয়ে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ক্ষীরচোরা গোপীনাথের নিকট হইতে রাত্রিকালেই পলাইয়াছিলেন। কেবল আপনাদের উপকারের জন্য কর্ম্ম, "করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ" স্বয়ং ভগবানের বাহ্যজগতে প্রয়োজন নাই; ইহা মায়া কর্ত্তৃক সৃজিত, পালয়িতা বিষ্ণু পালন ও ধর্ম্মস্থাপন করেন; আপনারা প্রচার করুন, কাগজে লিখুন বা না লিখুন মিলনমন্দির করুন বা না করুন, তাহাতে আমার কিছু ক্ষতি হইবে না, আপনাদেরই ক্ষতি। আমাকে আর ভবে আসিতে হইবে না, মা অভয় দিয়াছেন।

প্রঃ। আপনি ও আমি নিত্যলীলায় বিশ্বাস করি। আপনি কি বিগ্রহের নিত্যত্বে বিশ্বাস করেন না? মূর্ত্তি পূজা কি দোষাবহ?

উঃ। "শ্রীবিগ্রহে যে না মানে সেইত পাষণ্ডী।
অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী॥

আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়।

সেই প্রভু বেদে, ভাগবতে করিয়াছেন দৃঢ় ॥"

যখন বংশীর ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করাইয়া আপনাদিগকে জানাইয়াছেন যে, "আমার একটী ভক্ত একসের তণ্ডুল অভাবে অনাহারে দিন যাপন করিতেছেন" তখন তাহার প্রতিকার না করিয়া পূজা করিতে পারেন না; মহাপ্রভুর লীলা নিত্যলীলা, অদ্যাপিও এই লীলা করিতেছেন ইহা তিনি জানাইতেছেন; বর্ত্তমান থাকিতে অনুমান পূজা কোন শাস্ত্রে বিধি নাই।

প্রঃ। মিলন মন্দির স্থাপিত হইলে উহাতে কাহার প্রতিমূর্ত্তি কোন্ কোন্ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়?

উঃ। কলিযুগের যুগধর্ম্ম অনুসারে সপার্ষদ মহাপ্রভু গৌরনিতাইয়ের শ্রীমূর্ত্তি স্থাপনই বিধেয়।

প্রঃ। গম্ভীরা লীলায় মহাপ্রভুর যে সকল ভাব হইয়াছিল্ তাহা কি আপনার দেহেও বিকাশ পায়? দুই তিনটী ভাব মাত্র দেখিয়াছিলাম।

উঃ। "সেই সমুদয় ভাব দেখিবার জন্য দেশবাসীকে বহুদিন হইতে আহ্বান করিয়াছিলাম; "দিবা রাত্তি নাই, বাজারে সদাই, যে যায় সে প্রেম পায়।"

প্রঃ। আমার ক্ষুদ্র কুটীরে নিতাই গৌরের মৃন্ময়ী মূর্ত্তি রহিয়াছে উহার পূজা আমি নিজেই করিতে চাই, কি ভাবে পূজা করিব।

উঃ। আপনার মনে প্রভু যে ভাবের বিকাশ দিবেন, তাহাই করিবেন।

প্রঃ। "রস পরিপাটী সুবর্ণের ঘটী" ইত্যাদির এবং "কাম বীজ কাম গায়ত্রীতে যার উপাসনা।" ইহার অর্থ কি?

উঃ। উহা বুঝাইবার জন্য আপনাকে, প্রভু বংশীদাস বিরচিত নিকুঞ্জ-স্তব পাঠ করিতে দিয়াছিলাম। আপনি বুঝিতে পারেন নাই, জীবের বুদ্ধির গতি নাই, প্রেম ও ভাবের গতি ভিন্ন বুঝা যায় না; "যদি হয় রাগোদ্দেশ, তাহা হয় আবেশ, সহজ বস্তু না যায় লিখন।"

মায়া দ্বারা দেহের সার পদার্থ অপহরণ করে, ঐ সময় বিশেষরূপে স্মরণ কর্ত্তব্য, "দুঃসঙ্গ কহি কৈতব, আত্ম-প্রবঞ্চনা" রমণ কাল ও মৃত্যুকালে কেহ কখনও সুখী থাকিতে পারে না। আপনি স্মরণ না করিলেও তিনি সর্ব্বত্র

দেখিতে পান। পাপের সময় স্মরণ করিলে শ্রীভগবানই পাপ কার্য্য হইতে বিরত করিয়া সুপথ দেখাইয়া দেন সর্ব্বদাই স্মরণ কর্ত্তব্য।

প্রঃ। "এক বিন্দু জগৎ ডুবায়" কই আপনি ত জগৎ ডুবাইতে পারিলেন না! প্রেমসিন্ধু হইয়া এক বিন্দু দ্বারা আপনি ত আমাদের দুর্গতি দূর করিতে পারিলেন না। প্রভুর এ কি খেলা! এই কি ভক্ত বাৎসল্য?

উঃ। যেরূপ ভাবে জগৎ ডুবিয়াছে এ প্রকার আর কখনও হয় নাই। চীন, জাপান, আসিয়া, ইউরোপ, আমেরিকায় পর্য্যন্ত এক বিন্দু ব্যাপ্ত হইয়াছে; এমন দিন হইবে যে দিন এই নরাধমকে দেখিবার জন্য বহুলোক আসিবেন কিন্তু কেহই দেখিতে পাইবেন না। তখন আপনাদের ন্যায় প্রচারকদিগকে সকলে গালি দিবেন। যত দিন পৃথিবীতে মনুষ্য থাকিবেন, ততদিন কাঁদিবেন। যদি আপনি পত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া একখানি পুস্তক করিয়া রাখেন, তাহা হইলে আমার দুঃখ পাঠ করিলে পাষাণ হৃদয় গলিবে, পশু পাখী কাঁদিবে, আমি এই প্রকার থাকিব, দেখিতে পাইব; কিন্তু আমাকে কেহ দেখিতে পাইবে না। আর কতক গুলা ধ্বংস-দূত পাষণ্ড বধ হইলেই সে দিন আসিবে। যে ইহুদীগণ যীশু খৃষ্টকে ক্রুসে আবদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছিল, তাহারাই এখন খৃষ্টের জন্য কাঁদিতেছে। ইহাতে ভগবানের বাৎসল্যের ত্রুটী হয় নাই। এ প্রকার ভক্ত বাৎসল্য আর কোন যুগে দেখান হয় নাই। এই দরিদ্রের দ্বারা ১৫ বৎসর কাল বিনা মূল্যে সুলভ সমাচার বর্ষণ করিয়া ভক্তদিগকে জানাইলেন, আমি তোমাদের দুঃখ দর্শনে সর্ব্বদা ক্রন্দন করিতেছি, তোমরা আমাকে ভুলিয়া বাজে কাজে অর্থব্যয় আনন্দ করিতেছ।" ঘুম ভাঙ্গিল না,

"অজ্ঞ জীব নিজ হিতে অহিত করি মানে।
গর্ব্বচূর্ণ হইলে তবে দেখয়ে নয়নে।"

জগতের দৃষ্টি বিপরীত দিকে, হাতী, ঘোড়া, ব্যোমযান, বাইসিকেল লইয়া সকলেই ব্যস্ত; দরিদ্রের দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ সাধন উদ্দেশে ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া আছে; তাহাদের সকলের অর্থ উপায় প্রয়োজন; কেহ অর্থ দিয়া কাহার সাহায্য অথবা অন্যের সেবা করে না; তজ্জন্য এই দরিদ্রের সাহায্য করিতে কেহই অগ্রসর হইতেছে না। তাহাতে আমার কি ক্ষতি হইল? আপনার মাথা আপনি ভাঙ্গিল; আমার দিন ত

চলিয়াই গেল। তাহারা লুচি মণ্ডা খাইলেন, আমার না হয় শাক অন্নেই দিন গেল, মরিতে তো সকলেরই হইবে। কপটাচারীর পশ্চাৎ যম-দূত বসিয়া আছে, উনি দেখিতে পান নাই যখন দেখিবেন, তখনই দরিদ্রকে স্মরণ হইবে। কিন্তু আর আমার দেখা পাইবেন কি? বড় কান্দিতে হইবে, জগৎ শিশ্নোদর চরিতার্থতা-কেই সুখ জ্ঞান করে। অতীন্দ্রিয় নিত্যসুখ কি প্রকারে বুঝিবে? কাজেই কেহ বুঝিতে চেষ্টা করিলেন না, বিনা সাধু সঙ্গে ইহা পাইবার উপায় নাই। আমি আপনাদের জগৎ ছাড়া কুড়ি বৎসর দ্বীপান্তরে বাস করিতেছি। আমি শ্রীধাম গোলক বৃন্দাবন হইতে বংশী রবে এই ভাবেই ডাকিতেছিলাম। "তারা-তরী লেগেছে ঘাটে। কে ও পারে যাবি তো আয় রে ছুটে॥ পারে যাবি, দুঃখ মিটাবি, মনের গিরা দেরে কেটে॥" তখনকারও লোক আপনাদের মত কথা শুনে নাই। তাহাতে কি রামপ্রসাদের কোন ক্ষতি হইয়াছে? তিনি নিত্যধামে বসিয়া কৌতুক দেখিতেছেন।

"বিষম বাঁশীর কথা কহনে না যায়।
ডাক দিয়া কুলবধূ বাহির করয়॥
কেশে ধরি লয়ে যায় শ্যামের নিকটে।
পিয়াসে হরিণী ধায় পড়িয়া সঙ্কটে॥"

এই বংশী ধ্বনি নিত্য হইতেছে, এই বংশী বাজাইয়া ভগবান জগৎবাসীকে ডাকিতেছেন, কিন্তু গুরুদ্রোহী প্রচারকগণ এই ধ্বনি আচ্ছাদন করিতেছেন। অনেকে ইহার নকল করিতেছে এবং হাজার হাজার কুল বধূকে নাচাইতেছে। অসংখ্য সতী স্ত্রীলোক ইহাদের ফাঁদে পড়িয়া ইহ পরকাল নষ্ট করিতেছে। ক্ষতি হইল উহাদেরই, উহাদের সকলেরই ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করা উদ্দেশ্য নহে। উহাদের ধারণা এই প্রকারেই ভগবানকে পাইবে। আপনারা অতি সরল প্রকৃতির লোক, জগতের গতি জানেন না। ইহারা রাত্রিকালে কেউটের প্রসাদ ভক্ষণ করে ও জাতি বিচার করে না, দিন হইলে আবার জাতি বদ্ধ হইয়া বিধি বদ্ধ হয়, ইহারা মনে করে ভগবান রাত্রিতে দেখিতে পান না। আপনারা যদি এই দরিদ্র প্রদত্ত বংশীটী একবার বাজাইয়া দেন তাহা হইলে অনেকগুলি অবলার ধর্ম্ম রক্ষা হয়, আপনাদের মহা পুণ্য হয়, যশে জগৎ পূর্ণ হয় এবং ঐ সকল সাধ্বী স্ত্রীলোকদের আশীর্ব্বাদে আপনাদের প্রতি ভক্তিরাণী বৃন্দাবনেশ্বরীর

দয়া হয়। ইহাতে ভগবান ও ভক্তের কোন দোষ নাই। জীবের দগ্ধ অদৃষ্ট, তাই কেহ মনোযোগী হইলেন না, হেলায় অমূল্য রতন হারাইলেন।

প্রঃ। আপনি লিখিয়াছিলেন "আমি পাগল, অভাবে তিনটী মনুষ্যের অনাহারে প্রাণ যায়।" যদি তাহাই ঘটে তবে গীতার

" কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ।"

এই শ্লোক মিথ্যা হয়। ভগবান অতি ইতর জনকে, পশু পক্ষিকে আহার দিতেছেন, আর আপনার ন্যায় ভক্তের প্রাণ আহারাভাবে নষ্ট হইবে, ইহা কি সম্ভবপর? একথা আপনি লিখিলেন কিরূপে? তবে কি গীতার ঐ উক্তি আপনি বিশ্বাস করেন না?

উঃ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রতি অক্ষরই সার সত্য, ইহার অন্যথা কেহ করিতে পারিবে না। আমি সর্ব্বক্ষণ ঐ মহাবাক্য ধারণ করি, ভগবান সতত ভক্তকে রক্ষা করেন এবং প্রয়োজনীয় সমস্তই অনায়াসে দেন। গর্ভাবাসে রক্ষা করেন। কুড়ী বৎসর বহু বহু লোকের অযথা অত্যাচারেও তাঁহার অপার করুণাবলে এক্ষণ সেই প্রকারই অবস্থান করিতেছি। এতদিন যে কেহ সাহায্য করেন নাই তাহাতে আমার কি ক্ষতি হইয়াছে? ইহার পরও যদি কেহ সাহায্য না করেন, তাহা হইলেও আমার অনাহারে জীবন যাইবে না; তবে নরলীলা অনুকরণে আমার ন্যায় অক্ষম, নির্গুণ, জীবন্মৃতকে দেশবাসীর ভিক্ষা দেওয়া উচিত, ইহাই জগতকে শিক্ষা দিলেন, আমি জানাইতেছি যে দীন অক্ষম দরিদ্র নির্গুণ, অহঙ্কারের দ্বারা মন্ত্রীটীকে বিপাকে হারাইয়াছি। বুদ্ধি হত হইয়াছি; তজ্জন্য দু'টো অশ্ব, দু'টো গজ হস্ত পদ থাকিতেও কিছু করিতে পারিতেছি না। প্রয়োজন কেবল মহাপ্রভুর নামসংকীর্ত্তন মাত্র; জাতীয় ধন ভাণ্ডার হইতে মাসিক দুইটী টাকা সাহায্য করিয়া একটী লোককে অধ্যাত্মজগতে সাহায্যকরিলে ধনভাণ্ডারের কিছু যায় আসেনা, কারণ এ প্রকারের ভিখারী আর অধিক ছিল না, কোটীতে একটী হয়। খ্রীষ্টানেরা অধ্যাত্ম জগতের সাহায্যে কত অর্থব্যয় করে। এই ঘটনাটী খৃষ্টানদের মধ্যে হইলে আজ সমগ্র পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইত। "সময় তো থাকবে না গো মা, কেবল তো কথা রবে। কথা রবে কথা রবে মাগো জগতে কলঙ্ক রবে॥" "জীবে দয়া" কি প্রকারে করিতে হয়, ইহা শিক্ষার জন্য ভিক্ষা।

প্রঃ। আপনি কি বিধি নিষেধকে একবারে উঠাইয়া দিতে চাহেন ? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে মহাপ্রভু, সনাতনকে দিয়া বিধি শাস্ত্র করাইতে উপদেশ দিলেন কেন ? যখন অনুরাগের ঘরে যথেচ্ছাচার হয়, তখন বিধির প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি। আপনি কি বলেন ?

উঃ। বিধি নিষেধ উঠান আমার উদ্দেশ্য নহে। বিধি নিষেধ স্থাপনই আমার উদ্দেশ্য। অজ্ঞানীকে বিধিবদ্ধ করা এবং জ্ঞানীকে হরিনাম দিয়া মুক্তি দান করিবার জন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীর দ্বারা "হরিভক্তি বিলাস" করিয়া জগৎকে জানাইয়াছেন—সর্ব্ব শাস্ত্রে কৃষ্ণ ভজন উদ্দেশ্য। প্রভু শ্রীরূপ গোস্বামী দ্বারা চারি লক্ষ রস শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, অনুরাগের ভজন শ্রীরূপ গোস্বামীর করুণা ও সাধুসঙ্গ ব্যতীত জ্ঞাত হইবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। যথেচ্ছাচার দ্বারাই অন্ধ পরম্পরায় সৃষ্টি হইয়াছে। ভাগ্যবান লোকই অনুরাগ ভজন পাইতে পারেন। অনুরাগ না হওয়া পর্য্যন্ত বিধিবদ্ধ থাকা সকলেরই উচিত। বিধি না থাকাতেই যথেচ্ছাচার হইয়াছে। চারি যুগে চারি প্রকার যুগধর্ম্ম এবং ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া যাহা আজ্ঞা দেন, তাহাই বিধি।

"ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগ মার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম॥"

"ভবেৎ ক্রিয়া বিধিলিঙ অন্যথা প্রত্যবায়॥"

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ সেবনং
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্য সখ্যমাত্ম নিবেদনং।"

ইহাতে মালা তিলক বা অন্য কোন প্রকার ঐশ্বর্য্য-পূজার কথা নাই, অনুরাগ না হওয়া পর্য্যন্ত এই আচরণ কর্ত্তব্য।

ক্রমশ—

শ্রী———

"অনুরাগে।"

———:o:———

দিন'ত ফুরায়ে যায় ;
দিনে দিনে পলে পলে জানিনা কেমনে ?
ধরাতলে শান্তি কোথা, শুধু হৃদয়ের ব্যথা,
আঁকা আছে তায়।
জ্বালাময় বিষময় সংসার ভবনে,
র'বে আর কত দিন দগধ পরাণ
ভেবেছিনু সুখে যাবে,
গণাদিন গুলি এবে অশান্তি আধার।
বুক ভরা ছিল আশা মিটাতে অনন্ত তৃষা
কোথায় মিলিবে ?
অভাগা চাহিলে পরে শুখে' প্যারাবার,
সুধার সংসারে আজ রুচির বিকার।
হে বিভো করুণাময় !
কাঙ্গালের চির আশা, আছে রাঙ্গাপায়।
বিপদ বারিদ চয়, শুনিয়াই পায় লয়
(পায়) যে শরণ লয়।
রাঙ্গা পা দু'খানি তাই ধরিতে হিয়ায়,
অনুরাগে এ কাঙ্গাল ডাকিছে তোমায়।

দীন শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাস।

রাঙ্গা পা দু'খানি।

টুক্ টুক্ টুক্।

---:০:---

বিমল গগনে যথা ফুল্ল শশধর।
যথা পত্র গুচ্ছ মাঝে কুসুম সুন্দর॥
যশোদার কোলে যথা শোভে নীলমণি।
শচীর দুলাল শচী কোলেতে তেমনি॥
মাতৃস্তন্য-ধারা পূর্ণ নিমাই'র মুখ।
নীচে পাদপদ্ম লাল টুক্ টুক্ টুক্॥

দীন শ্রীরসিকলাল দে।

মাতৃ উপাসনা।

(১)

কে ? মা।

কে আমাকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন ?

ভূমিষ্ঠ হইবারপর কে আমার মুখ দর্শন করিয়া গর্ভজনিত দারুণ বেদনানুভব বিস্মৃত হইয়াছেন ?

শৈশবে কে আমায় প্রাণপণ যত্নে লালন পালন করিয়াছিলেন। আমার ক্রন্দনধ্বনি শুনিলেই কে সহস্র কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট ছুটিয়া আসিতেন এবং নানা মনোরম দ্রব্যের প্রলোভন দেখাইয়া আমার মনস্তুষ্টি করিতে যত্নবান হইতেন ? দুরন্ত মশক আমার শরীরের শোণিত পান করিতে আসিলে তাহাদিগকে দূরে বিতাড়িত করিয়া কে কোমল হস্তের মধুর স্পর্শদানে আমার

নিদ্রাকর্ষণ করাইতেন? শৈশবের স্বাভাবিক অজ্ঞতা বশতঃ মল মূত্র ত্যাগ করিলে কে সেই ঘৃণ্য ন্যাক্কারজনক মলরাশি অকুণ্ঠিত চিত্তে ও আহ্লাদ সহকারে উদ্ধার করিয়া আমার শয়ন-স্থান পরিষ্কার করিয়া দিতেন?

সন্ধ্যাকাল, গগন প্রাঙ্গনে মোহন চাঁদ উদয় হইয়াছে; আমি শৈশবে সেই চাঁদ ধরিবার জন্য আব্‌দার করিতাম; আমাকে ভুলাইবার জন্য, আমার অন্যায় আবদার থামাইবার জন্য "আয় চাঁদ আয় চাঁদ" বলিতে বলিতে কে আমায় ক্রোড়ে লইয়া গৃহ প্রাঙ্গনে নাচাইতে নাচাইতে চাঁদ দেখাইতেন?

কে তিনি?—তিনি আমার "মা"—

আমার পীড়া হইয়াছে; আমি শয্যাগত থাকিয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ ফট্‌ করিতেছি, কে মলিন বেশে বিষণ্ণচিত্তে আমার পার্শ্বে বসিয়া সতৃষ্ণ নয়নে আমার দিকেই চাহিয়া থাকিতেন। আহার নাই, নিদ্রা নাই, রাত্রি নাই, কে রাজারদ্বারে কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণ রক্ষকের ন্যায় আমার শয্যাপার্শ্বে প্রহরীরকার্য্য করিতেন, আমার রোগের শান্তির জন্য কে একমনে ইষ্টদেবতার ধ্যান করিতেন? বল দেখি? মায়ের ছেলে, তিনি—কে?

এই মা সংসার কাননের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। উত্তপ্ত সংসার মরুভূমির একমাত্র আশা। মার সুশাসনে এবং সাদর স্নেহে কেমন সুশৃঙ্খলতার সহিত সংসার পরিচালিত হয়; মা আমার সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর ন্যায় বিঘ্ন বিপত্তি, জ্বালা যন্ত্রণার মধ্যে থাকিয়া কেমন হাস্যমুখে ধীর স্থির হইয়া আমাদিগকে তুষ্ট করেন। ধন্য তাঁহার সহিষ্ণুতা ধন্য তাঁহার প্রেমময় হৃদয়ের কোমল ভাব-রাজি!

আমাদের মুখপানে চাহিয়া এমন করিয়া স্নেহ দান করিতে, নিজে না খাইয়া আমাদের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে মা ভিন্ন এমন কে আছে রে? যার, মা নাই তার পক্ষে সংসার অন্ধকারময়, সংসার তাহার পক্ষে বড়ই ভীতি পূর্ণ এবং যন্ত্রণাপ্রদ স্থান!

মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্য্যা চাপ্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহং॥"

যথার্থ বটে। যাহার মা নাই তাহার পক্ষে গৃহবাস, বনবাস, উভয়ই সমান।

"মা" নামটী যেমন মধুর, মা'র কার্য্যগুলিও তেমনি সুন্দর ও মধুময়। মা নামটী যেমন কোমলতা পূর্ণ, মা'র হৃদয়খানিও সেইরূপ সরলতা ভরা। বাহিরের কার্য্যে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, প্রাণে কি যেন কি একটা অশান্তির ছায়া পড়িয়াছিল, গৃহে আসিয়া দেখিলাম মা ব্যস্তসমস্ত হইয়া আমার কষ্টোপশম করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছেন, সহস্র কার্য্য ফেলিয়া আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছেন, আমি মা বলিয়া ডাকিলাম, এমন বুকভরা প্রাণজোড়া নামে আমার অর্দ্ধেক কষ্ট যেন তৎক্ষণাৎ দূর হইল; সমস্ত দিন মা আমায় দেখেন নাই, তাই আমার জন্য তিনি নিজ ভাণ্ডার হইতে যত্ন সঞ্চিত বাছা বাছা ফল সুমিষ্ট দ্রব্য আনিয়াছেন; আমার দেহ ঘর্ম্মাক্ত দেখিয়া স্বহস্তেই ঘর্ম্ম মুছাইয়া দিতে-ছেন প্রখর তপন কর পীড়িত পথিক যেরূপ বটবৃক্ষের শীতল ছায়ায় শ্রান্তিদূর করে, আমিও তদ্রূপ মায়ের কোমল প্রাণের অতুল স্নেহ স্পর্শে মুগ্ধ হইতেছি।

আহা কি স্নেহ! কি প্রাণের টান!! কি মোহকর প্রীতিপ্রদ মাতৃস্নেহ!!! এ স্নেহের কথা প্রকাশের অযোগ্য, এ স্নেহ কেবল কল্পনারই অনুভব্য। প্রকৃতির মূল্যবান্ ভাণ্ডার হইতে কবির নীরব আনন্দ পানের ন্যায় এ আনন্দ নীরবে পান করাই বিধেয়।

আহা এমনি মা! এমনি মায়ের স্নেহ!! তবে কি মায়ের স্বতন্ত্র প্রাণ নাই, আমার প্রাণই কি মায়ের প্রাণ, আমার আত্মাই কি মায়ের আত্মা, আমার দেহই কি মায়ের দেহ, মায়ের ভালবাসার সহিত তুলনা দিতে জগতে এমন সুন্দর দ্রব্য ত কিছুই খুঁজিয়া পাই না। শারদীয় জ্যোৎস্না প্লাবিত রজনী দেখিয়াছি, অমল ধবল সুষমার আধার গোলাপের মধুর হাসির মধ্যে একটী সজীব সত্তার সঞ্চার দেখিয়াছি, পঙ্কিলতাবিহীন সরোবরের স্বচ্ছ অনাবিল সলিলোপরি চন্দ্রের রজত কিরণ উদ্ভাসিত হইতে দেখিয়াছি, সমুদ্রের তরঙ্গ নিচয়ের স্তরে স্তরে সূর্য্যের সৌন্দর্য্যময় প্রতিবিম্ব খেলা করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু মায়ের হৃদয়ে সঞ্চালিত স্নেহরে অপূর্ব্ব জ্যোতির ন্যায় একটী প্রাণ স্নিগ্ধকারিণী অলোকপ্রভা তো কোথাও দেখিলাম না, তবে কি এ নিঃস্বার্থ মাতৃ প্রেমের তুলনা, এ স্বর্গীয় ভালবাসার তুলনা এ জগতে নাই!!

স্নেহের আধার, দেবী প্রতিম এমন মাকে কে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারে? এমন মাকে যিনি দেবী বোধে পূজা না করেন, তিনি ঘোর পাষণ্ড, তিনি মনুষ্য

চর্ম্মাবৃত পশু মাত্র। আনন্দময়ী জগজ্জননীর পূর্ণ প্রতিকৃতি প্রত্যক্ষ দেবী স্বরূপা এ মূর্ত্তির পূজা না করিলে তুমি কাহার পূজা করিবে? কে তোমার পূজায় সন্তুষ্ট হইবেন? এই মা আর সেই মা কি ভিন্ন? আমি পুত্র হইয়া যেমন মা ছাড়া নহি মাও তদ্রূপ আনন্দময়ী জগজ্জননী ছাড়া নহেন। চক্ষুর সম্মুখে এমন প্রতিমা থাকিতে, পাগল কোথায় যাও, কোথায় ছুটিয়া যাও। নদীস্রোতে ভাসমান তৃণখণ্ড যেমন সমুদ্রে আসিয়া পড়ে আমি ক্ষুদ্র-তৃণ স্বরূপ তেমনি মা'র উপাসনা করিতে করিতে সেই চিদানন্দময়ী মায়ের কোলে গিয়া পড়িব। তাই বলি, এই মায়ের উপাসনা করিলেই আমার সেই মায়ের উপাসনা করা হইবে।

"পিতা ধর্ম্ম, পিতা স্বর্গ, পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্ব দেবতা॥"

আমি বলি মাও, তাই। মাতা স্বর্গ, মাতা ধর্ম্ম মাতা আমার জপ, তপ, মা আমার ধ্যান, ধারণা। এস প্রিয়ভক্ত পাঠকবর্গ আমরা নিজ নিজ মাকে সন্তুষ্ট করিয়া সর্ব্বদেবীর প্রীতি সাধন করি।

দীন—রসিকলাল দে।

শ্রীগৌর পূর্ণিমা।

——:০:——

(স্মৃতি উৎসব।)

আজি, জোছনা-পুলকে ফুল্ল যামিনী,
বাসন্তী পূর্ণিমা এসেছে।
আজি, শ্রীগৌর চাঁদের জনম তিথির,
মধু মহোৎসব জেগেছে॥
তোরা, আয় ভাই আয় গৌর ভক্তগণ!
নব সুর প্রাণে তুলিয়া।
গোরাগুণ-গাঁথা, গাহিয়ে গাহিয়ে,
প্রেমানন্দে নাচি মাতিয়া॥

মোদের, প্রাণের ঠাকুর গৌরাঙ্গ সুন্দর
নিমাই শ্রীশচীনন্দন।
ওরে, পরকট ভাবে এসেছিল ভবে,
এখনো সে ভাব স্ফুরণ
আজিকার নিশি সুষমাররাশি,
চৌদিকে বিকাশি রয়েছে।
যেন, শ্রীগৌর স্মরণে প্রফুল্ল প্রকৃতি,
ভাবেতে মাতিয়া উঠেছে॥
আয় আয় সবে, নাচি মহোৎসবে,
সকলে মিলিয়া মিশিয়া
ওই শুন ওই, ডাকিছে দয়াল
মধুর আহ্বান তুলিয়া॥
"এস মিলে মিশে" কাতর এ স্বর,
"সেবানন্দ" যাহা শুনেছে।
মাভৈঃ, মাভৈঃ কি মধুর ধ্বনি!
হিয়া ভরপুর করিছে॥
গৌর নাগর, পরম সুন্দর!
নাগরীর ভাবে ছুটিয়া।
এ মহা উৎসবে, পরাণ বল্লভে
এস ডাকি প্রাণ ভরিয়া॥
সে যে, বড় দয়াময়, ডাকিতে ডাকিতে
আসিবে প্রেমের বন্য।
তার, রূপের আলোকে, ভাবের পুলকে
ঝলকিবে সারা বিশ্ব॥

দীন শ্রীরসিকলাল দে।

সৎপ্রসঙ্গ।

—:o:—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

চ। বিজ্ঞানে অনুভূতি হইবার পরে কি চক্ষু মুদিলেই শ্রীভগবানের রূপ দেখা যায়?

র। সমুদ্রের জলে লবণের আস্বাদ অনুভব কর বলিয়া কি উহা ছাঁকিলেই লবণ দেখিতে পাও? ঐ জলের মধ্যস্থ লবণকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে হইলে যেমন তাপের সাহায্য লইতে হয়, সেইরূপ অনুভবের পরে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে ধ্যান যোগ অবলম্বন করা আবশ্যক।

চ। এই ধ্যান পথে অগ্রসর হইবার সহজ উপায় কি?

র। পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে, কিন্তু বিষয়টি যখন দুরূহ ও আবশ্যকীয় তখন তোমার ধারণার জন্য পুনরায় বিশদ ভাবে বলিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

ধ্যান শব্দের অর্থ চিন্তার দ্বারা মনকে কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তুতে বা বিষয়ে সংযুক্ত রাখা, জ্ঞান লাভের পরে যখন সাধক বিজ্ঞানে সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যসত্তার অনুভব করেন, তখন তিনি শ্রীভগবানকে প্রত্যক্ষ করিবার উদ্দেশে স্থূল বা সূক্ষ্ম যে কোন লক্ষ্যে একাগ্রতার চালনা করিয়া পরিণামে সফল কাম হন, কেননা তাঁহার একাগ্রতা যখন চৈতন্যের অব্যক্ত ভাব ভেদ পূর্ব্বক ব্যক্ত বা স্বরূপ ভাবে সংযুক্ত হয় তখন সেই জ্যোতীর্ম্ময় চিৎসত্তা তাঁহার ভাবানুকুলে ঘনীভূত হইয়া শ্রীভগবান রূপে প্রকাশ হন, কিন্তু প্রথমতঃ সাধকের একাগ্রতা স্থূল লক্ষ্যে প্রযুক্ত হইলেই ভাল হয়, এবং সেই লক্ষ্য তাহার আপন ভাবানুযায়ি ভগবদুদ্দীপক কোন মুর্ত্তি হইলে আরও সুবিধা, উদ্দেশ্যই কর্ম্মকে চালনা করিয়া লাভের কারণ হয়, শাবক বহিষ্কৃত করিবার উদ্দেশ্যে যেমন পক্ষীগণ ডিম্বগুলিতে তাপ দেয়, ফুল ফুটাইবার উদ্দেশ্যে যেমন কণ্টকময় পুষ্পবৃন্তে জল সেচন করা হয়, সেইরূপ শ্রীভগবানকে

প্রত্যক্ষ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাকুল হইয়া স্থূল লক্ষ্যে একাগ্রতার চালনা করিতে করিতে তন্ময় হইলেই সাধকের চক্ষু আপনা হইতে মুদ্রিত হয় এবং তাঁহার অন্তঃদৃষ্টি সূক্ষ্মতত্ত্ব ভেদ পূর্ব্বক কারণ স্বরূপ শ্রীভগবানের চিন্ময় রূপে সংযুক্ত হওয়ায় তিনি সচ্চিদানন্দ সম্ভোগ করেন।

নৌকার সাহায্যে নদী উত্তীর্ণ হওয়া সহজ হইলেও শক্তিমান ব্যক্তি যেমন সন্তরণের দ্বারাও পার হইতে পারেন, সেইরূপ তীব্র সংকল্প সম্পন্ন সাধক যদি স্থূলকে অবলম্বন না করিয়া সূক্ষ্ম হইতে অগ্রসর হওয়া সুবিধা বোধ করেন তাহা হইলে প্রথমতঃ ব্যাকুল প্রার্থনার দ্বারা শক্তিসঞ্চয় পূর্ব্বক চক্ষু মুদিয়া চৈতন্যের অব্যক্ত ভাব বোধে অন্ধকারে একাগ্রতা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, অপর কোন বিষয় চিন্তা না করিয়া উদ্দেশ্যকে দৃঢ় ও লক্ষ্যকে স্থির রাখিবার জন্য প্রণবকে আশ্রয় করিলে সুবিধা হয়, শাস্ত্রে আছে—

প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্য মুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥

মুণ্ডকোপনিষদ্।

অর্থাৎ প্রণব কে ধনু ও মন কে শর কল্পনা করিয়া ব্রহ্মলক্ষ্যে স্থির ভাবে প্রয়োগ করিলে ঐ মন রূপ শর তন্ময় হইয়া যাইবে।

লণ্ঠণের মধ্যে আলোক থাকিলে যেমন বাহিরের বায়ু তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না সেইরূপ প্রণবের মধ্যে মনকে রাখিলে উহা বহির্বিষয়ের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয় না।

চৈতন্যজ্যোতী স্থূল নয়নের দ্বারা দেখা যায় না, ইহা অন্তশ্চক্ষুর দর্শনগম্য, কিন্তু আলোক রশ্মির সহিত সংযোগ না হইলে যেমন স্থূল চক্ষুর দ্বারা দেখা যায় না, সেইরূপ চৈতন্য জ্যোতীর সংযোগ ভিন্ন অন্তশ্চক্ষু দর্শনক্ষম হয় না, আলোকের মৃদুতম কম্পনে স্থূল চক্ষু যেমন অন্ধকার দেখে, সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যজ্যোতীর অব্যক্ত প্রকাশে অন্তশ্চক্ষু অন্ধকার দেখে, কিন্তু সূর্য্যালোকের মধ্যে অগ্নি অব্যক্তভাবে থাকিলেও যেমন আতস প্রস্তরের কেন্দ্রীকরণ শক্তির দ্বারা ঘনীভূত হইলে উহা হইতে অগ্নির প্রকাশ হয়, সেইরূপ ব্রহ্মবুদ্ধিতে অন্ধকারের কেন্দ্রে মনকে একাগ্রভাবে চালনা করিবার ফলে ক্রমে যখন উহাতে কেন্দ্রীকরণশক্তির প্রতিষ্ঠা হয় তখনই উহার সংযোগে অব্যক্ত চৈতন্যজ্যোতী ঘনীভূত হইয়া

ব্যক্তভাব ধারণ করে জানিও, অথবা মৃত্তিকার সহিত বারি অব্যক্ত ভাবে আছে, কিন্তু একলক্ষ্যে খনন করিতে থাকিলে শেষে যেমন উহার মধ্য হইতে ব্যক্ত বারির প্রকাশ হয় সেইরূপ অন্ধকারেও চৈতন্য জ্যোতী অব্যক্ত ভাবে আছে এবং ঐ অন্ধকারের কেন্দ্রে একাগ্রতার সহিত মনের চালনা করিলে পরিশেষে ঐ অন্ধকারের মধ্য হইতে চৈতন্যজ্যোতী ব্যক্ত হইয়া অন্তশ্চক্ষুকে দর্শন ক্ষম করে, জ্ঞানী এই পরমজ্যোতী দর্শনে বিস্ময়োল্লাসভরে তাহাতে অবগাহন পূর্ব্বক মুক্ত ও জ্যোতীর্ম্ময় হইয়া অক্ষয়ভাবে প্রশান্ত ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করেন, আবার ভক্তের ভক্তিবলে যখন এই অনন্ত জ্যোতীর উৎস স্বরূপ শ্রীভগবান তাহার ভাবানুযায়ি চিদ্‌ঘন মুর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক আবির্ভূত হন, তখন সেই প্রশান্ত ব্রহ্মানন্দ সাগরে প্রেমানন্দের তরঙ্গোচ্ছ্বাস হয় জানিও।

চ। কি উপায়ে ভগবল্লক্ষ্যে একাগ্রতা স্থায়ী হয় ? এবং ধ্যান ঠিক্ হইতেছে কিনা তাহা কি লক্ষণের দ্বারা বুঝা যায় ?

র। সদ্‌গ্রন্থপাঠ ও সৎসঙ্গাদির দ্বারা বিবেক ও বিচার শক্তি যত বৃদ্ধি পায় সংসারের নশ্বরতা বোধ স্থায়ী হওয়ায় মন ততই বহির্বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া ভগবল্লক্ষ্যে স্থির হইতে থাকে এবং এইরূপে অনন্ত আনন্দ লাভের কারণ স্বরূপ আনন্দময় শ্রীভগবানকে প্রত্যক্ষ করিবার আকুল আকাঙ্খা যত পুষ্ঠ হয়, মন নিস্তরঙ্গ হওয়ায় ধ্যান ততই গাঢ় হইতে থাকে ; এই সময়ে বহির্বিষয় চিন্তার ঘাত প্রতিঘাত উপশম হওয়ায় হৃদয় মধ্যে আধ্যাত্মিক কম্পনের বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং ঐ কম্পনের তড়িৎ শক্তি বাহিরের সূক্ষ্ম পরমাণুতে প্রতিফলিত হওয়ায় ধ্যানের পর চক্ষুরুন্মীলন করিলে চারিদিকে বিদ্যুৎ ঝলকের ন্যায় আলোক কণা দেখা যায়, দুর্ব্বলাবস্থায় আলস্য ত্যাগ করিলে বা মস্তকে হটাৎ আঘাত লাগিলে লোকে যেমন সরিস্মর ফুল দেখে, প্রথমাবস্থায় এই জ্যোতী অনেকটা সেইরূপ ; তবে বিদ্যুতের ন্যায় সর্পাকার মাত্র, অন্তর্লক্ষ্যে একাগ্রতা যত বৃদ্ধি পায়, এই জ্যোতীর বাহ্য বিকাশ ততই উজ্জল হয়, ফলে এই আধ্যাত্মিক কম্পনই ভাবের দ্বারা ঘনীভূত ও মনের দ্বারা চালিত হইয়া শক্তিরূপে অপরের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়, আকর্ষণ, ও স্তম্ভন প্রভৃতি নানারূপ ক্রিয়া এই শক্তির দ্বারা সাধিত হইতে পারে জানিও।

আর একটি কথা মনে রাখিও যে বহির্বিষয় হইতে মন প্রত্যাহৃত হইবা মাত্রই নিস্তরঙ্গ হয় না, উহার বহির্ম্মুখীন স্রোত নিরুদ্ধ হইবার পরে জলমধ্যস্থ বুদ্বুদের স্থায় সূক্ষ্মতত্ত্বের তরঙ্গগুলি অন্তশ্চক্ষুর গোচর হয়, ঐ সময়ে বোধ হয় যেন অন্ধকার সমুদ্রের কেন্দ্র হইতে এক একটি বুদ্বুদ্ উঠিতেছে ও মিলাইয়া যাইতেছে, ক্রমে যখন সবগুলি মিলাইয়া যায় ও অন্ধকার সমুদ্র প্রশান্ত হয় তখন স্থূল নবঘনের দ্বারা চন্দ্র আবৃত হইলে যেমন উহার জ্যোতীহীন শ্বেত আকারটি মাত্র দেখা যায় ও ক্রমে বায়ুর দ্বারা ঐ মেঘ যত ক্ষীণ হয় ততই যেমন উহার উজ্জলতা বৃদ্ধি পায় ও পরে সম্পূর্ণ রূপে মেঘোন্মুক্ত হইলে স্বীয় বিমল প্রভার দ্বারা জগত উদ্ভাসিত করে সেইরূপ সূক্ষ্ম তত্ত্বের তরঙ্গগুলি বিলীন হইলে সাধকের লক্ষ্যস্থল হইতে বৃত্তাকারে অতি ক্ষীণ আলোকের আভাস পাওয়া যায় ও ঐ আলোকের উপর মনের একমুখীন্ বেগ পতিত হওয়ায় ক্রমশঃ উহার আবরণ যত ক্ষীণ হইতে থাকে ততই ঐ আলোকের উজ্জলতা বৃদ্ধিপায়, পরে ধ্যান গাঢ় হইয়া সমাধিতে পরিণত হইলে যখন উহা আবরণ মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্ত হয়, তখন চৈতন্যের বিমল জ্যোতীতে সাধকের হৃদয় উদ্ভাসিত ও অন্তদৃষ্টির পূর্ণ বিকাশ হয়, ফলে তাঁহার ভাবানুযায়ি সকল আশাই পূর্ণ হয়, তিনি অনন্তকালের তরে কৃতার্থ হন।

ক্রমশঃ

শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

ভক্তের পত্র।*

—:০:—

(গোপীভাব ও মধুর রস।)

ভাই রসিক!

তুমি বড় চতুর লোক, তুমি আগে থেকেই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সারধন "রাঙ্গা পা দু'খানি" আশ্রয় করিয়া বসিয়াছ। আর ভাবনা কি? দেখিও

* মধুর রসের চারিদিকে ছড়াছড়ি, উহার অযথা ব্যবহারের বাড়া বাড়ি দেখিয়া, "মধুর রস ও শ্রীপাদপদ্ম'' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা করিলাম

ভাই! সাবধান! যেন কলির কুহকে পড়িয়া মধুর রসের আপাত মধুর আলোচনায়, সাধনের ধন রাঙ্গা পা দু'খানি ভুলিয়া যাইওনা।

অদ্য অব্যক্ত আর্ত্তনাদ স্বরূপ, আমার জ্ঞান বুদ্ধির অগোচর, কল্পনার অনধিগম্য বিষয়ের আভাস দিবার জন্য দুই একটী কথা মাত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর।

ভাইরে! শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যের পর মধুর রস,—মধুর ভাব, বড় দূরের কথা। এই মধুর রস আমার তোমার আস্বাদ্য বা অনুভবনীয় নহে। কি সর্ব্বসাধারণের এক চেটিয়া সম্পত্তিও নহে। আমাদের মত কলিক্লিষ্ট কত লক্ষ কোটি জীব যে মধুর লোভে বিষ পান করিয়া মরিতেছে তাহার কি সংখ্যা আছে তাই তো, আজ সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই দুরবস্থা, এই শোচনীয় ভাবান্তর।

আমাদের দেশের যত দুর্দ্দশা, যত কলঙ্ক, যত অনর্থ পাত, কেবল এই "মধুর" হইতেই উৎপত্তি হইয়াছে। বৈষ্ণব—বৈষ্ণবী বলিতেই শিষ্ট লোকেরা যে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া উঠে, তাহার কারণও এই "মধুর রস।" বৈষ্ণব,—বৈষ্ণবীর নাম হইয়াছে,—নেড়া নেঁড়ী, কেবল মধুরের গুণে।

মহাপ্রভু নিজমুখে বলিয়াছেন,—

"একেলা রামানন্দের হয় ঐছে অধিকার।"

সেই রামানন্দ কি প্রকার লোক,—না—

"পাষাণ কাষ্ঠ স্পর্শে যৈছে ভাব।
তরুণীর স্পর্শে রায়ের তৈছে স্বভাব॥"

তৎপূর্ব্বেই; আমার পরম পূজনীয় বিজয় দাদাকে (বৈষ্ণব সাহিত্যের সুপরিচিত লেখক শ্রীবিজয় নারায়ণ আচার্য্য) এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করিতে বলিলাম। শ্রদ্ধাস্পদ বিজয় দাদা, আমার অন্তরের ভাব জানিয়া যে অমিয় মধুর উপদেশ পূর্ণ লিপিখানি, আমাকে লিখিয়াছিলেন, তাহা ভক্ত মণ্ডলীর পরম আস্বাদ্য পদার্থ জ্ঞান করিয়া "ভক্তির" শ্রীঅঙ্গে উহা ধারণ করিলাম। শ্রীপাদপদ্ম মকরন্দ লোভী ভক্ত ভৃঙ্গগণের, এ পত্র খানির রসাস্বাদনে বিশেষ আনন্দ লাভ হইবে বলিয়াই আশা করি। আমরাও, বিজয় দাদার সহিত এক বাক্যে বলিতেছি, "দুর্ব্বল আমরা, দুর্ব্বলের বল রাঙ্গা পা দু'খানি।"

দীন—শ্রীরসিকলাল দে।

এই রামানন্দ ভগবল্লীলায় বিশাখা সখী। গৌর লীলার নিত্য সিদ্ধ পার্ষদ। তাহার সঙ্গে সাধারণ জীবের তুলনা কি?

মধুর রস, সর্ব্বপ্রধান। এসম্বন্ধে কোন কথা নাই। তাহা হইলেও ইহা আমাদের জন্য নহে। তাহার জন্য বিশেষ পাত্র কি পাত্রী আছেন। তাহা কি ভূলোকে, না, গোলোকে, জানি না।

শান্তাদি রস চতুষ্টয়, মধুরেতে বিদ্যমান থাকিলেও আমরা তাহার অর্থাৎ মধুরের অধিকারী নহি। "কৃষ্ণে নিষ্ঠা তৃষ্ণাত্যাগ, শান্তের দুই গুণ।" বোধহয় এই পর্য্যন্ত হইতেই জীবের কত কোটি জন্ম গত হইয়া যাইবে। মধুর তো বহু দূরে। তবে আজ্‌কাল কতকগুলি লোক, মধুরের ভান করিয়া কু-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং কতকগুলি নিরীহ নর নারীকে কুপথগামী করিতেছে।

ভাইরে! আমারা কাম মোহিত কলির জীব, সর্ব্বদা বিষয় পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরিতেছি। এমতাবস্থায় আমাদের যদি কোন সাধন ভজন, কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, থাকে, তবে তাহা "শ্রীশ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন" ও "শ্রীশ্রীভগবানের পাদপদ্মের অনুধ্যান।" ভাই রসিক! তুমি তো "রাঙ্গা পা নিধি," রাঙ্গা পা দু'খানির মাহাত্ম্য কিছু বুঝিয়াছ, না? অবশ্য বুঝিয়াছ। আঃ! কি মধুর, মধুর হইতেও সুমধুর রস!!

পাদপদ্মের অনুধ্যানে বসিলেই মধুর রসের অনাবিল তরঙ্গ আসিয়া হৃদয় খানা ডুবাইয়া লয় কি না লয়, তাহা পাদপদ্মের পীযুষানুরক্ত ভক্ত ভ্রমর গণই জানেন সে বিষয় আমি কি জানি?

ভাইরে! ইহাই আমাদের সাধন সিদ্ধির শেষ সীমা। ইহার পর,—আরও উপরে উঠিতে চাহিলেই সর্ব্বনাশ! রসিক! অসাধ্য সাধনে অগ্রসর হইলে অধঃপতন অনিবার্য্য।

মধুর রস যে কি,—তাহাও বুঝি না—এবং জীবনের কোন অবস্থায় যে উহা উপভোগ্য হইতে পারে, তাহাও কল্পনায় আনিতে পারি না। এমতাবস্থায় আমি কি মাথা মুণ্ড লিখিব, কিছুই স্থির করিতে পারি না।

স্থির করিতে না পারিলেও মোটা মোটী এইমাত্র বুঝিয়াছি যে গোপীভাবের অনুসরণ ভিন্ন মধুর রসের কিঞ্চিন্মাত্রও বোধ জন্মিতে পারে না।

সুতরাং মধুর রস বুঝিবার পূর্ব্বে গোপীভাবের আংশিক জ্ঞান লাভের আবশ্যক, বিবেচনা করি। শুধু এই আংশিক জ্ঞানের বলে মধুর রস বুঝা যাইবে না।

মন, প্রাণ, দেহ সম্যকরূপে গোপী ভাবাশ্রিত অর্থাৎ গোপীভাবে বিভাবিত হওয়া চাই। তবে যদি মধুর রসের মাধুর্য্য কণিকা লাভে সমর্থ হওয়া যায়।

এখন গোপীভাব যে কি, তাহার কিঞ্চিদাভাস প্রদত্ত হইতেছে,—রসিক! প্রকৃতি অর্থাৎ স্ত্রীভাবই যে গোপী ভাব, তাহা তুমি মনে করিও না। কখনও মনে করিও না।

এই দুর্জ্ঞেয় গোপী ভাবের নির্ম্মলতা; উজ্জ্বলতা, উচ্চতা, বিশুদ্ধতা মানুষ প্রাকৃতিক জ্ঞান বুদ্ধির সহায়তায় বুঝিতে পারিবে না। অপ্রাকৃত চিন্ময় বিভূতি, হৃদয়ে ফুটিয়া না উঠিলে, গোপী ভাবের নির্ম্মল জ্যোতি তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না। এখন বলতো ভাই! এই মায়া মুগ্ধ কামাশক্ত হৃদয় লইয়া আমি তোমাকে গেপীভাব কেমন করিয়া বুঝাই? গোপী ভাব না বুঝিলে "মধুর রস" বুঝিবার আর অন্য উপায় নাই। আমি নরাধম নরকের কীট, গোপী ভাবের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া, এখন চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছি। হরি হরি! এ কি বাতুলের চেষ্টা।

আমি এই অসাধ্য, সাধনে অগ্রসর হইয়া বড়ই লজ্জিত হইলাম। রসিক! ক্ষমা করিও। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে এবং মধ্যের অষ্টমে গোপী ভাবের আভাস প্রাপ্ত হইবে। দেখিয়া লও। দেখা থাকিলেও পুনঃ পুনঃ দেখ।

মোট কথা,—এই মধুর রসাস্বাদনের যোগ্য পাত্র আমরা কখনই না।

"আমরা দুর্ব্বল; দুর্ব্বলের বল, রাঙ্গা পা'দুখানি" কেবল" গোপীভাব ও মধুরস" এরই বিষয় তুমি আগে একটী প্রবন্ধ লিখিবে পরে লিখ, "মধুর রস ও পাদপদ্ম।"

তোমার বিজয় দাদা।

আবাহন।

হৃদয়বল্লভ! একবার হৃদয়মধ্যে এস, আর দূরে দূরে থাকিও না; আসিয়া দেখ অভাগার হৃদয়াভ্যন্তরে কিরূপ ভীষণ অনল ধূ ধূ করিয়া দিবানিশি জ্বলিতেছে। আসিবে না? হৃদয় অগ্নিময় বলিয়া কি আসিতে ভয় হইতেছে? তা তোমার আবার ভয় কি? তুমি যে ভবভয়হারী, তোমার চরণ স্পর্শে অগ্নি শীতল হয়। বালক প্রহ্লাদ যখন তাহার পিতার আদেশে দৈত্যগণ কর্তৃক প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তখন তুমিইত তাহাকে কোলে করিয়া রক্ষা করিয়াছিলে। কৈ, তাহাতে ত প্রহ্লাদের এক গাছি কেশও দগ্ধ হয় নাই। তবে কি পাপী বলিয়া ঘৃণা হইতেছে? যদি তাই হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে তোমার পতিতপাবন নামে কলঙ্ক হইবে—হরি! তুমি এক সময় পাপী তাপীর উদ্ধারের জন্য সাধের চূড়া বাঁশী ত্যাগ করিয়া শ্রীনবদ্বীপে গৌর হইয়া কাঙ্গালবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলে। কত শত মলিন জীবকে প্রেম মন্দাকিনীর পবিত্র নীরে বিধৌত করিয়া, তোমার হরব্রহ্মা সেবিত চরণ যুগলের দাস্যপদ অর্পণ করতঃ কৃতকৃতার্থ করিয়াছিলে। তবে কেন আসিবে না হরি! বুঝেছি, বাসনাশূন্য হইয়া তোমায় ডাকিতে পারি না, প্রাণ খুলিয়া তোমায় ভালবাসিতে পারি না বলিয়া, আমি যে বড় স্বার্থপর, বিপদে পরিয়া যখন কোন কূল কিনারা না পাইয়া দশ দিক অন্ধকার দেখি তখনই তোমায় আকুল প্রাণে ডাকিয়া থাকি, আর যেমন তোমার অপার করুণ গুণে বিপদ সাগর হইতে উদ্ধার পাই অমনি তোমায় ভুলিয়া যাই। মুগ্ধ মন বিষয় মদিরা পানের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে। সর্ব্বান্তর্য্যামিন্! তোমার নিকট একাপট্য টিকিবে কেন? তবে কি আসিবে না, দীনের বসনা কি পূর্ণ হবে না? দয়াময়! কাতর প্রাণে নিবেদন করি একবার এস, নিজ গুণে কৃপা করিয়া একবার হৃদয়মন্দিরে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে দাঁড়াও, আমি তোমার গোপীমনোরঞ্জন ভুবন মোহন মূর্ত্তিখানি, মানসচক্ষে প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করি। দীনবন্ধু! দীনের কাতর প্রার্থনা পূর্ণ কর।

হে দয়াল গৌরহরি,
দীনেরে করুণা করি,
হৃদিমাঝে একবার দাও দরশন।
ভকতের প্রাণ ধন,
রাঙ্গা দু'টি শ্রীচরণ,
পরশে জুড়াই মম তাপিত জীবন ॥
আমি অতি হীনমতি,
না জানি ভকতি স্তুতি,
কুপথে সদাই গতি মায়ায় আবৃত।
বিশুষ্ক মরুভূ' সম,
প্রেমশূন্য হিয়া মম;
দুঃখের অনল তায় জ্বলিছে নিয়ত ॥

যে দারুণ যাতনায়,
যাপি'ছি জীবন হায়,
অন্তর্য্যামী তুমি প্রভু জানিছ সকল।
কাতরে প্রার্থনা করি,
দাও বিন্দু প্রেম বারি,
নিভে যাক্ অভাগার দুঃখের অনল ॥
পতিতপাবন তুমি,
অধম পাতকী আমি,
পড়ে' আছি পাপ নীরে তার'গৌরহরি!
ভ্রম তমঃ কর নাশ,
পুরাও এ অভিলাষ,
তোমার দাসের দাস হ'তে যেন পারি ॥

দীন—শ্রীশশিভূষণ সরকার।

ভাবুক ব্রাহ্মণ।

ভাবুক বিপ্র, গোকুলে ইঁহার অবস্থান। ইনি বাল্য ভাবে শ্রীকৃষ্ণ উপাসক ছিলেন। শুদ্ধ মাধুর্য্য বাৎসল্য ভাবে সেবা করিতেন। অনন্য মনে ভক্তিযুক্ত হইয়া এক ভাবে ভজনা করিতেন। বিপ্রের অপূর্ব্ব ভাব, তিনি হরিকে পুত্র তুল্য ভাবিয়া সর্ব্বদা মানসপথে স্নেহাবেশে ভজিতে ভজিতেই, স্নেহের মধুময় ভাব বিকাশিত হইয়া তাঁহার ভাবসিদ্ধ হইল। এমনি মাধুর্য্য ভাবের অপ্রতিম শক্তি। করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না, বিপ্রের অভিলাষ সিদ্ধ হেতু বালক রূপে আসিয়া বিপ্রের সাক্ষাৎ হইলেন। ব্রাহ্মণ যেন অমনি আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন, প্রেমে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান শিথিল হইয়া শুদ্ধ মাধুর্য্য ব্রজ ভাব উদ্দীপ্ত হইল। তিনি কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া কেবল পুত্র

জ্ঞানেই তাঁহার লালন পালন করিতে লাগিলেন। গোপালকে কোলে বসাইয়া অন্নভোজন করাইতেন। এবং গোপালকে নানা অলঙ্কার, বস্ত্র, মাল্য পরাইয়া-নাসায় তিলক রচিয়া, সেই মধুর মুর্ত্তি দর্শনে আনন্দিত হইয়া, গোপালকে নাচাইতে নাচাইতে স্নেহানন্দে চুম্বন আলিঙ্গন করিয়া আত্ম বিস্মৃতি হইতেন।

আহা! কৃষ্ণকে যে পুত্ররূপে লালন পালন করিতে পায়, যে কৃষ্ণর মনোমোহন মধুর বালক মুর্ত্তি দর্শন করিয়া, চুম্বন আলিঙ্গন দ্বারা চরিতার্থ হয়, তাহার আনন্দের আর সীমা কি? স্নেহানন্দ সিন্ধু ব্রাহ্মণ স্নেহের উত্তাল তরঙ্গে উচ্ছলিত হইয়া আপনকে ধন্য মনে করিতেন।

ব্রাহ্মণ যে কোন ভাল দ্রব্য সম্মুখে দেখিতেন তাহাই গোপালের জন্য আনিয়া অতি যত্নে রাখিতেন। লাটিম, ঝুমঝুমি, গেঁড়্, ভাঁটা, মৃত্তিকা নির্ম্মিত বর কন্যা, হাঁড়ী কুড়ী ইত্যাদি খেলনা গোপালের জন্য যোগাড় করিয়া ব্রাহ্মণ বিশেষ অনন্দিত হইতেন।

গোপালের কৌতুক দেখিয়া ব্রাহ্মণ আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেন না, অমনি গোপালকে কোলে করিয়া নাচিতে নাচিতে দুই চক্ষে প্রেমাশ্রু নির্গত করিতে করিতে একেবারে তন্ময় হইয়া যাইতেন।

ব্রাহ্মণ রাত্রিতে গোপালকে ক্রোড়ে শয়ন করাইয়া গোপালের গায় হাত চাপড়াইয়া ঘুম পাড়াইতেন। একদিন রাত্রিতে গোপালকে ঐরূপ ঘুম পাড়াইতে-ছেন, গোপালের তন্দ্রা আসিয়াছে দৈবাৎ শয়ন গৃহে একটা বিড়াল "মেও মেও" করিয়া ডাকিয়া উঠিল। গোপালের আর ঘুম হইল না, অমনি ভয়েতে চমকিয়া উঠিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে, ক্ষণে ক্ষণে ব্রাহ্মণের গলা জড়াইয়া ধরিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ অমনি ভয়ার্ত্ত বালককে বক্ষে ধরিয়া, কেন কেন, এরূপ করিয়া কাঁদিতেছ কেন, ব্রাহ্মণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। এদিকেও গোপাল কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল ঘরের ভিতরে কে ডাকিতেছে, তাই আমার ভয় হইয়াছে।

ভয়ের কথা শুনিয়া, ব্রাহ্মণ গোপালকে কোলে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, না না; ভয় নাই, ওটা একটা বিড়াল ডাকিতেছে, ভয় কি? আমি আছি, তুমি ঘুমাও। এই বলিয়া গোপালকে পুনর্ব্বার ঘুম পাড়াইলেন। তৎপরে আর একদিন গোপালের ঐরূপ ভয় হইল, ব্রাহ্মণ সেদিন ও গোপালকে ভরসা

দেখাইয়া শয়ন করাইলেন। গোপাল ব্রাহ্মণের নিকট ঐরূপ বালক ভাব প্রকাশ করিতেছেন, একদিন ব্রাহ্মণের দুর্দ্দৈব ঘটিল। শুদ্ধ মাধুর্য্য বাৎসল্য ভাব দূরীভূত হইয়া, ঐশ্বর্য্য ভাব প্রকাশ পাইল। বিপ্র আশ্চর্য্যন্বিত হইয়া, মনে মনে ভাবিতেছেন, একি অদ্ভুত! যিনি ত্রিলোকের নাথ কৃষ্ণ, স্বয়ং অচ্যুত, জিনি দেবের দেবতা, কালের কাল, ভয়ের ভয়, যমের যম, তিনি মুগ্ধ বালকের ন্যায় বিড়ালের ভয়ে কাঁদিতেছেন কেন? এই ভাবনায় ব্রাহ্মণের বাৎসল্য ভাব দূর হইয়াগেল, কৃষ্ণও অমনি ভাবান্তর দেখিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন।

ব্রাহ্মণ অমনি গোপালকে নাদেখিয়া নিধিহারা দরিদ্রের ন্যায় হাহাকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভূমিতলে গড়াগড়ী দিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের বাৎসল্য ভাব দূর হইয়াছে, সে অমনি হা বৈকুণ্ঠনাথ! হা দ্বারকাথ! হা জগদীশ্বর! ইত্যাদি ঐশ্বর্য্য সূচক নানাভাবে ভগবানকে স্তুতি করিয়া, শিরে করাঘাৎ করিতে করিতে উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। দয়াল হরি দয়া করিয়া ব্রাহ্মণকে দৈব বাণীতে বলিলেন, তুমি আর ক্রন্দন করিওনা, তোমার বাৎসল্য স্নেহে বশীভূত হইয়া বালকবেশে আমি তোমার নিকটে ছিলাম, এক্ষণে তোমার ভাবান্তর হইয়া ঐশ্বর্য্য ভাবের উদয় হইতেই, আমি অন্তর্দ্ধান হইয়াছি, অতএব তুমি এদেহে আর আমার দেখা পাইবে না, দেহান্তরে তুমি আমার দেখা অবশ্যই পাইবে। ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মণ দৈববাণী শুনিয়া কিছু স্থির হইলেন, এবং ভাবিলেন যে, আমি এইদেহে উৎকট মাধুর্য্য ভাব প্রাপ্ত হইয়া ছিলাম, তাহাতে ঐশ্বর্য্য ভাব উদয় হওয়াতে আমি কৃষ্ণকে হারাইয়াছি, এদেহে আর কৃষ্ণকে পাইব না। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ দেহান্তরের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। পুনঃদেহান্তর হইয়া ভাবান্তর হইতেই, সেই ব্রাহ্মণ পুনঃ ব্রজ পুরে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলেন। কৃষ্ণ ভজন একমনে করিলেই কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়। ঐশ্বর্য্য ভাবে অন্যধাম প্রাপ্তি হয়. কেবল মাধুর্য্য ভাবেই ব্রজ পুরে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্তি হওয়া যায়।

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এই চারিরূপ ব্রজ উপাসনা রতি, এই চারি রসেই কৃষ্ণ বশ হইয়া থাকেন।

প্রিয়, আত্মা, পিতৃ, সখা, গুরু, দৈব, মিত্র, সুহৃদ, ইষ্ট, পতি, ভ্রাতৃ, পুত্র

ইত্যাদি যে কোন ভাবে হরিকে যিনি চিন্তা করিবেন, তিনিই মুক্ত হইবেন, তবে যাঁহার যেমন ভাব তিনি সেইরূপ ধাম প্রাপ্ত হইবেন।

পতি পুত্র সুহৃদ্ ভ্রাতৃ পিতৃবন্মিত্র বদ্ধরিং।

যে ধ্যান্তি সদোদ্যুক্তা স্তেভ্যোপীহ নমোনমঃ ॥

উক্ত প্রবন্ধটী শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি অধমের দুরাশায় ভক্তগণ অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

ভক্তদাসানুদাস—শ্রীইন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য।

"নাম মাহাত্ম্য।"

—:০:—

(গল্প)

কোনও গ্রামে হরিহর নামে এক ব্যক্তি বাস করিত। এই পৃথিবীতে যতরূপ পাপাচরণ পরিদৃষ্ট হয়, হরিহর তৎসমুদয়ে আসক্ত হইয়া আমোদ প্রমোদে উন্মত্ত থাকিত এবং চুরি, জুয়াচুরি, জাল, প্রতারণাদি কদর্য্য কার্য্যে তাহার জীবনের সারাংশ অতিবাহিত হইত। হরিহর সাতিশয় লম্পট ও গণিকাসক্ত ছিল এবং দিবারাত্র নেশায় বিভোর হইয়া পশুবৎ জীবনাতিপাত করিত; ভ্রমেও একবার ভগবানের নাম লইত না এবং তাঁহার নাম লওয়া দূরে থাকুক যদ্যপি কেহ তাহার সমীপে হরিনাম উচ্চারণ করিত তাহ হইলে বেচারার আর রক্ষা থাকিত না অযথা কুকথা বাক্য বলিয়া উত্তম মধ্যম প্রহার দিয়া হরিহর তাহাকে তথা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিত। তাহার অবস্থায় দুঃখিত হইয়া কোন ও প্রতিবেশী তাহার মঙ্গলের নিমিত্ত যদি কহিত হরিহর, পররলোকে তোমার কি হইবে তাহা কি একদিনের নিমিত্ত ও চিন্তা করিয়াছ? নরকের কীটানুকীটের সহিতও তোমার স্থান হইবে না। এখনও কুবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া কুপথ হইতে সৎপথে এস, এখনও তোমার সময় আছে। বুদ্ধি দোষে যে সমস্ত কুকর্ম্ম করিয়াছ তাহার

নিমিত্ত অনুতাপ কর, ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; তোমার মুক্তি হইবে, তিনি তোমাকে ক্ষমা করিবেন। কারণ তিনি দয়াময়। আমার উপদেশ গ্রহণ কর আর কুৎসিত কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া পাপের বোঝা বৃদ্ধি করিও না।" তখন হরিহর তাহাকে বলিত "যারে বেটা যা, আপনার চরকায় ভাল করে তেল দে গিয়ে তার পর পরের চরকায় তেল দিস্। নরকে যাইতে হয় আমি যাইব, তোকে ত আমার সঙ্গে নরকে যাইতে হইবে না; তবে কেন বক্ বক্ করিস্? বেটা যেন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির এলেন! যা, যা নিজের ভাবনা ভাব্‌গে যা, আর পরের ভাবনা ভাবতে হবে না। অদৃষ্টত কেহ কেড়ে নিতে পারবে না, আমার কপালে যা লিখন আছে তা হবেই। এমন কি আমার অদৃষ্টে যদি থাকেত আমার স্বর্গে বাস হতে পারে, তা জানিস্?" সেই ব্যক্তি এই বলিয়া চলিয়া যাইত যে, "সূর্য্য পশ্চিম গগনে উদিত হইতে পারে, খঞ্জ হিমালয় গিরি উল্লঙ্ঘন করিতে পারে, বামন চন্দ্র স্পর্শ করিতে পারে, তথাপি তোমার অমর লোকে বাস হইতে পারে না"

একদিবস কোনও গৃহস্থের বাটীতে পূজা হইতেছিল। বাটীর সকলে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রতিমা সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তৎসমুদয় নিরীক্ষণ করিতেছে এমন সময়ে হরিহর মদ্যপান করিয়া উন্মাদাবস্থায় তথায় প্রবেশ করিয়া নানারূপ বিঘ্ন উৎপাদন করিতে আরম্ভ করিল। তাহার তদ্রূপ আচরণে সকলে রুষ্ট হইয়া তাহাকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিলেন। তাহাতে অপমান জ্ঞানে হরিহর তাহার দলবলকে সঙ্গে করিয়া গৃহস্থের ভবনে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিল এবং প্রতিমূর্ত্তির একটী অঙ্গহীন করিয়া দর্পভরে চলিয়া গেল। ইহাতে তৎভবনস্থ সকলেই হায় হায় করিতে লাগিলেন এবং ইহার নিমিত্ত "হরিহরই দোষী" এই বলিয়া ঈশ্বরকে সাক্ষী করিতে লাগিলেন। এইরূপ অগণিত পাপোপার্জ্জন করিয়া সে জীবনাতিবাহিত করিতে লাগিল।

ক্রমে হরিহর কালগ্রস্ত হইল। তাহার বিচারের দিন উপস্থিত। যমরাজ তাঁহার ভৃত্যদিগকে আদেশ দিলেন "যদবধি আমি প্রত্যাগমন না করি তদবধি হরিহরকে যেন শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হয়," এই বলিয়া তিনি যথায় স্বয়ং শ্রীভগবান উপবিষ্ট তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এবং বহুক্ষণ পরে খাতা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া যমরাজ শ্রীভগবানকে কহিলেন 'হরিহরের ন্যায় পাপিষ্ঠ

আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। জীবনে কখনও সে আপনার নাম লয় নাই অথবা কোনরূপ পুণ্য কর্ম্ম করে নাই। অতএব ইহার প্রতি কি দণ্ড হইবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। ইহাতে আপনার অভিমত কি?" শ্রীভগবান চিন্তা করিয়া কহিলেন "যমরাজ, আর একবার খাতাটা ভাল করিয়া দেখ দেখি, ইহার কোনরূপ সুকৃতি আছে কি না?" যমরাজ বহু পরিদর্শনান্তর কহিলেন "একটী মাত্র সুকৃতি দেখিতে পাইতেছি, এতদ্ব্যতীত সকলই পাশবিক আচরণ।"

শ্রীভগবান—উহা কি?

যজরাজ—এই ব্যক্তি একদা সুরাপানোন্মত্ত হইয়া তাহার গণিকার নিমিত্ত একটী সুগন্ধি গোলাপফুল স্বহস্তে লইয়া যাইতেছিল। উন্মত্ততার আধিক্য বশতঃ পুষ্পটী দৈবাৎ হস্তচ্যুত হইয়া কর্দ্দমে পতিত হয়। তাহাতে সে বলিয়াছিল "হায়! হরি কি করিলে?" এই একবার মাত্র দায়গ্রস্থ হইয়া হরিহর আপনার নামোচ্চারণ করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তাহার আর কিছুই সুকৃতি দেখিতে পাইতেছিনা।

শ্রীভগবান—এই সুকৃতির নিমিত্ত হরিহর একচতুর্থাংশ দিবস অমরলোকে যথেচ্ছা বিচরণ করিতে পারে। তাহার পর তাহাকে অনন্তকাল নরক বাস করিতে হইবে।

যমরাজ—ইহাই তাহার উপযুক্ত শাস্তি।

এই বলিয়া যমরাজ তথা হইতে হরিহরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আদ্যোপান্ত তাহাকে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "হরিহর, তুমি অগ্রে কি চাও, অগ্রে নরকবাস—না ক্ষণিক স্বর্গসুখ অগ্রে?" তাহার পূর্ব্বস্বভাব সুলভ বশত হরিহর বলিল "স্বর্গসুখ অগ্রে।"

হরিহর দিবসের চতুর্থাংশ কাল অবস্থানের নিমিত্ত অমরলোকে আসিয়া উপস্থিত হইল। তথায় দেবকন্যাগণ অপ্সরা অপ্সরীগণ নাচিয়া নাচিয়া গাহিয়া গাহিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, বিবিধ বর্ণের পক্ষী সমূহ শাখায় বসিয়া দিক্ সমূহ কূজিত করিতেছে এবং বিবিধ বর্ণের বিবিধ পুষ্প সমূহ বিকসিত হইয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া আপন আপন সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে। হরিহর মনে মনে

চিন্তা করিল যে একটী মাত্র পুষ্প পতিত হওয়ায় আমি একবার মাত্র নামোচ্চারণ করিয়াছিলাম বলিয়া এক্ষণে এরূপ সুখভোগ করিতেছি। অতএব আরও অধিক পুষ্প লইয়া প্রতিবারে হরি নামোচ্চারণ করিয়া ফেলিয়া দিলে ভবিষ্যতে আমার আরও অধিক সুখভোগ হইতে পারে। এইরূপ বিবেচনানন্তর তত্রস্থ প্রমোদোদ্যানে যত পুষ্প ছিল সে সমস্তগুলি একটী একটী করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল এবং তৎসহিত হরি, হরি নামোচ্চারণ করিতে লাগিল। এইরূপে যত পুষ্প ছিল সমস্ত একে একে নিঃশেষ করিল। যখন ভগবান সেই উদ্যানে প্রবেশ করিলেন তখন তিনি উদ্যানে একটীও পুষ্প দেখিতে না পাইয়া অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ধর্ম্মরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ধর্ম্মরাজ! উদ্যানের পুষ্প সমুহ কি হইল ?" তিনি কহিলেন হরিহর সমস্ত পুষ্পগুলি ছিঁড়িয়া দিয়াছে এবং ফেলিবার সময় প্রতিবারে আপনার নাম লইয়াছে। তিনি ইহা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং 'কহিলেন ধর্ম্মরাজ! এই উদ্যানে অগণন পুষ্প ছিল এবং হরিহর অগণন 'নাম লইয়াছে। অতএব ইহার পুর্ব্বসঞ্চিত সকল পাপ খণ্ডন কর এবং আমার আদেশমত অনন্তকাল তাহার বৈকুণ্ঠে বাস হইবে।" ধর্ম্মরাজ তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া খাতা পত্র কাটিয়া হরিহরের বৈকুণ্ঠবাসের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।] বন্ধুগণ যদিও এটী গল্প তথাপি নামের গুণে এ ঘটনা অপেক্ষা যে আরও বিস্ময় কার ঘটনা সাধিত হইয়া থাকে তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন।

শ্রীচুনীলাল চন্দ্র।

নিত্যধামগত পণ্ডিতপ্রবর দীনবন্ধু বেদান্তরত্ন।

(জীবনী।)

(৩)

শিক্ষান্তে নবঅঙ্কুর।

সমগ্র শাস্ত্র অধ্যয়ন যখন সমাপ্ত হইল, তখন দীনবন্ধুর প্রাণে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা ও কর্ম্ম জিজ্ঞাসার সেই শেষা শেষি ভাবটুকু আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি

দেখিলেন, সমগ্র শাস্ত্রের সার বেদান্ত যাহা দেখাইয়া দিতেছেন, যাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহার উপলব্ধি করা চাই। কেবল অর্থ সঞ্চয় করিবার জন্য বিদ্যার প্রয়োজন নাই, কেবল শুষ্ক জ্ঞান লাভের জন্য শাস্ত্র আলোচনার প্রয়োজন নাই, কেবল "গুণীগণ গণনায়" নাম বাজাইবার জন্য, পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই,—এ সব ছাড়া শিক্ষার যে একটা উচ্চ লক্ষ্য আছে, একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে, তাহা মননশীল আর্য্য ঋষিগণ বিভিন্ন শাস্ত্র গ্রন্থে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, আর সর্ব্ব শাস্ত্রের মূলাধার, সকল জ্ঞানের আকর, নিখিল বিশ্ব প্রকৃতির বিরাট রহস্য প্রকাশক বেদান্ত, তাহা মানবের কর্ণে, কেমন জলদ গম্ভীর স্বরে অহরহ প্রতিধ্বনিত করিতেছে। সে স্বর লহরী, বেদান্তের সেই আহ্বান, সেই ইঙ্গিত, বিশ্বের কেন্দ্রে কেন্দ্রে, রহিয়া রহিয়া, কখন প্রকাশ কখন অপ্রকাশমানা চপলার মত ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই "জন্মাদ্যস্য যতোর" সন্ধান বলিয়া বলিতেছে, কাণ পাতিলে তাহা শুনা যায়, চোখ মেলিলে তাহা দেখা যায়, হস্তপ্রসারণ করিলে তাহা আলিঙ্গন করা যায়, চিন্তা করিলে তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করা যায়; এই যে বিরাট বিশ্ব, যেখানে কত লতা উদ্ভিদ, কত জীব জন্তু, কত গ্রহ উপগ্রহ বিরাজমান এই সকলের উৎপত্তি যাহা হইতে, যাহা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেই অখিল রসামৃত মূর্ত্তি সেই "রসো বৈসঃ" অক্ষয় পুরুষ কে নাকি ইহাদের ভিতর দিয়া ধরিতে পারা যায়, ইহাদের মধ্যে থাকিয়াও নাকি তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায়? তাই না বেদান্ত বলিয়াছেন;—

"আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি॥"

ঐ যে গগণের পূর্ণ শশধর বিমল কিরণ-ছটায় লোকের মন হরণ করে, উহারই মাঝে কি সে আনন্দের ছটা নাই? ঐ যে ফোট ফোট ফুল গুলি সুসৌরভে দিক্ আমোদিত করে, উহার ভিতর কি সে আনন্দের আবেগ নাই, ঐ যে ছোট শিশুটি জননীর মুখের দিকে চাহিয়া, মধুর হাসিতে তাঁহার মন হরণ করিতেছে, উহার ভিতর কি সে আনন্দের তাড়িৎ প্রবাহিত হয় না? ঐ যে পতিত পাবনী সুরধুনী কুলু কুলু নাদে সাগর সঙ্গমে ছুটিয়া চলিয়াছে উহার ঐ উম্মাদ গমন ভঙ্গীতে কি সে আনন্দের সন্ধান পাওয়া যায় না? ঐ ত বেদান্ত বলিতেছেন; "আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।" আনন্দে জগৎ অবস্থিত

আনন্দেই জগতের উৎপত্তি আর আনন্দেই জগতের লয়। এ আনন্দ লাভ করিবার, এ আনন্দ ভোগ করিবার, এ আনন্দ অনুভব করিবার এবং এ আনন্দ সাধন করিবার। তাই না ব্রহ্মবর্ত্তের ঋষি বালকেরা পুণ্য তাপোবনে বসিয়া এই আনন্দের রসাস্বাদন করিতে করিতে উচ্চকণ্ঠে বিহ্বলিত প্রাণে দিগ দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া গাহিয়া ছিলেন—

মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধব　　*　　*　　*

তবে আমাদের অভাব কি? তবে কেন সংসারে মানব অহরহ নিরানন্দেরকথা বলে? আনন্দে যাহাদের অবস্থিতি, আনন্দেই যাহাদের লয়, তাহারা কেন আনন্দ-ধামের পথে চলেনা। আনন্দ কে না চায়? সুখ কে না চায়? জগতের প্রত্যেক পদার্থ তো স্ব স্ব সুখের জন্য লালায়িত, আনন্দের অধিকারি হইবার জন্য ব্যগ্র। ঐ যে উদ্ভিদ সম্মুখে বিদ্যমান, উহারও ভিতর তো একটা সুখের বাসনা রহিয়াছে। উহা আপন পুষ্টিকর রস সংগ্রহের জন্য কেমন সু কৌশলে শিকড় গুলির সাহায্যে রস আকর্ষণ করিতেছে, আলোক লাভের জন্য কেমন ধীরে ধীরে বাহু বাড়াইয়া দিতেছে। কারণ সে জানে যে এই সকলেই তাহার পোষণের সহায়তা করিবে। এইরূপে প্রত্যেক পদার্থের বিচার করিলে দেখা যায় যে সকলেরই একটা সুখান্বেষণের বাসনা আছে, আর সেই বাসনা যখন তাহার প্রকৃতি সঙ্গত হয় তখনই তাহাদ্বারা তাহার পরিপোষণের বিশেষ রূপ সহায়তা হইয়া থাকে। মানবের প্রাণে ও একটা সুখের আকাঙ্খা একটা আনন্দ লাভের বাসনা জাগিয়া থাকে। মানুষ যদি আত্ম প্রকৃতির পরিচয় লইয়া, অর্থাৎ তাহার প্রকৃতি তাহার প্রাণে কি পাইলে পরিতৃপ্ত হয়, তাহা বুঝিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে সেও প্রকৃত আনন্দের অধিকারী হইবে।

কারণ শাস্ত্রেই তো বলিয়া দিতেছে এই সুখের বাসনা, এই আনন্দের ইচ্ছা জাগায় কে? না যিনি পরমানন্দময় সেই পরমানন্দময়ের প্রতি বিশ্বের সকল পদার্থের চিত্ত আকর্ষিত হয় বলিয়া তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণ। সে আকর্ষণে সমগ্র বিশ্ব আকর্ষিত, গ্রহে উপগ্রহে, অণুতে পরমাণুতে, বায়ুর তরঙ্গে তরঙ্গে, সে আকর্ষণ চলিয়াছে। যেমন তাড়িৎ শক্তি অদৃশ্য ভাবে বিরাজ মান রহিয়াছে, কিন্তু পদার্থ বিশেষের সাহায্যে, উহা প্রকাশমান করিতে পারা যায়, সেইরূপ এই মহা

আকর্ষণ বিশ্বের সর্ব্বত্র রহিয়াছে, কেহ সরল প্রার্থনা দ্বারা, কেহ একটি গানের দ্বারা, কেহ ঐ নবনীরদ নিন্দিত মূর্ত্তিটি ভাবিতে ভাবিতে সেই আকর্ষণ তরঙ্গের বেগ হৃদয়ে অনুভব করিতে সমর্থ হন্। তখন তাঁহার চিত্ত যে দিকে ধাবিত হয়, সেই দিকেই সেই আকর্ষণের বেগ দেখিতে পায়। সেই স্রোতে পড়িয়া যাহা করে তাহাতেই আনন্দের সন্ধান পায়, আর তখন ঐ বেদান্তের অমৃত বাণী তাহার কর্ণ কুহরে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে।

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি,
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি ॥"

এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া শিক্ষা সমাপ্তে দীনবন্ধু আধ্যাত্ম জগতের রহস্য উদ্ঘাটনে উৎসুক হইয়া উঠেন। তাঁহার এই আনন্দধামের পথে বিচরণ করিবার বাসনা তীব্র হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন কেবল জ্ঞানবান হইয়া সংসারে প্রবেশ করিব না। মানুষের যাহা কর্ত্তব্য, যাহা পাইলে মানুষ হওয়া যায়, তাহাই যদি করিতে পারি তবেই সংসারে ফিরিব, নচেৎ নহে। এই ভাবিয়া শিক্ষা সমাপ্তে তিনি লোক চক্ষুর অন্তরালে, নানা স্থানে বহু বহু অজ্ঞাত নামা ভগবৎ প্রিয়গণের সহিত অবস্থান করিয়া সাধন ভজনতত্ত্ব ও অধ্যাত্ম বিদ্যার অনুশীলন করিয়াছিলেন। সে নিগূঢ় কথা সে নিভৃত সাধনা, সে ভক্ত প্রেমিকের সম্মিলনে, কবে কোথায় কি আনন্দের প্রবাহ ছুটিয়াছিল; কোন্ পুণ্য তপোবনে, কোন্ সঙ্গীদের মাঝে, কোন্ প্রার্থনার ঝঙ্কারে, সেই পরমানন্দময়, বিশ্বজীবজীবন, পরমদয়াল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নবনীরদ নিন্দিত কান্তিছটায় দীনবন্ধুর হৃদয় আলোকিত হইয়াছিল, তাহার পরিচয় কেমন করিয়া দিব! তবে এই টুকু বলিতে পারি যে, তিনি যে সকল পুণ্য চেতা সাধুদিগের সহবাসে, আপন চরিত্রকে এই ভাবে গঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, মানুষ বলিয়া গোবিন্দের দাস বলিয়া আপনাকে পরিচিত করিতে পারিয়া ছিলেন, সেই সকল মহাত্মারা যুবক দীনবন্ধুর এই অপূর্ব্ব ভাব পরিবর্তন ও ভগবৎ কৃপালাভ দর্শনে আনন্দিত হইয়া বলিয়াছিলেন—"যাও বৎস! আমাদের আশীর্ব্বাদে, তুমি লোক সমাজে ফিরিয়া যাও; লইয়া যাও সেখানে এই আনন্দের সম্বাদ, তোমার মত সংসারী পাইলে, অনেক সংসারীর চিত্ত মালিন্য বিদূরিত হইবে। তোমার সহবাসে তাহারা পরশমণির সন্ধান পাইবে।

আর তাহাদিগকে পথহারা পথিকের ন্যায় দিগ ভ্রান্ত হইতে হইবে না, তাহারা আনন্দধামের পথে বিচরণ করিতে সক্ষম হইবে।"

ক্রমশঃ

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীল রায় রামানন্দ।

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ভক্তির মহিমা শুনি গৌর ভগবান।
আনন্দ পূরিত তনু প্রফুল্ল বয়ান॥
ভক্ত-মুখে ভক্তি রস করি আস্বাদন।
রসোন্মত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ ভাবেতে মগন॥
দুনয়নে প্রেমধারা যেন মন্দাকিনি।
দুকূল বহিয়া সিক্ত করিছে ধরনী॥
কহে মৃদু মন্দহাসি শ্রীগৌর সুন্দর।
আলিঙ্গিয়া রামানন্দে ধরি দুটি কর॥
মায়াবাদী সন্ন্যাসী আমি কৃষ্ণ ভক্তি হীন।
মায়াবাদে সদাই ভাসি হয়ে উদাসিন॥
হরি ভক্তি রসতত্ত্ব কিছুই নাহি যানি।
বিশেষিয়া কহ মোরে ভক্ত চূড়ামণি॥
কিকব তোমারে গুণ কহনে না যায়।
মনুষ্য নহ তুমি কৃষ্ণ-তত্ত্ব-রসময়॥
অগোচর ভক্তি যোগ শাস্ত্রে সদাকার।
তারফল লিখি শাস্ত্রে জ্ঞান চমৎকার॥

জ্ঞানের পরম ফল ব্রহ্মে লীন হয়।
জ্ঞানমার্গে ভক্তিমার্গে ভেদ তো নাহয়॥

জ্ঞান ভক্তি দুই পথ বৈকুণ্ঠ্য বুঝায়।
জ্ঞান হইতে ভক্তি শ্রেষ্ঠ কোন অভিপ্রায়॥

কহ কহ বলে প্রভু গদ গদ বচনে।
জ্ঞান ভক্তি প্রভেদ ভাব শুনি ইচ্ছা মনে॥

প্রভু, রামানন্দ প্রমুখাৎ ভক্তি তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া, বাষ্পাকুল নয়নে বলিতে লাগিলেন, "দেখ রামানন্দ! আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, জ্ঞান পথের পথিক, সর্ব্বদা জ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া থাকি, কিন্তু আজ ভক্তি যে, আশুফলপ্রদ ও সহজ সাধ্য, তাহা তোমার নিকট শুনিয়া আমি যারপর নাই আনন্দিত হইলাম। কিন্তু মনের মধ্যে মহান্ সংশয় উপস্থিত, জ্ঞান মার্গ ও ভক্তি মার্গ ইহার মধ্যে কোন পথ সরল তাহা তুমি যথা শাস্ত্র প্রমান প্রয়োগ দ্বারা আমার সন্দেহ ভঞ্জন কর; আর কোন কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে জীবের হৃদয়ে হরি ভক্তির সঞ্চার হয়, এই সকল তত্ত্ব জানিবার জন্য আমার কৌতুহল জন্মিয়াছে, তুমি বিস্তারিত কীর্ত্তন করিয়া আমাকে সুখী কর।"

প্রশ্ন শুনি রামানন্দ বিস্মিত হইয়া।
স্তুতি করে মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়া॥
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি ব্রজেন্দ্র নন্দন।
তোমার নিশ্বাসে হয় বেদ প্রবর্ত্তন॥
শ্রুতি স্মৃতি পুরানাদি শাস্ত্র সমুচয়।
সকলি তোমারি সৃষ্ট শুনি দয়াময়॥
তুমি ভাগবত বক্তা তুমি জান অর্থ।
যারে জানাও সেই জানে অন্যে অসমর্থ॥
নাম কীর্ত্তনাদী ভক্তি করে যেইজন।
সেই জন পায় ঈশ্বর স্বরূপ দর্শন॥

দিব্য মুর্ত্তি বরপ্রদ দেখিবারে পায়।
যেরূপ মাধুরি লীলা গায় সর্ব্বথায়॥

সেইরূপ দেখি ভক্ত সুখ পায় যাহা।
কোটিকল্প জ্ঞান মার্গে নাহি মিলে তাহা॥
অতএব জ্ঞান হইতে ভক্তি গরীয়সী।
কহিল কোপিল দেব মায়ে উপদেশি॥

হে ভক্তবাঞ্ছা পূরণকারী কমলাপতে! আপনি দীনের প্রতি কঠিন প্রশ্ন করিয়াছেন। জ্ঞান ও ভক্তির পার্থক্য নির্ণয় করা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র বুদ্ধি বিশিষ্ট সংসারী জীবের দ্বারা সম্ভব পর নহে, আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রভু তুমিই আমার জ্ঞান, ভক্তি, সাধন এবং ভজন, তোমার শ্রীচরণ ভিন্ন আমি অন্য কিছুই জানিনা, তবে নিজগুণে দীনকে যন্ত্র করিয়া তাহাতে স্বয়ং যন্ত্রি হইয়া আমাকে যা বলাইবে আমি তাহাই বলিব, ঠাকুর তোমার রূপ অনন্ত, অসীম, তাহার সাধনোপায়ও অনন্ত, আবার আচার পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন। তোমার তত্ত্ব তুমি না বুঝাইলে কেহই বুঝিতে পারে না তবে যে যে পথই আশ্রয় করুক না কেন, মূলে সকলকার উদ্দেশ্যই সেই এক ভগবানকে লাভ করা।

ধর্ম্মের গুণ ভেদে সাধন প্রণালী। সাধক যে গুণের অধিকারী তাহাকে সেই গুণের প্রণালী মতন সাধন ভজন করিতে হইবে, কারণ মানবের প্রকৃতি অনুসারে সাধন মার্গ অবলম্বিত হইয়া থাকে। গুণভেদেই সাধন পন্থা পৃথক হইয়া থাকে, সুতরাং ধর্ম্ম আচরণ বিধিব্যবস্থাও প্রভেদ। প্রকৃতি ভেদে ধর্ম্মাচরণ যে পার্থক্য দৃষ্ট হয় তাহার প্রধান কারণ গুণ। কিন্তু প্রভো! যখন গুণের কার্য্য শেষ হয়, তখন সকল সাধকের হৃদয়ে এক পবিত্র মহান্ বিরাট পুরুষের উজ্জল জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হয় আর ভক্তগণ আনন্দ সলিলে কখন নিমজ্জিত, কখন বা সন্তরণ করিতে থাকেন। তবে জ্ঞান সাধন হইতেছে বিচারানুগতা আবার বিচার হইতেছে বুদ্ধির অনুগতা স্থূল বুদ্ধির দ্বারা সূক্ষ্ম পরমাত্মতত্ত্ব অবগত হওয়া অতি দুরূহ। বিশুদ্ধ বুদ্ধি মহাত্মাগণ স্থির সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারেন। জ্ঞান যোগ সাধন কালে বহু বিধ বিঘ্ন বাধা সংঘটন হইবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু পরাৎপর পরমেশ্বরে ঐকান্তিক ভক্তির উদয় হইলে তাঁহার কৃপায় সমুদয় বিঘ্ন দূরিভূত হইয়া যায় আর সাধকের অন্তঃকরণে বিমল জ্ঞানোদয় হয়। সেই জ্ঞানবান ভক্ত অনায়াসে জীবন মুক্তি কে লাভ করিতে পারে এই জন্য শাস্ত্রকারগণ ভক্তি পূর্ব্বক ঈশ্বর উপাসনার উপদেশ দিয়া থাকেন।

এ কথা পাতঞ্জল দর্শনে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে "ঈশ্বর প্রণীধানাদ্বা" (১ম পাদে ২৩শ সূত্রে) ঈশ্বরকে ভক্তি ভাবে উপাসনা করিলে শীঘ্র সাধনায় সাধকের সকল মনরথ হয়।

ঈশ্বরের ধ্যান করাই যোগসাধনের প্রকৃষ্ট উপায়, সাধক যে ভাবেই সাধনায় প্রবৃত্ত হউক না কেন যতই সার্থপরতা, সুখ ভোগ ইচ্ছা থাকুক, যদি কোন প্রকারে সাধকের মনে নিজ ইষ্টদেবের প্রতি বিন্দুমাত্র ও ভক্তির সঞ্চার হয় তাহা হইলে আর তাহার পতনের সম্ভাবনা থাকেনা; কারণ ঐ ভক্তি জোরে তাহার ভাবাঙ্কুর ধিরে ধিরে পরিপুষ্ট হইয়া সাধককে নিজ ইষ্টদেবের সাক্ষাৎ কারের জন্য মন ব্যাকুল করিয়া দিয়া থাকে।

জ্ঞান ও ভক্তি বিশেষ কথন।

জ্ঞান যোগশ্চ মন্নিষ্ঠো নৈর্গুণ্যো ভক্তিলক্ষণঃ।

দ্বয়োরপ্যেক এবার্থো ভগবচ্ছব্দ লক্ষণঃ।

ভা পু ৩,৩২।৩২

জ্ঞান যোগ এবং আমাতে নির্গুণ ভক্তিযোগ এতদুভয়ের একই উদ্দেশ্য অর্থাৎ উভয় হইতেই শ্রীভগবানকে লাভ করা যায়।

কিন্তু লক্ষণভেদো হি বস্তুভেদস্য কারণং।

ন ভক্তজ্ঞানিনোর্দ্দিষ্টা শাস্ত্রে লক্ষণ ভিন্নতাঃ।

বোধসার ভক্তিযোগ। ৩

জ্ঞান ও ভক্তি এক পদার্থ, কেবল লক্ষণ ভেদে পরস্পরের বস্তু ভেদ হইয়া থাকে; শাস্ত্রে, জ্ঞানে ও ভক্তিতে কিছুই লক্ষণ ভেদ দৃষ্ট হয় না।

কিন্তু কোন কোন শাস্ত্রকারগণ একথাও বলিয়া থাকেন যে, জ্ঞানের প্রধান কারণ ভক্তি; জ্ঞান, ভক্তিসাধনের অঙ্গ বটে, ভক্তি হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ নহে, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি হইলে জ্ঞানের অপেক্ষা করেনা, সকল প্রকার সাধন প্রণালী সত্য ও কার্য্যসাধক ইহা স্থির, সকলিই অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহার কোন বিধি ব্যবস্থা নাই।

আবার—

ন তু জ্ঞানং বিনা মুক্তিরস্তি যুক্তিশতৈরপি।
তথাভক্তিং বিনা জ্ঞানং নাস্ত্যুপায় শতৈরপি।
বোধসার ভক্তিযোগ।১১

জ্ঞান ব্যতিরেকে শত শত যুক্তি দ্বারা ও কখনই জীবের মুক্তি লাভ হইতে পারেনা, আবার ভক্তি ব্যতিরেকে শত শত উপায় অবলম্বন করিলেও কখনই জ্ঞান লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই।

ভক্তির্জ্ঞানং তথা মুক্তিরিতি সাধারণঃ ক্রমঃ।
জ্ঞানিনস্ত বশিষ্ঠাদ্যা ভক্তা চৈ নারদাদয়ঃ।
বোধসার ভক্তযোগ।১২।

অগ্রে ভক্তি, পরে জ্ঞান, তদনন্তর মুক্তি, এই ক্রম সর্ব্বসাধারণ; বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিগণ জ্ঞানী এবং নারদ প্রভৃতি মুনিগণ ভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ॥

ওঁ তস্যা জ্ঞানমেব সাধন মিত্যেকে।

কোন কোন মহাত্মা একথাও বলিয়া থাকেন যে, জ্ঞানই ভক্তির সাধন। কিন্তু প্রভো! ভগবদ্ বিষয়ক জ্ঞানকে ভক্তি বলা যায় না। কারণ ভগবদ্দেষী যাহারা তাহাদের ও ঈশ্বর বিষয়ে জ্ঞান আছে; তবে তাহারা ঈশ্বর মানেনা, এই মাত্র বিশেষ। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, মহান, জগতের আদি পিতামাতা ইহা সকলেই জানে কিন্তু কয়জন তাহাকে প্রেম ও ভক্তি করে; সুতরাং জ্ঞান থাকিলেই যে প্রেম ভক্তি হইবে, ইহা সম্ভবপর নয়। কিন্তু শাস্ত্রালোচনায় বেশ অনুমান হয়; জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পর সাধন সাপেক্ষ এই জ্ঞান সাধন করিতে করিতে ভক্তি জন্মে, আবার ভক্তি সাধনে ও জ্ঞানের উদয় হয় কিন্তু ভক্তি উদয় হইলে জ্ঞানের লয় হইয়া যায়। ভালবাসার আধিক্য জন্মিলে প্রেম ও প্রেমাস্পদ এক হইয়া যায়।

কিসে ভক্তির উন্মেষ হয় তাহা বলিতেছি যথা—

সোহচিরাদেব রাজর্ষে সগদচ্যুত কথাশ্রয়ঃ।
শৃন্বতঃ শ্রদ্ধধানস্য নিত্যদা স্যাদ্ধ ধীয়তঃ।
ভা পু ৪। ২৯। ৩৮।

হে রাজর্ষে! ভক্তি কেবল ভগবৎ কথা আশ্রয় করিয়াই অবস্থিতি করে, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সর্ব্বদা হরি কথা শ্রবণ বা পাট করেন, তাঁহার হৃদয়ে অতি-সত্ত্বর ভক্তির বিকাশ হইয়া থাকে।

নষ্টপ্রায়েধভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃ শ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠীকী॥
ভা পু ১। ২। ১৮

যাঁহারা একান্ত মনে শ্রীভগবানের গুণ কীর্ত্তন অথবা যে যে শাস্ত্রে, তাঁহার পবিত্র গুণাবলি বর্ণিত আছে, সেই সকল ভাগবত শাস্ত্র প্রত্যহ পাঠ কিম্বা শ্রবণ করেন, অনতিকাল মধ্যেই তাহাদের হৃদয়স্থ আবর্জ্জনা সকল নষ্ট হইয়া যায়, এবং পবিত্রকীর্ত্তি শ্রীভগবানে অচলা ভক্তি জন্মে।

বিষ্ণুভক্তির্যস্য চিত্তে কিম্বা জীবো নমেৎ সদা।
স তারয়তি চাতমানং তথৈব দুরিতার্ণবাৎ॥
গপু ১। ২২২। ৩৮

যাঁহার চিত্তে বিষ্ণু ভক্তি বিদ্যমান থাকে, অথবা যিনি সর্ব্বদা বিষ্ণুকে নমস্কার করেন, তিনি এই পাপময় সংসার মহাসমুদ্র হইতে আত্মাকে অনায়াসে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

প্রভো! অদ্য রাত্র অধিক হইয়াছে, দাসকে বিদায় দিন। আপনার ইচ্ছা থাকিলে পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীমতি লাল চক্রবর্ত্তী।

গোলাপ।

—:০:—

(১)

বৃন্তোপরি আহা মরি! হিঙ্গুল বরণ,
কে গো তুমি সমাগত আজি উষাগমে?

কি কর্ম্ম সাধিতে হেথা তব আগমন,
কি শিক্ষা শিখাতে এলে পাপ মর্ত্ত্যভূমে ?

(২)

স্বরগ-প্রসূন তুমি স্বরগে বিকাশি,
তুষিতে সৌরভে তব স্বরগ-লোকেশ ।
স্বর্গিবধূ, শচীদেবী, মেনকা, উর্ব্বশী,
তুলি' তোমা' সযতনে সাজা'ত কবরী বেশ ॥

(৩)

ত্যজি' কেন কহ মোরে বিলাস ভবন,
মহীতলে কেন এলে ক্ষণিকের তরে ?
অজ্ঞ নর নাহি জানে করিতে যতন,
অবহেলি' তোমা' প্রতি নাহি চাহে ফিরে ॥

(৪)

কার লাগি সহিতেছ হেন অপমান,
কেহ ত চাহে না তোমা' তুমি কেন চাও ?
অপরে তুষিতে বুঝি ত্যজি অভিমান,
অযাচিত ভাবে তুমি সৌরভ বিলাও ।

(৫)

কি মাধুরি গুপ্ত তব প্রতি-পত্র পাশে,
কপটতা, নিষ্ঠুরতা নাহি হৃদি মাঝে।
কি অমিয় ভাব মরি ! তোমার বিকাশে,
সরলতা, কোমতলা নিত্য তথা রাজে ॥

(৬)

এসেছ যদ্যপি ভবে ভূষিত হইয়ে,
চঞ্চল কেন বা এত ত্বরিতে যাইতে ?
কেন চলে যাও তুমি নিমেষে আসিয়ে,
নিমেষে যাইবে যদি এলে কেন মর্ত্ত্যে ?

(৭)

বুঝেছি বুঝেছি তব কর্ম্ম অবসান,
স্বকর্ম্ম সাধিয়ে হেথা, করিছ প্রয়ান।
যাও যাও পুষ্পবর আপন ভবন,
যাও সেথা, রাজে যথা শান্তি নিকেতন ॥

(৮)

হেরিয়া তোমারে যেন শিখে নর ভবে,
ক্ষণিকের তরে তা'রা এসেছে হেথায়।
নগ্ন বেসে আসিয়াছে নগ্ন বেসে যা'বে,
কর্ম্ম সাঙ্গ হ'বে যদা বিশাল ধরায় ॥

(৯)

সুদীর্ঘ সাধন লভ্য এই নরদেহ,
বহু ক্লেশ সাধ্য এই বিদ্যা বুদ্ধি ধন।
এসবে আসক্ত যেন নাহি হয় কেহ,
কিছুই মানব সহ যা'বে না যখন।

(১০)

মত্ত হ'য়ে যেন নর সেই নাম লভে,
যে নাম লভিতে ধ্রুব পশিল কানন।
শুধু এ' অমূল্য নিধি নিত্য সঙ্গী হবে,
বিচরিবে মানবাত্মা যেথায় যখন ॥

(১১)

মত্ত যদি হয় কেহ যৌবন-রূপেতে,
বারেক তাহারা যেন হেরে তব রূপ ।
তোমার ক্ষণিক স্থিতি স্মরি, অন্তরেতে,
বুঝে যেন সমদশা তা'দের এ'রূপ ॥

শ্রীচুনী লাল চন্দ্র।

"নাম ধর্ম্ম।"

—ঃ০ঃ—

" হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

যাগ যজ্ঞ ব্রত ধর্ম্ম, পূজা আদি পুণ্যকর্ম্ম,
যা কর সুখের মর্ম্ম জানা অতি ভার।
জন্ম মৃত্যু তাপ জরা, পরিপূর্ণ বসুন্ধরা,
ভবের সাগরে শুদ্ধ হরিনাম সার॥
কলির প্রধান কর্ম্ম, নামসঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্ম,
নামের সাধন বিনা নাহিক নিস্তার।
নাম ব্রহ্ম মুখ্যরতি, নাম মোক্ষ পরাগতি,
স্বরূপ বিগ্রহ নাম নাহি ভেদ তার॥
প্রাতঃ স্মৃতি আচমন, তুলসীর আহরণ,
দশন ধাবন স্নান সন্ধ্যাদি সাধন।
বন্দিয়া বৈষ্ণব ব্রজ, বৃন্দাবন মোক্ষরজঃ,
নিত্য সেবা উর্দ্ধ পুণ্ড্র চক্রাদি ধারণ॥
পঞ্চকাল পূজারতি, শ্রীগুরু চরণে মতি,
গোপী চন্দনের মাল্য তুলসী সেবন।
কৃষ্ণক্ষেত্রধাম গতি, শ্রীমূর্ত্তি দর্শন-রতি,
তপ জপ পরিক্রম দৈবত বন্দন॥
রাধাকৃষ্ণ প্রেমনাট, গীতা ভাগবত পাঠ,
চান্দ্রায়ণ, পুরশ্চরণ, প্রসাদ ভোজন।
লীলাক্ষেত্র দরশন, রাধাকৃষ্ণ প্রবোধন,
পঞ্চাশৎ উপচারে চরণ অর্চ্চন॥
শঙ্খ ঘণ্টা ঘটা রোল, সঘন প্রেমের কোল,
সচন্দন গন্ধ পুষ্পে অভীষ্ট পূজন।

গৃহ পীঠ সংস্করণ, মাস বিধি বিচরণ,
বিষ্ণুর নিন্দুকে করি সুদূর বর্জ্জন ॥
দিনকৃত্য মাসকৃত্য, বিচারি বিষম নৃত্য,
একাদশী মহাতত্ত্ব তর্কের সৃজন।
জন্মাষ্টমী একাদশী, নরসিংহ চতুর্দ্দশী,
বামনের দ্বাদশীতে বিদ্ধার বর্জ্জন ॥
ভক্তের লক্ষণ ধরি, কিবা দিবা বিভাবরী,
সাধুর সঙ্গেতে করি শুভ আচরণ।
এ সব বৈষ্ণব নীতি, শিখিয়া বিশদ রীতি,
ভবের হাটে আছে যত ভক্তজন॥
অথবা সন্ন্যাস করি, করেতে করঙ্গ ধরি,
ধর্ম্ম লাগি আছে ছাড়ি গৃহ পরিজন।
কিছুতে নাহিক পার, বিশ্বে নাম ধর্ম্ম সার,
নামের কীর্ত্তনে নিত্য পাপের নাশন ॥
নামের মধুর তার, সবে সম অধিকার,
নামের সাধন বিনা গতি নাহি আর।
নাম প্রেমে পরামুক্তি, ভাগবতে আছে উক্তি,
"অজামিল" নাম গুণে পাইলেন পার।
"ম্রিয়মাণো হরের্ণাম গৃণন্‌পুত্রোপচারিতং।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥"
অক্ষয় স্বরগ কাম, যে করে হরির নাম,
সুখের তরণী তার ভব সিন্ধু জলে।
সেই সুধাসিক্ত নাম, বিতরিতে বিশ্বধাম,
নাশিতে পাতক পঙ্ক মেদিনী মণ্ডলে ॥—
শ্রীঅদ্বৈত শান্তিধামে, নিয়ত হরির নামে,
করিয়া জগৎব্যাপি প্রেমের হুঙ্কার।
তুলসী গঙ্গার জলে, আনিলা সাধন বলে,
"নিত্যানন্দ" শ্রীচৈতন্য প্রেম-অবতার ॥

পাইয়া পরম ধন,　　পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ,
হরিনামে বিশ্বধামে সবে হল পার।
নাম প্রেমে বিশ্বভরা　　পীযূষে পূরিত ধরা,
"হরিবোলে" বসুন্ধরা নাচ একবার ॥
"হরি বোল হরি"
"নাম চিন্তামনিঃ কৃষ্ণঃ চৈতন্য রস বিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নাত্মা-নাম নামিনোঃ ॥"

শ্রীহরি চরণ দে।

সংসার সন্তপ্তের প্রার্থনা ॥

——:০:——

হে দীনবন্ধু দীনতারণ! তোমাকেভিন্ন আমি আর কিছু চাহিনা। অলিক ভোগ বিলাসে মত্ত হইয়া এতদিন কাটাইয়াছি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার চিন্তা করিনাই, কিন্তু নাথ! অসার চিন্তা জরে দেহ জরাজ্বর, অর্থ চিন্তায় মন প্রাণ বিকার গ্রস্থ, সর্ব্বদা পরের চিন্তায় চিন্তিত আপন চিন্তা ক্ষণেকের জন্যও করি নাই, তাই নাথ! এক্ষণে তোমার পাদপদ্মে দীনের এই নিবেদন আর যেন তোমার চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা করি না। পরনিন্দা পরচর্চ্চা শুনিতে শুনিতে কাণ ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে, কুনিতি কুটতর্ক কুকথা শুনিতে শুনিতে কর্ণ বধির হইয়াছে. তত্ত কথা শুনি নাই, তোমার লীলা গান শ্রবণেতে শ্রবণ হয়নাই তাই নাথ! আর যেন তোমার কথা ছাড়া অন্য কথা শ্রবণ করি না। চিত্ত বড়ই চঞ্চল কিছুতেই স্থির হইতেছে না, চঞ্চলতা যাইতেছে না, পাপ পথে চিত্ত ধাবিত হইতেছে, অসার সংসারে মন প্রাণ অর্পণ করিয়াছি তোমার শ্রীপাদপদ্মে চিত্ত অর্পণ করিতে পারি নাই, ফল মূল মিষ্টান্নাদি যেখানে যাহা পাইয়াছি ভাল মন্দ বিচার নাকরিয়া লোভের বশীভূত হইয়া তাহাই ভোজন করিয়াছি রসনার তৃপ্তির জন্য সুধা বোধে অখাদ্য কুখাদ্য কতই না খাইয়াছি কিন্তু নাথ! তোমার নাম সুধা একবার ও খাই নাই, ভুলেও একবার মহাপ্রসাদ

ভোজন করি নাই তাই প্রার্থনা আর যেন তোমার নাম সুধা ভিন্ন অন্য কিছু খাই না। এসংসারে আসিয়া কত গান করিয়াছি বন্ধুবান্ধবগণকে সন্তোষ করিবার জন্য কত প্রকারের কত সংগীত গাহিয়াছি অশ্লীলতা পূর্ণ তোমার ভাব ছাড়া কত স্থানে কত গান করিয়াছি কিন্তু নাথ! তুমি যাহাতে সন্তোষ হও এমন প্রাণ মাতান হৃদয় জুড়ান নাম সংকীর্ত্তন করি নাই ভব রোগ নাশক শান্তি দায়ক হৃদয়ানন্দকারক প্রেমপূর্ণ প্রার্থনা সংগীত ভূলেও একবার গান করি নাই, যে গান গাহিয়া ধ্রুব প্রহ্লাদ সাগরে অনলে গহন কাননে মহা মহা বিপদ হইতে ত্রাণ পাইয়াছিল, যে গানের মোহিনী শক্তিতে দেবর্ষি নারদ নিমিষে ত্রিভুবন ভ্রমণ করিত, যে গানের মধুর তানে ইন্দ্র চন্দ্র যক্ষ রক্ষ দানব মানব সকলেই মুগ্ধ, যে গান করিয়া ব্রজাঙ্গনাগণ কোথায় ব্রজনাথ! হা রাধানাথ! বলিয়া আকুল প্রাণে বৃন্দাবনের বনে বনে উধাও হইয়া ছুটিত, যে গান শুনিয়া ভক্তের প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিত আবার যে গান করিয়া অক্রোধ পরমানন্দ শ্রীনিত্যানন্দ ভাববিভোরিত প্রাণে "কে নিবি আয় কে নিবি আয়" বলিয়া উচ্চরোলে ডাকিত এবং ঐ ডাক শুনিয়া পাপী তাপী নর নারীগণ মুগ্ধ হইয়া যাইত যে গান গাহিয়া সাধক রাম প্রসাদ শমনকে টিট্‌কারী দিয়াছিল, যে গান শুনিয়া মহাপাপী জগাই মাধাই পরিত্রাণ পাইয়াছিল এমন সুধা মাখা মধুর নাম সংগীত গান করি নাই, তাই প্রভো! নিবেদন যেন মধুমাখা তোমার সেই গান ভিন্ন অন্য গান আর গাইনা। সংসারে আসিয়া মিথ্যা সুখের আশায় কত কি করিয়াছি, সুধা ভ্রমে হলাহল পান করিয়াছি, বিষয় বিষে দেহ মন জর্জ্জরিত, সুখ শান্তি পাই নাই, সুখ রত্ন লাভের আশে কত প্রকারে কত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছি. কিন্তু নাথ! অর্থ যে অনর্থের মূল অর্থ যে বন্ধনের হেতু তাহা ভ্রমেও একবার চিন্তা করি নাই, সুখী হইব বলিয়া কত কি অকার্য্য কুকার্য্য করিয়াছি মিথ্যাকথা পরচর্চ্চা পরদ্রব্যহরণ জুয়াচুরি বাটপারি কত কি করিয়াছি, তাহার সীমা নাই কিন্তু কিছুতেই সুখ সোয়াস্তি পাই নাই, দেহ মদে মত্ত হইয়া সুখী হব বলিয়া পাপ পুণ্য কিছুই জ্ঞান করি নাই, কত জনের প্রাণে কত প্রকার কত যন্ত্রণা দিয়াছি, কিন্তু নাথ! কিছুতেই সুখী হইতে পারি নাই; তাই প্রার্থনা, তোমার সুখে সুখ বিনা যেন অন্য সুখ চাইনা কর্ম্মক্ষেত্র সংসারে আসিয়া কতকর্ম্ম করিয়াছি কিন্তু তোমার উদ্দেশে কোন কর্ম্ম করিনাই, তুমি যাহাতে সন্তুষ্ট হও এমন কর্ম্মে মন

নিয়োজিত করি নাই. জানি কর্ম্মক্ষেত্র সংসারে কর্ম্ম করিতেই হইবে, কিন্তু নাথ! কি কর্ম্ম করিলে তুমি সুখী হও তাহা ভুলেও একবার ভাবি নাই, কেবল ভুতের বেগার খাটিয়াছি কাজের খাটুনি কিছুই খাটি নাই, যা কিছু কর্ম্ম করিয়াছি তৎকর্ম্মফল শ্রীচরণে অর্পণ করিতে পারি নাই সকল কর্ম্মের মূল যে তুমি তাহা জানি নাই তাই প্রার্থনা তোমার কর্ম্ম ছাড়া যেন অন্যকর্ম্ম করি না। এই ভবের বাজারে আসিয়া কত যে অপথে কুপথে চলিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই যেপথে যাইলে তোমায় পাওয়া যায় এমন সুপথ চিনি নাই, কণ্টকাবৃত কর্দ্দমময় পথে কেবল গিয়াছি সুপথে যাইতে মন কিছুতেই ধায়নাই, তাই নাথ! তোমার প্রেম পথ ভিন্ন যেন অন্য পথে আর যাইনা। তৃষ্ণায় আকুল হইয়া পিপাসা দূর করিবার জন্য কত শীতল জল পান করিয়াছি তাহার সীমা নাই কিন্তু প্রাণের পিপাসা মিটে নাই, প্রকৃত তৃষ্ণার জল কোথায় রহিয়াছে তাহারঅন্বেষণ করি নাই, হরি হে! তোমার চরণারবিন্দই যে তৃষ্ণাতুরের তৃষ্ণা নিবারণের একমাত্র উপায়; কিন্তু নাথ! সে সাগর চিনি নাই সে বারি কণিকা স্পর্শ করিবার সামর্থ্য আমার নাই, তাই প্রার্থনা "ভক্তি" বারি ভিন্ন যেন অন্য বারি পান করিনা।

ছাড় ভব ঘোরে ঘুরিয়া কত দিক্ গিয়াছি তুমি যে কোন দিকে আছ তাহার অন্বেষণ করি নাই হরি হে! তুমি সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছ অথচ তোমায় দেখিতে পাইতেছি না, তুমি যে বিশ্বময় এ তত্ত্ব বুঝি নাই তাই হরি! তোমা ছাড়া যেন আর অন্য দিকে চাই না। হরি হে! তোমারই শ্রীমুখের বাণী, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্" তোমাকে যে যে ভাবে চাহে তুমি সেই ভাবেই তাহার কামনা পূর্ণ কর, কেহ বা অর্থরূপে কেহ বা স্ত্রী পরিবারাদি রূপে কেহ যশ মান রূপে কেহ বিদ্যা রূপে তোমাকে চাহিতেছে যে যে ভাবে তোমায় চাহুক না কেন তুমি তাহাই তাহাকে প্রদান করিয়া থাক। কিন্তু হরি! আমি যে পতিত পাতকি আমার সমান নারকী আর সংসারে নাই তাই প্রার্থনা আমি তোমাকেই চাই তোমা ভিন্ন আর কিছু চাই না, দয়াকরিয়া দেখা দাও নাথ!

দীনাতিদীন

বৃন্দাবন ভট্টাচার্য্য

"মনেরপ্রতি উপদেশ।"

—:•:—

(১)

ওহে ভ্রান্তমন মগ্ন সদা কার ধ্যানে,
ছাড়ি নিজ নিকেতন, আসিয়া বিদেশে।
আছ প্রেমে মুগ্ধহয়ে, বিদেশীর সনে;
ভাবকি অন্তরে কভু কি হইবে শেষে?

(২)

কোথা রবে তবপ্রেম প্রেমিক, প্রেমিকা,
ধন রত্ন গৃহ আদি প্রিয় পরিজন।
মুগ্ধ হয়ে বারি ভ্রমে হেরি মরিচিকা;
ধাইতেছ,— আশা তব না হবে পুরণ॥

(৩)

মোহ পিপাসায় প্রাণ হবে জর্জ্জরিত,
মরুভূমি সম তপ্ত অসার সংসারে।
নিত্য প্রেম তরু তথা নহে বিরাজিত;
জ্বলিবে বিচ্ছেদানল, হৃদয় মাঝারে॥

(৪)

তুমি কার কে তোমার কোথা হ'তে এলে,
পুন কোথা যাবে চলে দেহের পতনে।
না বুঝে পথিক সহ প্রেমে বদ্ধ হলে,
ফুরাইবে পরিচয় পথ অবসানে॥

(৫)

এভাব উদয় কভু হয়েছে কি মনে?
না না তা'হলে কি অনিত্য বিষয় তরে,

ঘোর যুদ্ধে মগ্ন হিংসা দ্বেষ আবরণে;
স্বার্থপর,—সদাবক্ত—আসিত্ত্ব প্রসারে॥

(৬)

মোহ মদে মত্ত, পূর্ণ সদা অহঙ্কারে;
রহিবে কি চিরকাল অক্ষয় অমর।
সুরম্য হরম্য মাঝে পর্য্যাঙ্ক উপরে;
প্রিয়সনে আলাপনে আছ নিরন্তর॥

(৭)

প্রিয়া মুখইন্দু সদা হৃদয় দর্পণে,
উন্মত্ত হইয়া হের মোহ মদে মাতি।
ধাইতেছ তুমি সদা কামিনী কাঞ্চনে;
অনিত্যেতে নিত্যজ্ঞানে করিয়াছ রতি॥

(৮)

পুত্র কন্যা মুখ হেরি সদা আনন্দিত,
করিয়াছ অলঙ্কৃত পূর্ণ কলেবর।
দাস দাসী আজ্ঞাবহ নিযুক্ত সতত;
আদেশ পালনে ব্যস্ত আছে নিরন্তর॥

(৯)

থাকিবেকি চিরকাল এভাব তোমার,
কালের করাল স্রোতে সবারি পতন।
নহেক তোমার কেহ, তুমি নহ কার;
ভেঙ্গেযাবে একদিন মোহের স্বপন॥

(১০)

স্থায়ীভাবে কার্য্য কর তুমি যে অস্থায়ী,
অবিশ্বাস সদা শ্বাস যদি বাহিরায়।
কর্ম্ম ফল ভোগ হেতু সদা তুমি দায়ী,
যথা কার বস্তু পড়ে রহিবে তথায়॥

(১১)

পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি বিচারিলে
লভিতে অনিত্য ধন বিষয় সম্পদ।
সাথী তব কেহ নাহি হবে পরকালে;
সাধ ক'রে নিমন্ত্রিলে নিজের বিপদ॥

(১২)

অনিত্য বিষয়ে মুগ্ধ পাপ পথে মতি,
আমার আমার বৃথা কর উচ্চারণ।
যথা—ভেক রব করে আনন্দেতে মাতি,
নিজ কালে লয় ডেকে লভিতে মরণ॥

(১৩)

তেমতি সংসারে মাতি ভেক রব সম,
রসনা জপিছে তব বিষয় বাসনা।
বিষয় হইতে হয় বিষের জনম;
কালে বিষ নাশে দিয়ে ভীষণ যাতনা॥

(১৪)

কতশত জন্মগত হ'য়েছে তোমার,
কত শত জায়া সুত আর পিতা মাতা।
কন্যারত্ন লভিয়াছ প্রিয় পরিবার;
পাশরিলে আছে কিহে স্মৃতি মাঝে গাঁথা॥

(১৫)

তেমতি এ ধন জন অসার সংসারে—
কালেতে প্রকাশ হয় কালেতে নিধন।
আপন আপন ভাব দু'দিনের তরে;
নিশির স্বপন সম সব অকারণ॥

(১৬)

মৃত্যু অনিবার্য্য কভু নহেক অন্যথা,
জলন্ত দৃষ্টান্ত হের শ্মশানেতে গিয়া।

নর-অস্থি ভস্ম আর জ্বলিতেছে চিতা ;
কর্ত্তব্য পালিছে পুত্র মুখে অগ্নি দিয়া ॥

(১৭)

মৃত্যু শব্দ শুনে প্রাণ সদা চমকিত,
স্বাস্থ্য রক্ষা লাগি ব্যস্ত থাক সাবধানে।
কিন্তু হরে আয়ুকাল থাকিয়ে গোপনে ॥
সময় থাকিতে এবে হও সতর্কিত।

(১৮)

মরণের চিহ্ন হেরি না হয় চৈতন্য,
সুচিক্কণ কেশরাশি শুভ্রে পরিণত।
দন্তের পতনে ক্রমে হেরিছে বিষয় ;
বাধ্য হয়ে চক্ষে কর চশ্‌মা ভূষিত ॥

(১৯)

তথাপি রে মূঢ় মন পতিত ভ্রমেতে,
কালের কুহকে কালো কলপ্ করিছ।
শুভ্র কেশ রাশি হেরি বিষাদিত চিতে ;
মুখ-সুশ্রী লাগি পুন দন্ত বাঁধাইছ ॥

(২০)

স্বভাবের কার্য্যে বাধা দেয় কার সাধ্য ;
বিধির ব্যবস্থা কেবা লঙ্ঘিবারে পারে।
প্রকাশি পুরুষাকার শেষে হয় বাধ্য ;
কৃত্রিমের শোভা বল্ল ক'দিনের তরে ॥

(২১)

পরিহরি বৃথা চিন্তা বৃথা আড়ম্বর ;
হরি পাদ পদ্মে প্রাণ করহ অর্পণ।
হরি নাম সুধা পান কর নিরন্তর ;
নিত্য ধামে নিজ বাসে করিবে গমন ॥

দীনহীন—শ্রী ত্রৈলোক্যনাথ মজুমদার।

কুষ্ঠব্যাধি—গলিতকুষ্ঠ ও বাতরক্তাদি পীড়া অতিশয় কদর্য্য, ইহার চিকিৎসা তত্ত্ব লইয়া বিলাতের মহামহোপাধ্যায় চিকিৎসকগণ বিশেষরূপ আলোচনা করিতেছেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ উহার প্রকৃত ঔষধ আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন নাই, আজ কাল কলিকাতার মধ্যেও উহার তথ্যানুসন্ধান হইতেছে বটে কিন্তু হাওড়া কুষ্ঠকুঠিরের চিকিৎসক পণ্ডিত শ্রীরাম প্রাণ শর্ম্মা কবিরঞ্জন মহাশয় এই দুরূহ রোগ তত্ত্বের দ্বার উদ্ঘাটন করিবার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করায় উহার সফলতা দৃষ্টে হাওড়া কুষ্ঠ কুঠিরের উপর সাধারণের লক্ষ্য আকর্ষিত হইয়াছে কুষ্ঠব্যাধি, বাতরক্ত ধবল ইত্যাদি চর্ম্মরোগ চিকিৎসায় কবিরাজ মহাশয় যেরূপ বিশেষজ্ঞ তাহাতে তাঁহার উন্নতি অনিবার্য্য সুতরাং যাহারা উক্ত ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া কষ্ট ভোগ করিতেছেন তাঁহাদিগের পক্ষে ইহা সুসংবাদ সন্দেহ নাই, কেননা তাঁহারা এই বিজ্ঞ চিকিৎসকের আশ্রয় লইলে নিঃসন্দেহে উপকৃত হইবেন।

প্রোফেসার—

কে, এন, ভট্টাচার্য্য,

হিপ, নটিষ্ট।

(সমালোচক।)

ভক্তি।

১০ বর্ষ
১৩১৮ সাল। } ফাল্গুন মাস। { ৭ম সংখ্যা।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥

প্রার্থনা।

তৃষ্ণাতোয়ে মদনপবনোদ্ধূত মোহোর্ম্মিমালে
দারাবর্ত্তে তনয় সহজ গ্রাহ সঙ্ঘাকুলে চ।
সংসারাখ্যে মহতি জলধৌমজ্জতাং নস্ত্রিধামন্
পাদাম্ভোজে বরদ! ভবতো ভক্তি ভাবং প্রযচ্ছ ॥

হে সর্ব্বেশ্বর! আমি তৃষ্ণারূপ বারি—কামরূপ পবন—মোহরূপ তরঙ্গ—এবং কলত্রাদি রূপ আবর্ত্ত ও পুত্রাদিরূপ জলজন্তু সমাকুল এই দুস্তর সংসার সাগরে নিপতিত হইয়া, নিরন্তর হাবুডুবু খাইতেছি। তুমি ভিন্ন আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারে, এমন কেহ নাই। তাই এই প্রার্থনা যে তুমি দয়া করিয়া আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর। হে বরদ! তোমার ভাবছাড়া করিয়া রাখিয়া আর তোমাকে ভুলাইয়া যাতনা দিওনা। অনিত্য বিষয় হইতে আমার মনকে ভুলাইয়া তোমার পাদপদ্মে একান্ত ভক্তি ভাব প্রদান কর, আমি তোমার ভাবসাগরে ডুবিয়া ধন্য হইয়া যাই।

লীলাময়! ধন্য তোমার লীলা খেলা। তোমারই প্রেরিতা অঘটনঘটন-কারিণী মায়াদ্বারা মোহিত হইয়া তোমার খেলা বুঝিতে পারিতেছিনা; আর খেলা বুঝিতে না পারিয়াই তোমাকে প্রাণ খুলিয়া ভাল বাসিতে পারিতেছিনা এবং ভাল বাসিতে না পারিয়াই তোমার আদেশানুসারে কার্য্য করিতে অক্ষম আর তজ্জন্যই স্ত্রী পুত্রাদি পরিজনবর্গকে লইয়া মায়ামোহে বিমোহিত হইয়া একমাত্র প্রাণের প্রাণ সর্ব্ব কারণ-কারণ যে, তুমি তোমাকে ভুলিয়া রহিয়াছি। প্রভো! মায়ায় এতই অতিভূত হইয়াছি যে অনর্থকে অর্থ জ্ঞান করিয়া হিতা-হিত জ্ঞান শূন্য হইয়া সুখের পরিবর্ত্তে নিরন্তর দুঃখই ভোগ করিতেছি। অনিত্য ধন জন গৃহাদিতে এতই আসক্ত হইয়াছি যে, ভ্রমেও একবার সর্ব্ব মঙ্গলালয় পরম আনন্দ স্বরূপ যে তোমার শ্রীপাদপদ্ম তাহা ভাবনা করিতে পারিতেছি না। নাথ! তুমিই একমাত্র দুর্ব্বলের বল, এই দুর্ব্বল দীনহীনকে আর পরীক্ষা না করিয়া, কৃপা পাইবার যোগ্যাযোগ্য বিচার না করিয়া অবিচারে কৃপা কর। পরীক্ষার ছলে আর মায়ার বাজে খেলনা দিয়া অশান্তি কূপে নিপতিত করিয়া দুঃখের পর দুঃখ দিওনা। সৎ বুদ্ধি দাও, তোমাকে প্রাণ মন সমর্পণের প্রবৃত্তি ও শক্তি দাও। প্রভো! তুমি নিজেই বলিয়াছ যে,—

"দৈবী হেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"

অর্থাৎ "দৈবী ও গুণময়ী মায়া (ত্রিগুণাত্মিকা মায়া) আমারই শক্তি ঐ মায়াকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য কিন্তু যে ব্যক্তি আমার শরণাপন্ন হয় অর্থাৎ আমাকে অকপট ভাবে আত্মসমর্পণ করে, সে আমার কৃপাতে অনায়াসেই মায়া মোহ হইতে পরিত্রাণ পায়"।

হে মায়াধীশ! তাই কাতর প্রাণে প্রার্থনা করি যাহাতে তোমার শ্রীপাদ পদ্মে আত্ম সমর্পণ করিয়া মোহের করাল কবল হইতে উদ্ধার হইতে পারি এমন শক্তি দাও, আমি একেবারেই শক্তিহীন, একবার কৃপা করিয়া দেখ তোমার কৃপারূপ শক্তি পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্য কি না? দয়াময়! জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য তুমি যুগে যুগে দেশ কাল পাত্রোপযোগী ভাবে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিতাপ দগ্ধ জীবের প্রতি যে তোমার অপরিসীম দয়ার পরিচয় দিয়াছ তাহা স্মরণ করিয়াই বলিতে সাহসী হইতেছি। একবার কৃপাকর, একবার এই অন্তঃ-

সার বিহীন মৃত প্রায় হৃদয়ে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম ভাব সঞ্চার করিয়া দাও তোমার কৃপা শক্তি সঞ্চারে এই দুর্ব্বল হৃদয় প্রবল উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া উঠুক। নিঃস্বার্থ ভাবে প্রাণ খুলিয়া তোমার নামের জয় দিয়া ধন্য হই। একবার দেখ তুমি যে তোমার প্রিয় বড় সাধের অমূল্য মনুষ্যজীবন দিয়াছিলে তাহার কিরূপ অধঃপতন হইয়াছে, দেব দুর্লভ জনম পাইয়া হিংস্র জন্তুর ন্যায় পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ, পরস্পর পরস্পরের প্রতি হিংসা করিয়া কত দূর ঘৃণিত দশায় উপনীত হইয়াছি। আমার দশা ভাবিতে গেলে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখি, চিন্তা সাগরের আর কূল কিনারা পাইনা, কি উপায় হইবে তাহা কিছুই বুঝিতে পারিনা। প্রাণে প্রাণে শক্তি সঞ্চার করিয়া আমাকে সৎভাবে চালিত কর যেন তোমার প্রেম ময় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ভাবে ভাবে তোমার নাম করিয়া মানব জীবন সার্থক করিতে পারি, দীনের মনের আশা পূর্ণ কর।

দীনহীন—শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

গোরা অনুরাগ।

—:০:—

(নাগরি উক্তি।)

সই! কেবলে গৌরাঙ্গ ভালো?
বাহিরে উহাঁর, সোণার বরণ,
ভিতরে কেবলি কালো॥
বাহিরে গৌরাঙ্গ, সরল সুন্দর,
পটেতে যেমন আঁকা,
ভিতর চাহিয়া, দেখিছ কি তাঁর?
ভিতরে তিনটী বাঁকা॥
বাহিরে গৌরাঙ্গ, সাধু সু-পণ্ডিত,
সাত্বিক ভাবেতে ভোর,
ভিতর খুজিলে, বুঝিতে পারিবে.

এ বড় দারুণ চোর।

বাহিরের ভাব,　　পরের রমণী,
না চায় নয়ন কোণে,
ভিতরে উহার,　　পরাণ কাঁদিছে,
শুধু পর বধূ গুণে॥

বাহিরে দেখিছ,　　পুরুষ লক্ষণ,
সকলে পুরুষ কয়,
পুরুষ হইয়া,　　প্রকৃতির ভাবে,
ভিতরে প্রকৃতি ময়॥

বাহিরে দেখিছ,　　ব্রাহ্মণ তনয়,
ব্রাহ্মণ্য ধরম ভূপ,
মোর মনে কয়,　　ব্রাহ্মণ তনয়,
ভিতরে যেমন গোপ।

গোরা কিসে ভাল সই! —

ভালর লক্ষণ,　　কি আছে এমন,
শুন তাঁর গুণ কই।
রমণীর রঙে,　　রঙাইয়া অঙ্গে,
ভাবের তরঙ্গে ভাসে,
পাগলের প্রায়,　　ইতি উতি ধায়,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া হাসে।
আপনি পাগল,　　বলি হরি বোল,
লোকেরে পাগল করে।
কি পুরুষ নারী,　　পাছু না বিচারি,
পাগল হইয়া মরে॥
জাতি কুল মান,　　সকল বিনাসে,
ভুলায় বিষয় সুখ।
কুলের কামিনী,　　করে উন্মাদিনী,
দেখায়ে সুন্দর মুখ॥

দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ন'দের শ্রীধর,
থোর, মোচা বেঁচি খায়।
জোর করি তাঁর, পসার লুটিয়া,
বিনামূল্যে নিতে চায়॥
পাড়ায় পাড়ায়, ঘুরিয়া বেড়ায়,
সকলে পাগল কয়,
বিষ্ণুর আসনে, বসে গে কখনে,
আপনি শ্রীবিষ্ণু হয়॥
পড়াইতে যায়, কি জানি পড়ায়,
ব্যাকরণ ব্যাখ্যা সূত্র,
এক অর্থ ছাড়ি, আর অর্থ করে,
বুঝায় শ্রীকৃষ্ণ মাত্র।
বিষ্ণুপ্রিয়া পানে, নয়নের কোণে,
ফিরিয়া নাহিক চায়।
বায়ুর বিকারে, যা ইচ্ছা তা' করে,
মায়েরে মারিতে যায়॥
হয়ে আত্ম হারা, করে "রা,-রা,-রা,-"
'ধা' বলিয়া ভূমে পড়ে।
ভাগ্যে বাঁচে প্রাণ, প্রাণের সমান,
নিতাই ধাইয়া ধরে॥
দেশে অধিকার, যবন রাজার,
তাঁরে নাহি করে ভয়।
অধম চণ্ডাল, কিছু নাহি বাছে,
টানিয়া কোলেতে লয়॥
কাঙ্গাল বিজয়, করযোড়ে কয়,
শুন শুন সুবদনী।
যা, বলিছ তুমি, সব পরমাণ,
গোরা গুণ রস খনি॥

বৈষ্ণব দাসানুদাস,——————শ্রীবিজয় নারায়ণ আচার্য্য।

প্রেম রাজ্যের পত্র।

—:০:—

সংসার দাবানল দগ্ধ প্রাণের শান্তির জন্য, অথবা অশান্তি পীড়িত মরুময় জীবনের পরিতৃপ্তির নিমিত্ত যদি কিছু থাকিয়া থাকে, তবে তাহা,—

"প্রেম রাজ্যের পত্র।"

যদি প্রেমার্দ্র হৃদয়ের বিশুদ্ধ ভাবোচ্ছ্বাস তরঙ্গে ডুবিয়া ভাসিয়া, অপ্রাকৃত ভূমানন্দের সংস্পর্শ পাইবার কোন হেতু, কি ভক্ত হৃদয়ের অনাবিল ভক্তি-স্রোতে কলিক্লিষ্ট বিষয়দুষ্ট মলিন চিত্তকে কিয়ৎকালের জন্য নিমজ্জিত করিয়া রাখিবার কোন সন্ধান, কোথাও থাকিয়া থাকে, তবে তাহা,—

"প্রেম রাজ্যের পত্রে।"

প্রেম রাজ্যের পত্রকে প্রেমিক ভক্তের হৃদয় চিত্র বা নিঃস্বার্থ ভালবাসার অমৃতকুণ্ড বলিলে বোধ হয়, প্রেম জগতে অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইবেনা।

এ রাজ্যের পত্রে যেমন, 'সুখ, দুঃখ, হর্ষ', বিষাদ. হাসি, কান্না, বিষয়, সম্পদ ও মান, মর্য্যাদার কথা কি সাংসারিক বহুবিধ কেলেঙ্কারী কোলাহলের কথা লেখা থাকে, প্রেম রাজ্যের পত্রে সেরূপ কিছুই থাকেনা।

প্রেম রাজ্যের পত্রে থাকে, প্রাণারাম প্রেমের সঙ্গীত,—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সুমধুর লীলা গীতিকা,—ভুবন মঙ্গল শ্রীহরি নামের দিব্যধ্বনি,—কলি মল নাশক শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার মধুর্য্যময় তরঙ্গ, শ্রীবৃন্দা বিপিনের প্রেমাভাস, গোপী-ভাবের অপূর্ব্ব ঝঙ্কার, এবং বিশুদ্ধ ভালবাসার পবিত্র চিত্র। আরোও কত কিছু থাকে, তাহা মাদৃশ জীবাধমের বুঝিবার শক্তি নাই।

প্রেম রাজ্যের পত্র পাঠে প্রাণে যে কি এক অদ্ভুত পূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়, তাহা ব্যক্ত করিবার ভাষা নাই। মধুময়ী গৌর লীলা, কৃষ্ণ লীলার আনন্দামৃতে এবং শুদ্ধ ভালবাসার সুধা ধারায় প্রেম রাজ্যের পত্র গুলি পূর্ণ থাকে। যাঁহারা নিঃস্বার্থ ভাল বাসার অমৃতাস্বাদে উন্মত্ত, পরোপকার ব্রতের স্বার্থ ত্যাগ মহামন্ত্রে দীক্ষিত, এবং অতি নীচাশয় পরকে আপন করিয়া লইবার

শিক্ষায় শিশুকাল হইতেই সুশিক্ষিত, তাঁহারাই প্রেম রাজ্যের পত্র লেখক। অথবা যাঁহারা জড় জগতের মিথ্যা কর্ত্তব্যে আকৃষ্ট না হইয়া সদানন্দে প্রেম রাজ্যে অবস্থান করেন, প্রেম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সুধা মধুর প্রেম বিতরণে তৎপর, তাঁহারাই ঐ সকল পত্র লিখিয়া থাকেন।

যে সকল পত্রে প্রেমিক ভক্তের প্রাণের কথা, ভগবদ্ লীলা মাধুর্য্যের কথা, সুমধুর কৃষ্ণ কথা, অকৃত্রিম সখ্যের কথা ভিন্ন অন্য কোন কথার অবতারণা নাই, আমি সেই সকল পত্রগুলিকে "প্রেম রাজ্যের পত্র" বলিয়া থাকি।

প্রেম রাজ্যের পত্র পাঠে, প্রাণে ব্যাকুলতা ও চক্ষে জল আসে। গা, সিহরিয়া উঠে। আর মনে হইতে থাকে যে, "হায় রে! ইঁহারা কি মানুষ না মানুষরূপে দেবতা? ইঁহারা কি সুন্দর হৃদয় লইয়াই না জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন? কবে ইঁহাদিগের পদরজ গ্রহণে কৃত কৃতার্থ হইব! সহবাস সংস্পর্শে নব জীবন লাভ করিব! স্বর্গীয় ভাব মাধুর্য্য পূর্ণ পত্র দয়া করিয়া আমাকে লিখিয়াছেন, তিনি অবশ্যই আমার পরম বন্ধু অবশ্যই আমার পর কালের পথ প্রদর্শক! আমার দেহ প্রাণ, ধন, জন যথা সর্ব্বস্ব উহাঁর চরণে অনন্তকালের জন্যে উৎসর্গ করিয়া দিলেও আর এ ঋণ শোধ হইবেনা। আজ বিনামূল্যে ইহাঁর চরণে বিক্রীত হইলাম। এই দূর দেশস্থ বন্ধুবর আজ আমাকে যে সুখে সুখী করিলেন, অপ্রাকৃত প্রেমানন্দ রসে মাখাইলেন, তাহার বিনিময়ে দিবার বস্তু জগতে নাই। সুতরাং ঋণী হইলাম।"

বিশুদ্ধ ভাল বাসার পবিত্রাস্বাদ চিত্ত দ্রাবক মহাশক্তি, এবং ভজন পথের সন্ধান সকল প্রেমরাজ্যের পত্রে অতি সুন্দর বর্ণিত থাকে।

ইহার (প্রেম রাজ্যের পত্রের) ছত্রে ছত্রে, বর্ণে বর্ণে নিষ্কাম প্রেমের প্রলেপ মাখান। শুদ্ধ সখ্যের অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি। এই পরম নিতান্ত পবিত্র পত্র গুলিতে, অপকৃষ্ট ও উদ্দেশ্য বিহীন নীরস জীবনকে আনন্দ ধামের পথে অনেকটা টানিয়া লয়।

এইরূপ পত্র পাঠের ফলে, অনেক পতিত জীব পরিত্রাণ পাইতে পারে, অনেক শুষ্ক জীবন ব্রজরসের স্ফূর্ত্তি পাইয়া সরস হইয়া উঠিতে পারে, অনেক পথ হারা পথিক ভজন পথের সন্ধান পাইতে পারে। এবং অনেক দগ্ধ প্রাণে ভক্তি লতার অঙ্কুর গজাইতে পারে।

আমি নিতান্ত ভক্তি ভজন শূন্য জীবাধম হইয়াও পূর্ব্বজন্মের কোটি কোটি সুকৃতির ফলে সর্ব্বদাই প্রেম রাজ্যের পত্র পাইয়া আপনাকে আপনি ধন্য মনে করিতেছি। আমি কলি ক্লিষ্ট, বিষয় দুষ্ট মন লইয়া, ত্রিতাপের রাজধানী এই সংসার মরুতে বাস করিয়াও সর্ব্বদা শান্তির শীতল সেকে স্নিগ্ধ আছি, কেবল প্রেম রাজ্যের পত্র পাঠে।

আমার প্রিয়সুহৃদ্ প্রেম রাজ্যের পরম বন্ধু "ভক্তি" সম্পাদক শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, মুর্শিদাবাদ কুঞ্জঘাটার "সাধনতত্ত্ব বিচার" গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত রামাচরণ বসু, ঢাকা ভাগ্য কুলের "মহা যজ্ঞাদি" বহু ভক্তি গ্রন্থ রচয়িতা শ্রীযুক্ত কালীহর দাস বসু ভক্তি সাগর, বাঁকুড়ার সোণামুখী নিবাসী "রাঙ্গা পা দু'খানি" প্রণেতা শ্রীযুক্ত রসিকলাল দে রাঙ্গা পা নিধি, বাঁচি তামার নিবাসী ভক্তকবি শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ময়মনসিংহ শাখুয়াই নিবাসী "বোধনাদি" গ্রন্থ প্রণেতা ভক্ত কবি শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীহট্ট সুয়া-তাীয়র নিবাসী পরম গৌরভক্ত শ্রীযুক্ত রূপনাথ সূত্রধর, শ্রীহট্ট কাইলাহানির গৌর ভক্ত শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র চৌধুরী, মুর্শিদাবাদ গোবরহাটীর "গৌড়ভূমি" সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাম প্রসন্ন ঘোষ, বাঁকুড়া জেলার প্রসিদ্ধ গৌরগত প্রাণ উকীল, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দাস, বাঁকুড়ার "হরিবোল" গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত মঙ্গলা প্রসাদ পাত্র (গুহ), হুগলী এলাটী নিবাসী শ্রীশ্রীবৈষ্ণব সঙ্গিনী" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস অধিকারী, ময়মনসিংহ রামেশ্বরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র আচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাগণ আমাকে যে সকল কৃপা পত্র লিখিয়া থাকেন, সম্প্রতি তাহাই আমার জীবনের অবলম্বন।

আমার বোধ হইতেছে, প্রেমিক ভক্তগণের কৃপাশ্রিত হইতে পারিলে, অতি অল্প সাধনায়ও প্রেম রাজ্যে প্রবেশের অধিকার জন্মিতে পারে।

প্রেম রাজ্যের পত্র পাঠে আর শ্রীগ্রন্থ পাঠে সমান ফল। প্রেমিকের সঙ্গে প্রণয় সংস্থাপন করিতে পারিলে জীবনের বিশেষ উন্নতি আছে। প্রেমিকগণ, আপন হৃদয় নিহিত প্রেমের ভাব, প্রেমের দীপ্তি পত্রে সঞ্চার করিয়া দেন। সুতরাং প্রেম রাজ্যের পত্র পাঠে পাঠকের হৃদয়ে ভাবের সঞ্চার হয়, প্রেমালোক প্রবেশ করে।

আমি অনেক গুলি "প্রেম রাজ্যের" পত্র সংগ্রহ রাখিয়াছি, সময়ে "প্রেম রাজ্যের পত্র" নাম দিয়া পত্রগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিব ইচ্ছা আছে। এ ক্ষেত্রে সাধু, গুরু, বৈষ্ণবের কৃপাই একমাত্র আমার সম্বল ।

হরিবোল ! হরিবোল !! হরিবোল !!!

বৈষ্ণব দাসানুদাস,—

শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য।

"তুমি ও আমি।"

১

জীবনে তোমারে আমি চিনিনি কখন ;
বৃথা মোহে ঘুরে ঘুরে,
গান গাহি' নানা সুরে,
তোমারে ধরিতে সদা করেছি যতন ;
হায় তুমি কোথা গেছ,
হৃদয়ে বেদনা দেছ,
আমি মিছে কেঁদে কেঁদে মরি অনুক্ষণ।

২

কোথায় আছ গো তুমি কে বলিবে মোরে
কাহারে শুধাব আমি,
তব কথা, ওগো স্বামী !
তোমারে কখন ডাকি, নিশীথে না ভোরে
বল আমি কোথা যাব,
কোথায় তোমারে পা'ব ?
তোমার লাগিয়া অশ্রু ঝরিছে অঝোরে ;
কি এক বেদনা আসে প্রাণখানি ভ'রে

৩

তোমারে দেখিছি খুঁজি' প্রভাত অলোকে ;
তরুণ রবির হাসি,
বাজায়ে কপট বাঁশী,
তোমারে রেখেছে ঢাকি' ব্যাকুল পুলকে
আমি [illegible] সিয়াছি ফিরে,
নিরাশায় [illegible]ন ঘিরে,
কল্পনার নেত্রে খুঁজি দ্যুলোকে ভূলোকে

৪

নদীর গানের মাঝে খুঁজিয়াছি আমি ;
তোমার গানের বেশ,
ওগো মোর হৃদয়েশ !
তবু তুমি চিত্তমাঝে আস নাই নামি ;
শুধু নদী উথলিয়া,
পুলকিয়া উছলিয়া
চলেছে আপন মনে বারেক না থামি'।

৫

তোমার আঁখির আলো নির্ম্মল, করুণ
চন্দ্রালোকে খুঁজিয়াছি
কিন্তু হায় দেখিয়াছি
বিমল চাঁদের মুখে দীপ্ত লাজারুণ;
আর কিছু দেখি নাই,
আর কিছু পাই নাই,
ধরিতে পারিনি তব আলোক তরুণ।

৬

প্রতিদিন প্রাতে দেখি কুসুমেরা ফুটে,
তাদের সরল প্রাণ,
তাদের হাসি ও গান
দেখিয়াছি একমনে ক্ষুদ্র আঁখি পুটে;
অমনি অস্ফুট কলি
আবেশে পড়িল ঢলি
অবশরে মধুকর মধুটুকু লুটে।

৭

নিরাশ হৃদয় ল'য়ে আসিনু ফিরিয়া,
কেমনে পাইব মনে
আমার হৃদয় ধনে,
পেলে পরে দেখাতাম হৃদয় চিরিয়া
কি দিয়া গড়া এ প্রাণ,
কি সুরে সাধা এ গান,
তার লাগি' কোন্ মধু রেখেছি ভরিয়া।

৮

হায়! সে তো আসিলনা হেথা একবার;
নিরাশা দগ্ধ হৃদি
কত জ্বালা নিরবধি
সহিতেছে আনমনে কে জানিবে আর!
নিরজনে বসি' আমি
ভাবি শুধু দিবাযামী
চরণ কমল খানি মোর দেবতার।

৯

কোথা তুমি, কোথা তুমি, এস ফিরে এস
একবার দেখে যাও,
একবার ফিরে চাও,
হৃদয় আসন পরে একবার বস;
জীবনে চাহিনা কিছু,
শুধু ফিরি তব পিছু
নিমিষের তরে একবার ভাল বেস।

১০

চাহিনা আরাম, সুখ, রূপ, ধন, মান,
শুধু তুমি আমি মিলি'
র'ব প্রেমে নিরিবিলি
কারেও কবনা আর মোদের সন্ধান;
দিবস রজনী বসি,
দুইটী হৃদয়ে পশি'
দোঁহে দোঁহা মধুপানে হ'ব হতজ্ঞান।

১১

তোমাতে করিব হারা সকলি আমায়,
আমি, তুমি হ'য়ে র'বে
তুমি, সেও আমি হ'বে
কিছুই র'বে না ভেদ সব একাকার;

তুমি শক্তি, আমি শব
দোঁহে মিলে শিব হ'ব
যে যাহার দুঃখ সুখ ভুলে আপনার।
জীবনে মরণে সদা তুমি হে আমার।

শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়।

৺চন্দ্রনাথ সীতাকুণ্ড (যোগানন্দ)।

চাঁদপুর হইতে এ, বি, (Assam-Bengal) রেলওয়ের আরম্ভ। পূর্ব্বদিক্ আসিয়া লাক্‌সামে উহার জংশন। প্রধান লাইন কুমিল্লা, আখাউড়া (আগড়তলা) দিয়া শ্রীহট্ট পার হইয়া কাছাড়ের দিকে গিয়াছে। এক শাখা নওয়াখালী, অপর শাখা চট্টগ্রামে পৌঁছাইয়াছে। ভক্তবৃন্দ, এই লাক্‌সাম্ হইতে চট্টগ্রামের দিক্ একবার চলুন্। আমি যাহা দেখিয়াছি, আমার মত অভিনব হইলে, আপনারাও তাহা দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত করুন। আমার এই বর্ণিত কাহিনীর বাহুল্যে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইবেন না, পাঠ করুন ; নারিকেল ফলের ভিতর যেমন কোমল মধুর শস্য ও স্নিগ্ধবারি থাকে, ইহার মধ্যেও তেমন যোগানন্দ আছে, ভক্তি আছে।

স্বাধীন ত্রিপুরার দক্ষিণাংশ খণ্ডলপরগণা। উহা অতি বিস্তীর্ণ ও পর্ব্বতাকীর্ণ। খণ্ডল হইতে রঘুনন্দন পর্ব্বত দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া ক্রমশঃ তরঙ্গের পর তরঙ্গ রচনা করিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিয়াছে। বামশাখা চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব্বসীমা আঁকিয়া আকায়াব গিয়াছে। দক্ষিণ শাখা চট্টলভূমি দ্বিখণ্ডিত করিয়া উহার মেরুদণ্ড গঠিত করিয়াছে। এই পর্ব্বতমালার নাম চন্দ্রশেখর। উহার পশ্চিমদিকের সমতলটীই আমাদের সমধিক আলোচ্য। ইহার একদিকে পর্ব্বতমালা, অপরদিকে সাগর তরঙ্গমালা।

চন্দ্রশেখর ও সাগর ঠিক্ সমান্তরালে অগ্রসর হয় নাই। সিন্ধু চন্দ্রশেখরের এবং চন্দ্রশেখর সিন্ধুর উদ্বেলমুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে উভয়ে সখ্যপ্রীতির মিলন প্রয়াসে ক্রমশঃ দক্ষিণ ও পূর্ব্বমুখে নিকটস্থ হইয়াছেন এবং অবশেষে চন্দ্রশেখর আহত হইয়া চট্টগ্রাম সহরের নিম্নে অতীব প্রেমোচ্ছ্বাসে প্রিয় সখার তরলাঙ্গে ঝাঁপ দিয়াছে। এখানে উভয়ের সুখ সম্মিলন।

এখন আপনারা বলিবেন, পর্ব্বত পাষাণময়; সিন্ধু দ্রব পয়োময়। উভয়ের প্রীতি অনৈসর্গিক। আপনারা তা বলুন কিন্তু এপ্রেমের সম্ভাবনা ও সামঞ্জস্য, কঠিন বস্তু কভু মধুর নয়, মধুরতা তরলে থাকে। ইক্ষুরস তরল, মধুর; দুগ্ধ তরল, মধুর; পুষ্পমধু তরল, মধুর। সুধা বলুন, অমৃত বলুন সবই যেন তরল। কবিগণ চাঁদের কিরণকেই "তরল" শব্দ দিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক কথায় বলিলে, রসই মধুর। সোণা, রূপা, লোহা, হীরা, চুণী প্রস্তরে মধুরতা নাই। এ সব কঠিন। কিন্তু কঠিন গুড় খণ্ড মিঠা; ইহার কারণ, উহা তরলেরই বিকৃতি অর্থাৎ তরল রসকে কৃত্রিমোপায়ে ঘনকরিয়া গুড় বা মিশ্রি প্রস্তুত করা হয়। সুতরাং তাহার আদি মধুর স্বভাব বিদ্যমান থাকে। এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিব। হিন্দুর দর্শন বলেন "জল হইতে "ক্ষিতি"। তবে দেখুন, জলের পরিণাম মাটি, মাটির বিকার পাষাণ। সুতরাং পাষাণে শৈত্যস্নিগ্ধতাউর্ব্বরতাদি জলগুণ বিদ্যমান আছে। ইক্ষুরসের পরিণাম যেমন মিশ্রি, সিন্ধুবারির পরিণাম তেমন পাষাণ পর্ব্বত। অতএব ইহাদের প্রণয়প্রীতি সমধার্ম্মিকতা থাকিবেনা কেন? অনেকাংশ আছে। এ সম্বন্ধে বিশিষ্ট প্রমাণ পরে দিব।

সে দিন চট্টলবাসী ভক্ত শ্রীমান্ বিধুভূষণ দেকে সঙ্গে করিয়া অপরাহ্ন এক ঘটিকার সময় ফেণীতে ট্রেনে চড়িলাম। ফাজিলপুর ষ্টেশন পার হইয়া হিঙ্গুলী বা ধুম ষ্টেশনে নামিয়া ৩॥ মাইল হাটিয়া করের হাট গ্রামস্থ হৃদয়ানন্দ আশ্রমে গেলাম। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীযুক্ত অভয়ানন্দ ব্রহ্মচারী এই আশ্রমে থাকেন। আশ্রমটি চন্দ্রশেখর পর্ব্বত পার্শ্বে, দেখিতে মনোরম। চট্টগ্রামের কতিপয় পদস্থ শিক্ষিত ভক্ত আশ্রমের পৃষ্ঠপোষক। অভয়ানন্দ বেশ প্রেমিক। ইনি জীবকে ভাল বাসিতে জানেন। অনুরোধে দুদিন অবস্থান করিয়া বেশ কীর্ত্তনানন্দ পাইলাম। করেরহাট জমিদার বাড়ীর মঠপ্রাঙ্গণের হরি সভায় আহূত হইয়াছিলাম। এই নিবিড় অরণ্যের ভিতরও আমার প্রাণ গৌর-নিত্যানন্দের নামধ্বনি, হরিবোল, খোল করতালরোল দেখিয়া শুনিয়া বিহ্বল হইয়াছিল। দেখিতেছি আমার গোরাচাঁদের লীলা-গুণ-তরঙ্গ সিন্ধুবক্ষ বল পর্ব্বতশিখর বল সর্ব্বত্র ছাইয়াছে। আমার গৌর দিন দিন আবার প্রেমাধিকার ছড়াইতেছেন।

তৃতীয় দিবসের শেষ রাত্রিতে রওনা হইয়া হিঙ্গুলী আবার ৫টার ট্রেনে চড়িয়া অনুমান ৭টার সময় সীতাকুণ্ডে নামিলাম। সীতাকুণ্ডের ২৪ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে চট্টগ্রাম সহর। চন্দ্রশেখর বামে রাখিয়া এই রেলপথ দক্ষিণে গিয়াছে। হিঙ্গুলী হইতে গাড়ী ছাড়িল। বামে পর্ব্বতমালার মধুর দৃশ্যশোভা। আমার নেত্র দুটি পর্ব্বতমালার সৌন্দর্য্য কুসুমে ভ্রমরবৎ সন্তরণ করিতে থাকিল। চিত্ত প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। প্রভাতী শিশিরে সমাচ্ছন্ন গিরিগাত্র স্নিগ্ধ নীলনব মেঘের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে চন্দ্রশেখরের শিখর দিয়া বালার্ক কোমল দীপ্তি খুলিয়া হাসিলেন। তৎকালীন শোভা অতি মনোমদ ও স্নিগ্ধ ভাবোদ্দীপক হইয়াছিল। ট্রেন পর্ব্বতমালা ঘেঁসিতে ঘেঁসিতে শেষে ক্ষুদ্র পাহাড় সব ভেদ করিয়া বড় বড় পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী সীতাকুণ্ডে থামিল। এই চন্দ্রনাথ।

চন্দ্রশেখরের উচ্চতম চূড়াটি চন্দ্রনাথ। হিঙ্গুলী ছাড়াইয়া কুণ্ডেরহাট আসিলে চন্দ্রনাথ দৃষ্ট হন। কিন্তু প্রভাতী শিশিরে চিনা যায় নাই। চন্দ্রনাথের পর পর্ব্বত আবার নত হইয়াছে। চন্দ্রনাথ চন্দ্রশেখরের যেন মুকুট খানি শোভা পাইতেছে। অথবা বোধ হইল যেন বিষ্ণুবাহন গরুড় ধরায় অবতীর্ণ হইয়া পক্ষপুট দুইদিকে প্রসারিত করিয়া অমৃত বিলাইতেছেন। চন্দ্রনাথ যেন উঁহার মস্তক, মধ্যে কিঞ্চিদুন্নতভাবে আছে। সীতাকুণ্ডে নামিয়া দেখি, যেন মাথার উপর চন্দ্রনাথ।

পূর্ব্বে সীতাকুণ্ডে চট্টগ্রামে এক মহকুমা ছিল। এখন তা উঠিয়া গিয়াছে। তথাপি স্থানটিকে সহরের মতই লাগিল। রেলপথের পশ্চিমে বৃহৎ বাজার, পোষ্টাফিস, ফরেষ্ট আফিস ইত্যাদি অনেক আছে। বাজারের বরাবর পূর্ব্বদিকু রেলপথ কাটিয়া পর্ব্বতাভিমুখে এক প্রশস্ত পথ গিয়াছে। এই পথের উভয় পার্শ্বে প্রথম পাণ্ডাগণের বাড়ী। চট্টলে চক্রশালা এক বিখ্যাত পরগণা। এখানে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস। পাণ্ডাগণের অধিকাংশই চক্রশালার ব্রাহ্মণ। পাণ্ডাগণের বাড়ীগুলিই যাত্রিকনিবাস। স্থানটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, গৃহাদি সুন্দর ও পরিষ্কার, কিন্তু পুকুর গুলির অবস্থা তত ভাল নয়।

ষ্টেশনে নামিয়া দেখি বহু পাণ্ডা যাত্রিকপ্রতীক্ষায় সমবেত। আমাদের নিয়াও টানাটানি পরিচয়াদি হইল। যাহা হউক আমরা ৺রামকুমার পাণ্ডার

গৃহে আসিলাম। একটি বৃহৎ বৈঠকখানা ঘরে কাপড় ছাতা জুতা রাখিয়া ধুতি গামছা স্কন্ধে লইয়া চন্দ্রনাথ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। এক ব্রাহ্মণ কুমার ফুলের সাজী, বিল্বপত্র কমণ্ডলু, ও নামাবলী লইয়া সঙ্গী হইলেন এবং বলিলাম, "আপনাদের ব্যাসকুণ্ডে স্নানতর্পণাদি করিতে হইবে, চলুন।" আমি বলিলাম, "আপনার কষ্ট করিতে হইবেনা, ফুল বেলপাতা আমাদের লাগেনা। স্নান করা না করা তখন বুঝিব। আমরা পুণ্য করিতে, তীর্থ করিতে আসি নাই। আমরা পথিক, ভ্রমণ আমাদের উদ্দেশ্য। আমরাই যাচ্ছি, আমরা কখন ফিরিব নিশ্চয় নাই; যখন আসি যেন কিছু প্রসাদ পাই।" এ কথায় ব্রাহ্মণ নিরস্ত হইলেন এবং বলিলেন, "হাঁ, প্রসাদ পাবেন, আসুন্‌যেয়ে।" আমরা দুজনে মনের সুখে মুক্তভাবে রাজপথে পূর্ব্বাভিমুখে চলিলাম।

পাণ্ডামহল ছাড়িয়া আসিয়া সীতাকুণ্ডের মহাভাগ্যবান্ মোহন্তজীর প্রাসাদ বাটীতে প্রবেশ করিলাম। মোহান্তটী অল্প বয়স্ক, ইংরেজী শিক্ষিত লোক। বেশ-ভূষায় বাঙ্গালী গৃহীর মত দেখাইল। কিন্তু ইহাঁরা কুমার সন্ন্যাসী, ইহাঁদের সাম্প্রদায়িক উপাধি "বন"। শিষ্যপরম্পরায় মোহন্তাপদলাভ হয়। বর্ত্তমান মোহান্তের নাম যতীন্দ্র বন। মোহান্তবাটী অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বদিকে এক ছড়ার তীরে তীরে পর্ব্বত পার্শ্বে আসিয়া ব্যাসকুণ্ড পাইলাম।

শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত "চন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ" গ্রন্থ পাঠে ব্যাসকুণ্ড সম্বন্ধে এইরূপ জানা যায় যে বেদব্যাস ব্যাসকাশী দ্বারা নিস্ফল হইয়া পুনরায় ঘোর তপস্যা করেন। বৃষবাহন প্রসন্ন হইয়া বর দেন :—

"গচ্ছ ত্বং নামেকং ক্ষেত্রং শ্রীচন্দ্রশেখরং মুনে।
গোপনীয়ন্ত তদ্বিদ্ধি দেবাদীনাঞ্চ সর্ব্বদা॥
তং ক্ষেত্রং পরমং রম্যং সর্ব্বর্ত্তু পরি শোভিতম্।
উমযা নিবাসয্যামি কলৌ সত্যং ব্রবীমিতে॥"

শিববাক্য শুনিয়া ব্যাস চন্দ্রশেখরের এইস্থলে আসিয়া তপস্যা আরম্ভ করেন। পার্ব্বতীনাথ পুনরায় এখানে ব্যাস সাক্ষাতে আবির্ভূত হন।

"ইহ তেনৈব রূপেণ তিষ্ঠ দেবগনৈঃ সহ।
গয়াদীনি চ তীর্থানি অত্রৈবানীয়তাং প্রভো॥"

ব্যাসের এই প্রার্থনা শুনিয়া দয়াময় শূলপাণি —

"এবমুক্তস্ত্রিশূলেন ভগবান্ বৃষবাহনঃ।

সর্ব্বতীর্থাম্বুনা সদ্যঃ কুণ্ডং তত্র বিনির্ম্মমে॥" (শম্ভুরহস্যে।)

ব্যাসকুণ্ডের উৎপত্তিকাহিনী এইরূপ এই চন্দ্রশেখর কলিতে সাক্ষাৎ কৈলাস বিরাজমান।

বৃষকেতুর ত্রিশূলাগ্রকৃত খাত ব্যাসকুণ্ড এখন এক গভীর বৃহৎ জলাশয়ে পরিণত হইয়াছে। উহার চারিপার বাঁধান। পশ্চিমপারের অধিকাংশ এক সুদীর্ঘ সোপানে নিবদ্ধ। ঘাটলার উপরেই ভৈরব মন্দির, ছাগাদির বলি দ্বারা নিত্য উহার পূজা হইতেছে। এই ঘাটে পঁহুছিয়া প্রথমতঃ বেশী আনন্দ পাই-লামনা। অনেকগুলি যাত্রিক স্নানতর্পণাদি করিতেছে এবং ভৈরবসম্মুখে পূজো-পহার অর্পণ করিতেছে। দেখিলাম মেয়েদের সংখ্যাই বেশী। বেণীবাবু বলিয়া একটী সুগায়ক ভদ্রলোকের সঙ্গে এখানে মিলন হইল। স্নান করিলাম, মন প্রফুল্ল হইল। সিক্ত বসন ত্যাগ করিতে ভৈরবমন্দির পার্শ্বস্থ এক মঠে প্রবেশ করিলাম। উহার খিলান দ্বার অতি নিম্ন। তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিতে খিলানের চোখা ইষ্টকে আমার মাথা সজোরে লাগিয়া গেল। রক্তপাত হইল। কিন্তু গ্রাহ্য না করিয়া বাহিরে রৌদ্রে বসিয়া তিলক ধারণ করিয়া জপে বসিলাম এবং মনে মনে ভাবিলাম, "প্রভো, দয়াময়, তুমি ভৈরবরূপে দ্বারী সর্ব্বত্রই আছে। জীবে সাবধান করিতেই তুমি ভৈরবরূপী। আমাকে বেশ সাবধান করিয়া দিলে সহজেই অহঙ্কার পাপ মোচন করিয়া দাসকে গ্রহণ করিলে। কারণ, আমি বুঝিলাম আমি যে পাণ্ডাঠাকুরকে বলিয়াছিলাম।" আমরা পুণ্য করিতে আসি নাই" এইবাক্য সত্য হইলেও উহাতে অহঙ্কার আসিয়াছিল। তুমি কৃপাময়, আমার দুচারবিন্দু রক্ত লইয়া তার প্রায়শ্চিত্ত করিলে এবং ছাগকে সতর্ক করিয়া দিলে।" এতে বুঝিলাম আমার ভ্রমণ সিদ্ধ হইবে। এই ভাবিতেই প্রাণে আনন্দের এক উদ্দাম ঢেউ খেলিল। আনন্দ প্রবাহে তারকব্রহ্ম নামমন্ত্র অজস্র ফুটিতে লাগিল। দুনয়নে খর অশ্রুধারা, প্রবাহিত হইতে লাগিল। আমি যেন গলিয়া ধরায় মিশিতে লাগিলাম। ব্যাসকুণ্ডের উত্তর পশ্চিম কোণে বিরাট বটবৃক্ষ। বট নয় বটু। এও আরণ্য একপ্রকার বটবৃক্ষ। কেহ কেহ ইহাকে অক্ষয়-বট বলেন। ইহার নামান্তর ব্যাসবট। ইহার পরিধি মাপিয়া দেখিলাম ২০ হাত।

অতি প্রকাণ্ড বৃক্ষ। মূলদেশ ইষ্টকবেদিকা সম্বদ্ধ। উহার গুঁড়ির অভ্যন্তরে গহ্বর দৃষ্ট হইল। এত বড় বৃক্ষ, অথচ গুঁড়ি এমন ভাবে জড়িত যে উহাকে লতা বলিলেও দোষ হয়না। স্ত্রীগণ প্রদক্ষিণ করিয়া উহার গাত্রে সূত্র জড়াইয়া দেন পবিত্রজ্ঞানে আমি তথা হইতে একখণ্ড সূত্র সঙ্গে আনিয়াছি। এইস্থানে ব্যাসদেব শিবের আরাধনা করিয়াছিলেন।

বটুকো মতিদক্ষশ্চ নন্দীশঃ ক্ষেত্র পালকঃ।
নির্ব্বিঘ্নং কুরু দেবেশ পঞ্চচোষ্টোপ্রিয়ঃ সদা॥"

শিবের দ্বারপাল নন্দী এখানে বৃক্ষরূপী বটুক। অশ্বত্থে শ্রীভগবান্। তুলসী বৃক্ষে শ্রীবৃন্দাজী বিল্বে শ্রীসদাশিব আছেন। বটুকরূপে নন্দীর অবস্থান মিথ্যা হইবে কেন?

ব্যাসকুণ্ডে স্নান করিয়া ব্যাসবটে পঞ্চলোষ্ট্র নিক্ষেপ করার বিধি। আমি সে বিধি পালন করিতে পারিনাই! কারণ বৃক্ষের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে যখন নয়ন উর্দ্ধপানে দিয়া ছিলাম, তখন আমার আত্মা দেহ হইতে অকস্মাৎ ফাঁক হইয়া উঠিয়া গতির সঙ্গে উর্দ্ধে ছড়াইয়া গেল। মাটির দেহ গলিয়া মাটিতে মিশিতে থাকিল। বৃক্ষমূলে লোটাইয়া পড়িলাম। বৃক্ষের সঙ্গে অপূর্ব্ব প্রেম হইল। আমার প্রাণ বল্লভ যেন বৃক্ষময় সুতরাং বৃক্ষাঙ্গে আঘাত দিতে প্রাণে চাহিলনা। সুতরাং ভাবের নিকট বিধি অবিধিতে পরিণত হইল। চিত্তের প্রমত্তাবস্থায় ভৈরব দর্শন করিলাম। যা দেখি তাই যেন আমার সঙ্গে কথা কহে তীর্থ মহাত্ম্য অস্বীকার করিবেননা। সৃষ্টির সৌন্দর্য্য শ্রীভগবানের প্রকট মূর্ত্তি বটে। অতঃপর ব্যাসকুণ্ড প্রদক্ষিণ করিলাম, উহার পূর্ব্বোত্তরে শ্মশান ভূমি, পূর্ব্বপারে মুমূর্ষু যাত্রীগণের আশ্রয়গৃহ আছে।

অনুমান ১১ ঘটিকার সময় আবার পূর্ব্বাভিমুখে প্রশস্তপথে চলিতে থাকিলাম। দুধারে সারি সারি বড় বড় পর্ব্বত। আনন্দ হৃদয়ে "আর্টেন"। পথ অতি সুন্দর, ক্রমোন্নত। ১০ মিনিট হাটিয়া এক জলধারা বা ছড়ার সম্মুখীন হইলাম। উহা পথ কাটিয়া ডান বা পশ্চিমদিক খাড়াভাবে একগভীর গহ্বরে পড়িতেছে। গহ্বরে নামিবার পথ ভাল, ধীরে ধীরে নামিলাম। সেই জলধারা সম্পাতের প্রথমধাপে বসিয়া জলস্পর্শ করিলাম। এই ঝরণার নাম মন্মথমদ। ইহার

উৎপত্তি সম্বন্ধে কিম্বদন্তী এই যে শিবের নেত্রানলে মন্মথ (মদন) দগ্ধ হইলেও মন্মথের স্তবে তুষ্ট শিব তাহাকে পুনঃ শীতল করিয়া এই শব্দ পরিণত করেন। এই জলপ্রপাতের পার্শ্বেই ধর্ম্মাগ্নির দর্শন পাইলাম। হরকোপানল এই ধর্ম্মাগ্নি আর এখন জলময় মন্মথকে দগ্ধ করিতে পারিতেছেনা। যেন বেশ প্রণয়! প্রস্তরের স্থানে স্থানে মশালের ন্যায় অগ্নিশিখা বাহির হইতেছে। উহা অতি চঞ্চল, নানা স্থান দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। স্থানে স্থানে পাথরে পোড়ার কাল দাগও আছে। আমরা সেই আগুনে গাছের পাতা ফেলিলাম; আগুন ধপ্ ধপ্ জ্বলিয়া পাতাগুলি ভস্মীভূত করিল। মন্মথের জল ঢালিলাম; উহা নিভিয়াও আবার জ্বলিল। বোধ হইল পাথরে সতত একপ্রকার দাহ্য দ্রবপদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাই উহার ইন্ধন। এ অনল জলে নিভেনা। এ অগ্নি অমর। জলও অনলের বিরোধ এখানে নাই বরং সখ্যপ্রীতি। উহা জলেও জ্বলে, যেমন বিরহের জ্বালা। এই অগ্নির নাম ধর্ম্মাগ্নি বা জ্যোতির্ম্ময়।

এই জলপ্রবাহের কূলে কূলে আরো নামিলাম। নামিয়া প্রথম উত্তরে একখানি ক্ষুদ্রমন্দির দেখিলাম। উহার অলিন্দে উঠিয়া দেখিলাম মন্দিরের ভিতরগর্ভ প্রস্তরস্তূপ পুরিত। বিধুবাবু বলিলেন প্রস্তর ফেলিয়া কুণ্ডটি রুদ্ধ করা হইয়াছে। সীতাকুণ্ডের মোহান্তজীর আয়ের ব্যাঘাত ঘটাইবার মানসে অপর সন্ন্যাসীদল নাকি শত্রুতা পূর্ব্বক রাত্রিযোগে এহেন বিগর্হিত কার্য্য করিয়াছে। ইহা জনশ্রুতি হইলেও সত্য বলিয়া বোধ হয়। হায়! যে কুণ্ডের নামে এই তীর্থের নাম হইয়াছে, এই প্রদেশের নাম হইয়াছে সীতাকুণ্ড, সেই সীতাকুণ্ডের এই দুর্দ্দশা! অনস্তিত্ব! হায় হায়! সে কোন্ প্রাণে মানুষ হইয়া এমন কার্য্য করিয়াছে? মানুষে যে যাহা করে সবই নাকি অভিশাপের ফল। সীতাকুণ্ড বিলুপ্ত থাকিবেন, শ্রীরামের নাকি এরূপ অভিশাপ আছে। তবে মানুষ করিয়া বিশ্বাসে মারা যায়। এই মন্দির হইতে নামিয়া দক্ষিণ দিকে ছড়া পার হইয়া অল্প উর্দ্ধে উঠিয়া দুটি কুণ্ড বা বাঁধান কূপ দর্শন করিলাম। সোপানের ধাপ বাহিয়া নামিয়া জলস্পর্শ করিলাম। কুণ্ড দুটি এক শান্তিময় স্থানে বসিয়া যেন কি ধ্যান করিতেছে। ইহাঁরা রাম কুণ্ড ও লক্ষ্মণকুণ্ড। হায়! সীতাকুণ্ড নাই, সীতা নাই! চিত্তে রামায়ণ জাগিল। অতঃপর ফিরিয়া পূর্ব্বপথে সীতা কুণ্ড ও ধর্ম্মাগ্নি পার্শ্বে রাখিয়া জলপ্রপাতের মাথায় রাজপথে উঠিলাম। প্রস্রবণ

ধারা (মন্মথ) পার হইয়া এক সমুচ্চ সোপানের পাদদেশ পাইলাম। উপরে চাহিয়া দেখিলাম এক মনোজ্ঞ ক্ষুদ্রপুরী। সোপান দিয়া পর্ব্বতশিখরে উঠিলাম। পশ্চিমে বা আমাদের ডাহিনে এক চত্বর। তাহাতে তুলসী কানন শোভা পাইতেছে। কয়েকখানি মঠও আছে। তথা হইতে পর্ব্বতের আর একস্তরে উঠিলাম প্রথমে এক চন্দ্রশালা। উহাতে দুবেলা নহবৎ বাজে। পুরীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। এখানে অনেকগুলি ইষ্টকালয়। শিখরের মধ্যস্থলে একখানি সুন্দর বৃহৎ মন্দির। উহার পাছে ও বামে সারি সারি কতিপয় মঠ ও দেবালয়। এই সকলের মধ্যে সাধু সন্ন্যাসীগণ বিশ্রাম করেন। পাছের মন্দির কয়খানির গাত্রে শিল্পখচিত দেবদেবীমূর্ত্তি শোভিত। দক্ষিণদিকে বিরাট পাকা মন্দির ও সেবাইতগণের বিশ্রাম ভবন। সম্মুখস্থ অট্টালিকায় যাত্রিকমেয়েগণ বসবাস করেন। মধ্যস্থ প্রধান মন্দিরের প্রথম প্রকোষ্ঠে সহস্র সহস্র নানা রকমের শিলাচক্র আছেন। একটি শিলা ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম। শিলাগুলি পাইতে দর্শকের সাধ জন্মে। শিলাচক্র ও শিবলিঙ্গ স্বভাবের সৃষ্টিতেই ফলে। পর্ব্বতে মিলে, লোকের তৈয়ারী নয়। ভিতরের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ঢুকিলাম মধ্যস্থলে শ্রীশম্ভুনাথ বা স্বয়ম্ভুনাথ বিরাজমান। উহা লিঙ্গমূর্ত্তি, লোহার কাটরা ঘেরা। যাত্রিকগণ মন্ত্রপাঠ সহ ফুলদল উহার মস্তকে দেন এবং উহা স্পর্শ করিয়া আনন্দিত হন। বাহুমূল পর্য্যন্ত প্রবেশ না করাইলে শ্রীমূর্ত্তির নাগ পাওয়া যায় না। আমি মন্ত্র পড়ি নাই, স্বতন্ত্রভাবে হস্ত প্রবেশ করাইয়া স্পর্শসুখানুভব করিয়াছি এবং সজল পুষ্পদল তুলিয়া মস্তকে ধারণ করিয়া নাচিয়াছি। আমি শম্ভুনাথকে কিছু দিতে পারি নাই, কিন্তু লইতে পারিয়াছি। শম্ভুনাথ আমার ঠাকুর দাদার নাম, আমার বাপের বাপ। তাই একটু রহস্য চলিল। শম্ভুনাথের বামপার্শ্বে উচ্চমঞ্চে মায়ের গৌরীমূর্ত্তি আসীনা। উহা নিত্যপ্রতিষ্ঠিতা বলিয়া বোধ হইলনা। বোধ হইল অর্থপ্রাপ্তি মানসে কোন পূজারী এই মূর্ত্তিটি এ স্থানে বসাইয়াছেন। বাহির হইয়া আনন্দে কতক্ষণ বিচরণ করিলাম।

সুদূর গিরীশিখর হইতে চন্দ্রনাথ দিয়া পাইপ্ বসাইয়া মন্দাকিনী সলিল প্রবাহ শম্ভুনাথ মন্দির প্রাঙ্গণে আনা হইয়াছে। উপরে থামও আছে। বড় সহরের মত কলের জল অজস্র পাওয়া যায়। স্বচ্ছন্দে সুখে স্নানপানাদি করুন,

বাধা নাই। রোয়াক আদি বাঁধান আছে। পাকা নর্দ্দমা আছে। জলের সুবিধা বেশ। জলেও স্বর্গেয় ধারা সুনির্ম্মল, তাহাও কলে।

শম্ভুনাথের বাটী হইতে পূর্ব্বোত্তর কোণে ১৫।১৬ হাত অগ্রসর হইলে বামে এক ইষ্টক সোপান্ (বা পাথরের মনে নাই) পাইলাম। উহা এক গভীর গুহায় নামিয়াছে। সিড়ি দিয়া নামিয়া এক বৃহৎ খোলামণ্ডপগৃহ পাইলাম। ইহাও ইষ্টকময়। উহার দক্ষিণাংশে এক কৃত্রিম বাঁধান কুণ্ড বা কূপ। চৌধার বৃত্তাকারে কাটারা ঘেরা। ইহার নাম জানিলাম গয়াকুণ্ড। যাত্রীগণ ইহাতে পিণ্ড দান করেন। এই মণ্ডপের উত্তর হইতে ক্রমাবনত হইয়া এক ছড়া আসিয়া মণ্ডপের পশ্চিমকোণ দিয়া দক্ষিণে নামিয়া পশ্চিমদিক্ সীতাকুণ্ডের গহ্বরে নামিয়াছে অনুমিত হইল। ইহা সেই মন্মথের উপরাংশ। এখানে নদধারা বড় দৃষ্ট হইলনা। শুষ্কবোধ হইল। শীতঋতু বলিয়া সর্ব্বত্রই প্রস্রবণ বা ছড় বা নদীর গতি অতি মৃদুমন্দ। মণ্ডপের অন্যোত্তরে জলের এক থাম ও পাকা চৌবাচ্চা দেখিলাম। কলটি সম্প্রতি ভগ্নদশাগ্রস্থ। উহার আর কিছু উত্তরে মানবমুণ্ডের কর্ত্তিত কেশরাশি স্তূপীকৃত দেখিলাম। বোধহয় লোকে মানস করিয়া মাথার চুল এখানে উৎসর্গ করিয়া থাকে। ফিরিয়া উপরে উঠিয়া চন্দ্রনাথের দিক্ কয়েক পা চলিলাম, কিন্তু সঙ্গী বিধুবাবু ভীত হইয়া বলিলেন, আমি পথ সম্যক্ জানিনা, বিশেষতঃ বাঘের ভয়ও আছে; চলুন্, দেখি বেণীবাবুকে পাই কিনা।—মেলা ও পর্ব্ব উপলক্ষ ভিন্ন চন্দ্রনাথের যাত্রিক বিরল। শম্ভুনাথের বাড়ী পর্য্যন্ত প্রতিদিন কিছু না কিছু যাত্রিক সমাগম হয়, কিন্তু চন্দ্রনাথে শতকে দু এক জন যাইয়া থাকে। আমরা অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু এক বেণীবাবু ব্যতীত অপর কেহ চন্দ্রনাথ যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। যাহা হউক্, আমরা শম্ভুনাথের মন্দিরে ফিরিয়াই বেণীবাবুকে পাইলাম। তিনিও আমাদিগকে পাইয়া আনন্দে ও উৎসাহে আমাদিগকে নিয়া চন্দ্রনাথ চলিলেন।

শম্ভুনাথ হইতে পর্ব্বতের উপরে উপরে উত্তরকোণে প্রায় অর্দ্ধ মাইল আসিলাম। অনন্তর উত্তরদিকে চলিলাম। পথ নতোন্নতভাবে চলিয়াছে। অবশেষে কেবল উঠিলাম। এক্ষণে বেলা ১২টা কি কিছু বেশী হইয়াছে।

রৌদ্র প্রখর, এপর্য্যন্ত জলযোগ হয় নাই। তাতে পার্ব্বত্য পথে হাঁটা। রৌদ্র প্রখর হইলেও, ঘোর নিবিড় বনাকীর্ণ ও গুহাসীন বলিয়া পর্ব্বত শীতল। বিধুর

বাক্যে নিতান্তই নিরাশ হইয়াছিলাম। কিন্তু বেণীবাবুকে পাইয়া আশা নবীভূতা হইল। দেহ ও মনের গ্লানি মোটেই তিষ্ঠিলনা। অতি সুখে প্রকৃতি মধুরিমা পান করিতে করিতে এক সুবৃহৎ ছাড়ের তীরে উপনীত হইলাম। প্রস্তরের উপর দিয়া গড়াইয়া ঝরঝর বারিধারা পড়িতেছে। যে যে স্থানে খাড়া হইয়া জল পড়িতেছে, সেসব পতনস্থলে খাত হইয়া কুণ্ড নির্ম্মিত হইয়াছে। কুণ্ড পূর্ণ রাখিয়া অতিরিক্ত সলিলরাশি নিম্নদিকে গড়াইয়া পড়িতেছে। পথে মন্দাকিনীর পাইপ্ দৃষ্ট হইল। ছড়ার জল তত পরিকার নয় বলিয়া যাত্রিকগণের পানার্থ এই সুন্দর সুবিধা করিয়া রাখা হইয়াছে।

এখন আমরা দুই পর্ব্বতের পাদদেশের মধ্যবর্ত্তী গিরিসঙ্কটে দণ্ডায়মান। এখন এই সঙ্কটেই সঙ্কট। ডাহিনে চন্দ্রনাথ, বামে বিরূপাক্ষ। চন্দ্রনাথের চূড়া দৃষ্ট হয়না, বিরূপাক্ষের প্রায় দৃষ্ট হয়। চাহিতে মাথা ঘুরে। হায়, এত উচ্চে কেমনে উঠিব! যে জংশনে দাঁড়াইয়াছি, তথা হইতে দক্ষিণে ও বামে দুটি পথ উঠিয়াছে। যাত্রীগণ সচরাচর আগে বিরূপাক্ষ দর্শন করিয়া চন্দ্রনাথ যান এবং সেই ডাহিনের পথে নামিয়া আসেন। আমাদেরও তাহাই অভিপ্রেত হইল। চন্দ্রনাথে উঠিবার পথ ইষ্টকময় সোপানাবদ্ধ, সুতরাং তত ভীষণ ও ক্লেশপ্রদ নয়। কিন্তু বিরূপাক্ষে উঠিতে তেমন কিছু সুবিধা নাই। স্বভাবের কোল দিয়াই উঠিতে হয়। লোক উঠে, এমন দাগমাত্র পড়িয়াছে; তাহাও সঙ্কীর্ণ। আমার পক্ষে আগে চন্দ্রনাথ উঠাই শ্রেয়ঃ ছিল।

ক্রমশঃ

শ্রীকালীহর দাস বসু।

প্রার্থনা।

—:০:—

নিশির শিশির সিক্ত তুলি' বনফুল,
হে মহান্ হে স্বামিন্ হ'য়ে চিন্তাকুল।

উষার সুষমালোকে আজি উপনীত,
লহ লহ ভক্তি অর্ঘ্য দীন জনার্পিত।
প্রাসাদ নাহিক মোর নাহি মুক্তাহার,
নাহি মম বিমণ্ডিত মণি স্বর্ণাধার ;
বৃক্ষ মূলে বৃক্ষ পত্রে ল'য়ে অশ্রুহার,
এসেছি তোমারে প্রভো দিতে উপহার।
পূজিব বসা'য়ে তোমা' এবে হৃদাসনে,
মাতাবে সুরভি দানে প্রভাত প্রসূনে,
কুহু কুহু তরু শাখে গাহিবে কোকিল,
বীজন করিবে তোমা মন্থরে অনিল।
বিমল প্রভাতে হেন বিমল পরাণে,
ডাকি প্রভু অনিবার বস হৃদাসনে।

শান্তি নিকেতন।

—:০:—

কোথা মা গো শান্তিদেবি! তব নিকেতন?
বিজন চাঁদিনী রাতে,
গগনে তারকা ভাতে,
বসতি তোমার কি মা! তথা অনুক্ষণ?
কিম্বা স্নিগ্ধ উষাকালে,
রঞ্জিত অম্বর ভালে,
শোভে যথা নবোদিত অরুণ কিরণ?
প্রকৃতি প্রমদা সনে,
যমুনা কল্লোল স্বনে,
ফুল্ল কুমুদিনী দলে কর কি ভ্রমণ?

কিম্বা অরণ্যানী কোলে,
অতল অর্ণব তলে,
অবিদ্যা করে না যথা কভু বিচরণ?
নিশির শিশির পাশে,
উষার কুসুম বাসে,
অশান্ত হৃদয়ে তোমা' করি অন্বেষণ;
তপ্ত প্রাণ তনু ছাড়ি,
কভু বা বিমানে উঁড়ি;
অন্বেষি' নিলয় তব করে আগমন।
কোথা তব নিকেতন,
নিত্য মন উচাটন,
সতত চঞ্চল মম আকুল পরাণ;
বিমল করুণা দানে,
কহ, মা বিদগ্ধ জনে,
কোথায় বিরাজে তব পুণ্য নিকেতন।

শ্রীচুনী লাল চন্দ্র।

পারের তরি।

ভ্রান্ত মানব! ভব সাগরের কূলে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছ? ঐ দেখ পারের তরি কিনারায় আসিয়াছে; শীঘ্র চল তরিতে ত্বরিতে আরোহন করি গিয়া। ভাইরে! গণা দিন যে ফুরাইয়া আসিল, এখনও বিষয় বাসনা গেলনা, এখনও মায়া মমতার হাত এড়াইতে পারিলে না? সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে আসিয়া কেন অকারণ অপথে কুপথে ভ্রমণ করিতেছ, নিজ নিকেতনে যাইবার সময় পথে যে "পার" আছে তাহা একবারও ভাবিলেনা। পথের সম্বল কিছু সঙ্গে লইলেনা, পাপের বোঝা মাথায় করিয়া কেবল বৃথা খাটুনি খাটিতেছ,

বিদেশে আর কেন যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ, ভব বাসে আসিয়া যাহা কিছু পুণ্য ধন সঞ্চয় করিলে কাম ক্রোধ লোভ মোহ আদি ভীষণ দস্যুগণ মাঝে মাঝে ডাকাতি করিয়া যে তোমার সর্ব্বস্বধন হরণ করিতেছে, তাহা তো একবারও ভাবিলে না। যদি পুণ্যধন সঞ্চয় করিতে বাসনা থাকে তাহা হইলে শম দম নামে দুইজন প্রহরী পরম যত্ন সহকারে রাখ তবেই কিছু কিছু রক্ষা পাইবে। আর যদি প্রহরী রাখা সত্বেও দস্যুগণ তোমার প্রতি অত্যাচার করে তাহা হইলে প্রাণপনে রাজার দোহাই দিও। দস্যুগণ ভীত হইয়া দূরে আপনিই পলায়ন করিবে তখন নির্ভয়ে কালযাপন করিতে পারিবে। প্রবাশে বিপদে পড়িলে রাজা ভিন্ন কে আর রক্ষা করিবে, যদি বিপদে রক্ষা পাইতে চাও তবে রাজার চরণ তলে স্মরণাপন্ন হও কোন বিপদ থাকিবে না, কোন ও ভয় ভাবনা থাকিবেনা, দেখিও যেন রাজার স্মরণ লইতে ভুলিওনা। ভাই! জাননাকি রাজার প্রবল প্রতাপ, যার শাসনে ইন্দ্র চন্দ্র যক্ষ রক্ষ দেব দানব মানব সকলেই শাসিত হইতেছে স্বয়ং শমন পর্য্যন্ত যার শাসনে শাসিত, সেই রাজরাজেশ্বরের স্মরণ লইতে পারিলে আর কিছুরই ভয় থাকিবেনা। ভাই! বিদেশে তো কত স্থানেই ঘুরিলে কৈ সুখ পাইলে কি? আর ঘুরিওনা আর কাল বিলম্ব করিওনা, চল বিশ্বরাজ শ্রীহরির দোহাই দিয়া তাঁহার "নাম" তরিতে আরোহণ করি গিয়া।

ভাই! প্রপঞ্চময় সংসার নাট্যশালায় আসিয়া গৃহীর সাজ সেজে কত অভিনয় করিলে পিতা মাতা ভাই বন্ধু প্রভৃতি অভিনেতা অভিনেত্রীর সহিত মিলিয়া মিশিয়া কত অভিনয় করিলে সুখ সোয়াস্তি পাইলে কি? বাসনা পূর্ণ হইল কি? ভব রঙ্গালয়ে অভিনয় করিতে আসিয়া কত সময় ধরিয়া অভিনয় করিলে তবু সাধ মিটিল কি? ভাই! হয়তো তুমি পিতার সাজ সাজিয়া আসিয়া কত প্রকারে অভিনয় করিলে যেই ঘটার ধ্বনি অমনি তোমার সাজ সজ্জা ত্যাগ করিতে হইল, স্ত্রী পুত্র কন্যা বন্ধু বান্ধব ত্যাগ করিয়া তোমাকে যাইতে হইল, কই কেহ তো আর তখন তোমাকে রাখিতে পারিলনা? তাই বলিতেছি এই রঙ্গক্ষেত্রের অভিনয় যখন সাঙ্গ হইবে তখন কেহ কাহারও নহে। ভাই তুমি গৃহী তোমার বড়ই ভয় হইতেছে কি প্রকারে পারের তরিতে উঠিব, বলিতে পার, আমারতো উপাসনাদি কিছুই নাই, দান ধ্যান ব্রত পূজা তীর্থ-ভ্রমণ প্রভৃতি শ্রীভগবানের প্রীতিকর কোনও কার্য্য আমার দ্বারা হয় নাই

কিরূপে ভবসাগরের পারে যাইব? তাহাতে আর ভয় কি আছে, ভাই! স্থির চিত্তে পুরাণ ইতিহাস আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে জনক রাজা তো গৃহী ছিলেন বিদুর, উদ্ধব, অর্জ্জুন প্রভৃতি মহাত্মারাতো গৃহী ছিলেন পরন্তু ইদানিং রামপ্রসাদ, সর্ব্বানন্দ তুলসী দাস এরাওতো গৃহী ছিলেন এই সকল মহাত্মা-গণ অনায়াসে ভব সিন্ধু পারে গিয়াছেন, তাহারা না হয় ভগবানের দাস ভক্ত সখা ছিলেন, গৃহী হইয়া অনাশক্ত ভাবে গৃহস্থাশ্রমের কার্য্য করিয়াছেন। আমরা না হয় সংসারে আসিয়া মায়াজালে জড়িত হইয়াছি তাই ভয় হইতেছে যে, "পারে" কি প্রকারে যাইব। ভাই! তাহার জন্য ভাবনা কি? আমরা যদি সাহস করিয়া শ্রীহরির নাম তরণীতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি তাহা হইলে অনায়াসে ভব সাগর "পারে" যাইব, কিন্তু একটী কথা যখন প্রকৃত ভবসিন্ধুর গভীর গর্জ্জন সেই শেষের শেষ দিনে শুনা যাইবে শমন যখন বিকট মুখব্যাদন করিয়া গ্রাস করিতে আসিবে তখন 'যে নিরূপায়। তবে সাহস আছে ঐ রাঙ্গাপায়ে স্মরণ নিতে পারিলে আপনা আপনিই উপায় হইবে তখন মহাত্মা রামপ্রসাদের সহিত বলিতে পারিব "শমন কি ভয় দেখাস্ মোরে। তোরে ভয় করিলে ভয়ের ভয় ঐ অভয়ার চরণের জোরে॥" আর কোন ভয় থাকিবেনা নির্ভয়ে পারে যাইতে পারিব। ভাই! বহু ভাগ্য বলে এই সুদুর্লভ মানব জন্ম লাভ করিয়াছ, দেখিও যেন এমন সাধনার জন্মটী বৃথা না যায়, যাহাতে মানব দেহোচিত কার্য্য হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে আর নিশ্চিন্ত হইরা বসিয়া থাকিবার সময় নাই চল নামের তরি আশ্রয় করি গিয়া, প্রতিক্ষণেই আমরা মরনের পথে অগ্রসর হইতেছি "অদ্যাব্দে শতান্তেবা মৃত্যু বৈঁ প্রানিণাং ধ্রুব" এই শাস্ত্র উপদেশ স্মরণ করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই মরণ হইতে পারে ইহা স্থির জানিয়া সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আর বিলম্ব করিওনা চল যাই নামের তরি আশ্রয় করি গিয়া। ঐ দেখ ভাই! পারের তরি তীরে আসিয়াছে, মাঝি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছে "আয় আয় কে যাবি ভবসিন্ধু পারে" আর বলিতেছেন "পার করিব বিনা মূলে পারের কড়ি লইবনা" শীঘ্র আয় তরি আশ্রয় কর। ভাই! এমন মাঝি আর হইবে না শুনিয়াছি দয়াল শ্রীগৌর-হরি এই তরির কর্ণধার সহকারী কর্ণধার শ্রীনিত্যানন্দ তবে আর ভাবনা কি? ভাই দেখ দেখ যুগাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গ অক্রোধপুরমানন্দ শ্রীনিত্যানন্দ দুই

ভাই বাহু তুলিয়া উচ্চরোলে ডাকিতেছেন কেবল হুহুঙ্কারে হরিবোল বলিয়া ঘন ডাকিতেছেন দুই ভাইয়ের নয়নেতে যেন শ্রাবণের জল ধারার ন্যায় অবিরল প্রেমধারা বহিতেছে নাম তরিতে যেই উঠিতে আসিতেছে কাহাকেও বারণ করিছেন না। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল পাষণ্ড পাপাচারী জ্ঞানী মূর্খ সকলেরই ঐ তরিতে সমান অধিকার, এমন আশ্বাস বাণী কি আর হইবে? ভাই ভবের হাটে আসিয়া কেন অকারণ বসিয়া আছ। হিসাব নিকাশ সব ভুলিয়া গিয়াছ এই বেলা যাহা বেচা কেনা থাকে শীঘ্র শীঘ্র সারিয়া লও আঁধার হইয়া আসিলে গোলে পড়িবে, ভাই যত পারো হরিনামরূপ পণ্য দ্রব্য ক্রয় করো তোমার জমা খরচ আপনিই মিলিয়া যাইবে ভাই! আর কেন শীঘ্র চল বিলম্ব করিলে নামের তরি চলিয়া যাইবে। পারে পার হইতে পারিবেনা তাই আইস মন প্রাণ খুলিয়া হরিবোল হরিবোল বলিয়া পারের তরিতে উঠি গিয়া শ্রীহরি নামই যে পারের তরি !!!

দীনাতি দীন—

শ্রীবৃন্দাবন ভটাচার্য্য।

উচ্ছ্বাস।

—:০:—

সাধে কি গৌরাঙ্গ দেবে এত ভালবাসি?
সাধে কি ও রাঙা পায়, পরাণ ছুটিয়া যায়,
সাজায়ে ফুলের সাজে দেখি দিবানিশি।
সাধে কি হৃদয় খানি, ও পদে দিয়াছি আমি,
সাধে কি হেরিতে চিত হেথা সেথা ধায়;
কি যেন কি ভাব মাখা, হরি বোল ব'লে ডাকা,
জীবন তরঙ্গে মোর নাচিয়া বেড়ায়
নিতাই গৌরাঙ্গ আমার এ হৃদয় বাসী॥

২

সাধে কি গৌরাঙ্গ পদ এত ভালবাসি ?
মোহন মুরতি খানি নবীন সন্ন্যাসী ॥

ছিল 'এ হৃদয় মম অন্ধকার ময়,
কি জানি কি ভাব দিয়া হইল উদয়।
আচণ্ডালে দিয়ে কোল, সুধু মুখে হরিবোল,
প্রেমে মাখা হরিনামে ঢালে সুধারাশি।

কি যেন কি মধুময় পরাণ শীতল হয়
প্রেমের পুতলী মরি কিবা রূপরাশি ॥

৩

সাধে কি গৌরাঙ্গ নাম এত ভালবাসি ?
মরুময় প্রাণে বারি দিলে নাথ আসি ॥

না হাঁসিত চাঁদ সখে ! দোল পূর্ণিমায়,
না পড়িত ঢলি বায়ু কুসুমের গায়;
সরায়ে পাতার বেড়া হাসিয়া হাসিয়া,
ফুটায়ে ভাবের ফুল হৃদয় ভরিয়া ;
আসিয়া নাশিলে প্রভু ঘোর তমোরাশি।
মৃত সঞ্জীবনী একি অমিয়ার হাসি ॥

(৪)

সাধে কি গৌরাঙ্গ দেবে এত ভালবাসি ?
দেখিতে ওরূপ মন সদা অভিলাষী ॥

শচী মার বুক ভরা, বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদি গোরা,
নিতায়ের প্রাণচোরা, শ্রীগৌরাঙ্গ শশী।
গদাধর বাসেন ভালো, শ্রীবাসের গৃহ আলো,
অদ্বৈতের প্রাণসখা জাগো হৃদে আসি।
ভুলাইয়ে মোহ মায়া, দাও সখা পদ ছায়া,
যে পদ দেখিয়া ভুলে যত ন'দেবাসী ॥

৫

সাধে কি গৌরাঙ্গ প্রভু এত ভালবাসি?
মনে রে'খো প্রেমময় আমি তব দাসী॥
কি দিব তোমারে দেব! কি আছে আমার,
দিবার কিছুই নাই আমরা তোমার,
কোথা পাব প্রাণ ভরা ভালবাসা রাশি,
শিখাইয়া দাও প্রভো বিরলেতে আসি;
দাও ভক্তি দাও বল, স্বামী পুত্রে অবিরল,
গাইব তোমার নাম প্রেমানন্দে ভাসি॥

দীনহীনা,—শ্রীমতী নির্ম্মলা রাণী।

হে সুন্দর!

—:০:—

(গীতিকা)

হে চির সুন্দর, কম-কলেবর,
এস হে মম হৃদয়ে।
আমি, তোমার লাগিয়ে, পিপাসিত হ'য়ে,
(আছি) আকুল পরাণে চাহিয়ে॥
ভব নশ্বর রূপে, মজিয়ে মাতিয়ে,
সৌন্দর্য্য পিয়াস মিটে না।
তব মোহন চিন্ময় রূপ দেখাইয়ে,
ঘুচাও এ নীচ কামনা॥
নাথ, প্রেম-বিচ্ছুরিত মূরতি তোমার,
বারেক আমায় দেখায়ে।

মোরে, মুগ্ধ চিরকাল, রাখ হে দয়াল্!
(যেন) নাহি রহি কামে ভুলিয়ে॥

আমি, প্রাকৃত রসে, ডুবিয়ে ডুবিয়ে,
তব অপ্রাকৃত রস ভুলেছি।

এখন, উপায় কি মোর, হে পরাণ চোর!
কাল ভয়ে কাতর হ'য়েছি॥

হে বাঞ্ছিত মোর, মায়ার এ ঘোর,
লও নিজ গুণে সরা'য়ে।

তুমি সুন্দর! অতি সুন্দর!
আমি সুন্দর হই হেরিয়ে॥

দীন—শ্রীরসিক লাল দে।

কৃষ্ণ তত্ত্ব ও জীব তত্ত্ব।

——:০:——

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

হরিদাস—জীবের স্বরূপ লক্ষণ কি?

গুরুদেব—"জীবের স্বভাব কৃষ্ণদাস অভিমান। দেহে আত্মজ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান"। (শ্রীচরিতামৃত)।

জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস; ভগবৎকর্ম্ম পালন ভগবৎ সেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। সেবাবুদ্ধি থাকিতে জীবকে কেহ নষ্ট করিতে পারে না। কিন্তু মায়াধিকৃত রাজ্যে মায়ার কবলে পড়িয়া জীব নিজস্বরূপ "দাস্য" এইভাব ভুলিয়া গিয়া আত্মসুখে ভোগলিপ্স হইয়া পড়ে, এবং তাহাই সর্ব্বনাশের হেতু হয় জানিবে। দাসের পৃথক কোন স্বতন্ত্রতা নাই, সুতরাং আত্মসুখ দাসের থাকিতে পারে না। দাস সর্ব্বথা প্রভুপরতন্ত্র, প্রভুর সেবাকার্য্যে দাস আত্মবিক্রয় করিয়াছে; তাহার

নিজের স্বতস্বামিত্ব প্রভুতেই মিশাইয়া ফেলিয়াছে। দাস স্বসুখ-কামনাগন্ধ বিহীন। "অহিংসায় অমায়ায় করে সর্ব্ব কর্ম্ম"। ভালমন্দ বিচারেও দাসের অধিকার নাই, দাস আদেশবাহী যন্ত্রমাত্র। প্রভুর ধর্ম্ম ভোগ, আর দাসের ধর্ম্ম সেবা। সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা প্রভুসেবা। তাই "কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা জীবের স্বধর্ম্ম", আর "আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা জীবের অধর্ম্ম"। যতদিন এই আত্মসুখ ভোগরূপ পাপব্যাধি জীবহৃদয় স্পর্শ করিতে না পারিবে, ততদিন জীব অজেয়। দাস হইলেও দাস তখন মুক্ত, সিংহের ন্যায় তেজস্বী। সময়ে স্বয়ং প্রভুই দাসের অধীন হন।

অল্প হেন না মানিহ কৃষ্ণদাস নাম।
অল্প ভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান্ ॥
সেবক কৃষ্ণের পিতা মাতা পত্নী ভাই।
দাস বই কৃষ্ণের দ্বিতীয় আর নাই ॥
যেরূপে চিন্তয়ে দাসে সেইরূপ হয়।
দাসে কৃষ্ণ করিবারে পারয়ে বিক্রয় ॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)।

হরিদাস—পূর্ব্বে বলিয়াছেন জীব তটস্থা, আলোক অন্ধকারের সন্ধিস্থলে অবস্থিত; জীব তবে আলোকে না গিয়া অন্ধকারে মরিতে আইসে কি জন্য?

গুরুদেব—শাস্ত্র বলিতেছেন জীব দুই প্রকার, "এক নিত্যমুক্ত নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ; অন্যটি নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হইতে বহির্ম্মুখ"। ইহাই প্রভুর খেলা। তটস্থা জীবের সম্মুখে দুইটি পথ—একটি কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা, ইহাই প্রেমের পথ, অন্যটি আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা, ইহাই কামের পথ। এই প্রীতি ইচ্ছা অর্থাৎ কামনা ছাড়িয়া জীবের মন এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না। মহাসমুদ্রবৎ জীবহৃদয় সর্ব্বদাই তরঙ্গায়িত ও অশান্ত। এই কামনা কোথা হইতে আইসে? "সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ"। সঙ্গ হইতেই কামনার সৃষ্টি। প্রাকৃতবিষয়ের সঙ্গ হইতে কামের উৎপত্তি, আর অপ্রাকৃত বস্তুসঙ্গজন্য প্রেমের উদয় হয়। অপ্রাকৃত কামনায় মন ডুবিয়া থাকিলে প্রাকৃত কাম আর তথায় প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় না। সৎস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-সূর্য্যের নিকটে অসৎ মায়ান্ধকার কিরূপে যাইবে?

"কৃষ্ণ সূর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥"

এই প্রীতি ইচ্ছা অর্থাৎ আনন্দাকাঙ্খাই জীবের মূল আকর্ষণ বা নিয়ামক। "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং" এই শ্রুতিতে যানা যায় যে সেই আনন্দ হইতেই জীবের উৎপত্তি, আনন্দলিপ্সু জীব তাই আনন্দ খুঁজিয়া বেড়ায়। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন ;—

ওঁ আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেনৈব জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। ইতি শ্রুতিঃ।

আনন্দ হইতে জগৎ সৃষ্ট, আনন্দের দ্বারা সঞ্জীবিত আবার আনন্দস্বরূপেই প্রত্যাগত ও অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে। এই বিশুদ্ধ আনন্দ অপ্রাকৃত ইহা, দ্বিবিধ, ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ এবং ঐশ্বরিক অর্থাৎ সেবানন্দ। ঐ অপ্রাকৃত আনন্দের অতি হেয় প্রতিফলনে উদ্ভূত যে আনন্দাভাস, তাহার নাম প্রাকৃত বৈষয়িক আনন্দ। প্রথম প্রকার, ত্যাগ ও শুদ্ধা ভক্তি হইতে সঞ্জাত, উহা দেখিতে আপাততঃ কষ্টকর হইলেও পরিণাম অতি সুখকর। আর দ্বিতীয় প্রকার, ভোগ অর্থাৎ আত্মসুখ হইতে সঞ্জাত, তাহা আপাতমধুর হইলেও পরিণাম বিষময়। লীলাময়ের ইচ্ছাই লীলা। তাই আনন্দাভিনয়ের জন্য তিনি স্থাবর জঙ্গম স্থূল সূক্ষ্মাদি বহু মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া আছেন।

অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম॥

শ্রীচরিতামৃত।

এই পরিদৃশ্যমান্ প্রাকৃত জগতের নাম "দেবীধাম", ইহা মায়াদেবীর অধিকৃত রাজ্য, এখানকার সমস্ত বস্তু মায়াবিজৃম্ভিত অসৎ; ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় জীব মায়ারাজ্যের অভ্যন্তরে পড়িয়াছে। অসদ্বস্তুর সঙ্গ আপাতমধুর। অতিসুমিষ্ট স্বাস্থ্যকর অমৃতোপম "গোবিন্দভোগ" সন্দেশ প্রয়াসী জীব অতিজঘন্য ব্যাধিকর, পরিণাম যন্ত্রণাদায়ক, আপাতমিষ্ট চিনির ঢেলা লইয়াই চাটিতে আরম্ভ করিয়া বিষয়সুখে নিমজ্জিত হইয়াছে। কাম (আত্মসুখ) হইতে লোভের উৎপত্তি, লোভে মোহ আনয়ন করে, তখন চৈতন্য লুপ্ত হয়, অবস্তুকে বস্তুজ্ঞান হয়,

দেহে আত্মবুদ্ধি সঞ্জাত হয়, সুতরাং জীব আত্মস্বরূপ ভুলিয়া মায়ার দাস হইয়া পড়ে।

জীবের স্বভাব কৃষ্ণদাস অভিমান।
দেহে আত্মজ্ঞান-আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান ॥

আমি জীব, ব্রহ্মের সূক্ষ্ম বিভূতি "সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ" ব্রহ্মের অনন্তগুণের কণিকা জীবেও বিন্দুবিন্দু মাত্রায় নিহিত রহিয়াছে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ শুষ্কতৃণ মধ্যে যেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তেমনই সঙ্গগুণে জীবের কোন কোন গুণের আধিক্য হইয়াছে।

জীবেষ্বেতে বসন্তোহপি বিন্দুবিন্দুতয়া ক্বচিৎ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

স্বতন্ত্রতা শ্রীভগবানের প্রধান একটী গুণ, জীবেতেও তাহার বীজ রহিয়াছে। জড়দেহাচ্ছন্ন হইয়া মায়ারাজ্যে প্রাকৃত বিষয় সঙ্গমধ্যে পড়িয়া জীবের স্বতন্ত্রতা ক্রমে জাগিয়া উঠে। মাতৃগর্ভে জীব পূর্ণমাত্রায় পরতন্ত্র, শৈশবেও প্রায় তাই, ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে প্রাকৃত সঙ্গজন্য জীবের স্বতন্ত্রতা বাড়িতে থাকিল; তখন শিশু চপল হইল, বালক অবাধ্য হইল, ষোড়শবর্ষে যুবক সাবালক হইল। তখন পিতা কর্ত্তৃত্ব ছাড়িয়া পুত্রের মিত্র হইলেন, হয় ত পুত্র আরও পাকিয়া গিয়া পিতার সহিত জঘন্য আচরণ আরম্ভ করিল। জীব আর তখন দাস নহে, জীব তখন পাকা কর্ত্তা।

হরিদাস—এই প্রাকৃত কথাটী ঠিক বুঝিলাম না।

গুরুদেব—প্রাকৃত শব্দ প্রকৃতি হইতে সিদ্ধ, এই প্রকৃতিকে অপরা প্রকৃতি বুঝিতে হইবে। শ্রীভগবানের দুইটী রাজ্য লইয়া আমাদের কারবার। একটী প্রাকৃত রাজ্য, অপরটী অপ্রাকৃত রাজ্য। অপ্রাকৃতের পৃথক্ কোন সূত্র নাই, যাহা প্রাকৃত নহে তাহাই অপ্রাকৃত।

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
(গীতা। ৭। ৪)

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আটটী অপরা প্রকৃতি। ইহাদের বিকারে বা সংস্রবে যাহা কিছু হইয়াছে, তাহাই প্রাকৃত অর্থাৎ "স্থাবরা জঙ্গমাশ্চৈব যৎ কিঞ্চিৎ স চরাচরং"। এই রাজ্যের পরিদৃশ্যমান্ সমস্তই অসৎ, জড়ীয় মায়াসৃষ্ট, সুতরাং পরিবর্ত্তনশীল ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। আর যাহা প্রাকৃত রাজ্যের অতীত, অথচ সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট, চিন্ময়, নিত্যানন্দ তাহাই অপ্রাকৃত। "চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং স চরাচরং" ইহা মায়ারাজ্যের অতীত পরব্যোম গোলোক বৃন্দাবন। বৃন্দাবনবর্ণনসময়ে কবিরাজগোস্বামী তাই বলিয়াছেন "বৃন্দাবন বিভু"।

এই বৃন্দাবন সর্ব্বত্র বিরাজিত, তবে মায়িক দৃষ্টির অতীত। পরম কৃপাময় লীলা-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ প্রকট লীলায় সেই দিব্য প্রপঞ্চাতীত চিন্তামণিধাম শ্রীবৃন্দাবনকে প্রপঞ্চান্তর্গত পুণ্যক্ষেত্র ভারত ভূমিতে প্রকট করিয়াছেন।

হরিদাস—দুর্ব্বল জীবকে প্রাকৃতরাজ্যে মায়ার হাতে ফেলাইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ঘুরাইয়া তাঁহার কি আনন্দ বাড়িতেছে?

গুরুদেব—উহাতেও আনন্দের বিবিধ বিবর্ত্ত চলিতেছে, বিরহ না হইলে প্রেমের পুষ্টি হয় না। স্বামী দীর্ঘপ্রবাসী না হইলে কালিদাসের অতিমধুর মেঘ-দূত হইত না। সীতাদেবী রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃত না হইলে বা তাঁহার উদ্ধার কল্পে অসাধ্যসাধন করিতে না হইলে, সুদীর্ঘ বিরহের পর রামসীতার যুগল মিলন অত মধুর হইত না, এবং পরমভক্ত রামদাস হনুমানেরও অত আনন্দ হইত না। সমুদ্রসেচনসিঞ্চিত মহারত্ন বলিয়াই কৌস্তুভ ভগবদ্বক্ষে স্থান পাইয়াছে। এইখানেই প্রকটলীলার বিশিষ্টতা। বিঘ্ন বাধা মধুরমিলনকে আরও মধুর করে। জটিলা কুটিলা না থাকিলে প্রেমময়ী রাধারাণীর প্রেমমহিমার সম্যক্ বিকাশ হইত না। কৃষ্ণদ্বেষিণীরা অনুক্ষণ অনুরাগিণীকে ঘেরিয়া আছে, ওদিকে অবুঝ শ্যামের বাঁশী বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে, বাঁশী সময়াসময় স্থানা-স্থান মানে না, দুপুরে ডাকাতি আরম্ভ করিয়াছে, অবলা সরলাকে উন্মনা করিল গৃহকর্ম্ম আর ভাল লাগিতেছে না, ক্রমে আকুল করিল, তখন বঁধুসঙ্গে মিলিবার উপায় খুঁজিতে লাগিল, তৎপরে 'বাউরী' (পাগলিনী) করিয়া তুলিল, আর ধৈর্য্য থাকিতেছে না, মনে হইতেছে "না হয় ত্যজি কুলে. যাই যে বনে মুরলী বাজে" সম্মুখে বিশাখায় পাইয়া ধনী খেদ করিতেছেন—

"শ্যামের বাঁশিটী, দুপুরে ডাকাতি, সরবস হরি লৈল।
হিয়া দগ্‌দগি, পরাণ পোড়নি, কেন বা এমতি হৈল॥
খাইতে শুইতে, আন নাহি চিতে, বধির করিল বাঁশী।
সব পরিহরি, করিল বাউরী, মানয়ে যেমন দাসী॥"

গুরুগরজন, ধরম সরম, কুলশীল লাজভয় সকলেই কৃষ্ণ মিলনের মহাবৈরী শ্রীমতীর প্রেমে-গরগর মনকে উহারা যত চাপিয়া রাখিতে চাহিতেছে, পদ্মার বাণের মত কানু-অনুরাগ তত বাড়িয়া উঠিতেছে, ক্রমে তাহা কুল, শীল, লাজ ভয় ডুবাইয়া গুরুগঞ্জনাকে ভাসাইয়া প্রেমময়ীর পাগল মনকে লইয়া কুঞ্জের দিকে ছুটিল; তখন অবলা সবলা হইলেন, অনুরাগিণী দৃঢ়ব্রতা হইলেন, স্থির করিলেন, সব যায় যাক্ তবু বঁধুকে ছাড়িতে পারিব না —

গঞ্জে গঞ্জুক গুরুজন তাহে না ডরাই।
ছাড়ে ছাড়ুক্ নিজপতি আপদ্ এড়াই॥
বলে বলুক্ পাড়ার লোক তাহে নাহি ডর।
না বলুক্ না ডাকুক্ না যাব কার ঘর॥
ধরম করম যাউক্ তাহে না ডরাই।
মনের ভরমে পাছে বঁধুরে হারাই॥
কালো মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানু গুণযশ কাণে পরিব কুণ্ডলে॥
কানু অনুরাগে রাঙ্গা বসন পরিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগীনী হইয়া॥

ইহারা পরকীয়া রসের চিত্র, স্বকীয়াতে এই সমস্ত বাধা নাই; সুতরাং সেখানে প্রেমের এই অপূর্ব্ব বিবর্ত্তও নাই। ইহাই প্রেমের মধুরতম চিত্র, কৃষ্ণ প্রাণ-ব্রজবাসী ভিন্ন এই লীলায় অন্যের অধিকার নাই।

পরকীয়া রসে হয় অধিক উল্লাস।
ব্রজবিনে ইহার অন্যত্র নহে বাস॥

পরকীয়ার নাম শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতেছ কি জন্য? আমাদের সম্বন্ধ ভাব লইয়া, বস্তুর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই।

আনন্দাভিনয়ের এই অপূর্ব্ব চিত্র দ্বাপরযুগে বৃন্দাবনে অভিনীত হইয়াছিল, উদ্দেশ্য জীবশিক্ষা। মায়ার চক্রে জীব সংসারের সহিত উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ সংসারের অসংখ্য জঞ্জাল ও কুটিল ব্যবহার জীবকে অনুক্ষণ ঘেরিয়া আছে, পূর্ণানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইতে দিতেছে না। ভগবানের চিচ্ছক্তি যোগমায়া, শ্যামের মোহনমুরলী রবের ন্যায় মুগ্ধ জীবকে ক্ষণে ক্ষণে চকিত করিতেছে। বিষয়াবদ্ধ জীবের হৃদয়ে প্রথমে "দগ্‌দগি" আরম্ভ হইল, ক্রমে "পরাণ-পোড়নি" ধরিল, তারপরে তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল, তখন ভক্ত সংসারসুখভোগকে পদাঘাত করিয়া, প্রাণবঁধুর সন্ধানে মধুর বৃন্দাবনাভিমুখে ছুটিলেন, মায়ার শত যুগের বন্ধন মুহূর্ত্তে টুটিয়া গেল, যোগমায়া জয়যুক্ত হইলেন। তাই লীলারহস্য বুঝাইতে কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—

"যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ সত্বপরিণতি
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপরতন ভক্তগণের গূঢ়ধন
প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে॥"

ক্রমশঃ।

শ্রীরামচরণ বসু।

বৈষ্ণব ব্রত তিথির তালিকা।

—:০:—

(সন ১৩১৯—৪২৭ চৈতন্যাব্দ।)

বৈশাখ।

অক্ষয় তৃতীয়া (চন্দন যাত্রা) ৭ই শনিবার।

জহ্নু সপ্তমী ... ১০ই মঙ্গলবার।

একাদশী ... ১৪ই শনিবার।

রুক্মিণী দ্বাদশী... ১৫ই রবিবার।

নৃসিংহ চতুর্দ্দশী ১৭ই মঙ্গলবার।
(পূর্ব্বদিনে ত্রয়োদশী বিদ্ধা)
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্পদোল পুর্ণিমা
১৮ই বুধবার।
একাদশী ... ৩০শে সোমবার।

জ্যৈষ্ঠ।

একাদশী ... ১৪ই সোমবার।
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান যাত্রা
১৭ই বৃহস্পতিবার।
একাদশী ... ২৯শে মঙ্গলবার।

আষাঢ়।

একাদশী ... ১১ই মঙ্গলবার।
একাদশী ... ২৭শে বৃহস্পতিবার
(দশম্যরুণোদয় বিদ্ধত্বাৎ)
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ যাত্রা
৩২শে মঙ্গলবার।

শ্রাবণ।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা
৭ই মঙ্গলবার।
একাদশী (শয়ন) ৮ই বুধবার।
শ্রীশ্রীহরির শয়ন (চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ)
৯ই বৃহস্পতিবার।
একাদশী ... ২৪শে শুক্রবার।

ভাদ্র।

একাদশী ... ৭ই শুক্রবার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রারম্ভ ঐ
পবিত্রা রোপন ... ৮ই শনিবার।
শ্রীশ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রা সমাপ্ত ও
রাখী পূর্ণিমা ... ১১ই মঙ্গলবার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রত
১৯শে বুধবার।
একাদশী ... ২২শে শনিবার।

আশ্বিন।

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ব্রত ... ২রা বুধবার।
একাদশী ... ৬ই রবিবার।
(পার্শ্বৈকাদশ্যুপবাস, শ্রাবণ দ্বাদশীর
উপবাস, বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ।)
শ্রীশ্রীবামন দ্বাদশী ৭ই সোমবার।
(অর্চ্চনানন্তর পারণ)
একাদশী ... ২১শে সোমবার।

কার্ত্তিক।

একাদশী ... ৫ই সোমবার।
পুর্ণিমা (শরৎ রাসযাত্রা)
৯ই শুক্রবার।
একাদশী ... ২০শে মঙ্গলবার।
গোবর্দ্ধনযাত্রা, অন্নকুট, দ্যুতপ্রতিপদ
বলিরাজ পূজা ২৪শে শনিবার।

অগ্রহায়ণ।

কাত্যায়নী ব্রত ১লা শনিবার।
গোপাষ্টমী ... ২রা রবিবার।
একাদশী (উত্থান) ভীষ্ম পঞ্চক
৫ই বুধবার।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রা
(চাতুর্ম্মাস্য সমাপ্ত) ৬ই বৃহস্পতিবার।
শ্রীশ্রীরাসযাত্রা... ৯ই রবিবার।
একাদশী ... ১৯শে বুধবার।

পৌষ।

একাদশী ... ৫ই শুক্রবার।
একাদশী ... ১৯শে শুক্রবার।

মাঘ।

*একাদশী (অরুণোদয় বিদ্ধত্বাৎ
একাদশ্যুপবাস) ৬ই রবিবার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক যাত্রা
৯ই বুধবার।
একাদশী † ... ২০শে রবিবার।
(অরুণোদয় বিদ্ধত্বাদেকাদশীরুপবাস)
বসন্ত পঞ্চমী ... ২৯শে মঙ্গলবার।
(শ্রীশ্রী কৃষ্ণার্চ্চনং)

ফাল্গুন।

মাকরী পঞ্চমী ... ১লা বৃহস্পতিবার।
(শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুরাবির্ভাব ঐ
একাদশী (ভৈমী) ৫ই সোমবার।
ত্রয়োদশী (শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ
প্রভুরাবির্ভাব উৎসব)...৭ই বুধবার।
একাদশী ... ১৯শে সোমবার।
শিবরাত্রি ব্রত ... ২২শে বৃস্পতিবার।

চৈত্র।

একাদশী ... ৬ই বুধবার।
(দশম্যরুণোদয়বিদ্ধত্বাৎ)
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা এবং
গৌর পূর্ণিমা শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য
মহাপ্রভুর আবির্ভাব উৎসব
৯ই শনিবার।
একাদশী ... ২০শে বুধবার।

ব্যবস্থাপক আচার্য্য।

—:o:—

শ্রীশ্রী৺রাধারমণ জিউর সেবাধিকারী।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম, শ্রীধাম বৃন্দাবন।
" " রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, আনন্দবাজার ও শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার সম্পাদক, কলিকাতা।

---

* কিন্তু ব্রজ মণ্ডলে "অবিদ্ধত্বাৎ" শনিবারে ব্রত হইবেক।

† কিন্তু ব্রজ মণ্ডলে "অবিদ্ধত্বাৎ" পূর্ব্ব দিনে ব্রত হইবেক।

বৈষ্ণবদিগের অপরাপর পর্ব্বদিন অর্থাৎ মহাপুরুষদিগের আবির্ভাব তিরোভাব দিনাদি গুপ্ত প্রেস পঞ্জিকায় দ্রষ্টব্য।

ভাগবত ধর্ম্মমণ্ডল,
১৬১ হ্যারিসন্ রোড্ কলিকাতা,
বৈশাখ ১৩১৯, ৪২৭ চৈতন্যাব্দ।

সম্পাদক শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী।
সহকারী শ্রীরাধাকান্ত গোসাঞি।

শ্রীল রায় রামানন্দ।

—:•:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বৈদিক দ্বিজের গৃহে শ্রীশচীনন্দন।
সন্ধ্যা বন্দনাদি ক্রিয়া করি সমাপন॥
সুখাসনে উপবিষ্ট প্রসন্ন বদন।
ক্রমে ক্রমে ভক্তগণ মিলিল তখন॥
চারিদিকে ঘেরিয়া বসিল ভক্তবৃন্দ।
তার মাঝে শশী যেন নবদ্বীপ চন্দ্র॥
সবে মিলি সঙ্কীর্ত্তনে মাতিল গৌরহরি।
ভাবে ভাবে নৃত্য করে মুখে বলে হরি॥

থেকে থেকে ভীমরবে ছাড়ে হুহুঙ্কার।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ করে জয় জয়কার॥
দুনয়নে অশ্রুধারা অধিক উজ্জ্বলে।
শ্বাস আসি দহিতে লাগিল কণ্ঠস্থলে॥
ক্ষণে জড়স্তু ভাব প্রভু রহে স্থির হইয়া।
প্রতি ক্ষণে প্রেমধারা পড়িছে বহিয়া॥
স্বর ভঙ্গ কম্প স্বেদ পুলক মূর্চ্ছিত।
প্রেম দেখি সর্ব্ব ভক্ত হইল বিস্মিত॥
চারিদিকে আনন্দিত ভকত মণ্ডল।
হরিধ্বনি জয় জয় হৈল কোলাহল॥
হেন কালে রামানন্দের হইল আগমন।
দণ্ডবৎ করি করে চরণ বন্দন॥

রায় রামানন্দ আসিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক, পাদবন্দনাদি করিয়া উপবেশন করিলেন এবং অবনত শীরে কৃতাঞ্জলি পুটে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। প্রভো! গতকল্য জ্ঞান ও ভক্তির পার্থক্য বিষয়ে, সাধুগুরুর কৃপায় যাহা অনুভব করিয়াছি, আমার যথা জ্ঞান বর্ণন করিয়াছি। কিন্তু দয়াময়! এদীনের ঐকান্তিক বাসনা দাসের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া আপনি জ্ঞান ও ভক্তির প্রার্থক্য বিষয় কিঞ্চিত আলোচনা করিয়া অধমের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

তখন চৈতন্যদেব আশ্রিত শরণাগত রায়ের মুখপানে চাহিয়া বলিতেছেন। অতি পবিত্র জ্ঞান ও ভক্তিতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া, আমি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি! জ্ঞান ও ভক্তির গুহ্য রহস্য এরূপ ভাবে কুত্রাপি কাহারও মুখে শুনি নাই। তবে ফলানুসারে জ্ঞান ও ভক্তিতে তারতম্য না থাকিলেও, ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের যে একটু বিশেষত্ব আছে তাহা বুঝা সুকঠিন, তবে উপযোগী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইলে সহজে বোধগম্য হয়। আমি দুই একটি সহজ লৌকিক দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিতেছি, বেশ নিবিষ্টমনে একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। দেখ দেখি, ঐ প্রাঙ্গন স্থিত কদম্ব বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া, লতিকা সকল কেমন উর্দ্ধে উঠিতেছে, আর লতিকা বেষ্টিত বৃক্ষের কিরূপ শোভা হইয়াছে বৃক্ষের আশ্রয় ব্যতিরেকে লতা

বাঁচিতে পারেনা এবং ফল পুষ্পান্বিত লতাগণ বৃক্ষকে বেষ্টন না করিলে, বৃক্ষের শোভা হয়না। জ্ঞান বৃক্ষ এবং ভক্তি লতিকা, ইহারা উভয়ে উভয়ের সাহায্য সাপেক্ষ। তরু লতায় যা পার্থক্য, পুরুষ প্রকৃতিতে যা পার্থক্য, জ্ঞান ও ভক্তিতেও তাই পার্থক্য। দেখ রামানন্দ তোমায় আমায় অভেদ আত্মা তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় তোমার প্রতি বিশেষ স্নেহ আছে, এজন্য বলিতেছি, এক্ষণে আমার প্রীতিকর ও কলির জীবের হিতার্থে অবশিষ্ট সাধন প্রণালী কীর্ত্তন কর।

এত শুনি রামানন্দ চরণে ধরিয়া।
পুনরপি কহে• কিছু বিনয় করিয়া॥
মুকে বলাইতে যদি হয় তোমার মন।
বল দেহ মোর মাথে ধরি শ্রীচরণ॥
মুর্খ নীচ ক্ষুদ্র আমি বিষয়ে লালস।
তব আজ্ঞাবলে করি এতেক সাহস।
সহজে আমার কিছু অর্থ নাহি আসে।
তব কৃপা বলে প্রভু যা কিছু প্রকাশে॥
বলেন প্রভু রামানন্দের শীরে দিয়া কর।
স্ফুরুক সকল শাস্ত্র দিলাম এই বর॥

রামানন্দ বলিতেছেন—

দেখুন দয়াময় আপনার আশীর্ব্বাদে এবং গুরু কৃপাবলে সাধন তত্ত্ব প্রসঙ্গে অনেক আলোচনা করিয়াছি, এবং কার্য্য দ্বারা যাহা উপলব্ধি করিয়াছি; তাহাতে বেশ বুঝিয়াছি অগ্রে মনকে গঠন করিতে হইবে, মনকে ঠিক্ করিতে না পারিলে কিছুই হইবেনা। জপ, তপ, ক্রিয়া, ধ্যান, ধারণা, যাহাই কর, তাহাতে কিছুই আসে যায়না। যদ্যপি মনকে নিজ অভীষ্ট দেবের প্রতি অর্পণ করিতে না পারা যায়, তবে সকলই মিথ্যা, কারণ মনই সকল কর্ম্মের নিয়ন্তা, সাধকের প্রথম কার্য্য মনস্থির করা, তার পর সাধন ভজন ইত্যাদি পঞ্চদশীতে একথা স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিয়াছেন। যোগবশিষ্ঠ বলেন—

মনোহি জগতাং কর্ত্তৃ মনোহি পুরুষস্মৃতং।
মনং কৃতং কৃতং লোকে ন শরীর কৃতং কৃতং॥

মনই জগতের কর্ত্তা এবং পুরুষ, মন দ্বারা যাহা করা হয় তাহাই প্রকৃত কৃত বলিয়া গণ্য হয়, আর শরীর দ্বারা যাহা করা হয় তাহা করাই নয়।

পঞ্চম দাস্যং—দাসস্য ভাবং ॥

সাধনার পঞ্চমস্তর দাস্যভাব, সেব্য সেবক ভাবের উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করাই পরম মুক্তি।

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ।
প্রশান্ত নিঃশেষ মনোরথান্তরঃ ॥
কদাহৈমকান্তিক নিত্য কিঙ্করঃ।
প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথ জীবিতম্ ॥

হে নাথ! আমার সেই দিন কবে হইবে, যে দিন নিরন্তর তোমার সেবা করিতে করিতে, আমার বিষয়াসক্ত মন বৃত্তি সকল তোমাতেই উন্মুখ হইবে, আর আমি তোমার ঐকান্তিক নিত্য ভৃত্য হইয়া কৃত কৃতার্থ হইব। দাস ভক্ত সর্ব্বদা নিজ ইষ্ট দেবের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে! হে দীনদয়াময়! তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার চিরদাস। আমি তোমা ভিন্ন অন্য কিছুই জানি না। তুমিই আমার ভজন, সাধন, সহায়, সম্পদ, রোগে, শোকে জীবনে মরণে, তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয় আমি আর কিছুই চাই না। নাথ! এই কর আমার মন যেন সর্ব্বদা তোমার ভাবে বিভোর থাকে। যথা—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহ কর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্ণব সঙ্গ রসায়ণং ॥ বশিষ্ট রামায়ণ।

যেমন পরপুরুষাসক্ত চিত্ত রমণী গৃহ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিলেও, সে সর্ব্বদা মনে মনে সেই পরপুরুষ সঙ্গ জনিত সুখাস্বাদন করিয়া থাকে, সেইরূপ, আমি যখন যেখানে যেভাবেই থাকিনা কেন, যে কোন কার্য্যই করিনা কেন আমার মন যেন নিরন্তর সেব্য সেবক ভাবামৃত পানে মত্ত থাকে। আর দয়াময়! যে সকল সাধকবৃন্দ নিজ নিজ অভীষ্ট সাকার মূর্ত্তিকে প্রভুপদে বরিত করিয়া এবং নিজে দাস ভাবে সর্ব্বদা তাহার সেবায় নিযুক্ত থাকে, তাঁহাদের কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। যথা—

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে ॥ শ্রীমদ্ভাগবত ৯।৫।১৬

যখন শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ মাত্রে মানব নির্ম্মল্ চিত্ত হয় তখন তাঁর দাসগণের কি আর কিছু অপ্রাপ্য থাকে। তুমি প্রভু আমি দাস এইরূপ ভাবে সেবা করিতে করিতে সাধকের তুমি প্রভু আমি দাস এভাব একেবারে ভুলিয়া যায় যথা—

অন্তর্বহি যদাদেবং দেবভক্ত প্রপশ্যতি।
দাসোঽস্মীতি তদা নৈতদাকারং প্রতিপদ্যতে
বো সা ভক্তিযোগ।

ভক্ত যখন অন্তর্বহি সর্ব্বত্রই তাহার ভজনীয় ভগবানকে দর্শন করে, তখন পরম প্রেমে পুলকিত হইয়া আমি আপনার দাস এই ভাব একেবারেই বিস্মৃত হইয়া যায়। ক্রমশঃ— শ্রীমতি লাল চক্রবর্তী।

সৎপ্রসঙ্গ

—:o:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চণ্ডীচরণ] গুরু ভিন্ন কি সাধন পথে অগ্রসর হওয়া যায় না ?

রঘুবর] গুরু শক্তির সাহায্য ভিন্ন যখন সামান্য শিল্প বিদ্যাও শিক্ষা করা যায় না, তখন কেবল অহংশক্তির দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা পূর্ব্বক ভগবল্লাভ করা অসম্ভব, আদর্শ স্থাপনের জন্য আবির্ভূত নিত্য সিদ্ধ মহাত্মারা যখন গুরুশক্তি সম্পন্ন হইয়াও লোক শিক্ষার্থে গুরু করণ করেন, তখন সাধারণের পক্ষেতো কথাই নাই, গুরু ভিন্ন শক্তিসঞ্চার পূর্ব্বক কে শিষ্যের আধ্যাত্মিক ভাবের উন্মেষ করিয়া দিবে ? সাধন প্রণালী শিক্ষা দিয়া কে সেই মহাপথের সহায় হইবে ? গুরু এক ও অদ্বিতীয় এবং সেই গুরুই শ্রীভগবান, তবে সূর্য্য এক হইলেও যেমন ভিন্ন ভিন্ন দীপাধারে অগ্নিরূপে প্রকাশ হইয়া কাহাকে বা দগ্ধ এবং কাহারো বা নিশাক অন্ধকার নষ্ট করে, সেইরূপ মঙ্গলময় শ্রীভগবান এক হইলেও বহু আধারে গুরু শক্তিরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়া শিষ্যের বাসনা ও ব্যবহার ভেদে কাহাকে বা অশান্তির নরকানলে দগ্ধ করিয়া শিক্ষা প্রদান করেন এবং কাহারো বা হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিয়া পরমধামের পথ দেখাইয়া দেন।

ব্যবহারিক দৃষ্টিতে দীক্ষাদাতা ও শিক্ষাদাতা ভেদে এই গুরুশক্তির দ্বিবিধ ভাব, জমিদারি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে যদি কেহ ব্যবসা আরম্ভ করে, তাহা হইলে মূলধন দাতা ও লভ্য দাতা উভয়েই যেমন জমিদারি ক্রয়ের উপযোগী ধন বৃদ্ধির সহায় হয়, সেইরূপ পরমপদ লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইলে দীক্ষা গুরুই শক্তি সঞ্চার ও জ্ঞানোন্মেষ পূর্ব্বক সাধন পথের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দেন ও শিক্ষা গুরুগণ সেই পথে অগ্রসর হইবার সহায় হন, একাগ্রতার প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক ভাবের সাধনা করিবার জন্যই দীক্ষা গুরুর আধার আবশ্যক এবং এই জন্যই দীক্ষা গুরু এক, অতএব সদ্‌গুরুর দ্বারা দীক্ষিত হইবার চেষ্টা করা উচিত, যাঁহার আধার নির্ম্মল, যিনি ভগবদ্ভক্ত ও শক্তি সঞ্চার ক্ষম, জ্ঞান সম্পত্তিতে যাঁহার হৃদয় ভাণ্ডার পূর্ণ, এরূপ মহাত্মাই গুরু হইবার যোগ্য। ভ্রমর যেমন পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে যে পুষ্পে মধু আছে তাহাতেই আকৃষ্ট হয় সেইরূপ যদবধি না উপযুক্ত গুরু আধার পাওয়া যায় তাবৎ গুরু অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য, সংসঙ্গাদির দ্বারা ভগবল্লাভের জন্য ব্যাকুলতা তীব্র হইলে সহজেই সফলকাম হওয়া যায় এবং সদ্‌গুরু লাভ করিবার ইহাই মূল সূত্র জানিও।

চ। সামাজিক সংস্কার বোধে অথবা কোন স্বার্থপর ব্যক্তির প্রলোভনে ভ্রান্ত হইয়া অসময়ে যদি কেহ গুরু করণ করে ও পরে সংসঙ্গাদির দ্বারা সেই ভ্রম বুঝিতে পারে, তবে কি সে উপযুক্ত গুরুর নিকট পুনরায় দীক্ষিত হইতে পারে না?

র। নিশ্চয়ই পারে, গুরু করণ সামাজিক সংস্কার নহে, ইহা আধ্যাত্মিক সংস্কার, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইহা সামাজিক যথেচ্ছাচারে পরিণত হইয়াছে, শাস্ত্রে গুরু ও শিষ্যের যে লক্ষণ নির্ণীত আছে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে অজ্ঞ ব্যক্তিগণের সর্ব্বনাশের পথ প্রস্তুত হয় মাত্র, তাহাকে গুরুকরণ বলিতে পারা যায় না, কপর্দ্দকহীন ব্যক্তি যদি লক্ষ টাকার চেক প্রদান করে তবে তাহার দ্বারা কি ব্যাঙ্ক হইতে টাকা পাওয়া যায়? ইহা যেমন বাহকের ক্লেশ ও নিরাশার কারণ হয়, সেইরূপ যাহারা ভ্রম ক্রমে তত্ত্বজ্ঞানহীন স্বার্থপরের নিকট দীক্ষিত হইয়া জ্ঞান সম্পত্তি লাভের আশা করেন তাহাদের ত্রিতাপের যাতনা বৃদ্ধি হয় মাত্র, এরূপ অবস্থায় নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া পুনরায় যোগ্য গুরুর নিকট

দীক্ষিত হওয়া উচিত, তবে প্রবঞ্চিত হইয়াই হউক বা অজ্ঞতা বশতঃই হউক যাহাকে একদিনের জন্যও গুরুবলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, কুব্যবহার করিয়া তাহার মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নহে, যে স্বার্থের আশা করিয়া সে দীক্ষা দিয়াছে তাহার সেই স্বার্থ পূরণ করিয়া শাস্ত্র বিধানানুযায়ী যোগ্য গুরুর শরণাগত হওয়া কর্ত্তব্য। তবে ইহাও জানিও যে সময় বিশেষে জ্ঞানবান গুরুরও পদস্খলন হয় কিন্তু ভগবদ্‌কৃপায় তাঁহারা নিজের দোষ শিঘ্রই শুধরাইয়া লন, এবং ঐরূপ গুরুর সাময়িক ভাবচ্যুতি দর্শনে অশ্রদ্ধা করা শিষ্যের উচিত নহে বরং ইঙ্গিতের দ্বরা ঐ দোষ দেখাইয়া দিয়া গুরু আধারের মালিন্য নষ্ট করিতে চেষ্টা পাওয়া উচিত, কেননা যে পাত্রে জল খাওয়া যায় সে পাত্রটি যাহাতে পরিষ্কার থাকে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য, লণ্ঠনটিই যেমন আলোক নহে, আলোকাধার মাত্র সেইরূপ গুরুর রক্তমাংসের শরীরটাই গুরু নহে, চিন্ময় গুরুআধার বা শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গ শক্তি আসিবার প্রণালী মাত্র এবং এই জন্যই গুরুকে মানুষ বোধ করিতে নাই গুরু আধারস্থিত গুরু সত্ত্বার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভগবদ্‌বুদ্ধিতে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলে আধ্যাত্মিক পথে দ্রুত অগ্রসর হওয়া যায় কেননা ভাবই লাভের মূল, ফলে পূর্ণভাবে আলোক পাইবার জন্য যেমন লণ্ঠনটি পরিষ্কার আছে কিনা লক্ষ্য রাখিতে হয় সেইরূপ গুরুআধারস্থিত চৈতন্যসত্ত্বা হইতে পূর্ণভাবে জ্ঞানালোক পাইবার জন্য গুরু আধারের সেবা করা বা যাহাতে সেই আধারে মালিন্য সংযুক্ত না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। যে স্তনে দুগ্ধ নাই, বালকেরা তাহা পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধ পূর্ণ স্তন পান করে, কিন্তু যাহাতে দুগ্ধ আছে তাহাতে রক্তও আছে, যদি সময় বিশেষ স্তনে ক্ষত হইয়া রক্তপাত হয় তবে বালক যেমন সেই রক্তপান নাকরিয়া দুগ্ধই পান করে, সেইরূপ যে আধারে গুরু সত্ত্বার প্রকাশ নাই তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাঁহাতে ঐ সত্ত্বার প্রকাশ আছে তাহা হইতে শিবভাব প্রসূত জ্ঞানসুধা পান করিয়া তৃপ্ত হওয়া উচিত, গুরু আধারের জীব ভাব প্রসূত সাময়িক গ্লানির অনুকরণ বা তদৃষ্টে অশ্রদ্ধা না করিয়া যাহাতে ঐ গ্লানি দূর হয় সে বিষয়ে কর্ত্তব্য।

চ। সকল আধারেই কি চৈতন্যসত্ত্বা নাই ?

র। আছে কিন্তু প্রাকাশ নাই, মৃত্তিকার অভ্যন্তরে সকল স্থানেই জল আছে কিন্তু তৃষ্ণার সময় উহা খনন করিয়া জল পান করা অসম্ভব, কাজেই যে স্থানে

জলের প্রকাশ আছে, তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির সেই দিকেই গমন করা কর্ত্তব্য।

চ। যাহার কুলগুরু আছে সে কি করিবে?

র। কুলগুরু যদি উপযুক্ত না হন তাহা হইলে তাঁহার নিকট যে দীক্ষা লইতেই হইবে তাহা কোন শাস্ত্রে বলে না অধিকন্তু ইহা যুক্তি বিরুদ্ধ, তোমার পিতার নিযুক্ত ডাক্তারের পুত্র যদি কামারের ব্যবসা করে, তাহা হইলেও কি তাহার দ্বারা তোমার পীড়ার চিকিৎসা করাইবে? যদি করাও তাহা হইলে তোমার মৃত্যুর জন্য কি তুমিই দায়ী হইবে না? দীক্ষাই নিত্যানন্দ লাভের একমাত্র উপায়, ইহা সামাজিক অনুষ্ঠান নহে, কুলগুরু অনুপযুক্ত হইলেও যদি তাঁহার নিকট দীক্ষা লওয়ার নিয়ম থাকিত তাহা হইলে শাস্ত্রে ঋষিগণ গুরুর লক্ষণ নির্ণয় করিতেন না, পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান কালের বিখ্যাত মহাত্মাগণ অশাস্ত্রিয় ভাবে গুরু করণ করেন নাই, তাঁহাদের জীবনী অনুসন্ধান করিলে দেখিবে যে তাঁহারা উপযুক্ত গুরুর নিকটেই দীক্ষিত হইয়াছেন, কুলগুরুর অপেক্ষা করেন নাই, ধনের আবশ্যক হইলে ভিক্ষুকের নিকট যাওয়ার ন্যায় ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য অজ্ঞানীর আশ্রয় লওয়া বিফল, ইহাতে ভবব্যাধি আরোগ্য হওয়া দূরে থাকুক বরং মৃত্যু নিশ্চয়।

চ। গুরুতে যদি ভগবানেরই বিকাশ, তবে এত বাছাবাছির আবশ্যক কি?

র। গঙ্গাজল যদি কোন বিষ্ঠাদি পূর্ণ পয়ঃ প্রণালীর মধ্য দিয়া আসে তাহা হইলে তুমি কি সেই অপরিষ্কার বারি পান করিতে পার? যদি মোহবশতঃ পান কর তবে কি তোমার স্বাস্থের হানি হইবে না? আবার ঐ গঙ্গাজল যদি নির্ম্মল প্রণালী দিয়া আগমন করে তাহা হইলে যেমন উহা ব্যাধি নাশ পূর্ব্বক স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করে, সেইরূপ শ্রীভগবানের চৈতন্য জ্যোতী জ্ঞান স্বরূপে নির্ম্মল আধার দিয়া আগমন করিলে তদ্দারা ভবব্যাধিনাশ ও আধ্যাত্মিক স্বাস্থের উন্নতি হয়, আবার স্বার্থ রূপ বিষ্ঠাদি পূর্ণ মলিন আধার দিয়া আগমন করিলে বিপরীত ফল প্রসব করে, ফলে নির্ম্মল বায়ু জীবন প্রদ হইলেও ব্যাধি কীটানুপূর্ণ বায়ু যেমন মৃত্যুর কারণ হয়, সেইরূপ গুরুআধারের সদসৎ ভাবই শিষ্যের আধ্যাত্মিক জীবন ও মৃত্যুর কারণ হয় জানিও, এ জন্য সাধন পথে অগ্রসর হইবার প্রারম্ভে সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা অতীব কর্ত্তব্য, কিন্তু ইহাও

জানিও যে নিজে প্রস্তুত না হইয়া অনন্তকাল গুরু অন্বেষণ করিলেও প্রকৃত সদ্‌গুরুলাভ করা যায় না, অতএব প্রথমতঃ সৎসঙ্গাদির দ্বারা হৃদয়ে সাত্বিক ভাবের উন্মেষ করা কর্ত্তব্য, কেননা তুমি আপনাকে আধ্যাত্মিক তত্ত্বগ্রহণের জন্য যেরূপ প্রস্তুত করিবে, তোমার গুরুর সংযোগ সেইরূপই হইবে, আবার যদিও পূর্ব্বের কোন সুকৃতি ফলে সদ্‌গুরুর সংযোগ হয় এবং বর্ত্তমান কর্ম্মের ফলে তোমার ধারণা শক্তি সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সদ্‌গুরুর নিকট হইতেও তোমার ধারণার অতিরিক্ত ফল পাইবে না, তোমার পাত্রটি যদি ছোট হয় তবে তুমি কূপ বা সমুদ্র যে স্থান হইতেই বারি উত্তোলন করনা কেন, তোমার পাত্রের অনুরূপ বারিই পাইবে অতএব এরূপ অবস্থাতেও নিত্যানন্দ লাভের লালসা রূপ অগ্নি ও সৎসঙ্গ রূপ হাতুড়ির সাহায্যে তোমার ভাবের পাত্রটিকে আধ্যাত্মিক পিপাসা শান্তির উপযোগীরূপে গঠন করিয়া লওয়া উচিত।

গুরু চতুর্ব্বিধ ;—তামসিক, রাজসিক, সাত্বিক ও তুরীয়। তন্মধ্যে প্রথম ত্রিবিধ অপরা প্রকৃতি বা মায়া শক্তির অন্তর্গত ও তুরীয় গুরু পরাপ্রকৃতি বা শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তির অন্তর্গত, তামসিক গুরুর নৌকায় উঠিলে উহা জোয়ারের টানে পিছাইয়া পড়িয়া শেষে তুফানের মুখে ডুবিয়া যায়, রাজসিক গুরুর নৌকায় উঠিলে তিনি গুণরজ্জুর দ্বারা কিছুদূর অগ্রসর করিয়া দেন কিন্তু শেষে তুফানের প্রবল টানে রজ্জু জীর্ণ হইয়া ছিন্ন হইলেই নৌকাখানি ডুবিয়া যায়, সাত্বিক গুরু কেবল ভবনদীটি মাত্র পার করিয়া মায়ার সীমান্ত পর্য্যন্ত অগ্রসর করিয়া দেন, তিনি কৌশলী নাবিক ভাটার সময় নৌকাটি ছাড়েন ও জোয়ারের সময় কর্ণটি দৃঢ়রূপে ধারণ পূর্ব্বক নঙ্গর ফেলিয়া পুনরায় ভাটার অপেক্ষা করেন ও এইরূপে ভবনদীটি পার করিয়া চৈতন্য সাগরের সঙ্গমস্থলে তুরীয় গুরুর জাহাজে তুলিয়া দেন, ঐ জাহাজই সাধককে নিত্যানন্দময় ভগবদ্ধামে লইয়া যায়।

চিচ্ছক্তি শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি ও মায়া শক্তিবহিরঙ্গ বা গৌণ, ভবনদী এই মায়া শক্তির অন্তর্গত এবং ভূলোক ইহার মধ্যস্থ ত্রিবিধ দুঃখ পূর্ণ একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ মাত্র, মায়াশক্তির বিদ্যা ও অবিদ্যা ভেদে দ্বিবিধ ভাব, যখন জীবের হৃদয়ে অবিদ্যা ভাব বা অনিত্যে আসক্তি প্রবল থাকে সেই সময়ে গুরু করণ করিলে তামসিক বা রাজসিক গুরুর সংযোগ হয় ও বিদ্যাভাব বা নিত্য আসক্তি প্রবল থাকিলে সাত্বিক গুরুর সংযোগ হইয়া থাকে এবং এই জন্যই গুরু

করণের পূর্ব্বে সৎসঙ্গাদির দ্বারা হৃদয়ে বিদ্যাভাবের উন্মেষ করা উচিত, পূর্ব্বে যে জোয়ার ও ভাটার কথা বলিয়াছি তাহাই মায়ার অবিদ্যা ও বিদ্যা ভাব, তমোগুণান্বিত জীবের হৃদয়ে নশ্বরাশক্তি পূর্ণভাবে থাকে, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম আশ্রয় পূর্ব্বক নিজের স্বার্থ ও অসদ্বৃত্তির পোষণ করিবার জন্য সর্ব্বদা উন্মুখ থাকায় তখন তাহাদের হৃদয়ে অবিদ্যাভাবের পূর্ণ জোয়ার, জোয়ারের সময় স্রোতের গতি সমুদ্র হইতে বিপরীত মুখীন্, সুতরাং এসময়ে দীক্ষা লইলে তামসিক গুরুর সংযোগ হয় এবং তাহার নৌকায় উঠিলে অর্থাৎ আশ্রয় গ্রহণ করিলে জীব চৈতন্য সমুদ্র বা শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি হইতে দূরে চালিত হয় ও শেষে আসক্তির ঘুর্ণিপাকে পড়িয়া ডুবিয়া যায়।

পার্থিব বিষয়োপভোগে প্রবৃত্তি থাকিলেও যাহার বাসনা কেবল তাহাতেই আবদ্ধ থাকিতে চাহেনা, পরলোকের অস্তিত্বে যাহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, নরক ভয়ে ও বিষয় সুখের প্রতিক্রিয়া জনিত দুঃখে বিচলিত হইয়া যাহার হৃদয় স্বর্গের উচ্চতর ভোগ সুখের জন্য লালায়িত, তাহার দীক্ষা রাজসিক গুরুর দ্বারা সম্পন্ন হয়, হৃদয়ে অবিদ্যাভাব প্রসূত অনিত্য ভোগসুখের লালসা বিদ্যমান থাকায় এ সময়েও জোয়ারের বেগ বর্ত্তমান থাকে, এদিকে রাজসিক গুরু নিপুণ নাবিক না হইলেও তামসিক গুরুর অপেক্ষা কিছু কৌশলী, এজন্য তাঁহার নৌকায় উঠিলে তিনি গুণ টানিয়া কিছুদূর অগ্রসর করিয়া দেন কিন্তু শেষরক্ষা করিতে পারেন না, জোয়ারের বেগে শীঘ্রই গুণরজ্জু জীর্ণ হইয়া ছিন্ন হয় ও নৌকাখানি বাসনা তরঙ্গের আঘাতে ডুবিয়া যায় অর্থাৎ রাজসিক-গুরু শিষ্যকে জন্ম মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিতে না পারিলেও বর্ত্তমান অবস্থা হইতে কিছু উন্নত করিয়া দেন, তামসিক গুরুর ন্যায় অধঃপাতিত করেন না।

যখন সৎসঙ্গাদির দ্বারা সংসারের নশ্বরতা হৃদয়ঙ্গম হয়, বিষয়াসক্তির তীব্রতা থাকে না, নিত্যানন্দ লাভের জন্য হৃদয়ে আকুল আকাঙ্খার উদয় হয়, তখন দীক্ষা লইলে সাত্ত্বিক গুরুর সংযোগ হইয়া থাকে, সাত্ত্বিক গুরু স্বার্থের প্রয়াসী নহেন, তিনি দাতা, শক্তিসঞ্চার পূর্ব্বক শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান করেন এবং ঐ শক্তি প্রেমের দ্বারাই সঞ্চারিত হয়, তিনি শিষ্যের চিত্তকে চৈতন্যাভি-মুখীন্ করায় ঐ সময় মায়ার উজান গতি হয়, এবং এই অবস্থাকেই ভাটা বা

বিজ্ঞাভাব বলে, ভাটার সময় যেমন স্রোতের গতি সমুদ্রাভিমুখীন্ হয় সেইরূপ এই ভাবের মধ্য দিয়াই সাত্ত্বিক গুরু আপন শিষ্যকে চৈতন্য সাগরাভিমুখে লইয়া যান, যদি পূর্ব্ব কর্ম্মের আকর্ষণে পৌছিবার পূর্ব্বেই জোয়ার আসিয়া পড়ে, তবে কৌশলী নাবিকের ন্যায় ঐ সময়ে তিনি ভগবদ্ভাবের কর্ণটি দৃঢ়রূপে ধারণ পূর্ব্বক বিচারের নঙ্গর ফেলিয়া ভাটার জন্য অপেক্ষা করেন অর্থাৎ সাধনের সময় প্রারব্ধের ফলে যদি শিষ্য রূপরসাদির আকর্ষণে পতিত হয়, তবে বিচারের দ্বারা উহাদের অন্তর্নিহিত চৈতন্যেরদিকে লক্ষ্য রাখাইয়া ভগবদ্ভাবে বিষয় রসের আস্বাদ করান, এবং এইরূপ আস্বাদনকেই ভোগ বলে (উপভোগ নহে)। এই ভোগের দ্বারা তৃপ্তির বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং তাহা হইতেই বৈরাগ্যের ফুল ও সেই ফুল হইতে মুক্তি ফল ফলে, সাত্ত্বিক গুরুর অধিকার সীমা এই পর্য্যন্ত, তিনি শিষ্যকে ভবনদী পার করিয়া মায়ার সীমান্তে চৈতন্য সাগরের সঙ্গমস্থলে তুরীয় গুরুর জাহাজে তুলিয়া দেন, জ্ঞান রূপ ডিম্ব হইতে এই সময় বিজ্ঞানরূপ পাখী বাহির হইয়া পড়ে, অর্থাৎ সাধক তখন আপনার অন্তরের মধ্যে বিজ্ঞানে চৈতন্যানুভব করেন এবং সেই চিন্ময় গুরুর চরণে আত্ম সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার দ্বারা যন্ত্রবৎ চালিত হন, এই অবস্থা কেই সবিকল্প সমাধি বলে এবং এই ভাবের উচ্ছ্বাসেই ভাব সমাধি হয়, ফলে তুরীয় গুরুই সাধককে চিদানন্দের পথ দিয়া "যদ্ধাম ন নিবর্ত্তন্তে" সেই পরম ধামে লইয়া যান এবং ইহাই সাধনার চরম ফল জানিও।

চ। শ্রীভগবান গুরুরূপে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্নভাবে ফল প্রদান করেন কেন? তিনি ইচ্ছা করিলেই ত সদ্‌গুরুরূপে সকলকে উদ্ধার করিতে পারেন?

র। রাজা যদি তাঁহার রাজত্ব হইতে জেলখানা গুলি উঠাইয়া দিয়া সকল অপরাধীকে মুক্ত করেন, তাহা হইলে তাঁহার রাজত্বে কি শান্তি থাকে? এই সংসার শ্রীভগবানের রাজ্যের একটি কারাগার মাত্র, তাঁহার ইচ্ছারূপিণী মায়াশক্তি মাতৃরূপে ত্রিগুণের দ্বারা ইহার পরিচালনা করিতেছেন এবং প্রথম ত্রিবিধ গুরুগণ এই মায়া শক্তির দ্বারাই চালিত হন। লৌহ উত্তপ্ত হইলে যেমন তাহার মধ্যে অগ্নির ক্রিয়া দৃষ্ট হয় সেইরূপ ইহাঁদের মধ্যে মায়াশক্তির দ্বারা গৌণভাবে ভগবচ্ছক্তির ক্রিয়া হয়, মায়া একদিকে দেবগণকে বরাভয় দিতেছেন ও অন্য

দিকে অসির দ্বারা অসুরগণের মুণ্ডচ্ছেদন করিতেছেন, ইহাই তাঁহার বিদ্যাও অবিদ্যা ভাব, যাঁহারা শ্রীভগবানেরদিকে উন্মুখ, সেই দেব ভাবাপন্ন সাধকগণকে বিদ্যাভাবে বরাভয় দান পূর্ব্বক সত্ত্বগুণের উর্দ্ধ পথ দিয়া জন্ম মৃত্যুর পারে নিত্যা-নন্দধামে প্রেরণ করিতেছেন। যাহারা অনিত্য সুখ অধিক পরিমানে উপভোগ করিবার জন্য পুণ্য কর্ম্মাদি করে তাহাদের মুণ্ড ছেদন করিয়া মধ্য পথে রক্ষা করেন অর্থাৎ মৃত্যুর নির্গম দ্বার দিয়া তাহাদিগকে স্বর্গ সুখাদি উপভোগ করা-ইয়া পুনরায় জন্মের আগম দ্বার দিয়া ভূলোকের যে স্তরে তাহারা ছিল তাহা অপেক্ষা কিছু উন্নত স্তরে তাহাদিগকে পাঠাইয়া দেন অর্থাৎ তাহা তাহাদের উর্দ্ধ বা অধোগতি হয় না, এদিকে অসৎ কর্ম্মান্বিত তমোগুণীদের মুণ্ড কাটিয়া তিনি নিম্নে ফেলিয়া দেন অর্থাৎ মৃত্যুর পরে ভূলোকে যাতনা ভোগের পর তাহারা ভূলোকের নিম্নস্তরে অধঃপাতিত হয় অর্থাৎ নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক দুঃখ ভোগ করে, এই জন্যই গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

উর্দ্ধংগচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজস্যাঃ।

জঘন্য গুণ বৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ॥

ফলতঃ যতক্ষণ জীবের, অহঙ্কার আছে, যতক্ষণ শ্রীভগবানের ইচ্ছার সহিত জীব তাহার সীমাবদ্ধ ইচ্ছার মিলিত করিয়া যুক্ত ভাবে কর্ম্ম করিতে না পারে, ততক্ষণ সে কর্ম্মফলের অধীন, বাসনার দ্বারা আপন কর্ম্মকে সে যে পথে চালিত করিবে, মায়া শক্তির নিয়মানুযায়ী তাহার তদনুরূপ ফলসংযোগ হইবে, শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন "যে যথামাং প্রপদ্যন্তে স্তাং স্তথৈব ভজাম্যহং"।

ইহার মধ্যে তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত আছে, বুদ্ধিমান সুপুত্র কে আদর করিলে তাহার উন্নতির জন্য উৎসাহ বৃদ্ধি হয় কিন্তু তাড়ণার দ্বারা দুঃখ প্রদান না করিলে নির্ব্বোধ কুপুত্রের শিক্ষা লাভ হয়না এবং এই জন্যই তিনি জীবগণকে তাহাদের কর্ম্মভেদে ফলপ্রদান পূর্ব্বক মঙ্গলের পথে লইয়া যান, অতএব প্রথমতঃ শাস্ত্ররূপ আইন পুস্তক হইতে বা আইনজ্ঞ সাধুগণের নিকট হইতে কর্ম্মসূত্র চালনা করিবার পন্থাটি জানিয়া লওয়া জীব মাত্রেরই কর্ত্তব্য, যিনি পথটি জানিয়া সেই পথে গমন করিবার জন্য আন্তরিক যত্ন করেন, শ্রীভগবানের শক্তিরূপিণী মায়া তাঁহার সহায় হন, তাঁহার সদ্‌গুরুর সংযোগ হয় এবং নানারূপ বিঘ্ন ও বিপদে

পতিত হইয়া তাঁহাকে দুঃখভোগ করিতে হয় না, সরল ভাবে প্রারব্ধ ভোগ করিয়া তিনি জন্মমৃত্যুর পারে অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত চৈতন্য ভূমিতে উন্নীত হইয়া নিত্যধামে চলিয়া যান।

চ।—বুঝিলাম যে যাহাদের সত্ত্বগুণ প্রবল, তাহাদের ঊর্দ্ধগতি হয়, কিন্তু জীব মাত্রেই ত্রিগুণান্বিত, অতএব সত্ত্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে আংশিক রূপে যে রজস্তম গুণের ভাব থাকে, তাহার জন্য কি তাহাদের ফলভোগ করিতে হয় না?

র। ঊর্দ্ধগতির মুখেই সেই ফলভোগ হইয়া যায়, ক্রমমুক্তির মার্গে যাঁহাদের ঊর্দ্ধগতি হয়, তাঁহারা দেহত্যাগের পরে ভুব ও স্বর্লোকের মধ্য দিয়াই গমন করেন সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে যদি কিছু রজস্তম গুণের গ্লানি বর্ত্তমান থাকে তবে ঐ সময়েই তাহার ফলভোগ হয়, তবে এরূপ অবস্থাপন্ন অধিকাংশ মহাত্মার প্রারব্ধ ফল এই ভূর্লোকেই ভোগ হইয়া যায়, ভুব বা স্বর্লোকে তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হয় না।

চ। গীতার এক স্থানে আছে যে "শ্রীভগবান জীবের ভাবানুযায়ী ফল প্রদান করেন" আবার অন্যস্থানে আছে যে "তিনি কিছুই করেন না, কর্ম্ম ফলাদির সংযোগ স্বভাবের দ্বারাই সম্পন্ন হয়"* ইহার অর্থ কি?

র। ইহার অর্থ মূলে ঠিক আছে, চুম্বক কিছুই করে না, তথাপি তাহার সান্নিধ্য বশতঃ তাহারই শক্তিতে যেমন লৌহ খণ্ড স্পন্দিত হয়, সেইরূপ শ্রীভগবান কিছুই করেন না অথচ তাহার শক্তিরূপিণী মায়ার দ্বারা সকল কার্য্যই সম্পন্ন হয় এবং এই মায়াকেই স্বভাব বা প্রকৃতি বলে! আমাদের সম্রাট যদি বলেন যে "আমি কাহাকেও জেলখানায় পাঠাইনা বা রায়বাহাদুর করিনা এ সকল আইন বা নিয়মের দ্বারা সম্পন্ন হয়" তাহা হইলে তাঁহার কি সত্য কথা বলা হয় না? কিন্তু ইহাও সত্য যে এই নিয়মের মূলে তাঁহারই শক্তি নিহিত আছে এবং তাঁহার প্রতিনিধি রূপে লাট সাহেব তাঁহার শক্তিবলেই সেই নিয়মের পরিচালনা করিতেছেন প্রজারা আপন কর্ম্মের ফলভোগ করে

* ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফল সংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে। ৫।১৪

নিয়ম কেবল সেই ফলের সংযোগ করে মাত্র, কিন্তু এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কোন প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত অপরাধী যদি কোনরূপে সম্রাটের কৃপালাভ করিতে পারে তাহা হইলে যেমন সে দণ্ড হইতে মুক্ত হয় সেইরূপ মায়া শ্রীভগবানের প্রতিনিধি রূপে নিয়মের অধিশ্বরী হইয়া জীবগণের কর্ম্মানুযায়ী ফল সংযোগ করেন, শ্রীভগবান মুখ্যভাবে কিছুই করেন না কিন্তু যদি কোন ভাগ্যবান জীব তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক ব্যাকুল প্রার্থনার দ্বারা তাঁহার কৃপালাভ করিতে পারে, তবে সহজেই সে মায়ার প্রদত্ত দণ্ড হইতে মুক্ত হয় এবং ইহাও তাঁহার নিয়মের একটি বিশেষ ধারা জানিও।

চ। তাঁহার কৃপা কি সর্ব্বভূতে সমভাবে নাই ?

র। কাষ্ঠের প্রতিপরমানুতে অগ্নি সমভাবে আছে, কিন্তু তাহার দ্বারা কি কোন বস্তু দগ্ধ হয় ? দগ্ধ করিবার উপযোগী অগ্নির প্রকাশ করিতে হইলে যেমন ঐ কাঠকে ঘর্ষণ করিতে হয়, সেইরূপ তাঁহার কৃপা সর্ব্বভূতে সমভাবে থাকিলেও জন্ম মৃত্যু প্রসবিতা কর্ম্ম সংস্কার সমূহকে দগ্ধ করিতে হইলে সাধনের দ্বারা তাঁহার বিশেষ কৃপা লাভ করিতে হয় জানিও।

চ। শ্রীভগবান যদি মায়া যোগে গুরু আধারে প্রতিবিম্বিত হইয়া জীবের ভাবানুযায়ীফল প্রদান করেন, তবে মন্ত্রের কি কোন শক্তি নাই ? গুরু আধার যে রূপই হউক না কেন, তিনি যে মন্ত্র দেন সেই মন্ত্রের শক্তিতে কি শিষ্য উদ্ধার লাভ করিতে পারে না ?

র। মন্ত্রের যে শক্তি আছে তাহা আত্ম শক্তি সাপেক্ষ ও আত্মশক্তি গুরু শক্তি সাপেক্ষ। কুঠারের দ্বারা কাষ্ঠ ছেদন করা যায় কিন্তু ঐ কুঠারটি যদি তুমি কাষ্ঠের উপর ফেলিয়া রাখ, তাহা হইলে কি কাষ্ঠ ছেদিত হইবে ? উহা ছেদন করিতে হইলে যেমন মন হইতে হস্তে ও হস্ত হইতে কুঠারে শক্তি সঞ্চারিত হওয়া আবশ্যক সেইরূপ মন্ত্রশক্তির দ্বারা সংসার বন্ধন ছেদন করিতে হইলে গুরু হইতে শিষ্যে ও শিষ্য হইতে মন্ত্রে শক্তি সঞ্চারিত হওয়া আবশ্যক জানিও, বারি ও অগ্নির শক্তি সম্মিলনে বাষ্প উৎপন্ন হইয়া যেমন এঞ্জিনাদি চালনা করে সেইরূপ সাধকের শক্তির সহিত মন্ত্র শক্তির সম্মিলন হইলে তবে মন্ত্রের প্রকৃত ক্রিয়া হয় নতুবা অবিশ্বাসী ও ভক্তিহীন ব্যক্তির নিকট মন্ত্র কখনই ফলপ্রদ হয় না জানিও।

চ। আর একটি কথা মনে পড়িয়া গেল, মহাজন বাক্যে আছে যে—

"যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ী যায়।

তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।"

ইহাতে তো বুঝা যায় যে গুরু যেরূপই হউন না কেন, শিষ্যের তাহা দেখা উচিত নয় ইহার প্রকৃত ভাব কি?

র। যদি কোন অসাধারণ শক্তিমান ব্যক্তি তৃষ্ণার সময় মৃত্তিকা খনন পূর্ব্বক জল বাহির করিয়া পান করেন, তুমি তাহা পার কি? তুমি নিশ্চয়ই জলের প্রকাশ স্থান অন্বেষণ করিবে। কিন্তু আবার তাহাও বলি যে পূর্ব্বকর্ম্মের ফলে যাহার এতদূর ক্ষমতা আছে তাহার সদ্‌গুরুরই সংযোগ হয়। ফলে তুমি উপরোক্ত মহাজন বাক্যের যে অর্থ বুঝিয়াছ তাহা প্রকৃত নহে, উহার অর্থ এই যে যাঁহারা প্রকৃত সাধু তাঁহাদের নিকট সামাজিক জাতি ভেদ নাই, তাঁহাদের জাতি ভেদ আধ্যাত্মিক, গীতোক্ত গুণানুসারে তাঁহারা জাতির নির্ণয় করেন, তাঁহারা চণ্ডালের মধ্যেও সদ্ভাব দেখিলে তাঁহার সঙ্গ করেন, আবার ব্রাহ্মণের মধ্যেও অসদ্ভাব দেখিলে তাহা হইতে দূরে অবস্থান করেন, কোন বৃথা জাত্যাভিমানী সাধুনিন্দুক হয়ত শুঁড়িবাড়ী যাইবার জন্য বা তাহাকে শিষ্য করিবার জন্য নিত্যানন্দ প্রভুর নিন্দা করিয়াছিল, তাহার উত্তরে নিত্যানন্দ প্রভুর কোন শিষ্য উপরোক্ত কথা বলিয়া থাকিবে, বিশেষতঃ প্রকৃত জ্ঞানী বা গুণাতীত সিদ্ধ পুরুষগণ যে স্থানেই যাউন বা যাহার সঙ্গ করুন না কেন, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, ফলে ইহাই উপরোক্ত বাক্যের অর্থ, নচেৎ নিত্যানন্দ প্রভু যে মদ খাইবার জন্য শুঁড়িবাড়ী যান নাই, ইহা বোধ হয় তুমি বিশ্বাস করিতে পার! আরও একটি কথা বুঝা উচিত যে নিত্যানন্দ প্রভুর ন্যায় মহাপুরুষের সম্বন্ধে তাঁহার শিষ্য উচ্চ কণ্ঠে যাহা বলিতে পারেন তাহা সাধারণ অজ্ঞান ব্যক্তিগণের পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে কি?

ক্রমশঃ

শ্রীহরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

সাধু সঙ্গ।

—:০:—

(হরিদাস ঠাকুর।)

উদাসী যুবক এক হরি পরায়ণ
তুলসী সম্মুখে রাখি ভজন কুটীরে,
একমনে করিছেন নাম সঙ্কীর্ত্তন,
দিতেছেন সন্তরণ প্রেমের সাগরে।
নবীনা যুবতী এক পরমা সুন্দরী
বারাঙ্গনা, আঙ্গিনায় বসি মুগ্ধ চিতে,
অঙ্গ আবরণ খুলি, অঙ্গ ভঙ্গি করি,
দেখায় অঙ্গ সৌষ্ঠব সাধু বিমোহিতে।
পাপাভ্যস্তা বারনারী সাধুর সদন,
পাপ বাক্য উচ্চারিতে মনে পায় ব্যথা,
কিন্তু হৃদে জাগিছে পাপ প্রলোভন,
লজ্জাহীনা প্রকাশিলা মনোগত কথা।
(মহাঝঞ্ঝাবাতে যথা হিমাদ্রি শিখর
অচল অটল) প্রেমে উন্মত্ত হইয়ে,
জপিছেন একমনে নাম সাধুবর,
সুধা ধারা প্রবাহিত হতেছে হৃদয়ে।
তিন রাত্রি হরিনাম পশিলে শ্রবণে,
পবিত্র হইল হিয়া দরবিল মন,
অনুতপ্তা বারাঙ্গনা সাধুর সদনে
"হরিনাম মহামন্ত্র" করিলা গ্রহণ।
বেশ্যা হৃদে কৃষ্ণ প্রেম হইল প্রকাশ।
ধন্য ধন্য সাধু সঙ্গ ধন্য হরিদাস॥

মধুর ভাণ্ডার কিবা রাঙ্গা পা দু'খানি
অনন্য শরণ যাঁর মানস মধুপ
মধুপান করিতেছে দিবস যামিনী,
নরকুলে জন্মি যিনি দেবতা স্বরূপ;
সেই রসিকের সঙ্গ মাগি এ জীবনে।
কোটী কোটী প্রণিপাত তাঁহার চরণে।

দীন—শ্রীশশিভূষণ সরকার।

নিরাকার।

—:০:—

হে নিরতিশয় নিরাকার! তোমার ঠিক কোন্ খান্‌টীতে আমার দৃষ্টি স্থির রাখিব বুঝিতে পারিনা, কোন্ খানে আমার অতি চঞ্চল মন নিস্তব্ধ হইবে জানিনা, কেমন করিয়া ঐ আকাশের মত অনন্তকে এই ক্ষুদ্র সত্ত্বার মধ্যে প্রকাশ করিবে! সত্যের ধীর ও গম্ভীর ছন্দে তুমি যে "তত্ত্বমসি" শব্দ গুলি আত্মার অন্তরে ঝঙ্কারিত করিয়া দিলে, ব্যাকুল বাসনাক্ষুব্ধ আত্মাকে ঐ শব্দের মোহে লালায়িত করিয়া তুলিলে, আজ সেই আত্মাকে সামলাইতে পারিতেছি না; আজ ভিতরে বাহিরে যে একাকার, যে বন্ধন ছেঁড়া স্বাধীনতার উদ্দাম ভাব, তাহাকে সংসারে, সমাজে, দেশে, সৃষ্টিতে, সঙ্কুচিত করিয়া রাখা বড়ই কঠিন। যে ছেলেটী ঘরের একটী কোণে নিঃশব্দে চক্ষু বুজিয়া দোলার অতি স্বল্প স্থানে দোল খাইয়া ঘুমাইতেছিল সেই আজ দেশ বিদেশ ঘুরিয়া মাথা তুলিয়া আপনার ঘরের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিতেছে; কিন্তু এ কর্ত্তৃত্ব স্বাধীন রাজ্যের, কাজেই সেখানে আধিপত্য করিতে গিয়া ভালবাসায় প্রেমে অভিন্ন অথবা এক হইয়া যাইতেছে।

আজ বসন্তের প্রভাত কিরণ অইযে অনন্ত আকাশের অগণিত স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টিগুলিকে আপনার মোহ জালে দৃষ্টি হইতে আবরিত করিয়া পৃথিবীর প্রতিকলিকার কোরক স্পর্শ করিতেছে, অই প্রতি শিশির বিন্দুতে যে আপনাকে ধরা দিতেছে,

অইযে পৃথিবীর তমোনিদ্রার চক্ষে হাত বুলাইয়া চৈতন্য কাকলীতে ভূপৃষ্ঠের এক দিক মুখরিত করিয়া তুলিল, এর মধ্যে কোন্ খানটীতে তোমায় দেখিব বলিয়া দাও। উপরে নীচে অগ্রে পশ্চাতে আশে পাশে তোমার বিস্তৃতি, তোমার উদারতা, তোমার অসীমত্ব। আমি ঠিক অই প্রাতঃ কালের জ্যোতিহীন নক্ষত্র টার মত একপ্রকাণ্ড শূন্যের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছি!

আমি ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছি; হে নীরব নিরাকার! তোমার এ সমুদ্রের কই আর তরঙ্গ নাই! এ কোন্ Dead Sea তে আমায় আনিয়াছ— এখানে আমার প্রাণের শত বাসনা শান্ত হইয়া গিয়াছে, আমায় উপাধি গোত্র সংস্কারাদি শুভ্র বস্ত্রাবৃত শবের মত আমারই চক্ষের সম্মুখে পর হইয়া বিরাজ করিতেছে এখানে বায়ু পর্য্যন্ত নিশ্চল। আমি তোমার এ সুন্দর Dead Sea তে জীবিত কি মৃত বুঝিতে পারিনা—কেবল সীমাহীন জল আর অন্তহীন আকাশ আমি তাই—আমি তাই এই অনুভব করিতেছি।

তোমার এই অসীমত্ব, তোমার এই বাধাহীন অন্তহীন প্রকাশ যাহা চক্ষের সামনে দূর হইতে দূরে সরিয়া যাইত তাহা আজ অতি নিকট হইয়া গিয়াছে, তাহা অভিন্ন আত্মীয়ের মত আত্মার পর্দ্দায় পর্দ্দায় মাখামাখি হইয়া গিয়াছে। যে শূন্য দিয়া পৃথিবীর মুকুট করিয়া দিয়াছ, যে শূন্য দিয়া তাহার পদ সেবা করিতেছ, যে শূন্য দিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া রাখিয়াছ আজ সেই রূপ ও অরূপ দেখিবার জন্য চক্ষের দৃষ্টি প্রসারিত করিতে হয়না, আজ তাহারা এই সংযত দৃষ্টির মধ্যে স্বতঃই স্বপ্রকাশ হইয়া আপনাকে আর লুকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না।

তাই আজ আমার সঙ্কীর্ণতা, কুটীলতা, বদ্ধতা বিদ্ধ হরিণের ন্যায় ত্রাসে ঘন হইতে ঘনতর ছায়ায় লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাহার শিং এত লম্বা হইয়া গিয়াছে যে যাহার দ্বারা সে অপরের প্রাণ সংহার করিত তাহাই আজ তাহার সংহারের কারণ হইয়া উঠিল। হায় যে আলোক আজ দিগ্বধূ-গণকে উজ্জ্বল করিয়া রাজ্যে রাজ্যে কুশল চৈতন্যের অভ্যুদয় করিয়া প্রেমে আনন্দে সকল কম্পন সকল স্পন্দন স্থির করিয়া আনিল, যাঁহার তীব্র প্রকাশে জ্বালা রাজ্য ছাড়িয়া লুকাইয়া পড়িল, যাহার সাড়া পাইয়া ইন্দ্রিয়গণ জয় ধ্বনি করিয়া উঠিল তাহাকে আবাহনের ভাষা নাই, তাহার অভ্যুদয়ের অর্ঘ্য নাই, তাহার পূজার কোন ফুল নাই, তাহার জন্য, শাস্ত্র গোপদ হইয়া গেল, সে

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্" তাহার যজ্ঞ করিতে গিয়া আহুতি আত্মার উপর আপনার উপর নিক্ষিপ্ত হইয়া গেল।

এ কোন্ বৃত্তের মধ্যে আমায় আনিলে এ কোন্ অরূপ সৌন্দর্য্য প্রাণের ভিতর নিষ্কাষিত করিয়া ধরিলে। ইহার উপাসনা নাই, ইহার স্তব নাই, ইহাকে স্তুতি করিতে পারিনা। ইহার সহিত কথা কহিতে গেলে দেখি, যে কথা কয় যে স্তব করে সেই স্তুত্য। তাই শব্দ শুনিতে গিয়া তোমারই অখিল ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী কেবলমাত্র প্রণব ধ্বনিই শ্রুতি গোচর হইতেছে, তোমার রূপ দেখিতে গিয়া আকার হীন সর্ব্বময় রূপ ও অরূপের আভাস পাই, তোমার স্পর্শ করিতে গিয়া সং অস্তি ভাতি ইহাই অনুভব করি। তোমায় বাহিরে দেখিব কি ভিতরে দেখিব? না তুমি ভিতরের বাহিরের সন্ধিস্থলেও বিরাজ করিতেছ। তাই এ বৃত্তের সর্ব্বময় যে দেবতার অন্বেষণ যে দেবতার অধিষ্ঠান তাহাকে এ রহস্যময় লুকোচুরী ছেলে খেলার উংসবে দিন কাটাইতে দেখিলে কে হাস্য সম্বরণ করিবে?

হে নিরাকার! হে সকল রূপ ও অরূপের মালিক! যে সৌন্দর্য্য সুধা ভিতরে জ্বালাইয়া রাখিয়াছ তাহারই অনুরূপ তোমার প্রকাশ বটে। সমগ্র মানব জাতি সৃষ্টির আদি হইতে (তথা আজও আমার আশৈশব) এই যে রূপ তৃষ্ণার আগুন প্রাণের ভিতর জ্বালাইয়া একটী সুন্দরী স্ত্রী একটী সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য এতটুকু জ্যোৎস্নাময়ী রজনী প্রভৃতির দ্বারা সময় সময় আপনার দিকে টানিয়া লইতেছে, তাহাতে এপর্য্যন্ত পূর্ণাহুতি হয় নাই। আজ চক্ষের অগোচর বিজ্ঞানের শক্তির অতীব ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর জীবাণু প্রমুখ ধীশক্তির অতীত প্রকাণ্ড হইতে প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এই যে আমারই সত্ত্বা ব্যাপিয়া দিয়া তোমার বিশ্ব রূপের সৌন্দর্য্য অনুভব করাইয়া দিলে এই যে শূন্যে আকাশে অন্তরীক্ষে জলস্থলে বাতাসে ও কিরণে নিরাকার কণিকায় কণিকায় অমুহূর্ত্তক আমারই আভ্যন্তরব্যাপী নৃত্য তোমারই আনন্দের তালে অনুভব করাইয়া দিলে তাহা সনাতন বলিয়া সং, তাহা আমার জীবাত্মা অনুভব করিল বলিয়া চিং, এবং এই সংচিং আজ এ সংচিং সহযোগে যে আনন্দ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাকেই তাই সসম্ভ্রমে যুক্তকরে প্রণামকরি।

শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়। এম, এ, বি, এল,

শ্রীবৃন্দাবন ভ্রমণ।

—:০:—

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরে পদকমলং বন্দে চৈতন্য দেবস্য॥

"জরুর তলব"

সন ১৩১৭ সাল ২৯ শে আশ্বিন রবিবার শুক্লাত্রয়োদশী আজ অতি শুভ দিন। আজ আমার জীবনের পরম অভীপ্সিত চরম আনন্দের আবাহন আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীমতী বৃন্দাবনেশ্বরী, ভানুকুলচন্দ্রমা, কৃষ্ণমনোমোহিনী আমার প্রাণেশ্বরী রাধারাণীর আজ, অপূর্ব্ব করুণা অবতীর্ণ হইল। যাহা এত শীঘ্র সংঘটিত হইবে বলিয়া স্বপ্নেও ভাবি নাই, যে আশা হৃদয়ে বহুদিন হইতে অতি ক্ষীণ ভাবে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল, তাহা যে হঠাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে ইহা এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও মনে করি নাই। ব্রজবিলাসিনীর কৃপাদেশ তদীয় অতি অন্তরঙ্গ প্রিয়জনের দ্বারা প্রচারিত হইল; এই প্রিয় জন অপর কেহ নহেন শ্রীল অদ্বৈতবংশাবতংশ পরমহংস প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত রাধিকা নাথ গোস্বামী। তাঁহার কৃপাপত্র তদীয় প্রিয় শিষ্য পরম ভক্তিমান সুধী শ্রীযুক্ত ললিত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট আসিল। ললিত বাবু একজন উচ্চ ইংরাজী শিক্ষিত এবং ব্যবহার জগতেও একজন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি। বাস কলিকাতায় এদিকে স্বকৃতভঙ্গ অর্থাৎ স্বয়ং তিনিই মধুর বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। উক্ত কৃপালিপিপ্রভুপাদের স্বকরাঙ্কিত (কার্ড) কিন্তু তাহাতে এই অধম বিষয়াবদ্ধকে সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে শ্রীধামে যাইবার জন্য কড়া হুকুম আসিয়াছে, কৃপাময় প্রভুপাদ লিখিয়াছেন "*** বাবুকে সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে আসিবেন অন্যথা না হয়।" কি অপূর্ব্ব করুণা আবার কি কড়া হুকুম; ইহাতে আর বিচার ব্যবস্থার আদৌ স্থান নাই, একেবারে শিষ্যের প্রতি গুরুদেবের অলঙ্ঘনীয় আদেশ এরূপ না হইলে পাষণ্ড ধরা পড়িবে কেন? অতর্কিত ভাবে ধাড়াওয়ারেন্ট লইয়া পূজনীয় ললিত দাদা বেলা ১ টার সময় এই মহা দুর্বৃত্ত অপরাধীকে

পাকড়া করিলেন, ওয়ারেন্টখানি বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিলেন "আর মাথা নাড়িবার যো নাই'' এবার "জরুর তলব একেবারে ওয়ারেন্ট, বিলম্ব করিবার যো নাই" শুনিতেই শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। মহামহিমান্বিতা রাজরাজেশ্বরীর সেই আদেশ বাণী স্বসম্মানে সানন্দে বারংবার মস্তকে ধারণ করিলাম। পাঠ করিতে চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, অস্ফুটস্বরে বলিলাম 'মা-তুমিই ধন্যা বটে; মায়ের অনন্ত কৃপাই বটে। যোগমায়া বৃন্দারাণী কি কল্পতরু হইয়াছেন? নাহইলে এই ঘোর বিষয়-বিমুগ্ধ পাতকীকে এরূপ অপার কৃপা করিবার কোন হেতু দেখা যায়না। শ্রীশ্রীবিজয়া দশমীর পর হইতে শ্রীনিয়ম সেবাব্রত আরম্ভ হইয়াছেন, কি জানি এবার মনে হইল ব্রজদেবীগণ এই কার্ত্তিকী ব্রত করিয়া মহামহিমাময়ী কাত্যায়নীর পূজা করিয়াছিলেন আর ভক্তিভরে মায়ের নিকট বর মাগিয়াছিলেন যে—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিণ্যধীশ্বরী।
নন্দ গোপ সুতং দেবী পতিম্ মে কুরুতে নমঃ॥

তাই কাত্যায়নী পূজার ফলে তাঁহারা শ্রীনন্দ দুলালকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন শ্রীগুরু কৃপায় সেই ভাবে এই অধমের চিত্ত কেন জানিনা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল এই সেই কার্ত্তিকী ব্রত, আমাদের ভাগ্যে কি কিছুই হইবেনা" বলিহারি মায়ের কৃপা যেমন প্রার্থনা অমনি পূরণ, অপূর্ব্ব সংযোগ। আরও বিশেষ কৃপা এই যে, যিনি আমায় কেশে ধরিয়া লইতে সর্ব্বদা সমর্থ সেই সুযোগ্যপাত্রের প্রতিই উক্ত আদেশ প্রচারিত হইল সুতরাং আমার আর হুঁ হাঁ করিবার বিন্দু মাত্র সুযোগ হইল না। আমার কোন চেষ্টাও করিতে হয় নাই যাঁহার কাজ তিনিই সব করিলেন। যদি আমার নামে চিঠি আসিত তবে নানা কারণে হয়তো আমার আদৌ যাওয়া হইতনা অথবা বহু বিলম্ব হইত, তাই জানিয়াই যেন উপর হইতে ঐরূপ পাকা বন্দোবস্ত হইয়া আসিয়াছিল। তখন টাইম্‌টেব্‌লের (time teble) খোঁজ পরিল ৺শ্রীধাম যাইবার ঢেঁড়া বাজিয়া উঠিল সঙ্গে সঙ্গে নূতন পঞ্জিকা খানি বাক্স হইতে হাসিতে হাসিতে দর্শন দিলেন। প্রভুপাদের সাক্ষাৎ আদেশ "অবিলম্বে" সুতরাং দিন ক্ষণ দেখা অনাবশ্যক "আজ্ঞাগুরুণামহ্যবিচারনীয়া" তবু আমরা গৃহী গোছাইয়া যাইতে হইবে তাই তিনিই আবার পঞ্জিকা দেখাইলেন, ফল একই

হইল; ২রা কার্ত্তিক বুধবার ভিন্ন আর নিকটে ভাল দিন নাই, তাহাই স্থির হইল। দেরী করিলে আবার পূজার ছুটীটার সুবিধাটা ছাড়াইয়া যায়। আমার মন বলিতেছে তিনি যখন অবিলম্বে যাইতে আদেশ করিয়াছেন এখন যত সত্বর যাওয়া যায় তাহাই ভাল, কি জানি পাছে কোন বিঘ্ন আইসে, কিন্তু এই সব রহস্যময় ব্যাপার ভাবিয়া আমি যেন বোকা বনিয়া গেলাম, মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় কেবল "দাদার জয়" দিয়া যাইতেছি। বুধবারে যাইবার কথা হইল বটে আমি তন্মধ্যে সব ঠিক করিয়া উঠিব কিরূপে? আমার বাসায় যে ঢাকা হইতে আমার অভিন্ন হৃদয় শ্রীমান জলধর ভায়া সপরিজনে (মাতা, ভগ্নি, স্ত্রী, পুত্র) আসিয়াছেন। তিনি সস্ত্রীক এইবার দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। মধ্যে মাত্র দুইদিন, এখনও তাহার কিছুই ঠিক করা হয় নাই। কেবল মদীয় শ্রীগুরুদেব প্রভুপাদ শ্রীল কংসারি লাল ঠাকুরকে অদ্য প্রাতে একখানি পত্র লেখা হইয়াছে মাত্র, দিন ক্ষণ চাই, তাঁহার শুভাগমনের সুবিধা চাই, আবার জলধরের শরীর অসুস্থ তাহার শরীর ভাল থাকা চাই, এত অল্প সময়ে কি সমস্ত সমাধান হইয়া উঠিবে? হঠাৎ মনে হইল আমি ব্যবস্থার কে? যিনি এই সব লীলা করিতে-ছেন দেখিনা তিনি কি করিয়া তোলেন! আমি ত এইরূপ "অবিলম্বে"র উপর চক্ষু রাখিয়া চলিয়া যাই। পাজি মন তবু বুঝেনা আবার বাড়ী ঘরের চিন্তা! কে বাসায় থাকিবে! টাকা কড়ির কি হইবে, ইত্যাদি ও চিন্তা আসিল। আমি সহজে সব গুলির মীমাংসা করিয়া ফেলিলাম। যদি প্রকৃত রাধারাণীর কৃপাদেশ হইয়া থাকে তবে তিনিই এ সমস্ত ছোট খাট বিষয় গোছাইয়া দিবেন কোন বাধাই টিকিবেনা। বাসায় আসিয়া জলধরকে সব বলিলাম তিনি পরমানন্দিত হইলে, বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিলেন বলিলেন "ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে, তুমি অবশ্যই যাইবে আমাদের জন্য ভাবিওনা"। দীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থার জন্য উভয়েই ব্যগ্র হইলাম। রাত্রিতেই প্রভুপাদের নিকট (ভৃত্য) যশোদাকে পাঠান হইল। ভ্রাতা জলধর শাক্ত পরিবারোদ্ভব, তিনি ও তাঁহার স্ত্রী উভয়েই দয়াল অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের শ্রীচরণে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন, উভয়েই শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়াছেন। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হইলেও জলধরকে স্বাধীন ভাবে নিজের ইচ্ছামত অভীষ্টদেব নির্ব্বাচন করিয়া আত্ম সমর্পণ করিতে বারংবার বলিয়া-

ছিলাম কিন্তু তাঁহারা উভয়েই মদীয় গুরুদেব প্রভুপাদের শ্রীচরণ সরোজে বিক্রীত হইতে কৃত সঙ্কল্প। সমস্তই সেই পরাবরেশ মহাপ্রভুর ভঙ্গী। সোমবারে জলধরের চিত্ত সহজেই অতি প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি বলিতে লাগিলেন আজ মনে অতি প্রসন্নতা আসিতেছে, বোধ হয় আমার শুভ মুহূর্ত্ত নিকটবর্ত্তী। বাস্তবিক সোমবারে প্রভুপাদ ভক্তবাৎসল্যের উজ্জ্বল মূর্ত্তি, বৈকালে ৫½টার সময় যশোদার সহিত সভৃত্য সপুত্র তদীয় দাস এই দীনহীনের ক্ষুদ্র কুটীরে উদয় হইলেন। মঙ্গলবার পূর্ণিমার দিন প্রাতে ৭টার মধ্যে শুভদীক্ষার কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। "জয় নিতাই গৌর সীতানাথ" ধ্বনি উত্থিত হইল, জলধরের ও তদীয় ভার্য্যা বহুদিনের অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ধন্য হইলাম। মনে হইল "গোত্রানবুর্দ্ধতাম্" শ্রীমন্ মহাপ্রভু কোথা হইতে এমন অপার্থিব বস্তু মিলাইয়া দিলেন, আজ যেন বন্ধু আরো হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। শ্রীমান্ জলধরের দীক্ষা উপলক্ষে ছোট রকমের একটু মহোৎসবের উদ্যোগ হইয়াছিল। শ্রীমালসা ভোগ হইলেন, ভক্তবৃন্দ মহানন্দে ভোজনারতি কীর্ত্তন করিতেছেন, এই সময়ে একখানি Slip (ক্ষুদ্র পত্র) আসিল! শ্রীযুক্ত ললিত দাদা লিখিয়াছেন বুধবার (কল্য) শ্রীধাম যাওয়া স্থির করিয়া প্রভুপাদকে Telegram (টেলিগ্রাম) করা হইল। সকলে "জয় রাধারাণী" বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। মদীশ্বর পরম দয়াল প্রভুপাদ ও পূর্ণাশীর্ব্বাদ করিলেন "রাধারাণীর কৃপা হইয়াছে, শ্রীধামে কল্য যাওয়াই ঠিক"। প্রভুপাদের শ্রীচরণ সরোজ মস্তকে ধারণ করিলাম মনে মনে বলিলাম সমস্ত তোমারই খেলা।"

শ্রীমান্ জলধরের যাইবার একবার ইচ্ছা হইয়াছিল কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য খারাপ তজ্জন্য পাছে আমাদের কষ্ট হয় এই জন্য নিজেই নিরস্ত হইলেন। শ্রীমান অনন্তের (আশ্রমবাসী ভক্তগণ) যাইবার বিশেষ ইচ্ছা, কিন্তু কড়ি নাই তাই মধ্যে মধ্যে ক্ষোভ প্রকাশক ধ্বনি শুনিতেছিলাম আমার মনে হইতেছিল, অনন্ত গেলে কীর্ত্তনের ও ভ্রমণের সুখ হয়। কিন্তু তাহার ও স্বাস্থ্য খারাপ মাসে মাসে জ্বর হয়। তবু তাহার আগ্রহ দেখিয়া ভাবিলাম উহাকে না লইয়া গেলে নিজের মনেও অশান্তি আসিবে, তাই বলিলাম "চল খরচের জন্য ভাবিতে হইবেনা" সে উদ্যোগী হইল। শ্রীযুক্ত অনঙ্গ দাদা ৮শ্রীধাম

যাইবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই উদ্যোগী কিন্তু তাঁহার ও অর্থাভাব, তিনি সন্ধ্যার সময় নিজ বাসায় যাইয়া কর্জ্জ পত্র করিয়া পরদিন বেলা ১১টার সময় একেবারে প্রস্তুত হইয়া আসিলেন. তাঁহার যামিনী (আশ্রমবাসী অন্য ব্যক্তিগণ বালক) ও যাইবার জন্য আগ্রহ করিয়াছিল কিন্তু খরচাভাব, তাহাও একরূপে হইত কিন্তু শেষে জলধর সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে তাঁহারা শ্রীধাম নবদ্বীপ যাইবেন এখন অনন্তও ঐ দলে গেল আমার সাজ সরঞ্জাম অনন্ত গোছাইয়া দিল। এক খড়িয়া, এক কম্বল, এক লোটা, অতি সুন্দর। বৈষ্ণবের বুদ্ধি বড় পাকা, তাই সুন্দর অথচ সহজ। খড়িয়া দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, অনেক জিনিস তখন কাপড় ১খান বালাপোষ, ২টী কোট, ২টী গেঞ্জী নব খড়িয়া গর্ভে প্রবেশ করিল, অথচ বহনের বড় অসুবিধা নাই, আবার রাত্রিতে বালিসের কাজ করে, চমৎকার শ্রীচরিতামৃতকে রাখিয়া যাইতে মন সরিলনা তাই তিনিও শ্রীধামে চলিলেন, আর করতাল। ললিত দাদার একটী ছোট বেতের বাক্স একটী ছোট Bedding বিছানা ও একটী বালতি ১টী ঘটী, অনঙ্গ দাদার এক পোঁলটা ১ লোটা কম্বল ও ছাতা একটী করিয়া লইলাম।

ক্রমশঃ—

শ্রীবামা চরণ বসু।

স্বপ্নোত্থিতের উচ্ছ্বাস।

—:০:—

হায়! হায়! কি করিলাম; কোথা আসিলাম। এ যে ঘনঘটাচ্ছন্ন মায়ারণ্য! চতুর্দ্দিকে দিকদিগন্তব্যাপী হাহারব। এ যে হলাহল পরিপূর্ণভব কোলাহল। ঐ যে কে কাম-মূর্ত্তি, মায়াকুহকিনী অগ্রগামী হইতেছে। কুহকিনী এতদিন আমাকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। ঐ মায়া রাক্ষসীর প্রখরা মায়ায় এই বিশাল বিশ্বমাঝে আবাল বৃদ্ধ নরনারী আকুল প্রাণে কেবল হাহারব করিতেছে।

নানাদিকে, নানারূপে, নানাভাবে কুম্ভকারের চক্রের মত ঘুরাইয়া মারিতেছে। অহো! কি দারুণ পিপাসা। এ পিপাসাতে যতই বারিপান করিতেছি, ততই বৃদ্ধি হওয়া ভিন্ন তৃপ্তিলাভ হইতেছে না। হায়! হায় নয়ন কতই কুভাবে, ঐ মায়াকুহকিনীর বশীভূত হইয়া আমাকে জ্বলন্ত দুষ্পূর অনলের মধ্যে ফেলিয়া আহুতি দান করিয়াছে। হায়! চঞ্চল দুর্ব্বল মন, মায়াবিনীর পৈশাচিক মায়ায় আক্রান্ত হইয়া কামিনী কাঞ্চনের প্রত্যাশায় ঘুরাইয়া মারিতেছে। এখন কোথা যাই, কি করি, কোথা গেলে মায়াবিনীর ছলনা হইতে রক্ষা পাই। আমাকে যে চারি দিকে টানাটানি করিতেছে। এ যে দারুণ যন্ত্রণা, এ যন্ত্রণা নিবৃত্তিই বা কিরূপে হয়?

আবার উহার পশ্চাতে কি ভীষণ মূর্ত্তি। ভীষণ মূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে। অহো! কি ভয়ানক আকৃতি, জ্বল-জটা-কলা-পাংশুভ্রূকুটি কি কুটিল নয়নে আমার পানে চাহিয়া রহিয়াছে। ওযে ক্রমে ক্রমে আমাকেই আক্রমণ করিতে আসিতেছে। উদ্বেলিত সাগর তরঙ্গের মত ক্রোধে কম্পমানা হইয়া থরথর কাঁপিতেছে। চক্ষু রক্তবর্ণ। নরকাগ্নি সন্তাপদায়িনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। অধর কম্পিত হইতেছে, নাসিকা বিস্ফারিত হইয়াছে, ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছে. ভয়ানক আসুরিক ভাবে পূর্ণ হইয়াছে, কি এক কালিমার ছায়ায় সমস্ত মুখ মণ্ডল ঢাকিয়া গিয়াছে। কি ভয়ানক কর্কশ শব্দ উচ্চারণ হইতেছে। হায়! ঐ দুর্দ্দান্ত পিশাচ আমাকে কত দিন যে অভিভূত করিয়া নরাকারে নরপিশাচ করিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। হায়! ঐ শার্দ্দূল আমাকে কত দিন যে উহার দুর্দ্দান্ত প্রচণ্ড পাশবিক প্রতাপে বশীভূত করিয়া আমাকে নরাকারে পশুভাবে পরিণত করিয়াছে তাহা আর কি বলিব। আহা! আহা! আমার পরুষ বাক্যে কত নরনারী বাণবিদ্ধ কপোতের মত যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। শাস্ত্রে আছে:—

রোহতে সায়কৈর্বিদ্ধং বনং পরশুনা হতং।
বাচা দুরুক্তয়া বিদ্ধং ন সংরোহতি বাক্‌ক্ষতং॥

মহাভারত।

বাণবিদ্ধ কিম্বা পরশুছিন্ন বৃক্ষ পুনরায় অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু দুর্ব্বাক্য দ্বারা বিদ্ধ হইয়া যে হৃদয় ক্ষত হয় তাহা আর পুনর্ব্বার সংরূঢ় হয় না।

হায়! এ বিশাল বিশ্বমাঝে কি দিবা, কি রাত্রি, কি পুরি মধ্যে নিভৃত স্থানে ইহাদেরই প্রচণ্ড প্রতাপে অধিকাংশ পাপ কার্য্য হইতেছে। এই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী শত্রুর প্রতাপে আমি ত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র নগন্য ব্যক্তি, সমাজের কত শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তি, কত সাধু পুরুষ, কত বৈরাগ্যাবলম্বী মহাত্মা ব্যক্তি ইহাদের কর কবল হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। এমন কি ভগবদ্ভক্ত শ্রীভগবানের প্রিয়সখা অর্জ্জুনও ইহাদের ভয়ে ভীত হইয়া একদিন শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। যথা;—

অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥

অর্জ্জু কহিলেন। হে বার্ষ্ণেয়! পাপ করিতে ইচ্ছা না করিলেও এই পুরুষ কাহা কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া যেন বল পূর্ব্বক নিয়োজিত হইয়াই, পাপ করে? ভগবান বলিলেন।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজো গুণ সমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরীণম্॥

শ্রীভগবান কহিলেন—ইহা রজোগুণজাত দুষ্পুরনীয় ও অত্যুগ্র কাম এবং উহা কোনরূপে প্রতিহত হইলে উহা হইতে উৎপন্ন ক্রোধ; মোক্ষমার্গে ইহাকে অর্থাৎ এই কামকে বৈরী বলিয়া জানিও।

অহো! উহার পার্শ্বে লোল রসনা বিকট দশনা ও কে মুখ হইতে অবিশ্রান্ত লালা নির্গত হইতেছে। রসনা পরিতৃপ্ত করিতে না পরিয়া মুখ, গহ্বর হইতে বহির্গত হইয়া পড়িয়াছে। কুক্কুরের মত জিহ্বা দিবানিশি স্বক্কিনী লেহন করিতেছে। ইহাকে যে দেখিতে পাই যতই ভোগ দেওয়া হয় ততই লোভাগ্নিকে ইন্ধন দেওয়া হয়। হায়! হায়! এও যে আমাকে দুর্ব্বল পাইয়া আত্মবশে আনিয়াছে। ইহার প্রলোভনে কতই যে অখাদ্য কুখাদ্য, আহার করিয়া, ইহার জ্বলন্ত অগ্নিতেপ্রাণ আহুতি দিয়াছি। কই! আজ অবধি যে পরিতৃপ্তি লাভ হইল না! অহো! ইহার কি সামান্য প্রতাপ! দুরন্ত শঠ! আমাকে ক্ষুদ্র পর্ণ কুটীর বাসী জানিয়াও রাজ অট্টালিকায় লইয়া যাইবার আঁশাদিতেছে। এ যে চারিদিকে লোভের ফাঁদ্ পাতিয়া বসিয়া আছে। হায়! এতদিন নানাবিধ চর্ব্ব্য চোষ্য,

লেহ্য পেয়, প্রভৃতি সুস্বাদু আহার দিয়াও ইহার তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলামনা। দুর্বৃত্তের যে কোন আশা মিটাইতে পারিলামনা। ইহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রজ্ঞা নষ্ট হয়, প্রজ্ঞা নষ্ট হইলে হ্রী (লজ্জা) নষ্ট হয়, হ্রী নষ্ট হইলে ধর্ম্ম নষ্ট হয়, ধর্ম্ম নষ্ট হইলে শ্রী নষ্ট হয়। আহা মহাভারতে এই ভাবের শ্লোক আছে। যথা—

লোভঃ প্রজ্ঞানমাহন্তি প্রজ্ঞা হন্তি হতা হ্রিয়ং।
হ্রীর্হতা বাধতে ধর্ম্মং ধর্ম্মো হন্তি হতঃশ্রিয়ং ॥

মহাভারত।

লোভ প্রজ্ঞাকে নষ্ট করে, প্রজ্ঞা নষ্ট হইলে হ্রী (লজ্জা) নষ্ট হয়, হ্রী নষ্ট হইলে ধর্ম্মনষ্ট হয়, ধর্ম্ম নষ্ট হইলে শ্রী অর্থাৎ যাহা কিছু শুভ সমস্তই নষ্ট হয়।

হিতোপদেশেও বেশ এই ভাবের একটী শ্লোক আছে। যথা;—

লোভে ন বুদ্ধিশ্চলতি লোভো জনয়তে তৃষাং।
তৃষ্ণার্ত্তো দুঃখমাপ্নোতি পরত্রেহ চ মানবঃ ॥

হিতোপদেশ।

লোভের দ্বারা বুদ্ধি বিচলিত হয়, লোভে তৃষ্ণা জন্মে, তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই দুঃখ প্রাপ্ত হয় ॥

হায়! হায়! এখন যে আমি লোভের দাস হইয়া পড়িলাম। উপায় কি! কোন দিকে যে পলাইবার উপায় দেখিতে পাই নাই। কাহার আশ্রয়ে যাইলে বা আমি এই রক্ত মাংস লোলুপ পাপ মূর্ত্তির হাত হইতে মুক্ত হই। চতুর্দ্দিকে যে লোভের ফাঁদে ঘেরা হইয়া পড়িয়াছি। কোথাও যে ফাঁক দেখিতে পাই নাই।

ও আবার কে মদ মত্ত বারণের-মত হেলিতে দুলিতে পৃথিবীকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া আসিতেছে। ও যে কাহাকেও ভ্রূক্ষেপ করিতেছেনা, সকলকে তৃণ তুল্য জ্ঞানে অবহেলা করিতেছে। ও যে দেখিতেছি শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলকেই আয়ত্ত করিয়াছে। আহা! উহার প্রচণ্ড তেজে সকলেই অভিভূত। আর ও আশ্চর্য্যের বিষয়, যিনি যত যে বিষয়ে অধিক শক্তি পাইয়াছেন তাহাকেই তত অধিকার করিয়াছে। কেহ একটু কবিতা শক্তি পাইয়া মনে করিতেছে যে আমার কবিতা পড়িলে কে না মুগ্ধ হইবে। কেহ হয় ত একটু বক্তৃতা শক্তি পাইয়া মনে করিতেছেন আমার ওজস্বিনী বাক্যচ্ছটায় শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়া পড়ে। কোন বলীয়ান ভাবেন আমার বাহু বলের কাছে কে প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে।

কোন গণিতবিদ্যা পারদর্শী মনে করেন আমি এক নৈসর্গিক শক্তির বলে গণিতের কূট প্রশ্নগুলিও অক্লেশে উত্তর করিতে পারি। যিনি ধন গর্ব্বে মত্ত তিনিও পৃষ্ঠে একটি বৃহৎ ঢাক লইয়া পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে, দেশে বিদেশে বাজাইয়া বেড়াইতেছেন। আবার যিনি রূপের গর্ব্বে গর্ব্বিত, তিনি তাঁহার বিদ্যুল্লতার মত রূপের ছটায় প্রতি ঘরে ঘরে বেড়াইয়া রূপের কিরণে মোহিত করিতেছেন। হায়! হায়! ইহার অত্যাচারে আমিও মত্ত ও জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের অধিকাংশই আমার মত মত্ত। যত মনে করি ইহার কাছ হইতে পালাইয়া যাই, ততই কোথা হইতে লুকাইয়া আসিয়া জড়াইয়া ধরে। হায়! হায়! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জ্জুন প্রভৃতি পঞ্চ পাণ্ডবও ইহার হাত হইতে এড়াইতে পারেন নাই। মহাভারতে স্বর্গারোহণ পর্ব্বে পঞ্চ পাণ্ডবের স্বর্গারোহণের আখ্যান ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ। একমাত্র ধর্ম্মনন্দন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া স্বশরীরে স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন। ইহার প্রচণ্ড তেজে সমস্ত সুকৃতি দগ্ধ হইয়া যায়। হায়! হায়! এক দিনও ভাবিলাম না যে এই অহংকার মৃত্যু অল্পকাল মধ্যে আসিয়া দূর করিয়া দিবে। হায়! একদিন মনেও স্থান দিই নাই যে কত জ্ঞানী, বৃদ্ধ বয়সে অজ্ঞানী হয়। কত ধনী পথের ভিখারী হয়! কত মানী অপমানিত হয়। কত প্রতাপী পর পদাবনত হইয়া থাকে। একদিন যে নেপোলিয়ন বনাপার্টির প্রচণ্ড প্রতাপে সসাগরা ধরা কম্পান্বিতা হইয়াছিল তাঁহাকেই আবার সেণ্ট হেলেনায় ক্ষুদ্র কারাগারে নিবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল। জ্ঞানীর শিরোমণি অগষ্টকোমৎ বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন। রূপ ত দুই দিনেই বিরূপ হইয়া যায়। ধনী দরিদ্র হওয়ার দৃষ্টান্তের ত অন্তই নাই। এখন কি উপায়ে যে এই বলদৃপ্ত প্রচণ্ড শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। নৃশংস যে প্রতিক্ষণে প্রতি মুহূর্ত্তে আমাকে হুঙ্কার রবে আক্রমণ করিতে আসিতেছে।

ক্রমশঃ—

শ্রীমহেন্দ্র নাথ বসু।

ভক্তি।

১০ বর্ষ
১৩১৯ সাল। | বৈশাখ মাস। | ৯ম সংখ্যা।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥

প্রার্থনা।

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানু স্মৃতি স্বভাবাৎ।
করোমি যৎ যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়ৈব সমর্পয়ামি ॥

হে সর্ব্বান্তর্য্যামিন্! আমাকে তোমার ভাবে এমন করিয়া বিভাবিত করিয়া রাখ যে, শরীর, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, জীবস্বভাব এবং পুর্ব্বপুর্ব্ব সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া, যখন যেকর্ম্মই করিনা কেন, যেন সমস্তই শ্রীনারায়ণ বলিয়া তোমাকে অর্পণ করতঃ কর্ম্মফল ও বাসনা সমুহকে পরিত্যাগ করিয়া পরমানন্দে তোমার ভাবে জীবন যাপন করিতে পারি।

লীলাময়! এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমারই নানা প্রকার বৈচিত্রপূর্ণ একটী লীলাক্ষেত্র, তুমি সর্ব্বদাই জীবসমুহকে নানা ভাবে ভাবিত করিয়া এক একটী

অপূর্ব্ব ভাবের খেলা খেলিতেছ, কখন যে কাহাকে লইয়া কি ভাবের খেলা খেলিতেছ, তাহা সীমাবদ্ধ সামান্য বুদ্ধিবিশিষ্ট মানব আমরা বহু যুক্তি তর্কাদির দ্বারা অনন্ত কাল চেষ্টা করিয়াও বিন্দুমাত্র বুঝিতে অক্ষম। প্রভো! তাই তোমার শ্রীপাদপদ্মে শরণ লইলাম, তুমি আমার সহিত কখন কিভাবের খেলা খেলিতেছ, কোনভাবে খেলিলেই বা তুমি প্রীত হও, এবং আমিও তোমার খেলার মধুরতা অনুভব করিয়া ধন্য হইয়া যাইতে পারি তাহা তুমি নিজগুণে দয়া করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দাও; আমি কায়মনোবাক্যে তোমার জয় ঘোষণা করি।

অন্তর্য্যামিন্! অন্তরের ভাব তুমি সকলই জানিতেছ, তোমার কৃপা ভিন্ন তোমার এই দুরূহ গুহ্যাতিগুহ্য লীলার বিন্দুমাত্র ভাবও হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। কৃপাময়! তুমি জ্ঞান রূপ আলো প্রদানে আমার জন্ম জন্মান্তরীন্ অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিয়া সর্ব্বদা তোমার ভাবে ভাবিত করিয়া রাখ, আমি তোমার প্রদত্ত জ্ঞানালোকের সাহায্যে ভাল করিয়া তোমার খেলার মধুরতা অনুভব করিয়া ধন্য হইয়া যাই।

হে সর্ব্বজীব-জীবন্! তুমিই স্রষ্টা, রক্ষাকর্ত্তা এবং তুমিই যে সংহার কর্ত্তা তাহা বুঝিয়াও বুঝিতেছি না, সুখ পাইলে একেবারে আনন্দে আত্মহারা হইয়া তোমাকে ভুলিয়া যাই, তখন তুমিই যে সর্ব্বসুখ-মূলাধার, তোমার কৃপাতেই যে এই আনন্দ পাইতেছি, তাহা একবারও মনে হয় না, আবার দুঃখে পড়িলে একেবারে অধীর হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে থাকি। মায়ামোহে এমনই মুগ্ধ যে, সর্ব্বভূতেই যে তোমার সত্ত্বা বিদ্যমান তাহা ভ্রমেও একবার মনে করি না, তাহা করিনা বলিয়াই অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আপন কর্ত্তৃত্বে জ্ঞান হারা হইয়া বিপদের উপর বিপদ আনয়ন পূর্ব্বক নিরন্তর দুঃখ ভোগ ও দুর্ল্লভ জীবনের অধঃপতন করিয়া তোমার নিকট পদে পদে অপরাধী হইতেছি।

দীননাথ! তোমার স্বরূপ তত্ত্ব বুঝাইয়া দাও, সর্ব্বভূতে যে তোমার পরমানন্দময় সত্ত্বা সর্ব্বদার জন্য বিদ্যমান তাহা অনুভব করাইয়া দাও; আমি তোমার তত্ত্ব অবগত হইয়া তোমার কর্ত্তৃত্বে আমার নিজ কল্পিত কর্ত্তৃত্ব মিলাইয়া তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র এই ভাবে কার্য্য করিয়া সকল জ্বালার শান্তি করি; আমি অজ্ঞান অন্ধকারে ত্রিতাপতাপে তাপিত হইয়া সর্ব্বদাই নানা প্রকার যাতনা ভোগ করিতেছি, তুমি কৃপাকরিয়া আমাকে জ্ঞানালোক প্রদান কর আমি তোমার প্রদত্ত আলোকের সাহায্যে এই ঘোর বিপদাপদ সঙ্কুল অন্ধকারাচ্ছন্ন সংসারে তোমার

আদিষ্ট,—তোমার প্রদর্শিত পথে চলিয়া শান্তিময় ধামের দিকে অগ্রসর হইতে থাকি ; কুচিন্তা জ্বরে জর্জ্জরিত এই দুর্ব্বল দীনহীনকে তোমার কৃপারূপ যষ্টির আশ্রয় করিয়া অগ্রসর হইতে দাও, আর অসার ভাবনা দিয়া সারাৎসার পরমানন্দময় তোমার ভাবে ভুলাইয়া রাখিওনা, দীনের আশা পূর্ণ কর, আজ ইহাই প্রার্থনা।

দীনহীন—শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

শ্রীগৌর-নৃত্য।

—:০:—

(১)

সোণার পুতুলি ওই কে নাচে মরি।
ভুবন মোহন রূপে হৃদয় হরি'।
অধরে মধুর হাসি,
উজলিছে দশদিশি,
মোহিত নদীয়া বাসি সেরূপ হেরি।
নাচে গোরা ত্রিভুবন পাগল করি।

(২)

শারদ পূর্ণিমা আজি উজলা রাতি।
অকাতরে ঢালে চাঁদ কিরণ ভাতি।
সুরধুনী তীরে আজ
সকল ভকত মাঝ,
নাচিছে নদীয়ারাজ প্রেমেতে মাতি।
চাঁদিমা জিনিয়া দেহে উজল ভাতি।

(৩)

হরিবোল হরিবোল সঘনে ব'লে।
নাচিছে নিমাই চাঁদ আপনা ভুলে।
আয়ত লোচনে হায়,
শতধারা ব'হে যায়,
প্রেমে পুলকিত কায় নাচিয়া চলে।
সুন্দর মালতী মালা দুলিছে গলে।

(৪)

শিরোপরে চূড়াবাঁধা মালতী মালে।
অলকা তিলকা শোভে প্রসর ভালে।
ওরূপ হেরিলে পরে,
হৃদি-মন-প্রাণ হরে,
ভুবন উজল করে কিরণ জালে।
সবে হেরে অনিমেষে শচীদুলালে।

(৫)

হেলে দুলে নাচে গৌর দু'বাহু তুলি।
প্রেমের ভরেতে কভু পড়িছে ঢলি।
নাচে নটবর বেশে,
কভু কাঁদে কভু হাসে,

বিহ্বল প্রেমের বশে, মাখিছে ধূলি।
শচীর দুলাল নাচে দু'বাহু তুলি।

(৬)

পতিত পাবন তুমি ভুবন বঁধু।
(তব) বিশাল হৃদয়ে ভরা করুণা সুধু।
'বড় দুখ জ্বালা স'য়ে
ডাকি হে আকুল হ'য়ে
জুড়াও বারেক দিয়ে চরণ মধু।
চির দয়াময় তুমি ভুবন বঁধু।

শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী দেবী।

স্বপ্নোত্থিতের উচ্ছ্বাস।

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ও আবার পশ্চাতে কে? দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপী অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া আসিতেছে। অবিদ্যারূপিণী পাপিনী জগতকে সম্মোহন শরে মোহিত করিয়া ফেলিয়াছে। পাপিয়সীর মোহমায়ার দ্বারা ভ্রমান্ধ হইয়া যাহা অস্থায়ী, অধ্রুব, কষ্ট, তাপ ও শোকের উপাদান, তাহাকেই স্থায়ী, ধ্রুব ও পরমানন্দের নিদান মনে করিতেছি। যাহা কখন আমার নয়, যাহার প্রতি আমার কিছুই অধিকার নাই, তাহাকেই আমার আমার করিয়া অস্থির হইতেছি। ইহারই মায়ায় পিতা, মাতা, বন্ধু, ভ্রাতা, পুত্র, পরিবার কেহই আমার নয় অথচ দিবানিশি হৃদয়ের মধ্যে কে যেন "আমার" আমার ধ্বনি করিতেছে। এই যে ভয়ানক ভ্রম ইহাকেই মোহ বলে।

এই পাপিয়সীই সকল পাপের মূলাধার। ঐ পিশাচী না থাকিলে জগত কত সুন্দর হইত, অনিত্য বিষয়ে কাহারও লোভ হইত না, অসার ধন লইয়া কেহই গর্ব্ব করিত না, পরশ্রী কাতরতা প্রভৃতি দোষে জীবন জর্জ্জরিত হইত না। যেখানে যত সঙ্কীর্ণতা মোহই সেই খানে তত অধিকার করিয়াছে। সাধারণতঃ মাতার পুত্রের প্রতি যে ভালবাসা তাহা প্রায়ই মোহ পরিপূর্ণ। কয়জন মা স্বগর্ভজাত পুত্র ও প্রতিবেশী পুত্রকে সমান চক্ষে দেখিয়া থাকেন। যদি

দেখিতে পাই কোন মাতা বা পিতা আত্মপর ভুলিয়া যে কোন বালক দেখিতেছেন অমনি কোলে তুলিতেছেন; আপনার পুত্রের ন্যায় তাহাকে চুম্বন করিতেছেন ও স্নেহের বিন্দুমাত্র বৈলক্ষণ্য করেন নাই, তখনই বলিব এই পিতামাতার অপত্যস্নেহ জনিত মোহ দূরীভূত হইয়াছে। এই বিশ্বজনীন ভালবাসায় সমগ্র হৃদয় প্লাবিত হইয়া ছিল বলিয়া ভগবান বুদ্ধদেব ও শ্রীচৈতন্যদেব প্রাণাপেক্ষা ও প্রিয়তমা প্রেয়সীকে ত্যাগ করিয়া জগদুদ্ধারের জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়া বাহির হইয়া ছিলেন। তাঁহারা মহাপ্রেমে মজিয়াছিলেন বলিয়া ক্ষুদ্র মোহের মস্তকে পদাঘাত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভগবান্ বুদ্ধদেব গৃহত্যাগের অব্যবহিত পুর্ব্বে নিশীথ সময়ে তাঁহার সহধর্ম্মিনীকে যে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে উদার প্রেমের এই মোহ দমনী মহাশক্তির পরিচয় উৎকৃষ্ট রূপে উপলব্ধি হয়। " আমি ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত জীবকে এত ভাল বাসিয়াছি বলিয়াই, তোমাকে অত্যন্ত ভাল বাসিয়াছি জগতের সমস্ত জীবকে যে ভাল না বাসে তাহার ভাল-বাসা ভালবাসাই নহে, তাহাই মোহ। হে নিদ্রাভিভূতে প্রিয়তমে! সময় উপস্থিত আমাকে প্রস্থান করিতে হইবে যাহাতে সমস্ত পৃথিবী উদ্ধার হইবে অথচ তোমাতে আমাতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে সেই মহাব্রত সাধনের জন্য তোমার সুকোমল অধর আমাকে আহ্বান করিতেছে, অর্থাৎ তোমার প্রতি আমার যে ভালবাসা তাহাই আমাকে বলিতেছে, আমার নাম ভালবাসা যদি তুমি হৃদয়ের আনন্দ প্রতিমা চিরসঙ্গিনীকে ত্যাগ করিয়া এই পাপক্লিষ্ট দুঃখজর্জ্জরিত পৃথিবীকে মোহ নিগড় হইতে উদ্ধার করিবার জন্য অগ্রসর না হও, আর যদি ইহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া এই জগতের মঙ্গল সাধনে ব্রতী না হও, তবে আমার নাম ভালবাসা নহে, আমার নাম মোহ"। আহা! আমরা মোহ ভারাক্রান্তা তরণী লইয়া উদ্বেলিত সাগর তরঙ্গে ভাসমান। প্রতিক্ষণেই সংসার সাগরে ডুবু ডুবু প্রায়। এরূপ অবস্থায় বা উপায় কি? কিরূপে নিস্তার পাওয়া যায়।

ঐ যে একদিকে নয়ন কোঠরান্তর্গত জীর্ণ শীর্ণ লম্বা পিশাচ রূপী আকৃতি দাড়াইয়া, ও কে? উহাকে দেখিলেই মনে হয় হিংসার মূর্ত্তি মাৎসর্য্যরূপী দাঁড়াইয়া আছে। ইহার জিহ্বায় অনবরত পরনিন্দা ও পরগ্লানি নৃত্য করিতেছে। পাপিষ্ঠ স্বীয় জীবনের দোষগুলি সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ হইয়া পরের ছিদ্রান্বেষণে

সদা জাগ্রত। প্রাণ থাকিতে সরল মনে কখন পরের গুণানুকীর্ত্তন করিতে পারে না। পাপাত্মা সর্ব্বদাই ঈর্ষান্বিত হইয়া পরের অনিষ্ট করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া ঘুরিতেছে। মুখে সুমধুর বাক্যে মনস্তুষ্টির জন্য চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু হৃদয়াভ্যন্তর বিষে পরিপূর্ণ। মক্ষিকা যেমন দেহের মধ্যে সামান্য ক্ষত স্থান পাইলেই বসিতে চেষ্টা করে, এই পিশাচও যেখানে যাহার যে কোন দোষ থাকে তাহারই অনুসন্ধানে তৎপর। ঐ পাপিষ্ঠ অবসর পাইলেই আরও চাপিয়া বসে। ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতির উপায় কি? হায়! হায়! কি ছিলাম, ঐ দুরাত্মাদের ছলনায় কি হইলাম। এখন এই ভীষণ অরণ্যে ছয় দিক হইতে ছয় জন আমাকে টানাটানি করিতেছে। হায়! অগ্র পশ্চাৎ কোন দিকে যাইবার উপায় নাই। ইহারা ঘেরিয়া রাখিয়াছে। আমার শ্রান্ত, ক্লান্ত জরাজীর্ণ দেহে আর দৌড়াইয়া পলাইবার শক্তি নাই। পদে পদে পথে পথে ইহাদের বাধা বিঘ্নে অগ্রগামী হওয়া দূরে থাকুক ক্রমে পিছাইয়া পড়িতেছি পথ ভ্রমে কোথায় আসিয়াছিলাম। ক্রমে বেলা অবসান হইয়া আসিল। মায়া মেঘে ঘন ঘটাচ্ছন্ন হইয়াছে। চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছি। হায়! কোন্ দিকেই বা যাই। কে পথ বলিয়া দিবে। যাহারা বন্ধুছিল তারা যে আর কেহ নিকটে নাই। আমার এ বিপদের বন্ধু কি কেহই নাই! "কোথা বিপদ ভয়হারী কে আছ রক্ষা কর। জ্বলন্ত অঙ্গারে দেহ মন প্রাণ দগ্ধ হইয়া গেল রক্ষা কর।"

ঐ যে অতিদূরে যেন কিসের শব্দ শুনিতেছি। আহা! ওযে মধুর বংশীধ্বনির মত বোধ হইতেছে। আবার যে সকলেই নীরব। তবে কি কেহ নাই। আবার আকুল প্রাণে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া দেখি। "কোথা বিপদের বন্ধু! আমায় এ বিপদে রক্ষা কর। আমাকে এই পিশাচদের হস্ত হইতে ত্রাণ কর," ঐযে কে যেন মাভৈঃ মাভৈঃ রবে অভয় দিতেছে। উহার রব ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে। আহা একজন সৌম্য মূর্ত্তি তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ সুন্দর পুরুষ আমার দিকেই আসিতেছেন। আহা! যতই নিকটে আসিতেছেন ততই যেন নির্ভয় হইতেছি। "হে দেব! আমাকে এই অজ্ঞান অন্ধকার রূপ মায়ারণ্য হইতে রক্ষা করুন, আমি আপনাদের শ্রীচরণে আত্ম সমর্পন করিলাম।" আহা! কি সুমধুর স্বরে কহিলেন। "বাপ্ বিপদে পড়িলেই মধুসূদন মধুসূদন

বলিয়া আকুল প্রাণে ডাকিবে, ডাকিলেই, আমি বা আমার মত কোন একজন আসিয়া তোমাকে অভয় দান করিবে। আমরা সেই বিপদ ভয়কারী মধুসূদনের অজ্ঞাকারী হইয়াই এখানে আসিয়াছি তুমি দিবানিশি "হরি হরি" বলিয়া ডাক তাহা হইলে তোমার সকল বিপদই দূর হইবে।"

হায়! এই মাত্র যে সুন্দর সৌম্য মূর্ত্তি দেখিতে ছিলাম। কোথায় গেলেন। যাহা হউক এখন আমি তাঁহার উপদেশ মত "হরি হরি" বলিয়া সরল প্রাণে ডাকি। আহা কি সুন্দর নাম। আমার যে নামের গুণে নয়নে ধারা আসিতেছে। হৃদয়ে যে আনন্দ উপভোগ করিতেছি। সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে। এখন যে দেখিতেছি সেই কামমূর্ত্তি কুহকিনী অন্যবেশ ধারণ করিয়া আমার কাছে আসিতেছে। সে যে এখন দাসীর মত আমার আজ্ঞাকারী হইয়া হরিনাম সাধনে প্রবৃত্তি দিতেছে। যে ক্রোধের বিকট ভ্রূভঙ্গিকে একদিন ভয় করিয়া ছিলাম সে এখন অনুগত হইয়া আমারই বৈরী রিপুগণকে দলন করিতেছে। যে লোভের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি একদিন অনলের মত জ্বালাইয়াছে সে এখন অন্ধকার পথে দীপশিখার মত ভগবৎ সন্নিধানে যাইবার রাস্তা দেখাইতেছে। যে দম্ভের ভয়ে ভীত ছিলাম সে এখন শ্রীহরির অভিমানে অন্যায় মন্দ কার্য্যে বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে। যে মোহের অন্ধকারে আপনাকে পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতে ছিলাম না, এখন তাহারই আলোকে ভগবৎ স্বরূপ দর্শনে মোহিত হইতেছি। আহা এখন সেই ভীষণ বন, উপবন বলিয়া বোধ হইতেছে। এখনে যে চতুর্দ্দিকে আনন্দধারা বহিতেছে, চারিধারেই আনন্দ ময়। এ যে আনন্দ বাগান। এই কি সেই বৃন্দাবন। হে বৃন্দাবনচন্দ্র! এখানে যে সকলে আনন্দ লহরী লইয়া নাম গানে বিভোর হইয়া আনন্দে সুমধুর নৃত্য করিতেছে। তুমি সুধারাশি ছড়াইয়া আমার হৃদয় আনন্দময় করিতেছ। হে বনবিহারি! তোমার কাছে এই দীনদাসের এই প্রার্থনা যেন এই আনন্দরাজ্যে তোমার যে সুমধুর জগমঙ্গলকর প্রেমেমাখা নাম শুনিতেছি, ইহা শুনিতে শুনিতেই দাসের জীবন অন্ত হয়। হরিবোল, হরিবোল।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বসু।

প্রার্থনা।

হরি হরি কবে হেন শুভ দিন পাব ;
অলীক আমোদ ত্যজি বিজনে সতত র'ব।
প্রাণারাম হরিনাম শান্তি-সুখ নিকেতন ;
জপিব ভকাতভরে হইয়া অনন্য মন।
জপিতে জপিতে কবে প্রেমানন্দ মন্দাকিনী,
বহিবে হৃদয় মাঝে জুড়াবে তাপিত প্রাণী।
সে সলিলে সিক্ত হ'য়ে বিশুষ্ক হৃদয়মম,
হইবে মাধুর্য্যময় নন্দন কানন সম।
ফুটিয়া উঠিবে তায় ভাবের প্রসূন রাশি ;
সৌরভেতে প্রাণ মন আনন্দে যাইবে ভাসি॥
যতনে সে ফুল তুলি প্রেমভরে কুতুহলে ;
কুসুম অঞ্জলি দিব যুগল-পদ-কমলে।
দয়াময় দীনবন্ধু প্রেমময় গৌরহরি !
দীনের এ' অভিলাষ পূর্ণকর কৃপা করি'॥

দীন—শ্রীশশিভূষণ সরকার।

শ্রী"লক্ষ্মী" ঠাকুরাণীর সহিত শ্রীনিমাইর শুভ বিবাহের পূর্ব্বের "শুভ অধিবাস" !

নিমাইর বিবাহের শুভ অনুষ্ঠানে।
সর্ব্বানন্দ সুখ বহে নদীয়ার প্রাণে॥
বাজে বাদ্য, নৃত্যগীত করে নটগণে।
শচীর আলয় সদা পূর্ণ লোকজনে॥

চতুর্দ্দিকে বিপ্রগণ করে বেদ ধ্বনি।
শোভিছেন চন্দ্রসম মধ্যে চিন্তামণি॥

সুগন্ধি চন্দন মাল্য লয়ে শুভক্ষণে।
করিলেন অধিবাস আত্মবর্গগণে,॥

তাম্বুল গুবাক গন্ধ মলয়জ দিয়া।
ব্রাহ্মণগণের তুষ্ট করিলেন হিয়া॥

বল্লভআচার্য্য আসি, কত মনোসুখে।
করাইয়া অধিবাস, গেলেন কৌতুকে॥

মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি মনোমুগ্ধ করে।
প্রেমানন্দ রস বহে শচীদেবী ঘরে॥

অবরোধে ঘোরে সর্ব্ব পতিব্রতা সতী।
ব্রাহ্মণ সজ্জনগণ বড়হৃষ্ট মতি॥

সিন্দুর তাম্বুল তৈল খই কলা দিয়া।
অসীম আনন্দ সবে অঙ্গণা লইয়া॥

কাঁশি কাড়া ঢোল বাঁশি বাজিছে স'নাই।
স্থির হয়ে শুনিছেন ঠাকুর নিমাই॥

অঙ্গনে অসংখ্য শিশু হ'য়ে দিগম্বর।
বাজনার তালে তালে নাচিছে সুন্দর॥

হরিবোলে নাচে কত প্রেম পরিকর।
হুলুর হুঙ্কারে যেন কাঁপিতেছে ঘর॥

সর্ব্ববিশ্ব চিন্তামনি শ্রীশচীনন্দন।
তাঁরি স্বেচ্ছালীলা শুভ বিবাহ বন্ধন॥

সুদীন—হরিচরণ দে।

শ্রীঅদ্বৈত সমাধান।

—:০:—

* * * * *

শান্তিপুরে গঙ্গাতীরে করি সমাধান।
বারমাস যোগেশ্বর যোগগত প্রাণ॥
দারুণ আগুন সম গ্রীষ্মের দাহনে।
বরষার ঘনঘটা ঘোর বরষণে॥
শরতের সর্ব্ব শোভ স্বভাব দর্শনে।
হেমন্তের শশীকর হিম সমীরণে॥
বাঘের বিক্রম সম মাঘ মাস শীতে।
মধুমাসে পিক পুঞ্জ মদন পীরিতে॥
সর্ব্বকালে শ্রীঅদ্বৈত সমাধান সম।
হরির হুঙ্কার তাঁর প্রাণ প্রিয়তম॥

শ্রীহরিচরণ দে।

শ্রীবৃন্দাবন ভ্রমণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—:০:—

আমাদিগকে রওনা করাইবার জন্য বহরমপুরের ভক্তবৃন্দেরা অনেকেই আসিয়াছেন, কেহ কেহ না খাইয়াও আসিয়াছেন, কি অপূর্ব্ব প্রেম। বেলা দেড়ঘটিকার সময় অর্ণবপোত ভ ভ শব্দে ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে আসিল, সকলে "জয় রাধারাণীর জয়" ধ্বনি করিলেন, যেন প্রেমালিঙ্গনের তরঙ্গ আরম্ভ হইল, সকলের নিকট কৃপাভিক্ষা করিলাম যেন "শ্রীধামের অপ্রাকৃত দর্শন ঘটে।" কয়েক জন আমাদিগকে রেলে তুলিয়া দিতেও চলিলেন। অর্ণবপোত ভভ শব্দে আবার নাচিতে নাচিতে যেন জয় রাধারাণী জয়ধ্বনি করিতে করিতে আজিমগঞ্জের দিকে সবেগে ছুটিয়া চলিল।

মায়া কিন্তু সহজে ছাড়িবার বস্তু নহে, মহামহিমাময়ী রাজ রাজেশ্বরীর আদেশেও বাধাদিতে ছাড়িতেছে না। দুই তিন প্রকারে আমাদিগকে বিশেষ বাঁধাইয়াছিল। আমি শ্রীনন্দদুলালের উপর নির্ভর করিলাম এই সময়ে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। স্বর্গীয় সাধু শ্যামদাসের ঠাকুর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতেছি আর মনে মনে ভাবিতেছি 'নন্দদুলাল, তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে সাক্ষাৎ অনুমতি কর এদিগেও নানা বাধা।' ভক্ত বৎসল কল্পতরুর কি অপূর্ব্বরূপা! ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পূজারি গোপীনাথের শ্রীকণ্ঠ হইতে প্রসাদী মালা আনিয়া আমাদিগকে দিলেন বুঝিলাম স্পষ্টই অনুমতি বটে। কবিরাজ গোস্বামীর কথা মনে পড়িল ;—

দর্শন করি ঠাকুর পাশে আজ্ঞা মাগিল।
পূজারি প্রভুর মালা প্রসাদ আনি দিল॥
আজ্ঞা মালা পেয়ে হর্ষে নমস্কার করি।
বৃন্দাবনে চলিলাম গোবিন্দ স্মঙরি॥

২রা কার্ত্তিক বুধবার। "বৃন্দাবন যাত্রা"—

বেলা প্রায় ৮টার সময় আমাদের ষ্টীমার পৌঁছিল তখন গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল, কোন রকমে তাড়াতাড়ি আমাদের প্রিয় বন্ধুরা টিকিট কয়খানি কারিয়া দিলেন। তিনজনে এক Inter Class এ মধ্যমশ্রেণীতে উঠিলাম গাড়ী ছাড়িল, সঙ্গে সঙ্গে "জয় রাধা রাণী" ধ্বনি উত্থিত হইল। বন্ধুরা বিদায় হইলেন আমরা অপূর্ব্ব আনন্দ হৃদয়ে বৃন্দাবন যাত্রা হইয়া গাড়ীতে ঘর বাড়ী গোছাইয়া লইলাম। নূতন টাইমটেবিল্ আমাদের সকল পূর্ব্ব বন্দোবস্ত উল্‌টাইয়া দিল। দেখা গেল Ondal (অণ্ডাল দিয়া যাওয়াই সুবিধা Howrah Umbala Express ধরিতে হইবে, গাড়ী একবার নলহাটী যাইয়া বদল করিতে হইল। আবার ৯টার সময় Ondal যাইয়া বদলাইতে হইল। তখনি কুলী আসিয়া আমাদের দ্রব্যজাত কেবল নামাইয়া অন্যত্র গিয়াছে, এই সময়ে আর এক নূতন খেলা হইল। কুটিল কালো ঠাকুরটী সহজ পাত্র নহেন তিনি ভাল করিয়া না বাজাইয়া ছাড়িবেন কেন? তাই এক রঙ্গ করিলেন যেমন আমরা গাড়ী হইতে নামিলাম, ঠিক সেই সময়ে ভোঁ করিয়া একখানি গাড়ী আসিল। কে বলিল। ওই ডাকগাড়ী (Express)

চলিয়া যায়, তখন আমরা "কুলি কুলি" করিয়া হাঁকিলাম, কুলি না পাইয়া নিজেরাই মোটগুলি মাথায় লইয়া ছুটিলাম, আমার ভাগে বেতের বাক্স পোটলা পড়িল, দাদা বিছানও বালীষ, ললিত দাদাও খড়িয়া স্কন্ধে লইলেন। সকলেই ছুট্ ছুট্, বেশ একটুকু পরিশ্রমও হইল। ছুটিবার সময় আমার বড় হাসি পাইতে লাগিল। ভাবিলাম বড় চাকুরীর বড় গরিমাটাকে এখানে না ফেলিয়া গেলে ব্রজে যাইবার অধিকার হইবে কেন? তাই ঠাকুরের এই চক্র। হাঁপাইতে হাঁপাইতে সকলে গাড়ীতে উঠিলাম। দেখি সেখানে অনেক যায়গা বেশ রাত্রিতে শুইবার সুবিধা হইবে, মন ভারি খুসী হইল, কিন্তু অহোভাগ্য! শুনিলাম সে-খানি Express Train নহে Passenger Train তখন হাঁসির ঝঙ্কার পাড়য়া গেল আমাদের জ্ঞান গরিমাও বুঝি টুটিয়া গেল। আমরা না উচ্চ শিক্ষিত B. A. M. A. পাশ করা বড় বড় বাবু? চতুর শেখরের চতুরতার হাতে পড়িয়া বুঝি এইখানে সব টুটিল। মনে হইল তবেত কবি ঠিক গাহিয়াছেন—

কবে যাবে আমার ধরম করম, জাতি কুল মান জ্ঞানের ভরম।
কবে যাবে ভয় ভাবনা সরম; পরিহরি অভিমান দুরাচার॥

শুনিলাম ডাকগাড়ি (Express) পরে আসিতেছে, কাজেই আমরা আবার আসানসোলে নামিলাম, সেখানে Express ডাকগাড়ি ধরিলাম এ গাড়িতে বেশ ভিড় শুইবার উপায় নাই আমরা তিন জন এক বেঞ্চ পাইলাম। তখন "গোবিন্দ স্মরণে মোর বুদ্ধি উপজিল" এরূপ ক'রে ব'সে রাত কাটাইলে ত চল্‌বেনা, আমি পা রাখিবার স্থানে কম্বল পাতিয়া শুইয়া পড়িলাম, দাদারা দুই জন এক বেঞ্চের দুই দিকে শয়ন করিলেন, আমি কিন্তু মহাসুখে লাটসাহেবের মত নাক ডাকাইয়া ঘুমাইলাম। বুঝিলাম এখনও শিক্ষা চলিয়াছে। সঙ্গে কিছু গোপীনাথের প্রসাদী মালপুয়া ও সন্দেশ ছিল তাহাই পরমানন্দে সকলে প্রসাদ পাইলাম। অতি প্রত্যুষে উঠিয়া দেখি অপূর্ব্ব শোভা, প্রকৃতি সুন্দরী অতি রমণীয় মনহারিণী শ্রী পরিধান করিয়াছেন। উষারঞ্জিত পূর্ব্ব গগন বড়ই সুন্দর দেখাইতে লাগিল, মাঝে মাঝে ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘ, তাহাতে অরুণোদয়ের আভা পড়িয়া যেন ঝলমল করিতেছে, তখন প্রভাতী কীর্ত্তন "জয় ভবতারিণী জগৎকারিণী জগদ্ধাত্রী জগমাগ্নি জি" ধরিলাম বড়ই মিষ্ট লাগিতে লাগিল মন প্রফুল্ল সুতরাং সবই মিঠা সঙ্গে সব সরঞ্জাম ছিল, বেশ স্বচ্ছন্দে সকলে প্রাতঃকৃত্য সাধিয়া

সমাহিত চিত্তে শ্রীগুরু স্মরণে সন্ধ্যাকৃত্য সমাপন করিলাম। দানাপুরের ভাল মাখন ক্ষীরাদির ডাক হাঁকে আমার ধ্যান ভঙ্গ হইয়া গেল, তাহাই কিছু কিনিলাম সঙ্গে সঙ্গে কিছু আমরুদ (পেয়ারা) কলা, সরিফা (আতা) আপেলও কিনিলাম। মোগল সরাইতে যখন গাড়ী পৌঁছিল তখন বেলা ১১ টা। ইহা একটী বড় জংসন ষ্টেসন (Junction Station) এইখান হইতে পুণ্যধাম বারানসী যাইতে হয়, আমার বড়ই ইচ্ছা হইতে লাগিল। এইখানে নামিয়া সর্ব্বাগ্রে বুড়া বুড়ীকে দেখিয়া যাই কিন্তু দাদারা সমুদ্রের টানে পড়িয়াছেন তাঁহাদের কাণে আমার কথা আদৌ স্থান পাইলনা. তাঁহারা শ্রীগুরু চরণ পদ্মে মিলিবার জন্য এক প্রাণ হইয়া ছুটিয়াছেন, আমি ও বুঝিলাম শ্রীরাধারাণীর জরুর তলব সুতরাং পথি মধ্যে বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। সঙ্গে শ্রীতুলসী ছিলেন স্নানান্তে যথা সম্ভব প্রভুর ভোগ লাগাইয়া মহানন্দে তিন জন প্রসাদ পাইলাম, সে অপূর্ব্ব লাগিল। এমন পরিতৃপ্তি বোধ হয় রাজভোগ পাইয়াও কখন হয় নাই। মূলে প্রফুল্লতা বাঁধা থাকিলে সবই সুন্দর লাগে।

হঠাৎ ললিত দাদা ডাকিলেন "দেখ দেখ প্রয়াগ তীর্থরাজ, দর্শন কর" এই সেই ত্রিবেণী, ত্রিস্রোতা, এখানে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী মিলিতা, এখন সরস্বতীর চিহ্ন মাত্রও নাই, তাই এখন গঙ্গা যমুনার সঙ্গমতীর্থ বলে। অতি সুন্দর অতি মনোরম দৃশ্য, এখন গঙ্গায় যথেষ্ট জল বেশ তরতর করিতেছে। যখন সুদীর্ঘ পোলের উপর দিয়া ধীরে ধীরে আমাদের গাড়ী চলিতে লাগিল তখন প্রয়াগের অপূর্ব্ব তীর্থ দেখিয়া মন মুগ্ধ হইয়া গেল, অদূরে গঙ্গা গর্ভ হইতে শ্বেত সৌধমালা মাথা উচু করিয়া রহিয়াছে, ভাগিরথী কুলে দুইটি ছোট ছোট বালক আমাদিগকে হাত ছানি দিয়া কৌতুক করিয়া ডাকিতে লাগিল তাঁহারা যেন বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণার সহচরদিগের দর্শন জন্য মৃদু করপল্লব বাড়াইয়া প্রেমভরে ডাকিতেছেন, আমি প্রণাম করিলাম মনে মনে বলিলাম আমার এখন নামিবার যো নাই আমি ওয়ারেণ্টের আসামী স্বয়ং রাধারাণীর জরুর তলব আবার দুই সুচতুর পেয়াদা আমায় ঘেড়িয়া আছে, আমার নড়িবার উপায় কোথায়, সুতরাং উদ্দেশ্যে বিশ্বেশ্বর ও ভবতারিণীকে প্রণাম করিয়া জয় রাধারাণী বলিয়া এবারের মত নিরস্ত হইলাম। বিদ্রোহী দুষ্ট আসামীকে এইরূপে পাকড়া করিয়া নজর বন্দী করিয়া না লইলে হয়তো পথিমধ্যে গোলমাল হইত। এই খানে আবার রাধারাণীর

একদল নূতন পল্টন আসিয়া জুটিল আমার দুষ্ট অভিপ্রায় জানিয়াই বুঝি শ্রীরাধারাণী মুহূর্ত্তে আরো সিপাই শান্ত্রী আনিয়া গাড়িতে জুটাইলেন, গাড়িতে বসিয়া আছি হঠাৎ ললিত দাদা ভঙ্গী করিয়া বলিলেন "অই বুঝি কিশোরী দাদা"। ছুটিয়া যাইয়া তাহাকে ধরিয়া গাড়ীতে আনিলেন তখন দেখি আবার এক সুন্দর মূর্ত্তি ইনিও বড় কেও কেটা নহেন প্রভূপাদের অন্তরঙ্গ স্বয়ং রাধারাণীর সেবাপরা দাসী নামও তাই কিশোরী দাসী তিনি পরমানন্দে সকলকে আলিঙ্গন করিলেন আমার প্রতিও যথেষ্ট কৃপা দৃষ্টি করিলেন তিনি আবার একা নহেন সঙ্গে আর দুই তিন জন আছেন। চমৎকার! সতীশ দাদা তাহার জামতা শ্রীমান যোগেশ, সতীশ দাদার মাতা প্রভৃতি বুঝিলাম রাধারাণীর খেলা বড় সহজ নহে। কিশোরী দাদার প্রীতি বিহ্বল চেহারা খানি বড় সুন্দর লাগিল তিনি সব পথ ঘাট যান বাহনের খবর বলিয়া দিতে লাগিলেন তিনিও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। শ্রীধামে যাইয়াও সব ঠিক করিয়া দিবেন। কিশোরী দাদা বহুদিন ব্রজে বাস করিতেছেন সব জানা শুনা আছে এখন ত পাকা ব্রজবাসী। হঠাৎ ১৫ বৎসর পূর্ব্বের গানটী মনে পড়িয়া গেল—

সুরট মল্লার—একতালা।

মন চল যাই ব্রজধামে।

ব্রজনাথে আজি ব্রজেশ্বরীসনে হেরিব প্রেম নয়নে॥
স্কন্ধে করি লহ হরি নামের ঝুলি, শ্রীরাধে গোবিন্দ বল প্রাণ খুলি,
ব্রজবাসী আসি নিয়ে যাবে চলি, সেই রাধাকুণ্ড তীর পানে॥
মধুর ব্রজধামের এই সে পদ্ধতি, ব্রজগোপী বিনে কার নাহি স্থিতি;
অধিকারী নহিলে অশেষ দুর্গতি, খেদাইয়া দেয় তারে॥
রাধারাণীর আমার এই অনুমতি, তাঁর নাম নিলে অবাধে তার গতি,
তবে কি ভয় সম্প্রতি ওরে মন্দমতি, নিষ্ঠা করি জপ নামে॥
ললিতা বিশাখা আদি সখিগণ, রাধা কুঞ্জ ঘেরি আছে অনুক্ষণ,
কুঞ্জ মাঝে যেতে দেয় না কখন, আত্ম পরিজন বিনে॥
শরণ লইলে তাদের চরণে, শিখাইয়া লইবে যতনে,
অনুরাগ হেরে সেবার ভার দিবে, নিয়ে যাবে কুঞ্জ মাঝে॥
সেথায় যেমন যাবে, অমনি সব যাবে, মন প্রাণ তোর কেবা কাড়ি লবে,

নয়নেতে তোর বারি বরষিবে, প্রেমানন্দে ডুবে রবে ॥
প্রেমের মূরতী নয়নে হেরিয়ে, আপনারে আপনি ভুলিবে,
প্রেম মধু পানে সদা মত্ত রবে, শ্রীরাধা পদ পঙ্কজে ॥

আহা বৃন্দাবনেশ্বরীর কত করুণা কি অপূর্ব্ব প্রেমাকর্ষণ নিতান্ত বিষয় বিমুগ্ধ দীনহীন বলিয়া কত সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন।

অসার সিমুল গাছের সবই ফাঁকা আওয়াজ, কেবল মাত্র বাহ্যাড়ম্বর, ফুল আছে গন্ধ নাই সৌন্দর্য্য আছে কিন্তু মাধুর্য্য নাই কোন দেবতার পূজায় আসেনা আবার তাতে গাছটার সর্ব্বাঙ্গ কাঁটাভরা নিকটে যাইবার যো নাই। কোন কোন হাভাতে লক্ষ্মী ছাড়া ছেলের ঐরূপ কোন গুণ নাই কেবল সর্ব্বদা আঁকুট, আবদার লইয়া আছে স্নেহময়ী মাকে কেবল পোড়াইয়া মারে, আমারও ঠিক তাই হইয়াছে কিছুই নাই তবে গরিমাটুকু আছে কি জানি জানিনা কেন বহু দিন হইতে মনে একটা আবদার চলিতেছিল যে, "রাধারাণী নিজে ডাকিয়া না পাঠাইলে শম্ভুরাম শ্রীধামে যাইতেছেন না" যেন তাঁহারই কত উপকার করিবেন, বেশ মনে আছে ১৫ বৎসর পূর্ব্বে ঠিক ঐরূপ ভাব হয় পরে ১৩০৮ সালে যখন আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতার পুত্র স্বর্গীয় রাজেন্দ্র কুমার কেবল মাত্র ১৪৲ টাকা লইয়া শ্রীধাম দর্শন করিয়া আমার সিলাইদহের বাসায় আসিলেন তখন ঐ ভাবটী আরো যেন সতেজ হইয়া উঠিল উহার কিছুদিন পরে একটী কাতর আকাঙ্খা হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উত্থিত হইল—

কবে দয়া হবে রাধারাণী গো,
কত দিনে এ অধমে মনেতে পড়িবে।

এই কাতর উচ্ছ্বাস শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া গেল, আমার সহধ্যায়ী শ্রীল রাধিকা নাথ গোস্বামীর অতি প্রিয় শিষ্য শ্রীমান সত্যেন্দ্র নাথকে মোক্তার ধরিয়া তাঁহার যোগে ঐ কাতর নিবেদন রাধারাণীর নিকট জানাইলাম প্রাণেশ্বরীর অন্তরঙ্গা শ্রীরঙ্গিণী দেবী চরণে ও জানাইবার দরবার থাকিল কিন্তু তখনও কর্ম্মফের মিটে নাই সত্যেন্দ্রনাথ গরিবের চিঠির কোন জবাব দিলেন না কিন্তু এইবারে জানিলাম আমার কাতর প্রার্থনা শ্রীচরণের গোচরীভূত করিয়াছিলেন। নানা সুখ দুঃখে আরো ৮।৯ বৎসর কাটিয়া গেল যখনই শ্রীধামের কথা উঠিয়াছে তখনই উপরের গানটী জাগিয়া উঠিয়াছে বুঝিলাম কাল পূর্ণ না হইলে হইবে না।

"মহৎ কৃপা বিনে কোন কর্ম্ম সিদ্ধি নয়।
লব মাত্র সাধু সঙ্গ সর্ব্ব সিদ্ধ হয়॥"

বিধাতার বিধান অলঙ্ঘ্য নানা কর্ম্ম পাশ ভেদ করিয়া দুই বৎসর নিভৃত কারাবাস (Solitary confinement) এ সময়ে একেবারে কোন সঙ্গলাভ হয় নাই ভোগ করিবার পর প্রভুর কৃপায় মহৎ আশ্রয় লাভ হইল সঙ্গে সঙ্গে সৌভাগ্য চন্দ্রোদয় হইল। শ্রীমান ললিত দাদা প্রমুখ ভক্ত বৃন্দের চরণাশ্রয় মিলিল, মদীশ্বর প্রভুপাদের শ্রীচরণ প্রাপ্তি হইল মাতৃদেবীর কৃপা নামিল অমনি প্রভুপাদ রাধিকানাথের অযাচিত কৃপাদৃষ্টি হইল সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত চিত্তবিহারিণী রাজনন্দিনীর শুভ দৃষ্টি পাত হইল, তলব আসিল, সাধু সঙ্গ মিলিল, বামন চন্দ্র হাতে পাইল, অভাগারও শ্রীধাম দর্শনের ভাগ্য প্রসন্ন হইল।

ক্রমশঃ—শ্রীবামাচরণ বসু।

ভেদা-ভেদ।

—:০:—

বঁধু-বঁধু! কোন্ কুঞ্জে আজি তব
বাজিবে বাঁশরী?
হে গৌরাঙ্গ!—প্রাণপ্রিয়তম!
হৃদয় শিখিনী সখা! নাচিবে কি
প্রিয়ে তার স্মরি'
শুনি ধ্বনি মঞ্জু মনোরম?

২

শুষ্ক যে গো হৃদি মরু, ফুটেনি তো
বসোরা গোলাপ;—
রসে ভরা সরস প্রসূন।
কেমনে করিবে তুমি তবে হেথা
মুরলী-আলাপ?—
পারিবে না বুঝি হে নিপুণ!

৩

তাই বড় ভাবনা গো, বুঝি তবে
হবে নাক' গান ;
সব আশা এই বুঝি শেষ।
কাঁদিতে কাঁদিতে হবে, এজীবন
কোথা অবশান,—
দেখা তব পাব না প্রাণেশ !

৪

তাই যদি হয়, হোক্,—নিভে যাক্
আঁখি তারা মোর,
মরণে তো পাইব তোমায়।
জগতে তো বিঘোষিত হবে, তুমি
মম চিত্তচোর ;—
"ভেদা ভেদ" তোমায় আমায়।

শ্রীগোপেন্দ্রভূষণ বিদ্যাবিনোদ।

বিরহ বিধুরা।

—:০:—

হইয়ে আপন জন, ভুলে থাকে এ কেমন
এ কেমন কথা সই ! কেমন এ কথা ?
সে যদিরে বাসে ভাল, তবে প্রাণে কেন বল,
কেন দেয় ব্যথা সই ! কেন দেয় ব্যথা ?
নিঠুর কি তা'র রীতি, দুঃখে সেকি পায়প্রীতি ?
এত কি নিঠুর সই ! এত সে নিঠুর ?
শুনিয়াছি তা'ত নয়, সে যে সই, প্রেমময়,
সে যে সই, সে যে অতি সরল-মধুর।

অদৃষ্ট দোষেতে মোর আজি সে চিত চোর,
আজিকে সেজেছে বুঝি কপট-চতুর!
আর তা'র অদর্শনে, ধৈরয কি ধরে প্রাণে?
আজি চিত বড় যে রে বিরহ-বিধুর!
এনে দেনা শ্যামচাঁদে, বেঁধে দেনা প্রেমফাঁদে
প্রেমময়ী তোরা যে গো, আমি প্রেমহীন;
তোদের আহ্বান শুনি, অবশ্য আসিবে ধনি,
প্রেম শূন্য মরু আমি, সে যে প্রেমাধীন।
নিতি সাজি কত সাজে, সে বিনা মরি যে লাজে;
রুদ্ধ এ বেদনা থাকি কত কাল চাপি?
তোরা দে পায়ের ধূলি, আমার মাথায় তুলি,
"ওরে ভক্ত", কল্পতরু! প্রেম-ময়ী-গোপী!
তোরা রাখিলেরে পায়ে, অবশ্য সে প্রেমময়ে,
একদিনে একবারও দেখাদিতে হবে,
মরিব ভাবিনা তাই, বারেক দেখিতে চাই,
পায়ে ধরি এই সাধ পূর্ণ কর সবে।

শ্রীভূপালচন্দ্র দেব সরকার।

৺চন্দ্রনাথ সীতাকুণ্ড।

——:০:——

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বিরূপাক্ষে আরোহণ কেমন ভীষণ তাহা শুনুন'।—বেণীবাবু নবযুবক, বলিষ্ঠ বিশেষতঃ ইনি অনেকবার এপথে আরোহণ করিয়াছেন। তাহার সাহসে আমরা সাহসী হইলাম। তিনি অগ্রে বা উপরে, আমি মধ্যে, এবং বিধুবাবু পাছে বা নিম্নে থাকিলেন। কতক উপর উঠিলাম পর, এক সুদীর্ঘ খাড়া পথদৃষ্ট

হইল। শিখর পর্য্যন্ত উঠিয়া সমস্ত পথখানি এক বারে পথিকের দৃষ্টি গোচর হয় না। পথ বক্র ভাবে কোণ করিয়া ভঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া উঠিয়াছে এখন আমাকে হামাগুড়ি দিতে হইল। পা টিকিতে চাহেনা। শিশু অথবা পশু হইলাম। খাড়া হইয়া হাটিবার শক্তি ও সাহস আমার হইলনা। পথ অতি খাড়া; সিঁড়ি নাই, স্বভাববিনির্ম্মিত পায়ের পরিমানে উচু নিচু বক্রতা, অর্থাৎ ন্যুব্জতা কুব্জতা পর্য্যায় (ক্ষুদ্র তরঙ্গবৎ) আছে বলিয়া কোন মতে পা প্যাতা যায়। প্রতি পদে পরীক্ষা করিয়া পা পাতিতে হয়। দুহাত মাটিতে কিম্বা পাথরে পাতি, হাত• তিষ্টতে চাহেনা। তবে ভাগ্য এই, পথ ফাটিয়া মধ্যে মধ্যে বৃক্ষের শিকড় সর্পবৎ পতিত আছে. উহাই প্রধান অবলম্বন। প্রথম শিকড় পরীক্ষা করি মজবুত কিনা, তারপর টানিয়া ধরিয়া ঝুলিয়া উপরে উঠি। কোন কোন স্থলে পার্শ্বস্থ লতাগুল্ম আশ্রয় করিয়াও উঠিতে হয়। এক এক স্থান এমন খাড়া, মোটেই সাহস হয়না, তখন বেণীবাবু উপর হইতে আমাকে হাতে ধরিয়া টানিয়া আমায় উপরের থাকে (ধাপে) তুলেন। বেণীবাবুর কটিতে একখানি ধুতি জড়ান ছিল, মধ্যে মধ্যে আমি তাহার কটির বসন ধরিয়া থাকিতাম, তিনি আমাকে লইয়া উঠিতেন। ধন্য বেণী বাবু! ধন্য তোমার সাহস ও শক্তি!! তোমার ভালবাসায় ধন্য!!! তুমি আমাকে ঋণী করিলে।

ডাহিনে চাহিলে পাতালপুরী; বামে চাহিলে পাতালপুরী। ঈষৎ চাহিতেই আতঙ্ক আসে। পাছে চাহি এমন শক্তি তো একবারেই নাই। কেবল সম্মুখে পর্ব্বতগাত্রে দৃষ্টি লগ্ন। আমি এখন যে সঙ্কটে পতিত, সে সঙ্কট দেখিতে এবং মনে করিতেও ইচ্ছা করিনা। তাই, কোন দিক্ তাকাই না। কতকদূর উঠিয়া মাঝে মাঝে বিশ্রাম করা যায় এমন ২।১ বর্গহস্ত প্রমাণ সমতলস্থল পাওয়া যায়। তা না হইলে অবশ হইয়া খসিয়া পড়িতাম। ঐরূপ স্থলে বসিয়া সকলেই বিশ্রাম করিয়া লই। ছায়াতরুর তো অভাবই নাই। বৃক্ষেরই বাড়ী ঘর মেলা। যত উঠি, পথ বাহির হয়, ফুরায় না, অমনি নৈরাশ্য আসে। কিছু দূর উঠিয়া সবারই বুকে হাঁপানি উঠিয়াছে। তার পর ক্রমে জানু ভাঙ্গিয়া আসিল। যতই উঠি. বিরূপাক্ষ যেন বিরূপ হইয়া অথবা পরীক্ষা ভঙ্গীচ্ছলে ততই উপরদিক্ উঠিয়া যাইতেছেন, বুঝি ধরা দিবেন না।

যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ মনে পড়িল। ভীমার্জ্জুনাদি সকলেই স্খলিত হইয়া-

ছিলেন! সে পথ জানি কত ভীষণ ছিল! বিশেষতঃ আমার ন্যায় কীটের পক্ষে। জানিনা আজ কি পাতালেই ডুবি না স্বর্গেই উঠি। জীবনের এক বিশেষ পরীক্ষা, হয়তো আজই আমার জীবনলীলা শেষ হইয়া যাইতে পারে। দেশে ফিরিব কি এই অতল গুহাগর্ভেই প্রোথিত থাকিব জানিনা। একটু পা পিছলিলেই এই গভীর অন্ধতম পাতালগর্ভে প্রবেশ করিব এবং তথায় শুকাইয়া মরিব, উঠিতে পারিবনা কেহ উঠাইতেও পারিবেনা।

অহো বাঁচিলাম! এতক্ষণে এই যে বিরূপাক্ষ মন্দির! আশার অমৃত আসিল। জানু দুটি অবশ। ধূলায় পাষাণে গড়াইতে গড়াইতে, বেণীবাবুকে জড়াইতে জড়াইতে পর্ব্বতশিখরে পঁহুছিলাম। শিখরদেশের আয়তন অতিক্ষুদ্র। উহার দক্ষিণভাগে একটী ক্ষুদ্র সুদৃঢ় ইষ্টক মন্দির। পূর্ব্ব ও দক্ষিণে দুটিদ্বার। উপর পঁহুছিতেই অপূর্ব্ব এক বাত্যা অঙ্গে লাগিল। কোন মতে, অতি কষ্টে, অঙ্গ যেন আমার নয়, মন্দিরের পূর্ব্বদ্বারে চড়িয়া বসিলাম। যুগবৎ শান্তি ও আনন্দ আসিল। গ্লানির পলায়ন বৃত্তান্ত অনুভবেই আসিলনা। দুটি নেত্র ভরিয়া বিরূপাক্ষকে দর্শন করিলাম। অনন্তর মন্দির মধ্যদিয়া দক্ষিণদ্বারে বসিলাম। তিনজনেই বসিলাম। দক্ষিণে, নিম্নে সমুদ্র, উপরে আকাশ কোথায় আইলাম? সমুদ্র দর্শন বহু দিনের এক সাধ ছিল! অহো, এই যে তা পূর্ণ হইল! ডাহিনে বিরূপাক্ষ, বামে সমুদ্র, নয়ন ভরিয়া দেখিতে থাকিলাম। সামুদ্রিক দক্ষিণা শীতল বাতাস শোঁ শোঁ করিতেছে, অঙ্গে লাগিতেছে। প্রাণ ও অঙ্গ ঠাণ্ডা হইল। অহো, বিমল শান্তি! সাক্ষাৎ শান্তি! ইহাকেই শান্তি বলে! ইনিই শান্তিদেবী! বেণীবাবু বাবা শিবের ও মায়ের স্তোত্র গাহিতে লাগিলেন। চিত্ত যোগস্থ হইল। অহো, আজ উঠিয়া বাবার কোলে বসিয়াছি; ভবভীতি শাফ্ বিদূরিত হইল। আনন্দ—যোগানন্দ! বোধ হইল আরোহণে প্রায় ১ঘণ্টা লাগিয়াছে। ১ঘণ্টা বসিয়া বিরূপাক্ষের সঙ্গে আলাপ করিলাম। বাবার মাথায় কিছু চাউল ও কয়েকখানি বাতাসা ছিল। মক্ষিকাগণ গুন্ গুন্ গাহিয়া প্রসাদ পাইতেছে। আমাদেরও অংশিদার লইতে সাধ জন্মিল। বাবা আমাদের আহারের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। পাঁচভাগ করিয়া তিন ভাগ আমরা তিনজনে গ্রহণ করিলাম, দুইভাগ মক্ষিকাদের জন্য রাখিয়া দিলাম। উহারা পূর্ব্ববৎ খাইতে লাগিল। ক্ষুৎপিপাসা একবারে নির্ব্বাপিত

হইল। ধন্য প্রভু তোমার মহিমা! এখন আমরা চন্দ্রনাথ যাইবার জন্য গাত্রো-থান করিলাম। বিরূপাক্ষপদে প্রার্থনা জানাইয়া শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া উত্তর পূর্ব্বকোণ দিয়া অপর এক রাস্তায় নামিতে লাগিলাম।

এই ন্যুব্জপথে আমাদিগকে পর্ব্বতমূলে কি গহ্বরে নামিতে হয় নাই। পর্ব্বতপথে উঠিতে যেমন ক্লেশ নামিতে তেমন নয়। মহাসুখে বিচিত্র সুদৃশ্য সব দর্শন করিতে করিতে ঢালু পথে নামিতে থাকিলাম। কোন স্থলে দাঁড়াইয়া তলস্থ গুহা নিরীক্ষণ করিলাম। এ সব এত গভীর ও অন্ধকার যে উহাদের তল দৃষ্টিগোচর হয়না, বিশেষতঃ সবই ঘন ঘন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরুদ্বারা সমাচ্ছন্ন। বৃক্ষ নয়, বৃক্ষের সব রাজা। কত যুগের কত বৃক্ষ কালের সাক্ষী দণ্ডায়মান। স্থানটী বৃক্ষরাজ্য বলা যাইতে পারে। বৃক্ষের পুষ্টি গোলত্ব, লম্বত্ব, সরলত্ব, দৃঢ়ত্ব, ও স্নিগ্ধত্ব দর্শনে চিত্তে আনন্দ খেলে। ভারতবর্ষ যেমন নানাজাতীয় মনুষ্যের প্রদর্শনী, মেলা, এখানেও তেমন নানা জাতীয় বৃক্ষের সভা বসিয়াছে, এবং কত ভাবের আলাপ পরস্পর চালতেছে। সর্ব্বত্র স্বর্গনন্দনের চিত্র ফলাইতেছে। কিন্তু কেবল গভীর গহ্বরের অন্ধতম তলদেশ নরকের ছবি প্রকট করিতেছে। উঠ্‌তি পড়্‌তি স্বর্গনরক বিরোধ ঘোষণা করিয়া একে অন্যের উৎকর্ষতা বা অপকর্ষতা স্পষ্ট আঁকিয়া দিতেছে। এখন আমরা মর্ত্তে আসিলাম —স্বর্গেও নয়, নরকেও নয়। তার পর উঠ্‌তি। দুরারোহণ নয়, কেমন ভীষণ আশঙ্কাজনক এখানে কিছু নয়। অনেক উঠিয়া, অবশেষে চন্দ্রনাথের শিখর প্রাপ্ত হইলাম। এখন বুঝিলাম চন্দ্রনাথ দিয়া বিরূপাক্ষে যাওয়া তেমন সুবিধা নয়। দুর্ব্বলের পক্ষে ইহাই ভাল, কেবল কোন বাহাদুরি নাই।

পশ্চিম হইতে ক্রমে উত্তর দিক্ দিয়া চন্দ্রনাথে আরোহণ করিলাম। এখানে প্রথম শ্রীশ্রীচন্দ্রনাথ দেবের পুরাতন ভগ্নমন্দির। উহা পর্ব্বত গাত্র সহ ধসিয়া পড়িয়াছে। কেবল পশ্চিম দিকের ভিত্তি ও দক্ষিণে সিঁড়ি বিদ্যমান আছে। এই ভগ্নমন্দির বামে রাখিয়া অতি সঙ্কীর্ণ পথে দক্ষিণ দিকের মুক্ত প্রশস্ত ক্ষেত্রে আসিলাম। এই সঙ্কীর্ণ পথের পূর্ব্বে ভগ্নমন্দির ভিত্তি, পশ্চিমে লোহার কাটরা। এই কাটারা (Railing) প্রোথিত না থাকিলে এই পথে পার হইয়া আসা বড়ই বিপজ্জনক হইত। অন্ততঃ আমি আসিতে পারিতামনা। এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ, শান্তির উপরে শান্তির চূড়া !—পরমানন্দ ! এখন একবার বিরূপাক্ষ মন্দির দেখি

বার জন্য পশ্চিমদিক্ চাহিলাম। দেখিলাম পশ্চিম দক্ষিণ কোণে বহু নিম্নে যেন প্রায় অর্দ্ধ মাইল ব্যবধানে বিরূপাক্ষ অরণ্য মধ্যে অর্দ্ধ লুক্কায়িত। বিরূপাক্ষ ও চন্দ্রনাথ গিরিদ্বয়ের পাদদেশ ঘনিষ্ঠভাবে সংলগ্ন থাকিলেও শিখরদেশ দিয়া উহাদের দূরত্ব অনেক বেশী। এখন বিরূপাক্ষ গিরিকে প্রায় সমতলে শায়িত বোধ হইল। পশ্চিমে ও দক্ষিণে সিন্ধুর গগনস্পর্শী ধবলদৃশ্য। এখন চন্দ্রনাথ ভিন্ন যেন আর পর্ব্বত নাই ; সব যেন ভয়ে জড় সড় বিনিত ভাবে বা ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে সমতলশায়ী। প্রায় সমস্ত চট্টলদেশ খানি যেন পটবৎ আমার নয়ন সমক্ষে কে ধরিয়া দিল। হাতিয়া সন্দ্বীপ অস্পষ্ট কৃষ্ণবর্ণ লক্ষিত হইল। বায়ব্য বাষ্প ভেদ করিয়া বহুদূর নেত্র চালাইতে হয়, সুতরাং বাষ্পের ঘনত্ব বৃদ্ধি হইয়া দিঙ্মণ্ডল সারাদিন কুয়াসাচ্ছন্ন দেখায়। ইহাই দর্শনের অরি। পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া তৎসিমান্তে পশ্চিমদিকে নানা রঙের শস্যপূর্ণ চতুষ্কোণ ক্ষেত্র-সমূহকে দপারকোট (Chess board = Chequered cloth) বলিয়া বোধ হইল। মানুষ দৃষ্টি গোচর হইলনা। ক্ষেত্রচারী গোসকলকে এবং সমুদ্রবক্ষে ভাসমান তরণীসকলকে মাত্র কাল কাল চঞ্চল দাগ বলিয়া প্রতীত হইল। চন্দ্রনাথেরও উপরের আয়তন খুব ছোট। দক্ষিণ প্রান্তে নূতন ইষ্টক মন্দির, বিচরণ করিয়া সব দিক চাহিলাম। নেত্রপিপাসা ঘুচেনা। এই পর্ব্বতমালার পূর্ব্বদিকে অপর গিরিশ্রেণী দৃষ্ট হইল। উহা রঘুনন্দনের পূর্ব্ব কথিত অপর শাখা এই দুই পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যে সমতলদেশ লক্ষিত হইল। রাউজান, রাঙ্গামাটি প্রভৃতি ইহার মধ্যে।

এখন অন্তরঙ্গ ভাবের কথা লিখি।—মন্দিরের পূর্ব্ব দ্বার দিয়া চাহিলাম। চন্দ্রনাথদেব দর্শন করিলাম। মন্দির বাহিরেও চন্দ্রনাথ দর্শন হইতেছিল; সুতরাং মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার বেশী আগ্রহ প্রবল ছিলনা। বাহির হইতেই ভাবি,—এই চন্দ্রনাথের মন্দির!—"চন্দ্রনাথ" অর্থ কি ?—চন্দ্রের নাথ। চন্দ্র—সুধাকর, সুধাময় সুতরাং সুধার ভাণ্ডারী প্রভু চন্দ্রনাথ। সুধা কি ?—কিরণ, অমৃতকিরণ বা ব্রহ্মজ্যোতি ; তার আধার বা নাথ—চন্দ্রনাথ—শিব—মঙ্গলময়—সুধাময়! অথবা চন্দ্র—রেতঃ। যাহার ললাটদেশে চন্দ্র বা রেতঃকুণ্ড স্থির অচঞ্চল অকম্পিত বিরাজমান অর্থাৎ যিনি একমাত্র ব্রহ্মচারী

নিষ্কাম বা প্রেমময় পুরুষ তিনি চন্দ্রনাথ!—আমার পরাণ নাথ, প্রাণের ঠাকুর।—তিনি কোথায়?—এই মন্দিরে!

ক্রমশঃ—

শ্রীকালী হর বসু।

ভজন-গীতিকা।

—:o:—

(১)

মন কদম্ব তরু মূলে একবার দাঁড়াও হে
গোবিন্দ।
আমি, রত্ন বেদী সাজায়েছি হে—
এই হৃদি পদ্মাসনে রত্ন বেদী সাজায়েছি হে,
একবার দাঁড়াও হে।
আমি নয়ন ভ'রে দেখে নি হে,
জন্মের জন্মের সাধ পুরায়ে নি হে,
ভুবন মোহন রূপ দেখে নি হে,
যেরূপ দেখে মহাদেব শ্মশান বাসী হে
মহাদেব যোগাসনে ধ্যান করে হে।
আমি মদন মোহন রূপ দেখে নি হে
যেরূপ দেখায়ে আহিরী রমণী—
ভুলায়েছিলে হে ॥
ললিত ত্রিভঙ্গ হ'য়ে, , চরণ উপর চরণ দিয়ে,
অধরে মুরলী ল'য়ে
বামেতে কিশোরী লয়ে,
মা যশোদার বাঁধা চূড়া বামেতে হেলাইয়ে.
একবার দাঁড়াও হে ॥১
অগুরু চন্দন ল'য়ে. নবদল তুলসী ল'য়ে,
এই কর পাত্রে দাঁড়ায়ে আছি হে ;—
পাত্র বিনে কর পাত্রে
যুগল চরণে দিব ব'লে।

আমার পরিচয় দি হে, গুণ মঞ্জরীর যূথের দাসী হে,
গুরু রূপা সখীর দাসী হে,
যুগল সেবার দায়, আর কিছু চাই না হে,
যুগল চরণ সেবা বিনে ॥২

শ্রীমদন মোহন দাস
ব্রজধাম।

(২)

(হরি) তোমা ছাড়া আমি নই।
ধরি পদাশ্রয়, আছি দয়াময় (নাথ)
জানি নে যে তোমা বই ॥

(তুমি) একমেব পূজ্য পিতা পরিত্রাতা,
মম হৃদয় নিধি বিধি অন্নদাতা,
কার হেন মমতা, প্রাণে প্রাণে গাঁথা,—
ও তাই প্রাণের কথা দুটা কই।

(প'ড়ে) দুস্তর নরকে হাবুডুবু খাই,
অন্ন বিনে ছন্ন কি ঘোর বালাই,
অভাবে, স্বভাবে ধৃষ্টতা সদাই,
(কেবল) ফাঁকা কাজে হৈ চৈ ॥

(ছার) বিষয় বাসনা চাহিনা চাহিনা,
শ্রীপদ সেবিতে একান্ত বাসনা,
ললিতের আনাগোনা যেন আর হয়না,
(আমি) করিলাম আর্জি সই ॥

দীন—শ্রীললিত মোহন মণ্ডল।

ভক্তি।

১০ম বর্ষ।	জ্যৈষ্ঠ মাস।	১০ম সংখ্যা।
১৩১৯ সাল।		

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্‌ ॥

প্রার্থনা।

বিষয়-বিষবিলিপ্ত-স্বস্তনং পায়য়িত্বা
বিশসতি তব মায়া পূতনা মাং সুবেশা।
শরণমুপগতোঽহং সাম্প্রতং শঙ্কিতস্ত্বাম্‌
অব ভবধব দীনং পূতনারে হরে মাম্‌ ॥

হে শ্রীহরে! তোমারই প্রেরিতা মায়ারূপী পূতনা রাক্ষসী নানা প্রকার বেশ ভূষায় সর্জ্জিত হইয়া বিষয় রূপ হলাহল মাখান স্তন পান করাইয়া আমার জীবন অন্ত করিতেছে, এক্ষণে তোমাকে পূতনাঘাতী জানিয়া তোমার শরণ লইলাম তুমি আমাকে এই মায়ারূপী পূতনার হাত হইতে রক্ষা কর।

হে জগত জীবন! জগতের যেদিকেই নিরীক্ষণ করিনা কেন সেই দিকেই তো তোমার মঙ্গলময় সর্ব্বব্যাপিত্ব বিশেষ রূপে লক্ষিত হয়। যখন তোমার কৃপায় প্রাণে বিন্দু মাত্রও ভাবের সঞ্চার হয় তখন আমার আর কোনরূপ অভাব

বা কোনরূপ অশান্তি হৃদয়ে থাকেনা। তখন যথার্থই মনে হয় যে, তোমারই প্রেমপূর্ণ ভালবাসার অংশ হইয়া সংসারে পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজনগণ পরস্পর ভালবাসিয়া সুখ পাইতেছে ও অপরকেও সুখ দিতেছে। তোমার যে অমৃতময় ভলবাসার কোটী কোটী অংশের অংশ লইয়া ভালবাসিয়া পরিজন-বর্গ সুখ দিতেছে আমি এমনই নেমকহারাম যে তোমার সেই পূর্ণানন্দময় ভাল-বাসার বিষয় একবার চিন্তাও করিনা। তুমি নানা ভাবে নর নারীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আমাকে আদর যত্ন করিতেছ ও সুখ দিতেছ কিন্তু আমি যে তোমাকে প্রাণ খুলিয়া ভালবাসিয়া তোমার সদিচ্ছা পূর্ণ করিয়া তোমার আদেশ পালন করিতে পারিতেছি না ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। প্রেমময়! তুমি দয়া করিয়া আমাকে ভালবাসা শিখাইয়া দাও যেন স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গাদি করিয়া সর্ব্বভূতেই তোমায় সর্ব্বব্যাপিত্ব অনুভব করিয়া ভালবাসিতে পারি।

প্রভো! দাও দাও করিয়া তোমাকে অবিরত বিরক্ত করিতেছি তুমিও আমার বাসনা অপূর্ণ রাখিতেছনা কিন্তু কৈ আশারতো শেষ হইলনা, আকাঙ্ক্ষাতো ফুরাইলনা, বাসনাতো কিছু মাত্রও মিটিলনা, একটা পাই অমনিই অন্য পাঁচটা বাসনা আসিয়া মনকে চঞ্চল করিয়া দেয় আমি এখন উপায় কি করি। হে নিরুপায়ের উপায় শ্রীহরে! তুমি ভিন্ন তো আমার এই দারুণ দাও দাও পিপাসার শান্তি আর কেহ করিতে পারিবেনা।

প্রভো! আমি চাই বা না চাই তুমি আমাকে তোমার ভাবরূপ অমূল্য ধন দিয়া এমন করিয়া ভুলাইয়া রাখ যে, আমি যেন আর কিছু চাহিতে না পারি বা চাহিবার শক্তিও না থাকে। কর্ম্ম ক্ষয় করিব বলিয়া ভবে পাঠাইলে কিন্তু আমি বিবেকের আশ্রয় না লইয়া অজ্ঞান দ্বারা চালিত হইয়া নিরন্তর এমন কর্ম্মই করি-তেছি যে, কর্ম্ম ক্ষয় হওয়া দূরে থাকুক দিন দিন শতগুণে কর্ম্ম বাড়িয়াই যাই-তেছে। কর্ম্ম ক্ষয় হইবে ভাবিয়া সংসার পাতিলাম কিন্তু পার্থিব সুখে মত্ত হইয়া দিশাহারা প্রাণে নানা প্রকার অকার্য্য কুকার্য্য করিতে লাগিলাম মিথ্যা প্রবঞ্চনা জাল জুয়াচুরী শঠতা কিছুরই বাকী রাখিলাম না ক্রমে সমস্তই আমার আয়ত্বা-ধীন হইয়া গেল মোহমদে মত্ত হইয়া মনে করিলাম বেশ আছি, আমার মতন সুখী আর কেহ নাই, অহঙ্কারে ধরাকে সরার মত দেখিতে লাগিলাম, মনে করিলাম বুঝি চিরদিন এই ভাবেই যাইবে। কিন্তু কৈ দু'দিন না যাইতে

যাইতেই তো অশান্তির এক শেষ হইল ; যে অহঙ্কারে মত্ত হইয়া ধরাকে সরার মত দেখিতেছিলাম তাহা কোথায় গেল। প্রভো! তোমার এই সকল লীলা খেলা তুমি না বুঝাইলে তো অনন্তকাল ধরিয়া জ্ঞান বিচারাদি করিয়াও বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারিব না, প্রভো! আর না, আর ভুলাইয়া রাখিও না এইবার তুমি কৃপা করিয়া আমাকে সর্ব্বজনীন ভালবাসা শিখাইয়া দাও আমি তোমার ভালবাসায় আপনাকে ভুলিয়া যাইয়া বিশ্বব্যাপী তোমার দীব্য মুর্ত্তি দর্শন করিয়া ধন্য হইয়া যাই।

"ভালবাসায় মাতায়ে দাও ওহে হরি প্রেমময়।
আমি তোমার ভালবাসায় মগন হইয়া শীতল করিব হিয়ায়
কত মত ভাবের খেলা খেল্‌ছ আমার সনে,
তুমি থাকিয়ে আড়ালে, ডাক আয় আয় বলে,
আসিয়ে দেখা নাদাও আমায়॥
এ জীবনে পাবনাকি সদা দরশন,
তোমায় দেখিতে দেখিতে, লুকাও চকিতে,
ভাবিতে ভাবিতে দুঃখ হয়॥
(আর) আসিব না খেলিব না যদি না পাই দেখা,
ওহে প্রাণ সখা দিয়ে দেখা,
সুখে রাখ আমায় এই ধরায়॥
মনের কথা বল্‌ব তোমায় আছি আশা করি,
তোমায় নাদেখে নয়নে, ত্রিতাপ দহনে,
নিশি দিন দহে এ হৃদয়॥"

দীন—শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

প্রার্থনা।

—:০:—

(১)

যাঁর প্রেম মনো মাঝে
গাঁথে চারু ফুলহার,
যাঁর ছায়া ল'য়ে চাঁদ
জগতের শোভাসার,
যাঁর আঁখি কোণ হ'তে
লইয়া কণিকা হাসি
জগতের প্রাণ, রবি
আকাশে চলেছে ভাসি'
তাঁহার চরণ যুগে
আমার প্রণাম রাখি'
চলিব তাঁহার পথে
প্রেমেতে পরাণ ঢাকি'।

(২)

যাঁহার করুণা কণা
জগতে ঢালিছে আলো
যাঁহার পরশে মরে
সকল কালিমা কালো,
তটিনী যাঁহার লাগি'
বহ' যায় নিশি দিন,
বায়ু কেঁদে কেঁদে ফিরে
আকুল, মিলন হীন,

তাঁহার চরণ খানি
ভাবিব ভরিয়া প্রাণ
পলকে মিশিয়া যাব
যেদিন থামিবে গান।

(৩)

ফুলের হাসির মাঝে
যাঁহার মহিমাখানি
শিখাইছে মানবের
'কোটা ঝরা' মহাবলী,
আকাশের নীলিমায়
যাঁর রূপ কণা ভার,
গানের ধুয়ার মাঝে
যাঁর সুর উছলায়,
তাঁর প্রেম নিশিদিন
মরমে রাখিব গাঁথি'
জীবনে মরণে তারে
করিব প্রাণের সাথী

(৪)

থেমেছে যাঁহার পায়ে
জগতের সব ঢেউ,
যাঁহার লীলার রস
বুঝিতে না পারে কেউ
প্রেমের পরম প্রাপ্তি
চরণ নখরে যাঁর,
যাঁহার খেলায় খোঁজে
আসি যাই বার বার,

তাঁহার রাতুল পদে
আমার প্রণাম রাখি,
কামহীন প্রাণে তাঁরে
মরম ভরিয়া ডাকি।

শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়।

নববর্ষের নিবেদন।

—:০:—

বাবা শচীনন্দন! গত ৩১শে চৈত্র পর্য্যন্ত, আমার গণা দিনের আর একটী বৎসর শেষ হইয়া গেল। সাংসারিক অনিত্য সুখ দুঃখের ক্রীড়া প্রাঙ্গণের ভিতর দিয়া গড়াইতে, গড়াইতে স্বপ্নের খেলা খেলিতে খেলিতে, সম্প্রতি ১লা বৈশাখ হইতে নববর্ষে পদার্পণ করিয়াছি।

এইরূপে যাইতে যাইতে, এক দুই করিয়া আমার ৫৩টী বৎসর অনন্তকাল সাগরের অতীতরূপ অতলস্পর্শ বিশালাবর্ত্তে চক্ষের নিমিষে তলাইয়া গিয়াছে।

প্রভু গো! আমরা মর-জগতের মায়ামুগ্ধ জীব, সুখ দুঃখের লীলা খেলায় উন্মত্ত, জঞ্জাল জড়িত কুটিল সংসারের কুচিন্তা কোলাহলে অভিভূত। আপন কর্ত্তব্য ভুলিয়া, ক্ষিপ্তের ন্যায় আশা কুহকিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছি। কোথায় যে যাইব, তাহার একটা নিশ্চিত ঠিকানা নাই। কেবল যাইতেছি।

পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হইয়াও আর ফিরিতেছিনা, বা আপন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সমর্থ হইতেছিনা। সারাটা জীবন কেবল আশার পাছেই দৌড়িয়া মরিলাম। হরিনাম কি পরিণাম চিন্তার সময় পাইলাম না। উঃ! কি মর্ম্ম বিদারক পরিতাপ!!

কুসঙ্গে কুকর্ম্মে দুঃখ দুর্ভোগের মধ্য দিয়া অনেক দূরে আসিয়াছি। অনেক গুলি বৎসর বৃথা অতিবাহিত করিয়া, এখন আবার নববর্ষে প্রবেশ করিয়াছি। জানিনা, এ বৎসরটী আমার জন্য কোন্ অবস্থা ব্যবস্থা লইয়া আসিয়াছেন।

গত সারাটা বৎসর দাবানল দগ্ধ হরিণের মত একটুকু জলের জন্যে কত হাহাকার করিয়া ঘুরিলাম, ফিরিলাম, না পাইলাম এক বিন্দু। তবে সামান্য জলতো কতই ছিল, তা, তো নয়;—

সংসারানল দগ্ধ মুগ্ধ জীবের শান্তির জন্যে একটুকু প্রেমজল চাই, তোমার পাদপদ্মানুরক্ত ভক্ত জনের একটুকু কু-বুদ্ধি নাশক কৃপা জল চাই। নতুবা জুড়ায় না, পিপাসার পরিতৃপ্তি জন্মেনা। জীবনটা ভরা কত অনুসন্ধানে, কত চেষ্টাতেও একবিন্দু প্রেম জল মিলিলনা!!

প্রভো! তুমি না তোমার ভক্ত বৃন্দ সহ এই মর জগত প্রেম-প্লাবিত করিয়া রাখিয়াছিলে? কৈ? বাবা! তবে যে আমি কিছুই পাইতেছিনা? না, প্রেম গঙ্গা আমার মত পাতকীর জন্য নহে? তবে কা'র জন্যে? যদি পাপী, তাপী, অন্ধ, আতুর, নীচ, মুর্খ, নিন্দুক, পাষণ্ড তোমার ভুবন পাবন চরণামৃতে বঞ্চিত হইবে, তবে কোন গুণে তুমি পতিত পাবন? কাঙ্গালের ঠাকুর?

তুমি না বাবা! পতিত পাষণ্ডের পরিত্রাণের জন্যই অবতীর্ণ হইয়া প্রেম মন্দাকিনীর পবিত্র স্রোতে জগত পুরিয়া রাখিয়াছ? তবে আমি পাইব না কেন? আর কতকাল ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরিব বাবা!!

সংসারাগুনে পোড়া, তৃষ্ণার্ত্ত তপ্ত হৃদয়ের পরিতৃপ্তির জন্য তোমার মোহ নাশক প্রেমামৃত ভিন্ন আর কি আছে? কিন্তু, পাইলামনা। ভাবিলাম, প্রভুতো আপন ভুবনমঙ্গল শ্রীহরি নামের সঙ্গে প্রেম সুরধুনীর পবিত্র ধারা মিসাইয়া রাখিয়াছেন, তবে আর চিন্তা কি? নাম লইনা কেন? নাম সংকীর্ত্তনে যাইনা কেন? তবেই তো সকল জ্বালা জুড়াইবে, সকল দুঃখ দূর হইবে, বহু জন্মের দারুণ তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি হইবে।

কিন্তু প্রভুগো! আমি এমনই দুর্ভাগা যে আমার ভাগ্যে তো আর তাহা ঘটিয়া উঠিতেছে না। ঘটে কিসে? সংসারটা এক পাগ্‌লা রাক্ষসীর ন্যায় বিকট মুখ ব্যাদান করিয়া আমার পাছে সর্ব্বদাই "খাই খাই" করিতেছে। এখন উপায় কি?

বাবাগো! আমার বড় দুর্দ্দিন উপস্থিত। এই রাক্ষসীকে নিবৃত্তি করিতে না পারিলে, আর রক্ষা নাই। শান্তির আশা নাই।

আমি বুকের রক্ত দিয়াও এই দারুণ সংসার রাক্ষসীর ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারিতেছিনা। উহার পেট ভরাইতে না পারিলেই খাইতে আইসে। আমি যে বাবা! ভয়েই অস্থির! তোমার নাম কীর্ত্তন করিবার আমার সময় কৈ?

শুনিয়াছি, তোমার লীলা গ্রন্থ পাঠে, তোমার ভক্ত সঙ্গে তোমার নাম গুণ কীর্ত্তনে প্রাণানন্দী প্রেম পীযুষ পাওয়া গিয়া থাকে, তোমার লীলা গ্রন্থ এবং তোমার ভক্তবৃন্দ প্রেমামৃতের পূর্ণ পাত্র।

আমার এমনি পোড়া কপাল যে শ্রীগ্রন্থের সঙ্গেও দেখা নাই, ভক্তের সঙ্গেও দেখা নাই। এই তো আমার অবস্থা, এখন তুমি অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিয়া দেও। আর বেশী দিন বাকী নাই।

প্রভুগো! যে দিন গত হইয়া গিয়াছে, তাহা তো আর ফিরিয়া পাইবনা, তবে এখন এই নূতন বৎসর হইতে আমাকে তোমার ভজন রাজ্যে প্রবিষ্ট করিতে চেষ্টা কর। তোমার ভক্তগণের চরণ সেবায় ভর্ত্তি করিয়া দেও।

এই মোহময় কুটিল সংসার হইতে আমাকে কাড়িয়া লও। রিপুর দেশ হইতে উদ্ধার করিয়া তোমার চরণাসক্ত ভক্তজনের ভক্তির দেশে লইয়া চল। বাবা গো! আমি মহা পাতকী হইলেও তো তোমারি।

বাবা! আমি তোমার হইয়া তোমার চরণ ছায়ায় বঞ্চিত হইয়া আর কা'র কাছে দাঁড়াইব? কৃপার ভিখারী হইয়া কা'র দিকে তাকাইব? বাবা গো!

এই নূতন বৎসর হইতে যেন আমি তোমার এবং তোমার ভক্তগণের চরণ সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারি।

বাবা! কত কথাই বলিব বলিয়া মনেছিল, কিন্তু কিছুই বলা হইল না তুমি অন্তর্য্যামী অন্তরের দেবতা, আমার মনের খবর বুঝিয়া লও। আমার সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেও।

বাবা গো! তোমার ভক্তগণের কৃপানুগ্রহ পাইয়া যেন, বাকী ক'টা দিন হরিবোল, হরিবোল বলিয়া কাটাইতে পারি।

হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!!

বৈষ্ণব দাসানুদাস,—

শ্রীবিজয় নারায়ণ আচার্য্য।

নবকুমার।

—:০:—

দিব্য অঙ্গ, সৌম্য কান্তি, ভঙ্গিমা মধুর,
নশ্বর মূরতি নয় চিদানন্দ ময়
আধ আধ মা' মা' বোল শ্রবণ মধুর,
প্রফুল্ল প্রসূন সম আস্য হাস্যময়,
পঙ্কজ মৃণাল সম বাহু সুকোমল,
জগজন মনোলোভা সুন্দর নয়ন,
পবিত্রতা, সরলতা অর্পি' গুণদল,
কে তোমারে কহ শিশু সৃজিল এমন?
সংসার সন্তপ্ত হৃদে মানব যখন,
একবিন্দু শান্তিবারি পান করিবারে,
বিশাল ধরণীতল করি' অন্বেষণ,
হতাশ হইয়ে ফিরে ব্যথিত অন্তরে।
তোমারে ধরিয়া বুকে চুমিলে বদন।
শান্তি নীরে রহে সে যে মগ্ন অনুক্ষণ॥

শ্রীচুণীলাল চন্দ্র।

শ্রীবৃন্দাবন ভ্রমণ।

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অপরাহ্নে ৪ টার সময় ললিত দাদা কীর্ত্তন ধরিলেন ;—

কবেহব আমি বৃন্দাবন বাসী।
নিরখিব নয়নে যুগল রূপরাশী॥

সময়োচিত গানটী বড় চিত্তাকর্ষক হইল খুব ভাল লাগিল, আমিও ঐ সময় করতাল বাহির করিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিলাম। বৃহস্পতিবার

রাত্রি যখন ৩টা তখন গাড়ী একটী বড় ষ্টেশনে পৌছিল, অনঙ্গ দাদা সেটী কোন ষ্টেশন জিজ্ঞাসা করায় একজন খালাসী বলিল "মেরু" ষ্টেশন, আমরা অবাক্, এনাম তো Time Table মধ্যে দেখি নাই; তখন অনঙ্গ দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন "হাত্রস কেত্না দূর" খালাসী এক গঙ্গা হাসিয়া ফেলিল যেন কি একটা নূতন মজা হইয়াছে, সে বলিল "আরে ভাই সোত এহি হায় মেরু হাত্রস একি হায়" তখন তাড়াতাড়ি লাগিল পোঁট্লা পুঁট্লি লইয়া নামিলাম। কুলি মিলিল সে মোহাফের খানায় নিয়ে গেল। উপরে একটা আবরণ আছে আর চারিদিকে ফাঁক বেশ তিন ঘণ্টা হিম ভোগ করা গেল আর ব্রজবাসী পাণ্ডার সহিত সতীশ দাদার প্রেম কলহ শুন্তে লাগিলাম। এখান হইতেই পাণ্ডা মহারাজেরা সঙ্গ লয়েন চারিদিক হইতে প্রভুরা আসিয়া কত রকম মিষ্ট কথা আরম্ভ করিলেন "আরে বাবু সাহেব ত আচ্ছা হায়, শ্রীবৃন্দাবন ত যায়েগা, উয়াকি আপ্‌কী কোন ব্রজবাসী হায়? নেহি হ্যায় ত হামকো ব্রজবাসী করলেও, মেরা নাম ছন্নুলাল মন্নুলাল সাড়েচার ভাই" আর একজন বগলবন্দি আঁটিয়া, লম্বা লাঠি লইয়া উপস্থিত, "আরে বাবু হামি মথুরার চৌবে আছে সব দর্শন পর্শন করাবে, আপকা যো মর্জি কিছু দে দিও, হামার নাম মুরারী সাড়ে সাত ভাই"। এখন ত কথা খুব মিঠে, তবে শুনিতে পাইলাম শেষে শ্রীচরণ পূজার সময় ইহাঁরা নাকি অন্যমূর্ত্তি ধরেন। মথুরার চৌবেদেরই বেশী অত্যাচার শুনা যায়। "সফলের" সময় দশ বিশের কম মন উঠে না, তা ছাড়া নানা রকমে শোষণ আছে অর্থাৎ যাত্রির হাতে গাঁঠে কিছু থাকিতে প্রভুরা ছাড়েন না। তবে বৃন্দাবনের ব্রজবাসির অত্যাচার তত নহে। আহা এক হিসাবে ইহাঁরা বিদেশী যাত্রিদের পরম বন্ধুর কাজ করেন, সঙ্গে সঙ্গে লইয়া অভিষ্ট বস্তু দেখাইয়া দেন, নিজের গৃহে বাসা দেন সব রকম বস্তু মিলাইয়া দেন, তাহাদের কোন অভাবেই পড়িতে হয় না, অনুক্ষণ দীর্ঘল বাঁসের লাঠি লইয়া প্রহরীর ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে ফেরেন, কিন্তু হায়! সময় ক্রমে লোভের মাত্রা বৃদ্ধি হওয়ায় অনেক সাধু রক্ষক না হইয়া ভক্ষক হইয়া পড়িতেছেন, তবু ব্রজবাসী বলিয়া ইহাঁদিগকে যাত্রীরা সহজ ভক্তির চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। "আমি ত সাড়ে চার ভাই, সাড়ে সাত ভাই ইহার অর্থ কিছুই বুঝিলাম না। পরে বুঝিলাম ব্রজের যুগল রসমাধুরীর ইহাই একটী অভিব্যক্তি। ব্রজে "রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুহু দেহ

ধরি। অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি" অর্থাৎ রাধা কৃষ্ণ, শক্তি শক্তিমান মূলতঃ একবস্তু কিন্তু প্রকট লীলার জন্য দ্বিমূর্ত্তিতে প্রকাশ অথচ রাধা ছাড়া কৃষ্ণ নহেন। কৃষ্ণ ছাড়া রাধা নহেন অচিন্ত্যভাবে ভেদহইয়াও অভেদ তাই যুগল একত্রিত না হইলে ভক্তগণের বাঞ্ছা পূর্ণ হয় না, যুগলিত রাধাকৃষ্ণকেই তাঁহারা অভীষ্ট বস্তু বলিয়া ভজন করেন। ব্রজবাসীদেরও তাই। তাহারা যতদিন যুগলিত না হইতেছে ততদিন আধখানা। কিশোরী সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণ না হইলে শ্রীদাস গোস্বামী প্রণাম পর্য্যন্ত করিতেন না, সেই মধুর ভাবটী ইহাঁদের লৌকিক ব্যবহারে ও বেশ ফুটিয়া রহিয়াছে। অবিবাহিত ভাই অর্দ্ধখানা, তাই সাড়ে ভাই। পাণ্ডা মহারাজেরা আমাদের নিকট বড় সুবিধা করিতে পারিলেন না সতীশ দাদার উকিলের মুখ, (হাইকোর্টের উকিল) তাঁহার বচন মহিমায় সকলে পরাস্ত তায় আবার ললিত দাদা কি এক রংছোড় বলিয়া বসিলেন, আর সবাই আস্তে আস্তে সরিয়া, অন্য শিকারের আশায় ফিরিতে লাগিলেন।

পশ্চিমাঞ্চলে এখন ও হ্যাট কোটের খুব আদর ধুতি পরিহিত লাটসাহেবকেও উহারা ধাক্কা মারিয়া যায় কিন্তু কনষ্টেবল দেখিলেই অস্থির। ষ্টেশনের বাবুরা যেন দিল্লীশ্বর কথাই কহেননা, ইংরাজী বলিলে তবে চমকিয়া উঠিয়া জবাব দেন। বেশ হিমে বসিয়া আছি, আর ভাবিতেছি আমার কি ভাগ্য! মথুরা বৃন্দাবন দর্শন হচ্ছে কি ভাগ্য। এই সময়ে কে বলিয়া উঠিল "মথুরার গাড়ী এসেছে"। ঘণ্টাও একটা বাজিতে শুনা গেল, কাজেই সকলে ছুটিলেন কুলি ধনসিং কিন্তু নিষেধ করে। তখন বৃন্দাবন সত্বর যাইবার ঝোঁক কুলির কথা কে শুনতে চায়, গেটের কাছে আসিয়া দেখি গেট বন্ধ। বেশ নিমতলায় পড়িয়া "জয় রাধে" কীর্ত্তন করিতে লাগিলাম। আন্দাজ আধ ঘণ্টা পরে গাড়ীর ঘর ঘর শব্দ হইল। প্রফুল্লিত হইয়া ভিড় ঠেলিয়া মথুরার গাড়িতে যাইয়া উঠিলাম আধ ঘণ্টা মধ্যে মথুরা জংসনে আসিলাম।

অহো এইকি সেই "পুরী মধুপুরী বরা"? এই কি সেই মথুরা ভুবন? এই খানেই কি আমার প্রভু কংসারিলাল হয়ে ছিলেন, "কংসাসুর মারি মুই সে কংসারি" বলে অভিমান করেছিলেন। এই রজেই কি চাণূর মর্দ্দণের সহিত প্রভু কন্দু ক্রীড়া করিয়াছিলেন? এই খানেই অনাদি বিগ্রহ আদিদেব কেশব বিরাজিত। অই কি সেই বিশ্রাম ঘাট, ঐখানেই কি কংসবধান্তে বিশ্রাম করিয়া-

ছিলেন; আমি গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া বিহ্বলের স্থায় মথুরা ভুবনের শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলাম এবার বিবিধ ভাব তরঙ্গ উপর্য্যুপরি আসিয়া আমাকে তোলপাড় করিয়া তুলিতে লাগিল, এই খানেই বুঝি বৃন্দাদুতি কান্ত বিয়োগ বিধুরা রাধা রাণীকে "ধনি ধৈর্য্যং, কুরু ধৈর্য্যং মমগচ্ছং মথুরায়ে, ঢুরব পুরি প্রতি প্রতক্ষে, যাঁহা দরশন পাওয়ে" এই আশ্বাসবানী শুনাইয়া ত্বরিত পদে আসিয়া দাসখতের আসামীকে খুজিতেছিলেন। আর জনৈকা মথুরা নাগরীর দেখা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন ;—বলি তোমরা কি বলিতে পার "নন্দাত্মজ কৃষ্ণখ্যাত কাহার ভবনে আছে? মথুরা নাগরী নন্দাত্মজের কথা কাণেই লইল না, নন্দাত্মজ কৃষ্ণ বিষ্ণু কাউকেও চিনিনা তবে মোরা জানি "বসুদেব কি সুত রামানুজ মাধব" বলে একজন আছেন। তাঁর অই সে "উচ্চ বাসা"। তখন দুতি সেই উচ্চ সৌধ সমীপে যাইয়া "রাই রাই করি, ফুকারত সহচরি মিলল শ্যামরায়" কি অপূর্ব্ব কৌশলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। আহা দুতীর মত মন প্রাণ দিয়া রাই রাই বলিয়া ডাকিতে পারিলে বুঝি এখন ও অই সব উচ্চ সৌধ মধ্য হইতে শ্যামসুন্দরের দর্শন মিলে। এই সময় গাড়ীর মধ্য হইতে অনেকেই" জয় রাধে জয় রাধে ধ্বনি করিয়া উঠিলেন আমি ও কলের পুতুলের মত সেই সঙ্গে যোগ দিলাম দেখিলাম সম্মুখেই নীল তরঙ্গিণী যমুনা মৃদু মৃদু চলিয়াছে, "তুমি কি সেই যমুনে প্রবাহিণী যাহার বিমল তট বংশীবটে বিকাত নীলকান্ত মণি" প্রেম তরঙ্গিণী কালিন্দী দর্শনে কত ভাবের উদয় হইল। এই খানেই জলকেলী, ইহার পুলিনে কত মধুর লীলা, এই খানেই রাসস্থলী, এই খানেই যমুনার ঘাটে প্রথম সন্দর্শন। "পহি-লহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল" এই খানেই বসন চুরি, আহা কি মধুর! কি সুন্দর! আমরা কি সৌভাগ্যবান কিন্তু এই মধুর শান্ত ভাবের মধ্যে হঠাৎ একটা মর্ম্মা-ন্তিক বেদনায় চিত্তকে ব্যথিত করিল। আদিদেব কেশবজীর মন্দিরে দৃষ্টি পড়িল তখন ললিত দাদা বলিলেন "দেবদ্বেষী পিশাচের পৈশাচিক কীর্ত্তির ধ্বজা উড়িতেছে, দেখো" কেশবজীর অভ্রভেদী চুড়া ভঙ্গ করিয়া দুষ্ট আরঙ্গ দেব তদুপরি গুম্বোজ করাইয়া মন্দির মসজিদে পরিণত করিয়াছিল, তাই এখন কেশব জীউ ঐ যবনস্পৃষ্ট মন্দির ছাড়িয়া তৎপার্শস্থিত শ্বেত মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। মদোন্মত্ত নারকীর পাপ কলুষিত হস্ত হইতে দেবতারাও

রক্ষা পান নাই। গাড়ী মথুরা সিটি আসিল এইখানে দুর্বৃত্ত কংসাসুর দেবকী গর্ভজাত শিশুগণকে ও ব্রজমণ্ডলের অপোগণ্ড শিশুগুলিকে আছড়াইয়া মারিয়া নিজের পাপ ভার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাই আজও ইহার নাম মশান। বৃন্দাবন লাইনের ছোট রেল মার্টিনের রেলের মত হেলিতে দুলিতে চলিতে লাগিল। অল্পদুর যাইতেই যাত্রীরা অনেকেই "জয় রাধারাণী কি জয়" ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। বহু কামিনী কণ্ঠ হইতে হুলুর ঝঙ্কার উঠিল, বুঝিলাম বৃন্দাবনের সীমায় রেল পৌঁছিয়াছে বৃন্দাবন দর্শনে অপূর্ব্ব আনন্দস্রোত তাড়িত প্রবাহের ন্যায় বহিতে লাগিল, আমরা রাধারাণীর জয় গান করিতে লাগিলাম, আর মহাকৌতুহলদীপ্ত চক্ষে বনমাধুরী দর্শন করিতে লাগিলাম। বৃক্ষ লতা গুল্ম যেন মাধুর্য্য ভরা, রাখাল বালকেরা ছোট ছোট লড়ি হস্তে গোপালের পশ্চাতে নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে, তখন সেই গোষ্ঠের কথা জাগিয়া উঠিল—

শুনিয়া শ্যামের বেনু, মন্দ মন্দ চলে ধেনু, পুচ্ছ ফেলিপীঠের উপর।
নাচিতে নাচিতে যায়, নুপুরে পঞ্চম গায়, পাঁচনী ফিরায় শিশুগণে॥

আমরা কোন্ অপার্থিব রাজ্যে আসিলাম অপ্রাকৃত চিন্তামণি প্রেমরাজ্যে গোলক বৃন্দাবন কি মাদৃশ অধমের নয়ন গোচর হইবে! তখন মনে হইল প্রকৃত চিন্তামণি স্পর্শমাত্রেই লৌহ কাঞ্চনে পরিণত হয় তখন মহাভাব চিন্তামণির করুণা কটাক্ষে অসম্ভব সম্ভাবিত হইবে তাহা আর বিচিত্র কি? শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর কৃপায় আর কিছুই অসম্ভব নাই তখন বৃন্দাবনের সম্পদের বর্ণনা মনে পড়িল—

বৃন্দাবনে সাহজিক যে সম্পদ সিন্ধু।
দ্বারকা বৈকুণ্ঠের সম্পদ তার একবিন্দু॥
পরম পুরোষোত্তম স্বয়ং ভগবান।
কৃষ্ণ যাঁহা ধনী তাঁহা বৃন্দাবন ধাম॥
চিন্তামণিময় ভূমি রত্নের ভবন।
চিন্তামণি গণ দাসী চরণ ভূষণ॥
কল্পবৃক্ষলতা যাঁহা সাহজিক বন।
পুষ্পফল বিনা কেহো না মাগে অন্যধন॥
অনন্ত কামধেনু যাহা চরে বনে বনে।
দুগ্ধ মাত্র দেন কেহো না মাগে অন্যধনে॥

সহজ লোকের কথা যাঁহা দিব্য গীত।
সহজ গমন করে নৃত্য পরতীত॥

সর্বত্র জল যাহা অমৃত সমান।
চিদানন্দ জ্যোতিঃ স্বাদ্য যাঁহা মূর্ত্তিমান॥

লক্ষ্মী জিনি গুণ যাঁহা লক্ষ্মীর সমাজে।
কৃষ্ণবংশী করে যাহা প্রিয়সখী কাজে॥

মন দ্বাপরযুগে চলিয়া গিয়াছে হঠাৎ পোঁ করিয়া বাঁশী বাজিল, চমকিয়া উঠিলাম দেখি ষ্টেশন নিকটবর্ত্তী। তখন জয় রাধারানীর জয়" বলিয়া সকলে মহানন্দে শ্রীধামে অবতরণ করিলাম। সম্মুখেই প্রভুপাদের গাড়ী লইয়া প্রহ্লাদ দাদা উপস্থিত। দ্রব্যজাত তাহাতে উঠাইয়া তিন জনেই গাড়িতে উঠিলাম। তেজস্বী অশ্ব খুব ছুটিল পথে গোষ্ঠের গাভীর পাল বাধিল তখন গাড়ির গমন মৃদু হইল। ধবলী শ্যামলীরা মন্থর পাদ বিক্ষেপে লম্বা কাণ দোলাইয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে চলিয়াছেন একটী গরুও কৃশ বা খর্ব্বাকারের নহে। কোচমান বিপদে ঠেকিয়াছে বলিতেছে "গাইন থোড়া সরিয়া যাও" বেলা তখন আন্দাজ ৮টা হইয়াছে।

আমরা প্রথমেই প্রভুপাদের মন্দিরে চলিলাম কতযে অপূর্ব্বভাব লহরী লইয়া আমরা প্রভুমন্দিরে প্রবেশ করিতেছি, আমি সকলের পশ্চাতে আমি এক প্রকার প্রভুর অপরিচিত; চারি বৎসর পূর্ব্বে এক শুভদিনে ১০ মিনিটের জন্য দর্শন পাইয়াছিলাম মাত্র। অতি সুন্দর আনন্দ মূর্ত্তি প্রভুপাদ সন্ধ্যাহ্নিকে কেবল বসিতেছিলেন আর সন্ধ্যা করা হইলনা তখন তাঁহার সাহজিক আনন্দ প্রবাহ একেবারে উছলিয়া পড়িতেছে আমরা প্রণিপাত হইতে না হইতে তিনি প্রেম-ভরে আলিঙ্গন করিলেন আমি দীনভাবে জানাইলাম আমার ন্যায় শুষ্ক শিমুল বৃক্ষের উপর এককৃপা কি জন্য? আমায় কি জন্য কেশে ধরিয়া আনিলেন? এমন কি আমার সৌভাগ্য ছিল? প্রভু আনন্দে বলিলেন "আমি আনি নাই সেই রাধারানীই এনেছেন" তখন পাষাণ হৃদয় ক্ষণিকের জন্য বুঝি বিগলিত হইয়াছিল। দাদা প্রভু শ্রীগৌর বিনোদ গোস্বামী আসিলেন, প্রেমালিঙ্গন করিলেন, প্রভুপাদ যেন অষ্ট মুখে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন "চমৎকার চমৎকার

তিন জনেই এসেছেন বড় ভাল হইয়াছে তখন সকলেরই শিরস্পর্শ করিয়া বহু আশীষ করিতে লাগিলেন। বাসাঘরের কথা উঠিতেই আমরা মহারাজার কুঞ্জে থাকাই ঠিক করিলাম তবে প্রভুপাদ বলিলেন আজ এখানে প্রসাদ পাইতে হইবেই হইবে। তখন সেই গাড়িতেই আমরা যমুনা পুলিনস্থিত ভোমরালিকুঞ্জে আসিলাম। তথাকার কর্ম্মচারিরা আসিলেন, তাঁহারা শ্রীকুঞ্জের উপরের ঘরে আমাদের থাকার সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। স্নানান্তে আহ্নিকাদি সমাপণ করিয়া আমরা আবার প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শনে চলিলাম। যাইতেই পথিমধ্যে দেখি অতি সুন্দর নগরকীর্ত্তন হইতেছে খুব কীর্ত্তনের ধুম তাহা ছাড়িয়া যাইতে পারিলাম না সেখানে কিছুক্ষণ বসিলাম দেখিলাম আমাদের "পণ্ডিত বাবাজীই" কীর্ত্তন করিতেছেন. তিনি ললিত দাদাকে সম্ভাষণ করিলেন আমাদিগকেও প্রীতি সম্ভাষণ করিলেন।

ক্রমশঃ —

বৈষ্ণব চরণ রেণু প্রার্থী,

শ্রীবামাচরণ বসু।

পাগল মানুষের কথা।

—:০:—

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

প্রঃ। অধ্যাত্ম তত্ত্ব সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবেন কি ?

উঃ। যোগ তিন প্রকার কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। একই ভগবান প্রকাশ বিশেষে তিনরূপ ধারণ করেন, কর্ম্ম যোগের গতি ব্রহ্মা, জ্ঞান যোগের গতি পরমাত্মা, ভক্তি যোগ দ্বারা ভক্ত পূর্ণরূপ অনুভব করেন।

"কৃষ্ণ ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার।"

ব্রহ্ম জ্ঞানাদিসব তার পরিবার॥"

এই স্থান পর্য্যন্ত চিত্তের গতি হইলে শান্তি পাইবেন এবং শান্তিপুর নাথ অদ্বৈত আচার্য্যকে লাভ করিবেন ও জীবন মুক্ত হইয়া নবজীবন প্রাপ্ত হইবেন এবং যুগল মিলন দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হইবেন, তখন আপনি আপনার-স্বরূপ তুরীয় ব্রহ্ম জানিবেন, অচিন্ত্য ভেদাভেদ বুঝিতে পারিবেন এবং তাঁহার স্বরূপ শক্তি আহ্লাদিনী শক্তি পরমাত্মা হইয়া নিত্য নির্ব্বিকার শৃঙ্গার রস-রাজকে দেখিবেন। তিনি সর্ব্বক্ষণ বংশীরবে আপনাকে ডাকিতেছেন, আপনি তাহাতে কর্ণপাত না করায়ইয়ে এই যন্ত্রনা ভোগ করিতেছেন, তজ্জন্য ঘোর অনুতাপ আসিবে, তখন নির্ম্মল আত্মায় সর্ব্বত্রই কৃষ্ণময়দর্শন করিবেন কৃষ্ণ ভিন্ন এই জগৎ শূন্য জ্ঞান করিবেন, আপনার স্মৃতি ভ্রংশ হইয়াছিল আমি দূতী হইয়া উদ্দীপন করিয়া দিলাম, আপনি আমার কথামত শীঘ্র অভিসার করুন। আমি আপনার প্রাণ বল্লভবে মিলাইয়া দিব, নির্ভয় হৃদয়ে আমার সঙ্গে আসুন। "কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তি ত্রয় জ্ঞান" হইলেই সকল অন্ধকার পার হইবেন।

প্রঃ। "অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব বস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।"

এই "অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্বটী" বিশদরূপে বুঝাইয়া দিন ইহাই কি যোগীদিগের ধ্যেয় তুরীয় ব্রহ্ম? ইহাই কি রাধা কৃষ্ণতত্ত্ব (মিলিত রূপ)।

উঃ। "কৃষ্ণ ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার" এই পর্য্যন্ত জ্ঞানের গতি, ইহাই যোগীদের ধ্যেয় তুরীয় ব্রহ্ম। মুক্ত ও সিদ্ধদিগের এই পর্য্যন্ত গতি হয় ইহার পর আহ্লাদিনী শক্তির স্থান, নিকুঞ্জ কানন; সখী ভাবে আত্ম সমর্পণ করিলে অদ্বৈত প্রভুকরুণা করিয়া প্রেম সুধাদানে মিলাইয়া দিবেন. পুরুষার্থ হীন হইয়া স্ত্রীভাব না আসিলে যুগল মিলন দেখিবার উপায় কোথায়।

প্রঃ। মায়াতীত না হইলে রাধানাম গ্রহণের অধিকার হয় না, লিখিয়াছেন, তবে কি এমন রাধা নাম গ্রহণে ও মায়ার হাত এড়াইতে পারাযায় না? ইহাতে শ্রীরাধা নামের মাহাত্ম্য থাকিতেছে কই?

উঃ। যে পর্য্যন্ত, জীবের, বিষয় বাসনা পূর্ণ না হয়, সে পর্য্যন্ত লক্ষ্মীর উপাসনা করিবেন। যদি শ্রুতিরতি পায়, তাহা হইলে করুণাময়ী আহ্লাদিনী শক্তি স্মরণ করিবেন, তজ্জন্য ভগবান প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গের সৃষ্টি করিয়াছেন। নিবৃত্তি মার্গীয়গণ সাধু সঙ্গ করিয়া রাধানাম গ্রহণ করিবেন, এই

হেতু ভগবান বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতে প্রধানাগোপী বলিয়া রাধা নাম গোপন করিয়াছেন, শ্রীহরিভক্তি বিলাসে প্রভুপাদ সনাতন গোস্বামী, ধ্যান দেখাইয়া দেন নাই, সকলে শাস্ত্র আজ্ঞা হেলা করিয়া সিদ্ধের অনুকরণে নানাপ্রকার উপধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া রাধানামের মাহাত্ম্য আচ্ছন্ন করিয়াছেন, ভগবান সর্ব্বজীবের মঙ্গলের জন্য যাহা বিধান করিয়াছেন, তাহার অন্যথা করিবার কাহারও সাধ্য নাই, শাস্ত্র দেখুন। এই প্রকারই ভগবানের আজ্ঞা, আমি কি করিব।

প্রঃ। আপনার সহিত আলাপ পরিচয়ে বুঝিয়াছি, আপনি শুদ্ধা ভক্তির চেয়ে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির বেশী পক্ষপাতী। ইহা ঠিক কি না? মহাপ্রভু, শুদ্ধা ভক্তির স্থান, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির নিম্নে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব আমাদের লক্ষ্যটা শুদ্ধা ভক্তির দিকে থাকাই উচিত নহে কি? ভেদ বিচারে প্রয়োজন কি?

উঃ। আমি শুদ্ধা রাগানুগা ভক্তি ভিন্ন অন্য কিছু জানিনা। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির পথিকের সহিত পরিচয় করিবার প্রয়োজন বোধ করিনা।—

যোগী ন্যাসী কর্ম্ম জ্ঞানী　　অন্য দেব পূজক ধ্যানী
ইহলোকে দূরে পরিহরি।
ধর্ম্ম কর্ম্ম দুঃখ শোক,　　যেবা থাকে অন্য রোগ,
ছাড়ি ভজ গিরিবর ধারী॥

তাঁহাদের সহিত কথা হইলে এই উপদেশ দিব। মঙ্গল জন্য শুনিলে উত্তম নতুবা কোন বিরোধ নাই।

প্রঃ। "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছে, "গোপী নর যোগীশ্বর তোমার পদ কমল, ধ্যান করি' পাইবে সন্তোষ"। যখন তাহারা স্পর্শ করিয়াছে, তখন আর ধ্যান কেন ভাল লাগিবে? কথা গুলি কেমন? সকলেরই শিক্ষার বিষয় কি? চরিতামৃতের কোন্ স্থানে, একথা আছে?

উঃ। "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে" মধ্যলীলা ২১ পরিঃ আছে। বিবর্ত্ত বিলাস বাদীরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইহার কুব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং সিদ্ধ রতির অনুকরণ করিয়া উপধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে কলঙ্ক দিয়া এইরূপ করিয়াছেন।

"নির্ম্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্যদাগে, শুক্ল বস্ত্রে যৈছে মসী বিন্দু"। মহাপ্রভুর অন্তলীলার ভাব দেখিবেন। ইহার অর্থ—আত্মারামগণ ধ্যানে সন্তোষ

পান, যেমন শ্রীভগবান দাস ৪০০ শত বৎসর এই দেহ রাখিয়াছেন, প্রবাদ আছে, কিন্তু গোপী তাহাতে সন্তুষ্ট থাকেনা ; —

"বিরহ সমুদ্র জলে কাম-তিমিঙ্গিলে গেলে
গোপীগণে লয় তার পর।
দেহ স্মৃতি নাহি যার, সংসার-কূপ কাঁহা তার,
তাহা হ'তে না চাহি উদ্ধার ॥

জড় দেহ ঘুচাইয়া সেবা উপযুক্ত নিত্য দেহ প্রাপ্তির জন্য সমগ্র পরমায়ুটী ক্রন্দন করেন, যোগীরা আত্মানন্দে মৌনী থাকেন, নিজ কার্য্য সাধন করেন, কাহারও উপকার করেন না, ভক্তগণ নিজে কাঁদিয়া জগৎকে কাঁদাইয়া বিরহ জানাইয়া দেন, তজ্জন্য জপ কর্ত্তা অপেক্ষা উচ্চ সংকীর্ত্তন কারী শ্রেষ্ঠ, শ্রীচৈতন্য ভাগবতে হরিদাসের উক্তি।

প্রঃ। "রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার।" প্রাকৃত শৃঙ্গার জানা না থাকিলে কি অপ্রাকৃত শৃঙ্গার বুঝা যায়? যাঁহারা আকুমার ব্রহ্মচারী, তাঁহারা "রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার" বুঝিবেন কিরূপে?

উঃ। লৌহ আর হেম সদৃশ, কাম প্রেম দোঁহার বিভিন্ন লক্ষণ, আত্ম-ইন্দ্রিয় তৃপ্তি কাম, কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ত্তি প্রেম, প্রাকৃত শৃঙ্গার থাকিতে সে ভাব উদ্দীপন হয় না। অপ্রাকৃত শৃঙ্গার কেবল ভাবের দ্বারা হইবে, অনর্থ নিবৃত্তি হইলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়, প্রাকৃত শৃঙ্গারই অনর্থ; মহাপ্রভু আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন, জীবের মঙ্গল জন্য বিবাহ করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন মাত্র, ভট্ট রঘুনাথকে মহাপ্রভু বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, ছোট হরিদাসকে দণ্ডদিয়া যোষিৎ সঙ্গীর সঙ্গ ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং ওরূপ বলিলে, পতিত পাবন নামে কলঙ্ক দেওয়া হয়।

যাহাদের বিবাহ করিবার সাধ্য নাই, অথবা নিজ মনোমত প্রকৃতি নাই তাহাদের কি ভগবানের উপাসনা করিবার সাধ্য নাই? এই সকল কুতর্ক সৃষ্টি করিয়াই সহজিয়ারা, প্রকৃত পথকে ঘৃণিত করিয়াছে, তজ্জন্যই কোনও ভক্ত আমার কথা প্রকাশ করেন নাই। প্রকৃত ভক্তকে বুঝিতে পারেন নাই। গলিত কুষ্ঠ বাসুদেব, প্রভু হরিদাস প্রভৃতি বহু ভক্ত প্রকৃতি আশ্রয় করেন নাই

প্রকৃতি সঙ্গ ব্যতীত সাধন হইতে পারে না, এরূপ মত ধর্ম্ম জগতে ঘোর কলঙ্ক, সকলকেই কি শ্রীবৃন্দাবন যাইতে হইবে? যদি তাহাই যান, তাহা হইলে, শান্ত, দাস্য, সাখ্য, বাৎসল্য ভাবেও প্রেম করিতে পারেন। যাঁহারা স্ত্রী সঙ্গ ত্যাগ করিতে অক্ষম, তাঁহারা কি ভজিতে পারেননা? মহাপ্রভুর শিবানন্দ সেন প্রভৃতি বহু স্ত্রী সঙ্গী ভক্ত ছিলেন, তাঁহারা কি শ্রীবৃন্দাবন প্রাপ্ত হন নাই? অজামিল মৃত্যুকালে একবার নারায়ণ নাম উচ্চারণ মাত্রই মুক্ত হইয়াছেন, কেবল নাম সংকীর্ত্তন হইতে প্রেম হইবে। "জপিতে জপিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে। সাধ্য সাধনতত্ত্ব আপনি জানিবে॥" আগে শাস্ত্র আজ্ঞামত নাম গ্রহণ করুন, প্রেম উৎপন্ন হইলে, সমুদায় জানিবেন, নামের শক্তিকে অবহেলা করা কখনই উচিত নহে, সাবধান!

প্রঃ। (ডাক্তার বাবু জিজ্ঞাসা করিতেছেন—)"আপনার মতে আত্মহত্যা কথার অর্থ কি?

উঃ। "এমন মরণে কি কবি ডর।
সংসারে জনমি কে আছে অমর॥
মানুষ মরিয়া কুযোনিতে যায়, মরণ হয় তাই॥
মানুষে আসিয়া আপনা সারিয়া, মরিয়া মানুষ হয়।
পুরাণ ঘুচিয়া, নবীন হয় তো কে তারে মরণ কয়॥
মুনিগণ আগে গোবধ করিত, গোমেধ যাগের লাগি।
যে মরে সে হয়, কিবা অপচয়, তেঞী নহে বধ ভাগী॥
যমকে বাঁধিয়া, মানুষ মরিয়া, মানুষ হওরে ভাই।
কহে প্রেমানন্দ, হরি হরি বলতে তোর মরণ নাই॥

"মরিব, মরিব নিশ্চয় মরিব"। বিদ্যাপতির এই গানটী ও দশম দশার গান গুলি দেখিবেন।

প্রঃ। আপনার মতে জীবন্মুক্ত অবস্থাটা কিরূপ?

উঃ। সবে হইল অদর্শন, শূন্য হ'ল ত্রিভুবন,
অন্ধ হইল সবাকার আঁখি।
কাহারে কহিব দুঃখ, না দেখাই ছার মুখ,
আছি যেন মরা পশু পাখী॥

যে মোর মনের ব্যথা, কাহারে কহিব কথা,
এছার জীবনে নাহি আশ।
অন্ন জল খাই, মরিয়া নাহিক যাই,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস" ॥

প্রঃ। আপনি লিখিয়াছিলেন—"বুদ্ধদেব ও চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করিয়া আমরা অধঃপাতে গিয়াছি।—একটু এবিষয়ে খুলিয়া লিখিবেন। বুদ্ধদেবকে অনেকে নাস্তিক বলেন ইহা কি প্রকৃত?

উঃ। বুদ্ধদেব করুণাময় অবতার যজ্ঞে অবৈধ পশু বধ ও কর্ম্ম কাণ্ড নিবারণ করিয়া ভক্তির পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, শ্রীজয়দেব গোস্বামী প্রভৃতি মহাত্মাগণ তাঁহার স্তব করিয়া গিয়াছেন এবং আমাদের সমুদায় শাস্ত্রেই, দশ অবতার মধ্যে বুদ্ধদেবতার কথা স্পষ্ট আছে, ব্রাহ্মণগণ নিজ স্বার্থ নাশের জন্য নাস্তিক বলিয়া উড়াইয়া দিয়া নিজ মত বজায় রাখিয়াছেন; বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, সকলেই আস্তিক, কেবল বর্ত্তমান ভারতবাসীগণই নাস্তিক, ইহারা কেবল ঐশ্বর্য্য লাভ জন্যই উপাসনা করেন, ইহা এক প্রকার ব্যবসা অর্থাৎ আমি একসের চাউলের নৈবেদ্য দিলাম, তুমি ইহার প্রতিদান স্বরূপ বহুধন পুত্র দাও, ইহা ভগবানকে ব্যাঙ্গ করা মাত্র। পরকালের জন্য কয়জনে ঈশ্বর ভজনা করেন!

প্রঃ। প্রকৃতই কি আপনি কাঙ্গাল হইতে পারিয়াছেন? পৈতা ও মালা তিলকের উপর আপনার ন্যায় কাঙ্গালের এরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কেন? ইহা কি আমাদের মত লোকের পরচর্চ্চা নহে?

উঃ। "মত্তুল্যো নৈব পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেহপি লজ্জা মে কিংব্রুবে পুরুষোত্তম॥

আমি কিছুই হইতে পারি নাই, সর্ব্বক্ষণ মহাপ্রভুর নাম সংকীর্ত্তন করিবার বাসনা করিয়াছি মাত্র। ৩৩কোটী ভারতবাসী কিঞ্চিৎ ভিক্ষা ও শ্রীচরণ রজঃদানে আমার বাসনা পূর্ণ করুন। তজ্জন্য পত্র দ্বারা আপনাদের দ্বারে ভিখারী হইয়াছি। আমি যে হই, আপনারা নিজ শাস্ত্র দেখিয়া চলুন। সাধু হইতে না পারিলে তাহাকে কিছু ভিক্ষাদানও কি নিষিদ্ধ? আমি অসৎ সঙ্গরূপ কলের চিনি খাইয়া বহুদিবস জাতি মজাইয়াছি, অতিথি বিমুখ করিবেন না, আমি

কোন জাতিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করি না, কৃষ্ণ ভিন্ন অন্যপুরুষের মুখ দর্শন করি না, তজ্জন্য মরা জীব কৃষ্ণ সাজা দেখ্‌লে একটা ক্রোধ হয়। তাহাদের মঙ্গলের জন্য নিষেধ করি। শুনিলে আর যম দণ্ড ভোগ হয় না, এবং পৃথিবীর বহুদরিদ্র ও অবলার জীবন রক্ষা হয়। এ ক্রোধটাও, কেবল বাহ্য মাত্র, অন্তরে সকলেই এক, পত্র যাহা দিতেছি, ইহাবাহ্য পাষণ্ড দণ্ড। ইহাতে আমার কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

ক্রমশঃ

শ্রীরসিক লাল দে।

"ভগবানের বিশ্বরূপ"।

—:০:—

(১)

এসে ছিলে হরি! নররূপ ধরি'
গিয়াছ চলিয়া কবে।
কি দুর্ভাগ্য মম তখন জনম
না হইল এই ভবে॥

(২)

প্রাকৃতিক নয় তব আবির্ভাব, অপ্রাকৃত তনু তোমার স্ব-ভাব
মায়িক বুঝিতে হারে।
তাই তোমা ধনে, হেরি ত্রিভুবনে
বাঞ্ছা, রূপ রচিবারে॥

(৩)

অনন্তে উড়িতে শক্তি নাই চিতে
ধরিত্রী তোমাতে হেরি।
শ্যাম রূপ মম অতি অনুপম
আকৃষ্ট হইয়া মরি!

(৪)

মানস পুষ্পকে উঠি' উর্দ্ধ দিকে
নেহারিতে রূপ ছটা।
শ্যাম নভস্তল শ্যাম সিন্ধু জল
শ্যাম ধরাতল ঘটা॥

(৫)

শ্যামল সুন্দর তাই প্রাণেশ্বর!
ঋষিরা তোমারে বলে।
ঋষি ভাব তথ্য বোধ হয় সত্য
বিশ্বরূপ নিরখিলে॥

(৬)

রাখিতে জীবন জগতে যখন
পাকে ফল শস্য চয়।
স্বর্ণ কান্তি তার শোভার আধার
পীতাম্বর মনে হয়॥

(৭)

ত্রিভঙ্গ মূরতি স্বর্গ সিন্ধু ক্ষিতি
চাঁচর চিকুর মেঘে।
প্রকৃতির ডালা বন ফুল মালা
রাজে যেন উর যোগে॥

(৮)

অধরে মুরলী বিহগ-কাকলী
অমিয়ার যেন খনি।
প্রফুল্ল কমল লোচন যুগল
সুধাকর, দিনমণি॥

(৯)

শিখি পাখা শিরে সুনীলঅম্বরে
তারকা নিকর সাজে।

সুমধুর হাসি জোছনার রাশি
রতি পতি মরে লাজে ॥

(১০)

চটুল চাহনি ঘনে সৌদামিনী
কতই কৌশল ধরে।
মায়া অন্ধকারে পথ দেখাবা'রে
রসিকে সঙ্কেত করে ॥

(১১)

ব্যোম তব শ্রুতি ওহে বিশ্বপতি!
শুনিছ সবারই ভাষা।
অধমের তাই মানসে সদাই
আছে অতি ক্ষীণ আশা ॥

(১২)

শ্রীমুখের বাণী কখন না শুনি
যা করে বাঁশরী রব।
না না গুণ মণি! বেদ তব বাণী
মোহ যায় পরাভব ॥•

(১৩)

যেখানেতে যত রূপ প্রাণনাথ!
প্রতিরূপ তব হয়।
যেখানে যা সত্তা তুমি তার কর্ত্তা
'আমি কর্ত্তা' মায়াময় ॥

(১৪)

চরণে নূপুর বাজে সুমধুর
পয়োধি কল্লোল মাঝে।
যা শুনিয়া গোরী প্রেমে মাতোয়ারা
আলিঙ্গিলা সিন্ধুরাজে ॥

(১৫)

পালন কারণ হয় গো পালন
গোচারণ তব কায।
ধর্ম্ম সংস্থাপন করে নৃপগণ
তুমি নৃপ অধিরাজ॥

(১৬)

চরিত সুধায় ভব ক্ষুধা যায়
অমরতা পায় নর।
বদন অমিয়া পানে মত্ত হিয়া
ভকত চকোর বর॥

(১৭)

নব রসান্বিত কর্ম্ম অগণিত
সকলই তোমার খেলা।
প্রকৃতির সনে বিশ্ব বৃন্দাবনে
পুরুষের রস লীলা॥

(১৮)

সে রস তরঙ্গে খেলে কত রঙ্গে
অন্তরঙ্গা গোপীগণ।
সাধনের ধন এ রস কথন
বুঝে কি বিরস জন?

(১৯)

স্বেদ কম্প কার কারও অশ্রুধার
তপস্যা যেমন যার।
গোপী কণ্ঠ মণি প্রেম স্বরূপিণী
রাধিকা পদবী তাঁর॥

(২০)

যে জন তোমার দেখি' আঁখি ঠার
মরমে মজিয়া গেছে।

সেই জীবন্মুক্ত　　হিতব্রতে রত
সতত সন্তোষ আছে ॥

(২১)

জগদ্রূপ তব　　নিরখি' মাধব
আনন্দ লহরী প্রাণে।
বাসনা নিয়ত　　মিলাইতে নাথ!
আমিত্ব তোমারই সনে ॥

(২২)

কবে সে মিলন　　হবে সংঘটন
আনন্দে পরাণ ভরি।
কবে ত্রিভুবন　　বাসিব আপন
হবে কি সে দিন হরি ॥

(২৩)

তোমাতে আপন　　দিলা বিসর্জ্জন
শ্রীগৌড় গৌরব গোরা।
তাঁর ভাব কণা　　আস্বাদি' আপনা
কবে বা হইব হারা!

(২৪)

হেন বিসর্জ্জন　　রাধা সম্মিলন
মন-চোরা! তব সহ।
ক্ষুদ্র স্বার্থে মন　　করিলে ধাবন
সেই ত তব বিরহ ॥

(২৫)

নমি মনে মনে　　রাতুল চরণে
কৃপা কর অধমেরে।
নিবৃত্তির পথে　　শকতি যাইতে
সমর্পণ কর তারে ॥

(২৬)

কামনা মদন করি' সম্মোহন
মদন মোহন তুমি।
অভয় চরণে এক তান মনে
প্রণমি নিখিল স্বামি!

(২৭)

প্রেমী ব্যাসচিত্ত যায় বিশ্ব চিত্র
হইয়াছে পরকাশ।
সেই মুনিবরে নমি ভক্তিভরে
চরণ রেণুতে আশ।

শ্রীসত্যচরণ চন্দ্র।

৺চন্দ্রনাথ সীতাকুণ্ড।

—:•:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমার মধ্যে জগতের কেন্দ্র। খুলিয়া বলি, দেহের ভিতর হইতে আমিরূপ একটী মধুর সামগ্রী ফাঁক হইয়া গিয়াছে এবং জগন্ময় ছড়াইয়াছে। ইহার বিস্তার এত যে, জগৎ ক্ষুদ্র হইয়া আমার ভিতর গণ্ডিতে পড়িয়া গিয়াছে। সেই জগতের ভিতর পৃথিবী, পৃথিবীতে গিরি চন্দ্রশেখর; চন্দ্রশেখরে চন্দ্রনাথ তাহার চূড়া! আবার তার চূড়ার উপর এই শ্রীমন্দির। স্থূল হইতে ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া আসিয়াছে। মঠ যেমন ক্রমে সূক্ষ্ম সূচীবৎ হয়, অগ্নি মধ্য হইতে যেমন জিহ্বার সূক্ষ্ম অগ্নিশিখা; দেহের সূক্ষ্ম উর্দ্ধভাগ যেমন মস্তক, তদভ্যন্তরে জ্যোতিশ্চক্রের গতি যেমন ব্রহ্মরন্ধ্র, তেমন পৃথিবীতে চন্দ্রশেখর; তদুপর চন্দ্রনাথ; তদুপর এই মন্দির। এই শ্রীদোলমঞ্চ মন্দিরে আমার ঠাকুর বিরাজিত। অহো,

আনন্দ! বাহিরে যেমন ক্রমশঃ সূক্ষ্মে চড়িয়াছে ভিতরেও তেমন। রূপের মন্দির দ্বিদলে বসিয়া আনন্দ মধুর আস্বাদন করিতেছি। তাই বলি জগতের কেন্দ্র আমার অভ্যন্তরে। ব্যাসকুণ্ড—চতুর্দ্দল; (সীতাকুণ্ডে নাভীকুণ্ড আছেন) সীতাকুণ্ড—নাভীপদ্ম; মনিপুর; শম্ভুনাথ মন্দির—হৃৎকমল; বিরূপাক্ষ—কণ্ঠস্থ শুদ্ধ; এবং চন্দ্রনাথ—দ্বিদল। এই যে দ্বিদলে উপবিষ্ট!

বিধু ও বেণীকে লইয়া এবারেও শ্রীমন্দিরের মধ্যে দক্ষিণ দ্বারের মুখে বসিলাম। বামে বিধু, সম্মুখে বেণী দক্ষিণে প্রাণের ঠাকুর চন্দ্রনাথ লিঙ্গরূপী, দক্ষিণ দিক্ খোলা; নিম্নে জলনিধি, উপরে আকাশ অনন্তের দৃশ্য, অনন্ত ভাব। শ্রীমন্দিরের খিলান করা ছাদের পানে চাহিলাম; বোধ হইল ওটি ছাদনয়, আমার তালু; উহার উচ্চতম কেন্দ্রবিন্দু আমার ব্রহ্মরন্ধ্র এই লিঙ্গমূর্ত্তি আমার মস্তিকের ভিতর বসিয়া। পৃথিবীগর্ভ হইতে উঠিয়া, পর্ব্বত ঘুরিয়া, আমার ভিতর ভেদ করিয়া কি একটা জ্যোতির্ম্ময়ী গভীর সবল ধাকা উর্দ্ধে আকাশ পানে উঠিতেছে। দ্বিদল হইতে সহস্রারে অনন্তে ছাইয়া পড়িতেছে, আমি আর নাই। বাহিরের সে সিন্ধুও আনন্দসিন্ধুর মধ্যে লুকাইয়া অদৃশ্য হইল। কেবল যোগানন্দ! যখন আমিকে পাই, তখন দেখি আমি চন্দ্রনাথের পার্শ্বে, অহো ভাগ্য! তখন চন্দ্রনাথের সঙ্গে এইরূপ আলাপ চলিল:—

বলিলাম, "বাবা, আমাদের সব এত নিম্নে দুঃখের সংসারার্ণবে ফেলিয়া নিজে নিশ্চল, একটা উচু দুরারোহ স্থানে উঠিয়া নীরবে বসিয়া আছ? উং (উর্দ্ধে) আসিন, নির্লিপ্ত আছ। বাবা, এতদিন তোমার কৃপায় সন্ধান পেয়ে তোমায় এসে ধরেছি, তোমার নাগা পেয়েছি। বাবা, আমাদের জন্য কি তোমার বিদেশে চাকরী কর্ত্তে হয়? নচেৎ এই প্রবাসে কেন? এরূপ হইলে আমাদের উপায় কি, বাবা"?—বাবা বলিলেন, "বাছারে! উর্দ্ধে না বসিলে তোমাদের সব দেখিব কেমন করিয়া? উচুতে উঠিলে ভাল দেখা যায় যে। বাছা, আমাকে ধরা কঠিন বটে, কিন্তু যে ধরিতে চায়, তাকে আমি এই ভাবেই ধরা দিই। বাবা, আরো দেখ, চন্দ্রসূর্য্য উপরে উঠিয়া জগতে সকলেই দেখিতে পায়, আমি উর্দ্ধে না বসিলে আমাতে তোমাদের দৃষ্টি পড়িবে কেন? তোমাদের উর্দ্ধে তুলিবার জন্যইতো আমি উর্দ্ধে (উদাসিন) থাকি।" বাবার মধুর সস্নেহ বাক্যে বড়ই সুখ পাইলাম, বাবার পাশে ঘেসিয়া বসিলাম। যমটম,

জ্বালাযন্ত্রনা আমার আজ নাই। বাবার পাশে বসেছি, প্রাণে জোর কত! বাবা কৈলাসে থাকেন, আজ কৈলাসে উঠেছি। "কে জলে লয়তীতি কেলাসঃ বা কৈলাসঃ!"—অইযে সমুদ্র, কারণ সলিল। কারণ সলিলের উপর বা অতীত তুরীয়ধামে ব'সেছি। আর জ্বালা কিসের? ১। পৃথিবী (সংসার), ২। চন্দ্র শেখর, ৩। চন্দ্রনাথ পর্ব্বত, ৪। শ্রীচন্দ্রনাথ। তাই বলি তুরীয় বা তিনের উপর লোলমক্কোপরি—চতুর্থ বস্তু (বাসুদেব)।

সংসারব্যূহ অতিক্রম করিয়া চতুর্ব্যূহের চতুর্থ বা আদি বাসুদেবের ক্রোড়ে বসেছি। আনন্দ বলিবার নয়। বেণী সুগায়ক, গান ধরিল। আবার ডুবিলাম আবার ভাসিলাম। স্ত্রীপুত্র বন্ধুবান্ধব অন্তরঙ্গজনকে মন দ্বারা মন্দিরে তুলিয়া আনিলাম। তাহারাও এ সুখানন্দের ভাগী হউক্, সঙ্গী হউক্। তার পর আবার তাদেরে নামাইয়া দিলাম। ভাবিতে লাগিলাম স্ত্রীপরিজন বন্ধুবান্ধব সবে কত নীচে রয়েছে, আমি এত উপরে কোথায় এসেছি? আর কি তাদেরে দেখিব? তাহাদের ভাবনায় আমিও যেন নামিয়া পড়িলাম। না, নারদাদি ঋষিগণ বীণা বাজাইয়া ফিরিতেন, ব্রহ্মলোক, শিবলোক, গোলক, ধরাধাম বিচরণ করিতেন। এওত সেই এক ধাম। পুরাণে যাহা, শুনিয়াছি তাহা অদ্য প্রত্যক্ষ করিলাম। আহা, ব্রহ্মানন্দ রাজ্যের পূর্ণানন্দখেলা! আমার এখানে তিষ্ঠিবার অধিকার কতক্ষণ! এই দেখ, সংসারের বাত্যা এখানেও উঠিল বুঝি! না, তা উঠেনা। আমার এভাব মায়ানয়, দয়া, আমার সংসারও চিন্ময়, সবেই আমার প্রেমের বন্ধু। আমি ধরিয়া ধরিয়া তাদের একে একে সকলকে বাবার চরণতলে ফেলিয়া দিলাম। বাবা হাসিয়া তাদের পিঠে হাত বুলাইলেন। আমার আনন্দ আরো উথলিয়া উঠিল। চিন্ময় সলিল রাশির কেবল একটা ফোয়ারা অন্তর্ব্বহিঃ মাখিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছি! শুদ্ধ চিন্ময়ের খেলা! অন্তরঙ্গবন্ধুগণ সঙ্গে সঙ্গেই লুকোচুরি খেলিয়া আরো আমাকে মাতাইয়া দিতেছেন! সিদ্ধাবস্থা যাহাকে বলে, তাহার এইই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলাম। সবই মাত্র অমৃত! এখন দেহ ও আত্মা আমার দুটো নাই, সবে এক চিন্ময় মধু প্রবাহ। যাহাকে লিঙ্গ বলিয়াছিলাম, দেখি তার মুখ আছে, হাত আছে, পা আছে,—হাসি আছে, বরাভয় আছে, কমল মধু আছে! দেখি, আমি একটা আনন্দ বস্তু! আনন্দ মূর্ত্তি! আমি সাগরে মাখা আনন্দ, আমি আকাশে মাখা আনন্দ।

আমার প্রেম রাজ্যের বন্ধুগণ সবে এই অমৃত আমির স্রোতে ভাসিয়া আসিয়া মিলন করিল।

ঢেউ থামিলেও যেমন প্রবাহ থাকেই, তেমন যোগ ভাঙ্গিয়াও একটা মধুময় নেশা আমার থাকিয়া গেল। দিবাবসান প্রায়। সেই আনন্দ প্রবাহে থাকিয়াই বাবাকে শেষ নিবেদন জানাইয়া প্রসাদী পুষ্পদল ধারণ করিয়া শ্রীমন্দির পরিক্রমার পর কিছুক্ষণ থামিলাম। নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত নামিবার উদ্যোগ করিলাম। মন্দির পানে চাহিয়া, চাহিয়া "হায়, কোথা যাই তোমায় ছেড়ে কোথায় যাই, ভেবে কিঞ্চিৎ নামিলাম আমারা তিন জনেই ফিরিয়া আইলাম, "না, আর জীবনে হয় কিনা, এতকষ্টে বাবাকে পেয়েছি, আর একবার দেখে লই।"— বলিয়া উঠিলাম, দেখিলাম। অগত্যা নামিতেই হইল। চন্দ্রনাথের পূর্ব্বদক্ষিণ কোণ দিয়া প্রথমতঃ পূর্ব্বদিক্ অনেকদূর নামিয়া আসিয়া দক্ষিণ ও ক্রমে পশ্চিমমুখী হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ইষ্টকময় সুন্দর সুন্দর সোপান দিয়া পর্ব্বত গাত্র ও গুহার শোভা দর্শন করিতে করিতে সুখের ছায়ায় ছায়ায় নামিতে থাকিলাম। স্থানে স্থানে অত্যুচ্চ বিরাট প্রস্তরের তলদেশ দিয়া আসিতে হইল। দৃশ্যাদি এপথে যেন আরো মনোহর। চন্দ্রনাথ গিরি খানিই যেন বিরাট শিবলিঙ্গ উপমিত হইল।

সোপানের প্রায় সহস্র ধাপ ভাঙ্গিয়া সেই জংশনে আইলাম অমনি উপর ভ্রমণের একটা রঙ্গিল ম্যাপ চিত্তে ভাসিল এবং প্রাণে উৎকট আকুল ও বিচ্ছেদের ভাব লাগিল। এখন ভোলানাথের পাদমূলে পড়িয়া উপর দিক্ চাহিলাম, কিছুই দৃষ্ট হইলনা, সীমা পাইলামনা, কিন্তু চন্দ্রনাথও যেন আমাদের জন্য কাঁদিয়া ফেলিলেন। উভয়েই কাঁদিলাম। ক্ষুধাতৃষ্ণা, গ্লানি নাই, কেবল আকুলতা। সীতাকুণ্ডতীর্থের চরম উদ্দেশ্য ও সুখ চন্দ্রনাথ—সকলের উর্দ্ধে। সুতরাং বাঞ্ছা পূর্ণ হইল। কিন্তু পিপাসার শেষ নাই। আবার সেই পথে সম্ভুনাথ, সীতাকুণ্ড, ব্যাসকুণ্ড দিয়া পাণ্ডাবাটীতে আইলাম,। এখন এসব যেন নীরস লাগিল। চিত্তে কেবল চন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ যেন কত মধুর!—অপর সব তিক্ত, তাই আর এক্ষণে মন তিষ্ঠিলনা। মনে হইল, হয় চন্দ্রনাথ ফিরিয়া যাই ভাল, নহিলে এদেশ ছাড়ি। সুতরাং ৪॥টা প্রায় বাজে তাড়াতাড়ি প্রসাদ পাইয়া অমনি বস্ত্রাদি লইয়া ষ্টেশনে আসিলাম। ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া

দেখি চন্দ্রনাথ ও বিরূপাক্ষ মন্দির পরিষ্কার অইযে আমার মাথার উপর আমাকে ঝুঁকিয়া যেন দেখিতেছে। প্রাতে কুয়াসাচ্ছন্ন ছিল। ট্রেনে উঠিলাম ট্রেন ছাড়িল। নয়ন ভরিয়া চন্দ্রনাথ দেখিতে থাকিলাম চন্দ্রনাথে আমায় প্রাণসর্ব্বস্ব, মধুর, মধুর! কেবল চাহিয়া থাকি সাধ, চাহিয়া বিরহের আলাপ তুলিলাম। অন্যে অন্য কথা কয়, আমার তা ভাল লাগেনা। আমি, কেবলই বিগলিত নয়নে চাহিয়া। সন্ধ্যাকালে কুণ্ডেরঘাট ষ্টেশনে নামিলাম দর্শন ফুরাইল, নিরাশপ্রাণে বিধুবাবুর বাড়ী আসিলাম। মনের কি এক বৈক্লব্য, অঙ্গে অবসাদ। এক বিছানা লইয়া বসিলাম। এই গ্রামের নাম নিচিন্তাগ্রাম। আজমপুরনিবাসী আমার অন্যতম সহচর বান্ধব বেণীবাবুকে পথে বাড়েঢালা ষ্টেশনেই হারাইয়া আসিয়াছি। তাহার বিচ্ছেদও বেশ লাগিয়াছিল। আমি এখন এক অনুতাপানলে জ্বলিতেছি।

শয্যায় উপবিষ্ট আছি, অকস্মাৎ প্রাণের কোলে একটা ঢেউ লাগিল। আমার মস্তকোপরি চন্দ্রনাথ গিরি। এ পাষাণের গিরি নয়, পাষাণ গুলি সব দ্রবঘনরস—তরল নয়, দ্রব অর্থাৎ মণ্ডবৎ গলিত কোমল কেবলানন্দ। আমি উহাতে মাখা। আমাতে মাখিয়া সেই গলিত দ্রবঘন গিরি যেন খসিয়া পড়ে এমন ভাবে দণ্ডায়মান। বৃক্ষ লতা পাষাণ সব দ্রবরস। সেই রসের বর্ণ নীলও ধবল ও উভয়ের মিশ্রন—এই এক অপূর্ব্ব বর্ণের দ্রবমধু। আমি উহার উর্দ্ধগ প্রবাহে কেবল উঠিতেছি! কি এক অপূর্ব্ব সুখের অবস্থা! এ সুখের ভঙ্গ প্রাণে চহেনা। এই দ্রবমণ্ডলের মধ্যে একটুকু ফাঁক হইল। আমার শ্রীশ্রীযুগল রাধা শ্যাম মধ্যে ফুটিলেন। অহো, মজিলাম!—ভোজনের ডাক পড়িল। ক্ষুধা নাই তবু সেই রাত্রিমধ্যে দুইবার খাইলাম। একবার লুচি আদি দিয়া জলযোগ, আবার অন্ন পিষ্টক মিষ্টান্নাদি ভোগ। অতঃপর বিশ্রামে বসিলাম, আবার সেই অভিভাব! রাত্রি ধরিয়া এই চিন্ময় সুখের জাগ্রত স্বপ্ন সুখ ভোগ করিলাম। পরদিবস বেলা প্রায় ১১ ঘটিকা কালে বিদায় হইয়া একাকী ট্রেনে আসিয়া চড়িলাম; ফেণি নামিলাম। এবারও ট্রেনে উঠিয়া চন্দ্রনাথ ধুঁধুঁ দর্শন করিলাম। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা চাহিয়া হায় কি হলো! চন্দ্রনাথ লুকাইলেন, কিন্তু প্রাণের ভিতর।

এযাত্রায় বাড়বাগ্নি, সহস্রধারা, লবণাক্ষ এবং উনকোটি দর্শন ভাগ্য হয় নাই। সীতাকুণ্ডে সবে ৮।৯ ঘণ্টা ছিলাম।

জয়ন্তীয়াপর্ব্বত ভ্রমণেও উনকোটির কথা শুনিয়া ছিলাম। কৈলাসহরেও উনকোটি আছেন। দর্শন হয় নাই। কারণ কৈলাসহরে মাত্র ১৩ দিন ছিলাম। বোধ হয় বঙ্গের অনেক স্থানে উনকোটি আছেন। "উনকোটি" এর অর্থ কোটির কম। কোটি শিবসমাবেশে কাশী হন। কোটির কম হইলে কাশী না হইয়া মহাতীর্থ গণ্য হন। "উনকোটির" অর্থ এখন এই হইয়া দাঁড়াইয়াছে—কোটির কম। কত কম নির্দ্ধারিত নাই। শতও কোটির কম, লক্ষও কোটির কম। এর থেকে অর্থ এই যে বহুশিব একত্র যেখানে বিরাজ করেন তাহাই উনকোটি মাহাতীর্থ। উনকোটি আদি তীর্থ দর্শন কারয়া পরে লিখিবার বড়ই আকাঙ্ক্ষা থাকিল।

শ্রীশ্রীযুত ত্রিপুরেশ্বর মহারাজা মানিক্য বাহাদুরের জিলায় বিলনীয়ায় আসিয়াও সেই অনাবিল দিব্য সুখের স্বপ্ন প্রাণে লুকোচুরি খেলিতেছে দেখিতেছি। চন্দ্রনাথ আমার ভিতরে আসিয়াছেন। আনন্দের সীমা নাই।—এই আমার যোগানন্দ।

বৈষ্ণবানুগ—শ্রীকালিহর দাস বসু।

আর্ত্তের কাকুতি।

—:o:—

রাজসাহী বৈষ্ণব সমিতিতে পাঠিত।

অধম পতিত জীবানত্রাতু মার্ত্তান্ ভবাব্জে,
নিখিল নিগমসার প্রেমভক্তি প্রদানৈঃ।
ইহখলুকলিদ্বারে চ্ছন্নরূপ প্রপন্নো,
বিমল পুরটকান্তি শ্চৈতন্যো মাং প্রসীদ॥

হা হা প্রভো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণাধার।
পাতকী তারিতে প্রভো তব অবতার॥
অনর্পিত প্রেমভক্তি নামামৃত দানে।
উদ্ধারিলে পাপিতাপি অধম দুর্জ্জনে॥
অধম পতিত আমি অতি অভাজন।
বিষয় ব্যসনে রত পাপাসক্ত মন॥
মায়াঘোরে অন্ধ আঁখি, সুপথ ত্যজিয়া।
সংসার সাগরে পড়ি যেতেছি ভাসিয়া॥
দুস্তর সাগর মাঝে প্রাণ মোর যায়।
কৃপাকরি এ অধমে রাখ গৌররায়॥
তৃষ্ণাতোয়ে কামঝড় রহে প্রতিক্ষণ।
উত্তাল মোহোর্ম্মিতায় উঠিছে ভীষণ॥
অকুল ভবাব্ধি হায়! কুল নাহি পাই।
কলত্র আবর্ত্তে পড়ি হাবু ডুবু খাই॥
দিবানিশি কন্যা পুত্র কুম্ভীনক্রগণ।
মমত্বদশনে করে অজস্র দংশন॥
দিনে দিনে বাড়ে জ্বালা, না দেখি নিস্তার।
আকুল পরাণে সদা করি হাহাকার॥
অগতির গতি তুমি ভবের কাণ্ডারী।
ত্রাণ কর এসঙ্কটে দিয়া কৃপাতরী॥
আমি অতি মন্দমতি দীন অকিঞ্চন।
না জানি তোমার প্রভো ভজন পূজন॥
কলুষ কালিমা বৃত এ চিত্ত মুকুরে।
তব প্রেমময় রূপ কভু নাহি স্ফুরে॥
অজ্ঞান মদিরা পানে বিবশ রসনা।
সুধামাখা হরিনাম বলিতে পারেনা॥
সদা জ্ব'লে মরি প্রভো ত্রিতাপ দাহনে।
অসহ্য যাতনা আর সহেনা পরাণে॥

কৃপাকর গৌরহরি দীনে কৃপা কর।
এভব যন্ত্রণা হ'তে স্বগুণে নিস্তার॥
তব প্রেম ভক্তি সুধারস দাওঢালি।
ধুয়ে যাক হৃদয়ের পাপতাপ কালী॥
নামামৃত আস্বাদিতে কর অধিকারী।
হরি হরি বলি, যেন বহে প্রেমবারি॥
পতিতপাবন! তুমি অগতির গতি।
অধমতারণ! তাই করি এ কাকুতি॥
হে কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভো অনাথের নাথ!
কৃপা করি এ অধমে কর আত্মসাৎ॥

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, (কবিরত্ন।)

ভক্তের পত্র।

—:০:—

ভ্রাতৃজীবন রসিকলাল!—

"মহাপ্রভু নিগুর্ণ পরমেশ্বর পতিতপাবন।" হরিনাম কৃষ্ণনামে যে নয়ন কোন দিয়া অশ্রুবিন্দুটুকু চুয়ায়, উহাও নিগুর্ণ অর্থাৎ মায়াতীত। মায়ার

---

* আমাদের পরমাত্মীয় প্রেম-পাগলের শ্রীমুখ নিঃসৃত "মহাপ্রভু নিত্য নিগুর্ণ স্বয়ং ভগবান্; পুণ্যবানের সেবার অধিকার নাই; নাম সংকীর্তনে পুণ্যবানের মহা অপরাধ হয়" এই অমিয় বাণী শ্রবণ করিবার পর পরম প্রেমময় দাদা কালী-হরকে "নিগুর্ণ, গুণাতীত ও সগুণ," সম্বন্ধে এবং কৃষ্ণনামে অপরাধের বিচার বিষয়ে কিছু আলোচনা করিতে বলিয়াছিলাম। তদনুসারে প্রেমময় দাদা যে, প্রেমলিপি খানি, এ অধমের উদ্দেশে লিখিয়াছিলেন, তাহা "ভক্তি"র শ্রীঅঙ্গে শোভনীয় হইবে, বলিয়া উহাতে প্রকাশ করিলাম। দাদার আলোচনার

রাজ্যের এটুকু নয়। ভজন কুঠরীর ভাই, সবই নির্গুণ দেখি। সুতরাং শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ মহাপ্রভু মানুষ হইয়াও নির্গুণ। পাপী উদ্ধার করা, মায়ার কার্য্য নয়, মায়াতীত শক্তির লীলা—উহা নির্গুণ। আমি শ্রীরাধা মাধবের সহিত এক মত হই। (নির্গুণ = মায়াতীত = সগুণ)

নির্গুণ—ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছু নাই, এই জগৎও ব্রহ্মই। পূর্ণ বা সর্ব্বাংশে ব্যক্ত। গৌর সর্ব্বাংশে ব্যক্ত।

গুণাতীত—গুণ দ্বারা যাহাকে লাভ করা যায় না। নির্ম্মল ভজন দ্বারা লব্ধ মাত্র।

সগুণ—কিয়দংশ ব্যক্ত, অবশিষ্ট অব্যক্ত। এই মিশ্রাবস্থা সগুণ। পৃথিবীকে মাটী বলি, কারণ উহাতে ব্রহ্ম অব্যক্ত। ব্যক্ত হইলে মাটিও ব্রহ্ম প্রতীয়তে।

সগুণ ভজন দ্বারা (বা অবস্থা হইতে) গুণাতীতে পৌঁছান যায়। তখন সর্ব্বাংশ ব্যক্ত হয়, দেখা যায় যাকে নানা উপাধি দিয়াছিলাম, সে সবও ব্রহ্মই। ইহাই নির্গুণাবস্থা। সর্ব্বময় ব্রহ্ম হইতেই তাহার কেন্দ্রস্থ অনৃত পুরুষ উদ্ভাসিত হয়। জীবও নিজ চিন্ময়ত্ব ভিন্ন অন্য কিছু উপলব্ধি করে না। এই সম্বন্ধই ব্রজ প্রাপ্তি। এই সবই নির্গুণ লীলা।

পুণ্যবান অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী কামুক স্বার্থপর তাহার নামই কি, সেবা তো দূরে। অহৈতুকী রতি নয় যে, ঐ যশো লিপ্সামূলে অন্যান্য দুষ্ট ভাব চিত্তে আসে, সুতরাং অপরাধ হয়। এক যশোলিপ্সা স্বার্থ গেলেই সব দূর হয়, কোন অপরাধ ঘটে না। এই কাম অপরাধ সমূহের বীজ। এই বলিলেই হইল।

নির্গুণ যিনি তিনিই গুণাতীত, তিনিই সগুণ। সুতরাং অভিন্ন। সগুণ ও নির্গুণের মধ্যবর্ত্তী সম্বন্ধটীর নাম গুণাতীত। অর্থাৎ নির্গুণ। সগুণের অতীত; সগুণ নির্গুণকে পাইতে পারে না, অতএত নির্গুণ বস্তুটী গুণাতীত প্রাপ্তির পূর্ব্বাবস্থা সগুণ, চরম নির্গুণ। আবার নির্গুণই সগুণ। সগুণ একটা পৃথক কিছু নয়। নিত্য গুণাতীত যিনি তিনি কি, নির্গুণ? তবে বিবাদ কি? মায়াও ব্রহ্ম। মায়াও ব্রহ্ম, এই জ্ঞান নির্গুণ।

সম্বন্ধে, অন্য কোন ভক্তের কিছু বলিবার থাকিলে, কৃপা পূর্ব্বক লিখিয়া পাঠাইবেন। এরূপ সমালোচনা সকলেরই পক্ষে মঙ্গলকর বলিয়া মনে করি।

দীন—রসিকলাল দে।

হৃদয়ে প্রেমানন্দোদয় হইলে দেহটাও অমৃতময় হয় না কেন। উহাও পরম পদার্থ বটে। পূর্ব্বে অব্যক্ত ছিল, এখন প্রেমোল্লাসে উহার যথার্থ পরিচয় হইল। ইহাই নিগুর্ণাবস্থা। নিগুর্ণ দ্বারা প্রেমলীলা ধসিয়া যায়, এমন বলা ভ্রম।

* • * * *

"কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার" ইত্যাদি—

কৃষ্ণনাম—সিদ্ধাবস্থার। গৌরনাম—সাধকাবস্থার। আমি অজ্ঞান মূর্খ, গৌরনাম করিয়া শিক্ষা লাভ করিব, আমি মূর্খ, আমার অপরাধ কি? পণ্ডিতের সে অপরাধ। খুব নাম কর, নাম গাও, তৈয়ের হও, তৈয়ের হও কিন্তু সাবধান! তৈয়ের না হ'য়ে কৃষ্ণনাম করিও না কৃষ্ণ বা যুগল ভজিও না। সাবধান-সাবধান, তৈয়ের হও, নচেৎ বিভ্রাট ঘটিবে। সর্ব্বনাশ হইবে। যুগল ভজন নিষ্কামের জন্য। গৌরনাম, প্রেম নদীয়ার সাধকাবস্থা, কেবল শিক্ষা। ছাত্রাবস্থা তখন অপরাধ নাই। কিন্তু পণ্ডিত হইয়া পাশ করিয়া ব্রজের Art রস বিদ্যায় প্রবেশ কর, তখন ভুল হইলে বিপত্তি। * * হাঁ আমি সহস্রবার বলি, শ্রীপাদপদ্মই মাধুর্য্যের উৎস। পাদপদ্মের পানে চাহিতেই যাঁর পাদপদ্ম, তাঁর মূর্ত্তি ফুটে, সুতরাং এক কথাই, কৃষ্ণ পাদপদ্ম দর্শন এবং কৃষ্ণ দর্শন এক কথা। সবই ঐ রাঙ্গা পা দু'খানিতে আছে। * * * * *

তোমারই কালীহর

—

অসভ্যতা ও অজ্ঞানতা চাই-ই।

———:০:———

তরুতল-বাসে যাঁরা ধূলায় শয়ন,
দুগ্ধ ফেননিভ শয্যা হেরেনি কখন।
স্নানাবানের পরিবর্ত্তে ছাই মাখে গায়,
ব্যবহার করে যাঁরা এসেন্স-গোময়।
ছিন্ন বাস পরিধান, কভু দিগম্বর,

থালি পা অগম্য স্থানে গতি নিরন্তর।
অসভ্য হয়েন যদি তাঁরা এসংসারে
সুসভ্য সংসার মাঝে বলি তবে কারে?
রাজা প্রজা, জ্ঞানি মূঢ়ে সমসম্বোধন,
নাহি মানে উচ্চ নীচ, সমাজ-শাসন।
স্বল্পভাষী নাহি জানে বাক্ চতুরতা,
সাদা প্রাণে ক'ন সদা যাঁরা সাদা কথা।
সত্য কহি প্রাণ দিতে কিছু ভয় নাই,
আত্মপ্রীতি-বোধে কাজ করেন সদাই।
শপথ প্রবাসী যদি অজ্ঞান সংসারে
জ্ঞান সমন্বিত ভবে বলি তবে কারে?
শিখিয়া বিজাতি ভাষা বিজাতি চলন,
সভ্যের জনক মোরা হয়েছি এখন।
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বসন ভূষণে,
ভূষিত হইয়া সভ্য হয়েছি এক্ষণে।
নিন্দিছি মোদের পূর্ব্ব পিতা-পিতামহ,
অসভ্য তাঁদের মত নাছিলেন কেহ।
বসে বসে আলস্যেতে সময় কাটা'ত,
ভাগ্যে শস্য বেশী হ'ত তাই প্রাণ র'ত।
না জানিত শুদ্ধরূপে কহিতে বচন
নিত্যশুদ্ধ লইতেন তাঁদের বচন।
সকলে সাজান্ যিনি নানা সাজ দানি,
বাখানে তাঁদের সাজ যখন আপনি।
তাঁরা যদি মূর্খ ম্লেচ্ছ হন এসংসারে,
পণ্ডিত সুসভ্য তবে বলি বল কারে?
নামানি সমাজ-নীতি নামানি সভ্যতা,
নাহি মানি বিপক্ষতা, না জানি একতা,
একাই এসেছি একা করিব গমন,

সমাজের সঙ্গে মোর কিবা প্রয়োজন।
আশাহীন যেই সংসার অরণ্য তার,
আশাসহ বনে গেলে নাহিক নিস্তার॥
সংসারে থাকিয়া যেই মিশেনা সংসারে,
পদ্মপত্র রহে যথা সলিল ভিতরে।
বলুক সমাজ মোরে অসভ্য অজ্ঞান
না ত্যাজিব এই ভাব থাকিতে পরাণ।
মহাজন যেইভাবে যে পথে গমন—
কৈল্লা, সে পথে করিব সেভাব গ্রহণ।
ভাবময় ভগবান্ এভাব রাখিতে
সহায় হউন দেব! মিনতি পদেতে।
লাভালাভ, জয়াজয়, মানঅপমান
সমান বোধিকা শক্তি দেহ শক্তিমান্!
শক্তিধর! এই শক্তি দাও দেব মোরে।
অসভ্য অজ্ঞান করি রাখহ সংসারে॥

বিবেকাকাঙ্খী—শ্রীবসন্ত কুমার প্রামাণিক।

শ্মশান।

The boast of hearldry, the pomp of power.
And all that beauty, all that wealth e'er gave,
Await alike the inevitable hour :—
The paths of glory lead but to the grave.

Gray.

এ মরজগতে শ্মশান অতি বিচিত্র ভূমি। এখানে জাত্যাভিমান নাই, জ্ঞানাভিমান নাই, উচ্চপদাভিমান নাই। কুলীন ও চণ্ডাল, ধনি ও নির্ধনি, সুশ্রী ও কুশ্রী, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, রাজা ও প্রজা এখানে সকলেরই সমদশা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সংসার নাট্যশালায় স্ব স্ব অভিনয় সমাপনানন্তর একসময়ে না একসময়ে এই বিচিত্র ভূমিতে আগমন করিয়া সকলকেই পুড়িয়া একই পদার্থ মুষ্টিমেয় ভস্মে পরিণত হইতে হয়। কাহাকে দশ দিবস পরে, কাহাকে দশ মাস পরে, কাহাকেও দশ বৎসর পরে, কাহাকেও বা শত বৎসরের পরে এখানে আসিয়া তাহাদিগের যাবতীয় লীলা খেলা সাঙ্গ করিতে হয়। এই শ্মশানে কুলীনের কৌলিন্য পোড়ে, ধনীর ধন পোড়ে, রাজার রাজসম্মান পোড়ে এখানে অহমিকা নাই, এখানে আমিত্ব নাই, এখানে জগতের বৈষম্য নাই। আপনাপন অভিনয় সাঙ্গ করিয়া একদিন না একদিন এই শ্মশানরূপ অনন্তের পথ দিয়া সকলকেই অনন্ত রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়। তুমিও এই পথের পথিক, আমিও এই পথের পথিক কেবল তুমি আমি কেন জীব মাত্রই এই পথের পথিক। যে অসাধারণ বীরপুরুষ নেপোলিয়ান্ বোনাপার্ট, সমগ্র পৃথিবী জয় করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, যাঁহার নাম শ্রবণ কুহরে প্রবিষ্ট হইলে সর্ব্বজন চমকিত হইয়া উঠিত, যিনি অনন্ত আশা স্বকীয় হৃদয় মধ্যে পোষণ করিয়া আপন যশলাভার্থ নিত্য নবোৎসাহে আজীবন সময় লীলায় অতিবাহিত করিলেন, হায়! যখন লীলাবসানে অনন্ত রাজ্যে গমনার্থ এই শ্মশানরূপ অনন্ত পথের দ্বারে উপনীত হইলেন, তখন কে তাঁহার সহিত কে কিছুই যাইল না! তখন তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্য কোথায় রহিল? তখন বহু আয়াস ও ক্লেশ লব্ধ তাঁহার ধনৈশ্বর্য্য কোথায় রহিল? তিনি একা আসিয়াছিলেন একা চলিয়া গেলেন। তিনিও যেরূপাবস্থায় যে পথের পথিক, একজন বিক্রমহীন, সাধারণ ব্যক্তিও তদ্রূপাবস্থায় সেই পথের পথিক। তিনি মহৎ, অপর ব্যক্তি ক্ষুদ্র। কৈ, ক্ষুদ্র ও মহতের কিছুই ত তারতম্য দৃষ্ট হইল না! এখানে অর্থাৎ এই শ্মশান ক্ষেত্রে দুই জন সমাবস্থা, সমবেশ ও সমপথ। সুন্দর পুরুষ অথবা রমণীর সুন্দর দেহ দগ্ধ হইয়া ভস্মপদার্থে পরিণত হয় আর কুৎসিত পুরুষ অথবা রমণীর কুৎসিত শরীরও পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হয়। সুন্দর দেহ পুড়িয়া সুন্দর ছাই, কুৎসিত দেহ পুড়িয়া কুৎসিত ছাই হইল কি? সকলেরই পরিণাম মুষ্টিমেয় ভস্ম মাত্র। এখনে

অন্তিম কালে সকলেরই যখন সমাবস্থা তখন মানব আমি বড়, আমি উচ্চ, আমি ধনী, আমি কুলীন এইরূপ অহমিকা কূপে মগ্ন হইয়া আত্মবিস্মৃত হয় কেন? পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে সাধারণাপেক্ষা ধনে মানে উচ্চতর স্তরে আসিন হইলে মানব মোহান্ধ হইয়া সমগ্র জগৎ বিস্মৃত হয় কেন? প্রত্যহ কত শত জীব ইহ-লীলা সমাপন করিয়া ধন, মান, রূপাদি পশ্চাতে স্থাপন করিয়া অনন্ত রাজ্যে গমন করিতেছে মানব ইহা প্রত্যহ স্বচক্ষে হেরিতেছে তথাপি তাহারা মনে করে যে তাহারা যেন চিরকালের নিমিত্ত জগতে আসিয়াছে, তাহারা যেন চিরকাল কন্যা পুত্র পরিবারাবৃত হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিবে; পৃথিবীতে ইহাই অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়। তাহারা বুঝেনা অন্তিমে এই শ্মশান ভূমিতে আসিয়া তাহাদেরও যে দশা হয়, জীবমাত্রেরই সেই দশা হইয়া থাকে। তাহারা বুঝেনা কয় দিবসের নিমিত্ত তাহাদের ধন, মান ও অভিমান। মহা পুরুষগণ ইহা সম্যক্ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন বলিয়াই তাঁহাদের রাগ, দ্বেষ কিম্বা অহমিকা কিছুই থাকে না। তাঁহারা আপনাকে যেরূপ ভাবে নিরীক্ষণ করেন এই ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় জীবগণকে তদ্রূপ ভাবে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বুঝেন এ মান দুদিনের জন্য, এ গর্ব্ব দুদিনের জন্য এ অভিমান দুদিনের জন্য এমনকি এই জীবনও দুদিনের জন্য। দুদিন পরে এই শ্মশান ভূমিতে আত্মা ভিন্ন সকলই পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হইবে। এই মুষ্টি মাত্র ভস্মের নিমিত্ত এত অভিমান; এত দর্প, এত পাপ, এত শঠতা, এত প্রবঞ্চণাদি, এত মিথ্যা চাতুরালি? হায় মানব!

মানব আজ যাহাকে ভালবাসিয়া স্বীয়বক্ষে তুলিয়া লইতেছে, আজ অমৃত বোধে যে পুত্রের বারবার মুখচুম্বন করিতেছে, কাল হয়ত সেই ভালবাসার পাত্র, সেই প্রাণাধিক পুত্র কালের করাল কবলে পতিত হইয়া চিরতরে তাহাদিগের যাবতীয় সাংসারিক বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে। মানব ইহা দেখিয়াও শিখে না, ইহা শুনিয়াও শিখে না? যখনই এই শ্মশান ভূমিতে কেহ উপস্থিত হয় তখনই কে যেন অলক্ষিত ভাবে রহিয়া রহিয়া অব্যক্ত ভাষায় বলিয়া দেয় "মানব! দেখিতে আসিয়াছ দেখ ভাল করিয়া দেখ। এখানে রাজা পুড়িয়াছে তৎপার্শ্বে নির্ধনীও পুড়িয়াছে, এখানে জ্ঞানী পুড়িয়াছে তৎপার্শ্বে অজ্ঞানীও পুড়িয়াছে। সকলেরই শরীর অভিন্ন মুষ্টিমেয় ভস্মে পরিণত হইয়াছে এই সকল বিষয় ভালকরিয়া

হৃদয়ঙ্গম করিতে যত্ন কর এবং বুঝিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে রত হইয়া দম্ভমাৎসর্য্যাদি পরিহার পূর্ব্বক সুখে জীবনাতিপাত করিতে চেষ্টা কর এবং দেখিও যেন কদাচ তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে স্খলিত হইও না।"

অনন্ত।

—:০:—

কেন ওই সৌদামিনী,
দোলাইয়ে চারু বেণী,
অম্বুদে লুকায় ?
রজন শোভন হেন,
উজ্জ্বল খদ্যোত কেন,
আঁধারে মিশায় ?
কুমুদিনী হ্রদ নীরে,
বিকসি ক্ষণিক তরে,
কেন বা শুকায় ?
বসন্তের নব তান,
জাগাইয়ে সুপ্ত প্রাণ,
কেন চলি যায় ?

আসে ওই উর্ম্মিখানি,
নীরদ গভীর ধ্বনি,
নির্ঘোষি হুঙ্কার ;
পরক্ষণে কেন হয়,
চূর্ণীকৃত সিকতায়,
দৃঢ় তনু তা'র ?
বুঝেছি এরূপ হায় !
দীপ্ত হ'য়ে এ ধরায়,
চকিতের তরে ;
মিশে যায় পরিজন,
জীবন, যৌবন, ধন,
অনন্তেরি ক্রোড়ে।

শ্রীচুনীলাল চন্দ্র।

বাল গৌর।

—:০:—

অমল বিমল রূপের ছটায়
উজলি নদীয়া ধাম।

আহা মরি মরি ! শচীর অঙ্কে
বিরাজে শ্রীভগবান।

ইন্দু নিন্দি বদন সুষমা
কুন্দ দশন মরি।
ঈষৎ হাস্য শোভিত আস্য
খেলিছে গৌরাঙ্গ হরি।
উজল কিরণে মণ্ডিত বপু
সুন্দর অভিরাম।
ঊর্দ্ধে চরণ তুলিয়া খেলিছে
নিখিল রসের ধাম।
ঋষিগণ যাঁর পদ পল্লব
ধেয়ানে না পায় ধরি।
লীলা করে সেই বিশ্ব ভূপতি
শচীর অঙ্কোপরি।
একটী লোমের মধ্যে যাঁহার।
অনন্ত কোটী বিশ্ব।
ঐ যে খেলিছে শচীর অঙ্কে
মরি কি মোহন দৃশ্য।
ওরূপ নেহারি বিশ্ব মাঝারে
বহিল প্রেমের বন্যা।
গৌর কিশোর গৌর অবতারে
ধরণী হইল ধন্যা।
নিখিল ভুবন বন্ধু তুমি হে
অতুল প্রেমের সিন্ধু।
চির পাতকিনী অধমা দাসীরে
পদে রেখো দীনবন্ধু।

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী দেবী।

মনের কথা।

—:০:—

মন! একবার হরি হরি বল; তোকে এত বলি, এত মিনতি করি, তবু তুই আমার কথা শুনিসনা? আমি তোর কাছে কি অপরাধ ক'রেছি? বল্ বল্, আমি এখনি তোর কাছে নতশিরে হ'য়ে ক্ষমা প্রার্থনা করব। বলবিনা শুনবিনা? আমি তোর এত কথা শুনি আর তুই আমার একটী কথাও রাখ্‌লিনা! আমি এত কাকুতি মিনতি করছি, এত কাঁদা কাঁদছি, এদেখেও কি তোর একটুকু দয়ার সঞ্চার হয় না! তুই বড় নিষ্ঠুর বড় নির্মম! বল্ একবার হরি হরি বল! তুই যা চাইবি তাই দেবো, যা ক'রতে বলবি তাই করবো, যেখানে যেতে ব'লবি সেই খানেই যাব, তো'তে আমাতে এক হ'য়ে মহাসুখে অনন্ত সুখে কাল কাটাব, একবার হরি হরি বল। হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!!

আরে অমনি ক'রে নয়—তেমনি ক'রে বল, ভক্ত প্রহ্লাদ অনলে সলিলে, হস্তি পদতলে প'ড়ে যেমন ক'রে হরি হরি ব'লে ডেকেছিল, তেমনি ক'রে বল,—বালক ধ্রুব যেমন বনে বনে ঘুরে ঘুরে অসহায় অবস্থায় সেই অসহায়ের সহায় হরিকে ডেকেছিল,— সুরথ পুত্র সুধীর পিতৃত্যজ্য মাতৃহারা হ'য়ে অনাহারে অনিদ্রায় যেমন ক'রে সেই বিপদবারণ মধুসূদন হরিকে ডেকেছিল,—অন্ধ বিশ্বাস বালক জটিল যেমন তাহার মাতৃবাক্যে বিশ্বাস ক'রে আচার্য্যের পিতৃ শ্রাদ্ধের দধির জন্য "কোথায় দীনবন্ধু দাদা" "কোথায় দীনবন্ধু দাদা" ব'লে ডেকেছিল, তেমনি ক'রে বল। এমন আলগা ভাবে তোকে বল্‌তে বল্‌ছিনে। পাগল হ'য়ে সংসারের সব ভুলে গিয়ে শক্ত ক'রে জড়িয়ে ধ'রে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে গভীর হুঙ্কারে বল্। আমার এই জড় মাংসপিণ্ডের প্রত্যেক অণু পরমাণু তোর সেই গভীর হুঙ্কারে প্রকম্পিত হউক। এত দেখ্‌ছিস্, এত শুনছিস্ তবু তোর চৈতন্য হয় না! তুই এই সামান্য দরিদ্রতার নিষ্পীড়নে নিষ্পীড়িত হ'য়ে অনর্থক অর্থ চিন্তায়, সেই সদানন্দ মন্ত্রের সদানন্দময় নাম ভুলে থাক্‌তে চাস্, একি তোর কিরূপ ব্যবহার। তুইত বড়মূর্খ! সুধাভাণ্ড ফেলে রেখে হলাহল পানে তোর এত আসক্তি। কবে তোর এভ্রম যাবে। কবে তোর এভ্রম দূরে গিয়ে জ্ঞানের উদয় হবে?

মন তোর কবে হবে জ্ঞানোদয়।
কবে, অসার আশা ত্যজ্য ক'রে, জড়িয়ে ধর্‌বি রাঙাপায়॥
কবে, বিষয়-বিষ উগারিয়ে, নাম সুধা পান কর্‌বি হায়।
তোর, ঘুচ্‌বে ভ্রান্তি, পাবি শান্তি, হবিরে আনন্দময়॥
স্ত্রী পরিজন, মায়ার বাঁধন, কবে ছেদন কর্‌বি হায়।
বল্, কাম ক্রোধাদি অজায় কবে বলিদিবি রাঙাপায়॥

* * * * *

না, না, না হ'লনা। যেমন চাই তেমন হ'লনা। কিছুই হ'লনা। বুঝি কেবল আসা আর যাওয়াই সার হ'ল। আর কিছুই হ'লনা। বড় সাধে ভবের হাটে ব্যবসা কর্‌তে এসে এখন দেখ্‌ছি লাভ হওয়া দূরের কথা মূলধন পর্য্যন্ত নষ্ট হয়। কেমন ক'রে হবে! যাকে দিয়ে ব্যবসা চালাব সেই আমায় গ্রাহ্য করে না। কেমন করে হবে! আমার মনত আমার কথা শুন্‌তে চায়না, সেত

আমার বাধ্য হ'তে চায়না। আমি এখন কি করি! আমার গতি কি হবে? হরি হে! আমার কি হবে? আমি যে লাভে মূলে সব খোয়ালাম আমার উপায় কি হবে? দয়াময় হরি তোমার দয়াভিন্ন আমার আর অন্য উপায় নাই। দয়াময় দীনের প্রতি সদয় হও। আর আমার এ নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য হয় না।

হরি হে! এ সংসারে আমার বলতেত কিছুই নাই, তোমারই সব তুমিই দাও আবার তুমিই নাও। তোমার সৃষ্ট জীব তোমায় কত ধন রত্ন, মণি মুক্তা, উৎসর্গ করে; তাদের দিয়েছ, তারা আবার তোমার চরণে উৎসর্গ করে। আমারত কিছুই নাই, আমি আমার এই অবাধ্য মনটাকে তোমার চরণে উৎসর্গ করিতে চাই তুমি দয়া ক'রে গ্রহণ কর। মন আমার কথা শুনেনা, আমায় বড়ই জ্বালাতন করে, তোমার কাছে কিছুতেই যেতে চায় না, যেতে চাইবে যে তারও আশা নাই, তুমি দয়াল শিরোমণি দয়াক'রে জোর পূর্ব্বক ওকে নিয়ে যাও। আমি আর ওকে চাইনে। তুমিনিয়ে নিয়ে তোমার ঐ রাঙা পাদুখানির কাছে শক্ত ক'রে বেঁধে রাখ যেন ছুট্‌তে নাপারে। ছুট্‌লে আবার আমায় জ্বালাতন ক'র্‌বে। নিজগুণে দায়া করে নিয়ে যাও। দেখো যেন আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হ'য়োনা। তোমায় কত ভক্তে কত মণি মুক্তা দান করে আর আমি একটী অসভ্য জানোয়ার মনকে তোমায় অর্পণ কর্‌ছি তুমি এতে অসন্তুষ্ট হ'য়োনা, নিজগুণে দাসের অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে গ্রহণ কর। তুমিত সকলি গ্রহণ কর, যাহাদেয় তুমিযে সবই গ্রহণ কর তবে আর আমার মনটাকে গ্রহণ কর্‌বেনা কেন? তোমার বড় কষ্ট হবে, নয়? একরম জানোয়ার মনটা নিয়ে তোমার বড় কষ্ট হবে, তুমি বড় জ্বালাতন হবে। তবে আর তোমায় দিই কিকরে। ওঃ আমিকি ভয়ানক স্বার্থপর! আমি নিজের যন্ত্রণা দুরকরবার জন্য আমার হরিঠাকুরকে কষ্ট দিতে যাচ্ছি। না হরি! আমি আমার মনটাকে তোমায় দেবোনা। তুমি কষ্ট পাবে তা আমার সহ্য হবেনা। আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরি সেও ভাল তোমায় কষ্ট দিতে পার্‌বনা। তবে এখন কি করি! দয়াময়! আমি কি কর্‌ব! তুমি দয়া ক'রে আমার একটী বাসনা পূর্ণকর। আমি অন্য কিছুই চাইনা পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু সহায়, সম্পদ চাইনা, ধর্ম্ম চাইনা, অর্থ চাইনা, স্বর্গ চাইনা, মোক্ষ চাইনা চাই তোমার একবিন্দু করুণা। আমার বড় সাধ হয় দিবানিশি

তোমার নামকীর্ত্তনে মাতিয়া থাকি, দয়াময় দীনের সেই বাসনা পূর্ণকর আমি আর কিছুই চাইনা—

ওহে দয়াল হরি পূর্ণ কর এই দীনের আকিঞ্চন।
আমায় ভক্তি দাও, আমি করি তোমার নামকীর্ত্তন॥
আমার অন্য সাধ নাই
আমি শুধুই ভক্তি চাই,
যেন, হরিবলে, নয়নজলে ভেসে ধুলাতে লুটাই—
তোমার ভক্ত-পদ-রজে শীতল হয় যেন আমার জীবন॥
অন্য কথায় বধির যেন হই,
তোমার নামে মজে রই,
যেন, তোমার পূজায়, তোমার ধ্যানে, জীবন কাটাই—
যেন, তোমার চরণ, করি স্মরণ (ও দয়াল হরি—হরিহে—)
প্রাণবায়ু থাকে দেহে যতক্ষণ॥
সংসার সমর অঙ্গনে,
দরিদ্রতার পীড়ণে,
তোমার, মধুমাখা নাম ভুলে যেন, থাকিনা আনমনে—
তোমার দয়া বলে, নিদান কালে (ও দয়াল হরি—হরিহে—)
যেন, হরি ব'লে যায় জীবন॥
যেন তোমায় না থাকি ভুলে,
সদাই কাঁদি হরিবলে,
যেন তোমার নাম ভুলে এক পলও যায়না বিফলে—
তুমি, ব'সে আমার হৃদ্-কমলে (ও দয়াল হরি—হরিহে—)
তুমি করাও তোমার নামকীর্ত্তন॥
যেন ক্ষুধা তৃষ্ণাও নাহি রয়,
তাতে যে সময় বৃথা যায়,
তোমার ভক্ত সঙ্গে মহারঙ্গে মন, তোমার গুণ গায়—(যেন)
আমি চাইনা কোন সোণাদানা,—(ও দয়াল হরি—হরিহে—)
হরি, তুমি মোর অমূল্য ধন॥

(আর কিছুই চাইনা চাইনা)

(অন্য ধনে কাজকি আমার)

বৈষ্ণব দাসানুদাস

কাঙাল সতীশ।

মহাপ্রভুর আব্‌দার।

—:০:—

("জগদীশ পণ্ডিত" ও "হিরণ্য ভাগবত"

দুই বিপ্রের একাদশীর দিনের

বিষ্ণু পূজার নৈবেদ্য খাইতে

মহাপ্রভুর আব্‌দার!)

একদা বালক বুদ্ধি শচীর কুমার;

কাঁদেন কাদায় পড়ি করি আব্‌দার!

সবে বলে কেন বাপ করহ ক্রন্দন?

ভাল করি কর দেখি কীর্ত্তন নর্ত্তন!

শচী কন শুন বাপ কেঁদনা নিমাই

চুপ কর যাহা চাহ আনি দিব তাই।

প্রভু কন যদি মোর প্রাণ রক্ষা চাও,

একটি খাবার মোরে শীঘ্র আনি দাও।

"জগদীশ পণ্ডিত" "হিরণ্য ভাগবত"

করেছেন দুই বিপ্র একাদশী ব্রত;

একাদশী উপবাসী ইষ্ট নিষ্ঠ মন;

বিষ্ণু সেবা লাগি করে বহু আয়োজন;

সে সব নৈবেদ্য যদি খাইবারে পাই

তবে আমি সুস্থ হ'য়ে হাটিয়া বেড়াই!

শুনি অসম্ভব বাণী শচী ঠাকুরাণী;
কন "এ কেমন বুদ্ধি কিছুত না জানি!
পরম বৈষ্ণব সেই ব্রাহ্মণ দুজন;
জগন্নাথ সহিত অভেদ প্রাণ মন।
বিষ্ণু সেবা লাগি করে বহুত সম্ভার;
কেমনে মাগিব তাহা একি আবদার!"
দুই বিপ্র শুনি সব পরম উল্লাস;
"কেমনে জানিল একাদশী উপবাস?"
এ দেখি পরম শিশু প্রেমময় প্রাণ;
বালক দেহেতে স্বয়ং বিষ্ণু অধিষ্ঠান?
সার্থক মোদের আজি শ্রীহরি বাসর;
সেবা দ্রব্য কর সব শিশুর গোচর!
ব্রাহ্মণ দুজনে ল'য়ে সর্ব্ব উপহার;
শিশুরে আনিয়া দিয়া আনন্দ অপার!
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর লোমকূপে রয়;
হেন শিশু ক্রীড়া করে মিশ্রের আলয়!
জয় জয়ান্তর দাস ব্রাহ্মণ দুজন;
পূজার সম্ভার হেরি প্রেমানন্দ মন!
অলপ অলপ সব করিয়া সেবন;
হইলেন সুস্থ পরে শচীর নন্দন।
প্রাণের ভকত ল'য়ে প্রেমময় খেলা;
দেখালেন শ্রীগৌরাঙ্গ অতি শিশুবেলা!

সুদীন—শ্রীহরিচরণ দে।

প্রার্থনা।

—:০:—

কোথা রাধে ব্রজেশ্বরী
গোপী চূড়ামণি,

রাস বিলাসিনী রমা,
কুঞ্জ বিহারিণী।
কনক বরণী কৃষ্ণা,
মরী কৃষ্ণ প্রিয়া!
কাম কলা বতী কান্তা,
দেবী যোগমায়া।
কৃপা করে, প্রেম সুধা
করি বরিষণ,
সুশীতল কর মোর
তাপিত জীবন।

ভক্তিভিক্ষু—শ্রীমদেন্দমোহন ঠাকুর।

প্রলাপ।

—:০:—

দুই বৎসরের একটী শিশু গৃহমধ্যে উপবিষ্ট হইয়া ক্রীড়াতে উন্মত্ত রহিয়াছে এবং তাহার পার্শ্বে শিশুটীর পিতা সম্মুখে একটী দীপাধার রাখিয়া একখানি সংবাদপত্র হস্তে শুইয়া আছেন। দৈবাৎ শিশুটী কাঁদিয়া উঠিল। অমনি ত্রস্ত ভাবে তহার পিতা সংবাদ পত্র দূরে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে রে? কাঁদিস্ কেন?" শিশুটী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "আলোতে একটা পোকা উলে গেল, তাকে ধল্‌তে গিয়ে আমাল্ হাত পুলে গেল। উঁ উঁ উঁ ...।" পিতা শিশুটীকে বুঝাইয়া কহিলেন "মুখ্যু ছেলে, আলোতে কি হাত দিতে আছে? আলোতে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়, আর কখনও উহাতে হাত দিওনা বাছা! যদি আবার হাত দাও তাহলে তোমার জামা, কাপড় সব পুড়ে যাবে বুঝেছ! আর কখনও হাত দিও না।" শিশুটী তখন বলিল "না বাবা আল কক্‌খনো হাত দেব না।" মিনিট পনর পরে যখন শিশুর পিতা অল্প তন্দ্রাভিভূত হইয়াছেন তখন আবার একটী ক্ষুদ্র ফড়িং আলোকের মুখে উড়িয়া পড়িল। স্বভাব-সুলভ চঞ্চলতাবশতঃ চঞ্চল হস্তে অবোধ শিশুটী আবার সেই ফড়িংটীকে ধরিতে

যাইল। আলোকের উত্তাপের আধিক্য হেতু তাহার হস্তে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উত্তাপ লাগায়, যেমন ক্ষিপ্রতার সহিত সে হাত সরাইয়া লইতে গেল, অমনি অসাবধানতা হেতু দীপাধার সমেত দীপটী তাহার পিতার গাত্রে পড়িয়া গেল। পড়িবামাত্র শিশুর পিতা চমকাইয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং তাঁহার শিশু পুত্রের প্রতি চাহিলেন। দেখিলেন যে চোরের মত ভয়ে গৃহের একধারে বসিয়া আছে। ব্যাপার কি বুঝিতে আর অধিক কষ্ট স্বীকার করিতে হইল না। তিনি বিরক্ত ও রাগান্বিত হইয়া শিশুটীকে অনেক ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন "এই কতক্ষণ হইল তোকে বারন কল্লুম্ যে আলোতে হাতদিবিনি তুই কিনা আবার হাত দিয়া সব উল্টে ফেলে একাকার কর্‌লি। বজ্জাত, পাজি ছেলে।" এই বলিয়া শিশুটীর দুই গণ্ডে দুইটী চপেটাঘাত করিলেন। আর দেখে কে তাহার ক্রন্দন ধ্বনি নৈশ গগন ভেদ করিয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধে উত্থিত হইতে আরম্ভ করিল। তাহার পিতাও ক্রোধে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং যাইবার সময় বলিলেন "থাক্ তুই পড়ে। যেমন কাজ তেম্নি ফল।" তিনি কি সত্য-সত্যই ক্রোধান্বিত হইয়া বাটীর বাহিরে চলিয়া গেলেন? না তাহা নহে। তিনি ভাবিলেন আমি যদি এই গৃহমধ্যে থাকি তাহা হইলে ছেলেটী ক্রন্দনের সুরটী আরও সপ্তমে চড়াইবে। অতএব গৃহের বাহিরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি তাহা হইলে অল্পক্ষণেই আপনাআপনি রোদন ক্ষান্ত হইতে পারে। কিন্তু শিশুর রোদনও থামিল না এবং পিতা ও পুত্র বাৎসল্য নিবন্ধন আর অধিকক্ষণ বহির্ভাগে স্থিরচিত্তে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। তিনি গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে তাঁহার সন্তানটী গৃহের মেজের উপর লুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন করিতেছে। হায় রে অজ্ঞান শিশু! সে তাহার পিতাকে পুনর্ব্বার দেখিবামাত্র সকল শাস্তিজনিত ক্লেশ একেবারে ভুলিয়া পিতার ভালবাসা পাইবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি ছলছল নেত্রে চাহিয়া রহিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "বাবা, আমি খাবাল খাব।" হরি, হরি! কোথায় সে ক্রোধ, কোথায় সে দুর্ব্বাক্য ও তীব্র ভর্ৎসনা? তাহার পিতাও অমনি তাহাকে বক্ষে তুলিয়া ধরিলেন এবং কত সুমিষ্ট বাক্যে তাহাকে সান্তনা দিতে লাগিলেন। একটী মিষ্টান্নস্থলে দুই হস্তে দুইটী মিষ্টান্ন দিয়া বারম্বার তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন এবং শিশুর পূর্ব্বকৃত অবাধ্যতা হেতু সকল অপরাধ ভুলিয়া যাইলেন। কি নিঃস্বার্থ পুত্র বাৎসল্য! কি পবিত্র ভালবাসা!!

দয়াময়! তুমি যে আমার পিতা। আমি তোমার অজ্ঞান শিশু। জ্ঞানে অজ্ঞানে আমি বহুবিধ অকর্ম্ম করিতেছি। আমাকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত, আমার মঙ্গলের নিমিত্ত বহুবার কতই না উপযুক্ত শাস্তি দিয়াছ ও দিতেছ। কিন্তু অজ্ঞানতা বশতঃই হউক্ অথবা আপাতমধুর লাভাশায়ই হউক আমি আবার সেই দোষণীয় কর্ম্মে লিপ্ত হইতেছি; উপরি উক্ত শিশুর আলো ধরিবার ন্যায় পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও আমি আবার পাপ কর্ম্ম রূপ আলো ধরিতেছি। ইহাতে আমার হস্ত দগ্ধ হইতেছে সত্য কিন্তু পরক্ষণে সমস্ত ভুলিয়া আবার উহা ধরিয়া স্বয়ং কষ্ট ও যাতনা ভোগ করিতেছি এবং তৎসহিত তোমারও অপ্রিয়ভাজন হইতেছি। তাই বলিয়া কি প্রভু! তুমি আমাকে ত্যাগ করিবে? তাই বলিয়া কি তুমি আমাকে কৃপানেত্রে দেখিবে না? তুমি যদি আমার প্রতি বিরক্ত হইয়া আমাকে না দেখ প্রভো! তাহা হইলে পিতৃহারা শিশু কার কৃপাভাগী হইবে? বল পিতঃ বল তোমার অবোধ, অজ্ঞান শিশু কাহার দ্বারদেশে কৃপা ভিক্ষা করিবে? হে জগৎপিতা! আমি যে অবোধ আমি শিশুর ন্যায় বিবেক বুদ্ধি রহিত। অল্প বয়স্ক শিশুকে তাহার মাতা পিতা বিবিধ দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হইবার নিমিত্ত কতই না উপদেশ দেন। শিশু কিন্তু উহা শুনে না। সুবিধা পাইলেই দুষ্কর্ম্ম করিয়া ফেলে। কই তাই বলিয়া তাহার মাতা পিতা তাহাকে ত ত্যাগ করে না? তোমারই কোনও সন্তান গাহিয়াছেন,

শত অপরাধ করিব চরণে,
তুমি ত করিবে ক্ষমা।

প্রভো! আমি ত অপরাধ করিবই। তুমি আমাকে সহস্র উপদেশ দাও না কেন, পাপের নিমিত্ত সহস্র উপযুক্ত শাস্তি দাও না কেন আমি কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সমস্ত ভুলিয়া আবার শিশুর ন্যায় পাপে লিপ্ত হইব। যখন আবার তোমার শাস্তি ভোগ করিতে করিতে যাতনায় অস্থির হইয়া উঠিব এবং "এইবার আমাকে ক্ষমা কর প্রভো!" এই বলিয়া যখন কাঁদিতে থাকিব তখন তুমি কি স্থির হইয়া থাকিতে পারিবে? তখন কি আমাকে কোলে তুলিয়া আমার সকল অপরাধ ভুলিয়া তোমার অবোধ শিশুকে আবার নব আশ্বাসে আশ্বাসিত করিবে না? বয়োবৃদ্ধির সহিত শিশুর ক্রমে ভালমন্দ জ্ঞানের সঞ্চার হইলে সে যেমন আপনা আপনি একে একে দুষ্কর্ম্ম পরিত্যাগে বদ্ধপরিকর হয় সেইরূপ হে পিতঃ! আমি

এখন অবোধ, অজ্ঞান ও নিরক্ষর; এই সুবিশাল সাংসারে কোন্ কর্ম্ম দোষণীয়, কোন্ কর্ম্ম হিতকর তাহা উত্তমরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম। যে কর্ম্ম করিলে আপনার উপকার হইবে, জগতের উপকার হইবে, হয়ত মায়াবিনী কুহকিনী সেই কর্ম্মটী তদীয় মায়া প্রভাবে আমার সম্মুখে এমনি বিভীষিকাময় করিয়া তুলে যে, আমি দূর হইতে সেই কর্ম্ম হইতে বিরত হই। আবার দুষ্কর্ম্মগুলি এমনি মধুময় করিয়া তুলে যে আমি উহা সংকর্ম্ম ভ্রমে উহাতে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া দিবানিশি রত রহি পরে যখন ঐ অলক্ষিত পাপ কর্ম্ম অসহনীয় ও বিষময় ফল প্রসব করিতে আরম্ভ করে তখন সেই ডাকিনী খিল্ খিল্ করিয়া অট্টহাস্যে স্বীয় মায়াবরণ তুলিয়া লয় এবং তংপাপ কর্ম্মজাত অগ্নিময় ফল আমারই সর্ব্বাঙ্গে বিক্ষিপ্ত হইয়া আমাকে দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া দুর্ব্বিষহ যাতনা দিয়া থাকে। তাই কহি প্রভো! এই সংসারে ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা অদ্যাবধিও আমার জন্মে নাই সংকর্ম্ম ভ্রমে কতই না পাপ কর্ম্ম করিতেছি। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সহিত যেমন তাহার সদসং বিবেক শক্তির ধীরে ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় সেইরূপ ক্রমে আমাকে জ্ঞান দাও, বুদ্ধি দাও, ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা দাও যাহাতে বয়স্ক শিশুর ন্যায় আপনা আপনি একে একে সকল দোষণীয় কর্ম্ম হইতে বিরত হইতে পারি। যেপর্য্যন্ত না আমার প্রকৃত জ্ঞানের সঞ্চার হইবে সেই পর্য্যন্ত আমি যে শিশুর ন্যায় অগণন দোষে দোষী হইব ইহা আশ্চর্য্যের নহে কিন্তু তুমি যদি তোমার অজ্ঞান সন্তানকে দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত ক্ষমা নাকর তাহা হইলে উহা বরং আশ্চর্য্যের বিষয় হইয়া উঠিবে। তাই কহি প্রভো! যদ্যপি কখন বুদ্ধি দোষে দুষ্কর্ম্ম করিয়া ফেলি এবং সেই দুষ্কর্ম্ম হেতু পরে যাতনায় অস্থির হইয়া উঠি তুমি কি তখন পিতা হইয়া তোমার সন্তানের দুঃখ স্থির হইয়া দেখিতে পারিবে? তুমি কি তখন আমার সকল অপরাধ ভুলিয়া গিয়া আমাকে সান্তনা বাক্য দিবেনা?

শ্রীচুণীলাল চন্দ্র।

শেষ নিবেদন।

অই দেখ ভাই চাহি চারিদিকে।
ক্ষয়-ধ্বংস-মৃত্যু সকলেই হাঁকে॥
আজি যে কুসুম কোরক আকার
কল্য প্রস্ফুটিত কি গন্ধ-বাহার।
পরশ্ব বিশুষ্ক ধূলায় পতন
বলে গেল "দশা আমার মতন॥"
উঠিল তপন হিঙ্গুল বরণ
যৌবনে প্রতাপে রাজ্যের পালন-
করি, সায়াহ্নেতে ত্যাজিল জীবন
বলে গেল "দশা আমার মতন॥"
আজিকে পূর্ণিমা পূর্ণচন্দ্র হাসি
করি বিতরণ সন্তোষের রাশি,
কালিকে অমার আঁধারে মগন
বলে গেল "দশা আমার মতন॥"
আসিল মোহন-বেশে ঋতুরাজ
কিছুদিন সাধি যত্নে নিজ কাজ
অজানা প্রদেশে করিল গমন।
বলে গেল "দশা আমার মতন॥"
হেনমতে ভাই! যে দিকে চাহিবে
ধ্বংসের সুদৃশ্য দেখিতে পাইবে
"ক্ষয়-ধ্বংস-মৃত্যু" করিবে শ্রবণ
"ক্ষয়, ক্ষণ স্থায়ী, উত্থান পতন॥"
চলহ শ্মশানে শুনিবে সুনীতি
হাসি নরমুণ্ড কহিছে ভারতি ;—

"বিলাসিতামগ্ন কেনহে ভুবন ?
সকলের দশা আমার মতন ॥"
"শুন শুন ভাই ! বিকট চীৎকারে
থেকোনা বিভোর মায়া তন্দ্রাঘোরে ॥
সৎগ্রন্থ-পাঠ কর সৎসঙ্গ
পরিহার কর বিষয়ীর সঙ্গ
বিতাড়িত করি কুবৃত্তিরগণ
সুবৃত্তি নিচয়ে দেহ সিংহাসন ॥
মৃত্যুকে সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিবে
হিতাহিত ভাবি কার্য্যে হাত দিবে ॥
নিজ দোষাবলী করিয়া লিখন
সতত সম্মুখে রাখিবে স্থাপন ॥
আহার-বিহারে সাবধান হবে।
মিথ্যা কথা হাস্য, বিদ্রুপ ত্যজিবে ॥
এক পিতা মাতা হইতে উদ্ভব
ভাবি নিজ সম দেখিবেক সব ॥
পদ্ম-পত্র-গত জীবন যেমন
তথা সব কর্ম্ম-কর সমাপন ॥
পলসাড়া-জ্ঞানী গুরুর সমান
থোরহ সংসারে, ডাক ভগবান্ ॥
থাকিলে ঈশ্বরে মতি নিরন্তর
যত বাধা তব হইবে অন্তর ॥
পুতুল খেলায় মগ্না ততদিন,
উদ্বাহ বালার নহে যতদিন ॥
দান ধ্যান পূজা মোদের (ও) তেমন।
যত দিন নাহি মিলে জনার্দ্দন ॥
প্রাণ-কর্ম্ম ধর্ম্ম, অকর্ম্ম সকল
বুঝি কর কার্য্য, হে ভাই সকল

কি আর বলিব বেলা যায় যায়।
করি কাজ এস—এসহে ত্বরায়॥

শ্রীবসন্তকুমার প্রামাণিক।

খোঁজা।

—:০:—

কথাটা যাই হোক্ কিন্তু কখন, ঠিক কোন্ সময়ে জিনিষটা একজনের প্রাণের ভিতর হটাং এসে ঠেলা দেয় তা সে নিজে অনুভব কত্তে গিয়ে নানা রকম জটীল মনোবৃত্তির ভিতর হারিয়ে ফেলে। ঐ যে ঘুম ভাঙ্গা থেকে আবার চোখ বোজা পর্য্যন্ত মনটা বাহিরের সকল রকম জিনিষ গুলাকে ছুঁয়ে বেড়ায় ঐ যে তার মংন আর পাঁচটা মনের বিবিধ ভাবের রং লাগিয়ে নিজের ভিতর যে অপর মন গুলার প্রতিবিম্ব নিয়ে নিজস্ব কর্‌বার চেষ্টা করে তার মধ্যে কোন্‌খানে সেই রহস্যটুকু লুকিয়ে আছে যেটী ভিন্ন হয়েও এক, পৃথক হয়েও পৃথক নয়; সেইটা খোঁজা যায় কি খোঁজা যায় না সেই কথাটাই একবার তলিয়ে দেখ্‌লে হয় না কি? আমরা যেমন করেই আসিনা কেন এই পৃথিবীতে যখন বেশ জাঁকিয়ে বসা গেছে আর খুব প্রতিপত্তি ও আধিপত্য বরাবর বাড়িয়ে আস্‌ছি তখন নিজের ঘরটা একবার খুঁজে পেতে দেখ্‌লে হয় না কি যে, যেজায়গাটায় আছি সেটা থাক্‌বার মত কি ফেলে চলেযাবার মত। তুমি হয়ত বল্‌বে যখন পৃথিবীটা আমাদের পুরাতন ভিটে আর এই এত অগণিত বৎসর যাবৎ আমরা এর রাজা হয়ে রাজ্য সুখভোগ কচ্ছি তখন নাই বা দেখ্‌লাম আমার অবস্থা, নাই বা খুঁজলাম আমার এখানে আশে পাশে ভিতরে বাইরে কি আছে না আছে। কিন্তু তুমি হিন্দু তোমার হয়ত মনে নেই কেন তোমার দেশটাতে বিদেশী এসে রাজা হয়েছে। তুমি বড় কুঁড়ে তাই তোমার কুঁড়ে ঘর ঘোচেনা। তোমার ঘরের একটা কাগজ খুজ্‌তেহলে তুমিবল "কে অত ঘাঁটাঘাঁটী করে থাক্ পরে দেখ্‌বো" কিন্তু তোমার ঘর খুঁজে বিদেশী এসে তোমার রত্ন লুটে নিয়ে যায়। সেই জন্য বলি তুমি পৃথিবীতে বুড়ো হ'লেও, তুমি পৃথিবীতে একাধিপত্য কল্লেও হে মানুষ!

তোমার স্বরটা একবার খুঁজে দেখো ; না হলে যারা তোমাদের নীচে যাদের পশু বল তারাই তোমাদের রাজা হবে।

ঐ যে পুরাতণ ঋষিরা বেদের একটা গুরু গম্ভীর সুরে আর মধুর আকর্ণী ছন্দে "উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ" বলে চেঁচিয়ে ছিলেন তা কেন জান ? তাঁরা অনেক খোঁজ করে ছিলেন তাঁরা যেখানটায় প্রথম বাসা বাঁধতে এসেছিলেন সেখানের জল বায়ু অগ্নি আকাশ পৃথিবী চারিপাশে খুঁজে ছিলেন আর খুঁজে পেলেন কি ? না যা পেলেন তা আর বলা গেলনা। শুধু বলে গেলেন "অবাঙ মনসগোচর।" তার পরথেকে যে কেউ খুঁজতে যায় সেই হারিয়ে যায়। কথাটা কিন্তু উল্টো। হয়ে গেল কেন না আমরা বলি সে হারিয়ে গেল অথচ সে বলে "পেয়েছি পেয়েছি" আর দ্বিতীয় কথা তার কাছে শোনা যায় না।

কিন্তু এই অনুসন্ধান করবার যে উপায়টা, যে ক্রমটা সে নিয়েছিল খুঁজতে খুঁজতে পথে বাটে যাকিছু দেখলে তা ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনে ধরে রেখে দিলে। কেন কল্লে জান ? মানুষের মনে অপত্য স্নেহ ব'লে একটা বৃত্তি আছে। সেই বৃত্তিটা বল্লে "আহা যে বাছারা পৃথিবীতে এরপর জন্মাবে তারা আবার কোথায় কষ্টকরে হাতড়াবে তাদের জন্য এই ফর্দ রেখে দিলাম তারা সাবালক হ'লে দেখবে আর কড়ায় গণ্ডায় সব বুঝেনেবে।" কিন্তু ঐ যে শাস্ত্র, দর্শন যার ভিতর দিয়ে আমরা এখন খুঁজতে যাই তার শেষ কালে দেখি হিসাবে মেলে না। খুঁজতে গিয়ে জটীল হয়ে পড়ে গোলক ধাঁধাঁ তৈয়াব হয়ে যায়। তার মানে কি ?

তার মানে আর কিছুই নয় কেবল বিস্মৃতি আর আলস্য। কেননা শাস্ত্র সমুদ্রের মধ্যে পড়লেই হাবু ডুবু এমন হবে যেরত্ন খোঁজা ভুলে যাবে আর এমন আলস্য হবে যে ঢেউএর মাথার ওপর অভিমানের ভঙ্গিতে উঠে কল কল কত্তে কত্তে চারিদিক মুখরিত করে তীরে এসে সটান ঘুমিয়ে পড়বে ; তোমার যে অনন্ত যাত্রা তা স্বপ্নেও মনে আসবে না। সেই জন্য পুরাতন ঋষিরা শুধু শাস্ত্রের ভিতর খুঁজতে বারণ করেছেন কেননা কাসেমের মত একঘর টাকার সন্ধান পেলেও "চিচিং ফাঁক", কথাটা যদি মুখস্থ কত্তে ভুলে যাও তবে টাকা পেয়েও পাবে না। কাজে কাজেই সে খোঁজায় একটা পরিশ্রম খুব হবে বটে কিন্তু তার সঙ্গে যদি জিনিষটা পাবার জন্য একটু লোভ বেশী হয় তবে এমনি মজা যে, যে সত্যকে সে এত

খুঁজছিল তাকেই নিতান্ত কাছে দেখ্‌তে পাবে। তবে এই খোঁজায় যে সুড়ঙ্গের ভিতর প্রবেশ কর্ত্তে হবে তার সন্ধান কে দেবে?

ঠিক এইখান্‌টাতে মানুষের প্রাণে কোন্ সময় খোঁজার জন্য ব্যাকুলতা জেগে ওঠে তা কে বল্‌তে পারে? এই পৃথিবীময় লোক কিল কিল কচ্ছে, দেশে দেশে (আবার ডাঙ্গায় কুলোয়না জলে বাসা করে) দিন কাটাচ্ছে এই যে এদের প্রাণে একসঙ্গে এক রকম একটা প্রশ্ন কেন ওঠেনা এইটাই না বড় রহস্যের কথা; আমি যেমন করে ভাবি তুমি তেমন করে ভাব না; আমি ঐ অমল ধবল শৈল শ্রেণীর উপর সন্ধ্যার সূর্য্যাস্তের কিরণস্পর্শ যে চক্ষে যে ভাবে দেখ্‌ছি তেম্‌নি কি ঐ ভুটীয়াটা দেখ্‌ছে? না ঐ দেখে আমার মনে যেমন রস, তৃপ্তি, শান্তি আস্‌ছে ঠিক তেম্‌নিটী ওর মনেও আস্‌ছে? না তাত আসেনা; তবু আমি আর ঐ ভুটীয়াটা সেই মানুষই বটে।

এই যে এতটা তফাৎ অথচ এক, এজন্য খোঁজা জিনিষটা মানুষের প্রাণের ভিতর খুঁজলে কোথাও কোথাও বেরুচ্ছে কোথাও একবারে লুকিয়ে রয়েছে কিন্তু লুকিয়ে থাক্‌লেও যাদের প্রাণে লুকিয়ে আছে তারা কিন্তু এম্‌নি ঠক্‌ছে যে কি বল্‌বো। কেননা তারা যদি একটী বার দেখে যে তাদের মনের যে ছুটোছুটী হুটোপাটী আর বাসনার সঙ্গে জিনিষের সঙ্গে অনবরত লড়াই তারই ভিতর খোঁজ করবার জন্য একটা ডিটেক্‌টিভের মত একটা মোটা রকমের ইচ্ছাকে অপর পাঁচটা কামনায় ধরে চেপে রেখেছে তাহলে তারা কোমর বেঁধে লণ্ঠন হাতে করে পথে পথে খুঁজ্‌তে বেরোয়। কিন্তু প্রথমত মানুষের প্রাণে এই খোঁজার বৃত্তিটাকে খুঁজে বের কর্ত্তে হয়।

"যদি খোঁজার দেখা পাও তা হ'লে তাকে বোলো" তোমায় বেশী কিছু কর্ত্তে হবেনা খুব ধাক্কা মার খুল্‌বেই খুল্‌বে"। Knock it and it shall be opened unto you.

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। (উকীল)

খেদোক্তি।

—:০:—

প্রাক্তন করম ফলে,
দুর্বিষহ দুঃখানলে,—
হইতেছি দগ্ধীভূত, কাঁদে প্রাণ অনিবার।
দুঃখের নাহিক ওর,
চিন্তাকীটে নিরন্তর—
হইতেছে জর জর অবসন্ন প্রাণাধার॥
ভকতের সঙ্গ গুণে,
ভক্তি শাস্ত্র অধ্যয়নে,
হয়েছিল এ হৃদয় আনন্দ অমিয়াধার।
সংসার তপন তাপে,
রোগ, শোক অনুতাপে,
বিশুষ্ক, মলিন এবে নিরবধি দুঃখাগার॥
এ দুঃখের বোঝাবহি,
দারুণ যন্ত্রণা সহি,
শান্তিহীন প্রাণে ভবে কতকাল রব আর।
দয়াল হরি কৃপায়,
পাইয়ে মানব কায়,
আশা না পূরিল হায়, আসা যাওয়া হল সার॥
দয়াময় গৌররায়!
কৃপাকর অভাগায়,
নিরাশার আশা তুমি অনন্ত করুণাধার।
তব রাঙ্গা শ্রীচরণে,
নিবেদি কাতর প্রাণে,
স্নিগ্ধ কর শান্তি-নীরে দগ্ধ হৃদি অভাগার॥

শ্রীশশিভূষণ সরকার।

ভক্তি।

১০ম বর্ষ। ১৩১৯ সাল। } শ্রাবণ মাস। { ১২শ সংখ্যা।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥

প্রার্থনা।

'অহংহরে! তব পাদৈকমূল-
দাসানুদাসোভবিতাস্মি ভূয়ঃ।
মনঃ স্মরেতা-সুপতেগুর্ণানাং
গৃণীতবাক্ কর্ম্মকরোতু কায়ঃ॥

হে দয়াময় শ্রীহরে! যে সকল ভক্ত, সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ শান্তিময় তোমার শ্রীচরণ-মূলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা কায়মনপ্রাণে তোমার শ্রীচরণে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন, আমার একান্ত বাসনা আমি যেন জন্মে জন্মে তাঁহাদের দাসানুদাস হইয়া, বাক্য দ্বারা তোমার নামগুণ কীর্ত্তন, মন দ্বারা তোমার লীলাগুণ স্মরণ এবং দেহদ্বারা তোমার সেবার কার্য্য করিয়া ধন্য হইতে পারি।

লীলাময়! তোমার লীলা নিকেতন, এই জগৎ সংসারে জীব মাত্রেই তোমার ক্রীড়া পুত্তলিকা, তুমি নিরন্তরই তাঁহাদের লইয়া নানা প্রকার খেলা খেলিতেছ, কিন্তু মায়ামুগ্ধ জীব যতদিন খেলার মর্ম্ম বুঝিতে না পারে, যতদিন অকপট প্রাণে তোমাকে আত্ম সমর্পণ করিতে না পারে, ততদিনই তাহারা আপনাপন কর্ম্মানুযায়ী ফল ভোগ দ্বারা সুখ দুঃখের ঘাত প্রতিঘাতে চঞ্চল হইয়া থাকে। যাহাকে তুমি নিজগুণে কৃপা করিয়া—আপন করিয়া তোমার খেলার মর্ম্ম বুঝাইয়া দাও কেবল সেই ভাগ্যবান ভাগ্যবতী নরনারীই, তোমাকে আপন করিয়া কায়মনে তোমাকে আত্ম সমর্পণ করিয়া কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভে সমর্থ হয়। মঙ্গলনিদান! তুমি না বুঝাইলে তুমি না কৃপা করিলে কোটী কোটী জন্ম ধরিয়া চেষ্টা করিলেও তো কেহ তোমার লীলা খেলার মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হয় না। তাই কাতর প্রাণে প্রার্থনা, তুমি আপন গুণে এই নির্গুণ দীনহীনকে জগৎ ভরা তোমার আনন্দময় লীলা দর্শনোপযোগী ভাবনেত্র প্রকাশ করিয়া দাও, আমি তোমার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া তোমার প্রদত্ত ভাবনেত্রে তোমারই পূর্ণানন্দময় লীলার সত্ত্বা অনুভব করিয়া ধন্য হইয়া যাই। তোমারই অশেষ করুণা বলে বেশ বুঝিয়াছি ও বুঝিতেছি যে, সংসার

অতি ভয়ঙ্কর স্থান, এ স্থানে পদে পদে পদস্খলনের ভয়। কেননা বেশ দেখিতেছি যে, আকুল প্রাণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া, তোমার নিকট হইতে যদি কখনও ভাবের কণামাত্রও লাভ করিতে সমর্থ হই, তবে ভাবে মজিতে না মজিতে, খেলার মর্ম্ম বুঝিয়া কৃতার্থ হইতে না হইতেই এমন বিক্ষেপ, এমন অশান্তি, এমন অভাব উপস্থিত হয় যে, তাহার অত্যাচারে সকল পরিশ্রম, সকল আশা ভরসা ও সকল প্রকার ভাবই একেবারে সমূলে নির্ম্মূল হইয়া যায়। ভাব লাভ করিয়া যেটুকু শান্তি লাভ করিয়াছিলাম একেবারে তাহার শতগুণে অশান্তি আসিয়া ক্লেশের উপর ক্লেশ দিতে থাকে।

হে সর্ব্বনিয়ন্তা বিশ্বজীবজীবন। আর কতদিন আমাকে এইরূপ ভাবে পরীক্ষা করিবে, আমি যে তোমার পরীক্ষার সম্পূর্ণ অযোগ্য, এরূপ ভাবে, ওঠানামা করিতে আমি যে সম্পূর্ণ অসমর্থ। যদি আমাকে ওঠানামা করাইয়া তোমার সুখ হয়, যদি আমাকে কষ্ট দিয়া তুমি আনন্দ পাও তবে কৃপা করিয়া আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিয়া যত ইচ্ছা কষ্ট দাও আমি কিছু বলিব না। এই ভাবে খেলার মর্ম্ম না বুঝাইয়া দিয়া আর ওঠা নামার কষ্ট দিওনা, আমি এ যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে পারি না। যাহারা তোমাকে একেবারে ভাবেনা বা ডাকেনা, তাহারা এক রকম বেশ আছে। কিন্তু নাথ! একবার ডাকিয়া বা একবার ভাবিয়া তোমার অনুতোপম ভাবের আভাষ পাইয়া যাহারা বঞ্চিত হয় তাহাদের যে কিরূপ কষ্ট অন্তর্যামী তুমিতো তাহা সকলই জানিতে পার। তোমারই কৃপায় যখন তোমাকে ভাবিয়া তোমার ভাবের আভাষ লাভে সমর্থ হইয়াছি, তোমায় ভাবিলে, তোমাকে ডাকিলে তোমাকে অকপট প্রাণে ভাল বাসিতে পারিলে যে সুখ পাওয়া যায় এই বিশ্বাস যখন আসিয়াছে তখন আর বিক্ষেপাদি দিয়া সেই সুখে বঞ্চিত করিয়া দুঃখ দিওনা। তুমি কৃপা করিয়া সমস্ত বিক্ষেপ, সমস্ত বিপদ ও সমস্ত অভাব দূর করিয়া দাও, এবং আশীর্ব্বাদ কর যেন বিপদা-পদের ঘাত প্রতিঘাতে চঞ্চল না হই। তোমার ভাবে মজিয়া তোমার খেলার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া যেন অবাধে সংসার ক্ষেত্রে তোমার নামের জয় দিয়া জীবন কাটাইতে পারি। রাজ রাজেশ্বর বাঞ্ছাকল্পতরুর নিকট যেন দীনহীন কাঙ্গালের এই ক্ষুদ্র প্রার্থনাটী অপূর্ণ না থাকে, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীদীনেশ চন্দ্র শর্ম্মা।

শ্রীগৌরাঙ্গ।

(গীতিকা।)

—:০:—

তুমি হে গৌরচন্দ্র।
ভকত হৃদয় মানস রঞ্জন, নিখিল ভুবন বন্দ্য॥

তুমি শচীর দুলাল, পরম দয়াল, গৌরকান্তি লইয়া।
পতিত তারিতে নাম বিলাইতে, ধরায় এলে নামিয়া॥
দিলে আলিঙ্গন দিয়ে নব, সুনি [illegible] প্রেম,
(আমি) দেখালে রসের রঙ্গ॥

হে ও আনন্দ কন্দ।
তুমি গৌর সুন্দর, ভুবনমোহন, নদীয়া-গগন-চন্দ্র॥

আজি নাম গানে [illegible] নে, গেছে যে বিশ্ব ভরিয়া!
গভীর আঁধারে দূরে [illegible] রে আছি যে আমি পড়িয়া॥
বঞ্চিত প্রাণে শ্রীনাম [illegible]নে
হইয়ে আছি যে অন্ধ।
তুমি, ত্রিলোক আলোক, নাশ দুঃখ শোক,
ঘুচায়ে দাওহে ধন্দ॥

ওহে শ্রীগৌরচন্দ্র।
তোমারি লাগি এ মোর চিত্ত, সন্তাপে গেছে জ্বলিয়া।
তুমি রসিক নাগর, রসের সাগর দাও প্রেমরসে রসিয়া॥
করুণার একবিন্দু-সঞ্চারে লভিব পরমানন্দ।
মধুর ঝঙ্কারে, গাহিব সংগীত, দাও হে পদারবিন্দ॥

হে মোর গৌরচন্দ্র॥
আমি দীন হীন, সদাই মলিন, তোমারি ভরসা করিয়া।
বহুদিন হ'তে পড়িয়ে বিপদে, কাতরে আছি যে চাহিয়া॥

ওহে বিপদ-বারণ, অধম তারণ,
ছাড়হে চাতুরী-রঙ্গ।
হে করুণাকর, দীনে দয়াকর দূরকর ভব-বন্ধ॥
হে আমার গৌরচন্দ্র॥

দীন—শ্রীরসিকলাল দে।

বর্ষশেষে সম্পাদকীয় নিবেদন।

—:০:—

ভক্ত গ্রাহক অনুগ্রাহক মহোদয়গণ! সুখ দুঃখের লীলা নিকেতন সংসার ক্ষেত্রে, আপনাদিগের ভালবাসা ও শ্রীশ্রীভগবানের অপার করুণাবলে দেখিতে দেখিতে আপনাদিগের অতি স্নেহে প্রতিপালিতা ভক্তি পত্রিকাখানি আর একটী বৎসরের পূর্ণতা লাভে সমর্থ হইলেন। সময় কাহারও হাতধরা নয়, সে কাহারও সুখ, দুঃখ, ভাল, মন্দ, হিতাহিত বিবেচনা করিয়া চলেনা, সে নিরন্তরই নিজ কর্ত্তব্য সাধনে রত। কেহ তাহাকে দেখুক আর না দেখুক, কেহ তাহাকে যত্ন করুক বা না করুক সে তাহা লক্ষ্য করেনা বা নিজ কর্ত্তব্য পালনে কখনও পরাঙ্মুখ হয় না, সে নিরন্তরই জগতের যাবতীয় কার্য্য কলাপকে অতীতের অতল সলিল গর্ভে নিমজ্জিত করিয়া হু হু শব্দে চলিয়া যাইতেছে। তবে কেহবা সাধন ভজনাদি দ্বারা আত্মার উন্নতি বিধান করিয়া সময়ের সংব্যবহার করিতেছেন আর কেহবা সদালোচনারূপ অমৃত পানে বঞ্চিত থাকিয়া দিন দিন নিজের আত্মার অধঃপতন করিতেছেন এবং অপরের প্রাণেও ঐরূপ ভাবের বিষময় বীজ সঞ্চারিত করিয়া দিয়া পরোপকার সাধনের পরিবর্ত্তে ঘোর নারকীয় ভাবের পুষ্টতা সাধন করিতেছেন ও ভগবানের নিকট পদে পদে অপরাধী হইতেছেন।

সাধন ভজনেরত সৌভাগ্যবান সৌভাগ্যবতী নরনারী সৎসঙ্গ ও সদালোচনাদি রূপ সুধাময় ফল সংগ্রহ করিয়া মানবজীবনের লক্ষ্য ও কর্ম্ম সমূহের পরিণাম স্থির করিয়া নিজ নিজ কুসংস্কার ও কুপ্রবৃত্তি প্রভৃত কুৎসিৎ ভাবসকলকে কালের

প্রবল স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া ক্রমোন্নতীর পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহারা সময়ের গতির সহিত এইরূপ অনুভব করিয়া থাকেন যে, একটা বৎসর গত হইল তাই কত প্রকার নূতন নূতন কথা, নূতন নূতন ভাবপূর্ণ শিক্ষালাভে ধন্য হইলাম, জীবন প্রদীপের যতটুকু তৈলক্ষয় হইল তাহা যেমন আর ফিরিয়া আসিবে না, আমারও ঐ সঙ্গে সঙ্গে যে সকল অজ্ঞান জনিত মত্ততা ও মন্দভাব সকল দূর হইয়া গেল তাহাও আর ফিরিবেনা; আমি এক্ষণে আগামী নূতন বর্ষে নূতন নূতন বিষয় শিক্ষালাভ করিয়া ও অনুষ্ঠান করিয়া ইহা অপেক্ষাও ক্রমে উন্নত—শুদ্ধ—পবিত্র হইব"। সদালোচনা সদুপদেশ ও ভগবদ্ভক্তগণের পবিত্র আচার ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা যে কত সুখকর ও কত আবশ্যকীয় ক্রমোন্নতীর সোপানে সমারূঢ় সেই নরনারীগণই তাহা বুঝিতে সমর্থ।

আর যাহারা নিজনিজ বদ্ধমূল কুসংস্কারের মোহময় শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া, কেবল মাত্র অসৎসঙ্গ, পরচর্চ্চা প্রভৃতি কুৎসিৎ ভাব সকল লইয়া জীবনের অমূল্য সময় অতিবাহিত করে, আত্মোন্নতীর দিকে কিছুমাত্রও লক্ষ্য করেনা, যাহাদের বিবেক শক্তি তমোগুণরূপ মেঘে সমাচ্ছাদিত, তাহারা সদালোচনা সৎসঙ্গ বা সৎগ্রন্থাদি অধ্যয়নের যে কি আবশ্যকতা তাহা বুঝিতে পারে না বা কাহাকে বলে তাহাও জানে না, কেবল ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়গণের দাস হইয়া আহার নিদ্রাদি দ্বারাই সুদুর্লভ মানব জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করে, একটা বৎসর গত হইলে, তাহাদের হৃদয়ের পাপ তাপ, হা হুতাশ, জ্বালা যন্ত্রণা প্রভৃতি কুফলগুলিও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তখন কেহবা ভাবে হায়! হায়! হইল কি! যে বিষয় ভোগের জন্য স্ত্রী পুত্রাদি পরিজনবর্গকে লইয়া সুখ ভোগ করিতেছিলাম তাহার তো একটা বৎসর কমিয়া গেল, কৈ—আশানুরূপ আনন্দ, আশানুরূপ সুখতো পাইলাম না। দেহ বা মনের অশান্তিতো দূর হইল না, কর্ম্মের বা কর্ম্মফল ভোগের তো শেষ হইলনা; হায় হায় কি করিতে কি করিলাম।

আর এক শ্রেণীর লোক আছে তাহারা উক্ত দুই ভাবের কোন ভাবেরই ভাবনা ভাবেনা, তাহারা কেবল বৃথা ভোগ বিলাসে মত্ত হইয়া ইন্দ্রিয়গণের আদেশ ক্রমে বৃথা আমোদ আহ্লাদে যে কোন প্রকারে দিনপাত করাই জীবনের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া মনে করে। তাহারা বোঝেনা যে মনুষ্য জীবন কত উচ্চ ও দুর্লভ,

তাহারা জানেনা যে এরূপ কর্ম্মের পরিণাম কি, এবং তাহারা ভাবেনা যে পরিণামে ইহা হইতে কিরূপ বিষময় ফল ফলিতে পারে।

এই ত্রিবিধ অর্থাৎ সৎভাবাপন্ন, সৎভাব লাভেচ্ছুক ও অসৎভাবাপন্ন লোকের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য নানা প্রকার শাস্ত্র যুক্তি ও ভক্তসাধুগণের জীবনী সম্বলিত প্রবন্ধাদিরূপ নানা আভরণে সুশোভিত হইয়া যথাসম্ভব ভক্ত নরনারীবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন মানসে, আজ দশবৎসর যাবৎ ক্ষুদ্র ভক্তি ডালিখানি ভক্তের দ্বারে দ্বারে কৃপাপ্রার্থী হইয়া আসিতেছেন। যাঁহারা প্রথমবর্ষ হইতে উহাকে নিজ ক্রোড়ে স্থান দান করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারাই বুঝিতেছেন যে, নিজ উদ্দেশ্য সাধনে ইনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সে সম্বন্ধে সমালোচনা করা আমার পক্ষে বাহুল্য বিবেচনায় সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণের উপরেই সে ভার অর্পিত হইল।

নানা প্রকার বিঘ্ন বিপদ সঙ্কুল এই ঘোর সংসার ক্ষেত্রে আমার ন্যায় ক্ষুদ্র কীটানুকীটের ইচ্ছা অতিশয় অকিঞ্চিৎকর। যে শক্তি না পাইলে জীব অতি সামান্য কার্য্য করিতেও অক্ষম সেই সর্ব্ব বিজয়ী শক্তি বলেই ক্ষুদ্র ভক্তি পত্রিকা খানি, আজ দশ বৎসর যাবৎ যথা সম্ভব নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া আসিতেছেন। নতুবা আমাদিগের ন্যায় ক্ষুদ্র শক্তি বিশিষ্ট মানবের দ্বারা এরূপ দুরূহ ব্যাপার সম্পন্ন হওয়া নিতান্তই অসম্ভব।

যিনি কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারেন যে, সেই কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া পর্য্যন্ত তাহার কতদূর দায়িত্ব থাকে এবং সেই সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীহরির কৃপায়, যদি সেই কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, তবে কত আনন্দ ও কত সুখ। আজ কয়েক বৎসর যাবৎ শ্রীভগবানের কৃপায় ও ভক্তগণের আশীর্ব্বাদে দীনহীনও সে আনন্দ লাভে বঞ্চিত নহে। নিরর্থক, স্বার্থপর জীবনের অনেকটা সময় যে সর্ব্বসাধারণের জন্য ভক্তি ভাণ্ডারে, ব্যয় করিতে পারিয়াছি ও পারিতেছি, ইহাও আমার পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা নহে।

ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান এই তিনটীই এক এবং অভিন্ন, ইহার যেকোন একটীর আলোচনা করিলেই অন্য দুইটীর বিষয় আপনা আপনি আসিয়া পড়ে। শ্রীভগবানের পবিত্র লীলাদির আলোচনা দ্বারা যেমন জীবন সার্থক হয়, ভক্তি বা ভক্তের আলোচনায়ও সেইরূপ হইয়া থাকে। শ্রীভগবান নিজ মুখেই বলিয়াছেন "অহং ভক্ত পরাধীন" শ্রীমদ্ভাগবতে আরও বলিয়াছেন ;—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহং।
মদন্যত্তে নজানন্তি নাহং তেব্য মনাগপি"

অর্থাৎ ভক্তগণ আমার হৃদয় আমিও ভক্তের হৃদয়,' ভক্তগণও যেমন আমাকে ভিন্ন অন্য কিছু চায় না আমিও তদ্রূপ ভক্ত ভিন্ন আর কিছু চাইনা, ভক্তও যেমন আমার অধীন আমিও তদ্রূপ ভক্তের অধীন, ভক্তের নিকট আমার জোর করিবার কিছুই নাই

"ভক্তের হাতে প্রেমের ছুরি!
যেদিকে ফিরায় সেইদিকে ফিরি॥"

ভক্তবৎসল শ্রীহরির অপার করুণা বলে যে, সেই ভক্ত ও ভক্তির পদ সেবায় নিয়োজিত হইতে পারিয়াছি আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির ইহাই যথেষ্ট লাভ।

অবশেষে আমার নিবেদন যে, যাঁহারা এই পত্রিকা হইতে আত্মোন্নতীর অনুকূলে বা ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুমাত্রও উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা যেন আপনাপন বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে সেই সেই সুখ ও উন্নতির ভাব উৎসাহের সহিত প্রচার করিয়া ধর্ম্ম জগতের একটী মহৎ কার্য্যের সহায়তা করেন। যে সকল ভক্তগণ ভক্তিতে প্রবন্ধ লিখিয়া বা লিখিত প্রবন্ধ পাঠে সুখী হইয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ ও উৎসাহ দান করিয়াছেন ও করিতেছেন তাঁহাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। তাঁহাদের নিকট আমার ইহাও নিবেদন যেন পূর্ব্বপূর্ব্ববৎসরের ন্যায় আগামী বৎসরেও ঐরূপ উৎসাহ দান করিয়া যাহাতে ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে পারি তাহা করেন

কৃপাপ্রার্থী—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
(সম্পাদক)

রে মন!

—:০:—

পাইয়ে এমন, দুর্লভ জনম,
অনিত্য সুখের আশে।
হ'য়ে মায়ামুগ্ধ, কেন হও দগ্ধ,
দুঃখ ময় ভব বাসে॥

এ ঘোর সংসারে জ্বলিছে নিয়ত,
অশান্তি অনল রাশি।
চল যাই যথা শান্তি সমীরণ,
বহিতেছে দিবানিশি॥
সন্তাপ নাশিনী, প্রেম মন্দাকিনী,
ধীরে ধীরে সদা বহে।
সে নীর পরশে, মানব পরাণ,
সদানন্দে মাতি রহে॥
শ্রীরাধা চরণ, করিয়ে স্মরণ,
চল যাই সেই স্থান।
তথা, অমর বাঞ্ছিত, রজে বিলুণ্ঠিত,
হইব, জুড়াবে প্রাণ॥
কালিন্দী সলিলে, করিব স্নান,
ঘুচিবে কামনা মলা।
প্রবেশি কাননে, বিবিধ প্রসূনে,
আনন্দে গাঁথিব মালা॥
রত্নবেদি পরে, কিশোরী কিশোরে,
হেরিব নয়ন ভরি'।
হ'য়ে কুতূহলী, দিব প্রেমাঞ্জলি,
রাতুল চরণোপরি॥
বসি তরু তলে, পিব কুতূহলে,
যুগলের নাম সুধা।
প্রেমে পুলকিত, হ'বে প্রাণ চিত,
দূরে যাবে ভব ক্ষুধা॥
কভু প্রেম ভরে, যাব ধীরে ধীরে,
রসিক ভকত পাশ।
লীলারসবাণী, শুনিব শ্রবণে,
পুরিবে প্রাণের আশা॥

গভীর নিশিথে, ভাবের আবেশে,
বসিব কালিন্দী তীরে।
মুরলীর ধ্বনি, শ্রুতি যুগে শুনি,
ভাসিব আনন্দ নীরে॥
তাই বলি মন, নাহি প্রয়োজন,
এই দুঃখময় ভবে
চল যাই সেই আনন্দ কানন,
জীবন সফল হবে॥

দীন—শ্রীশশি ভূষণ সরকার।

প্রশ্নোত্তর।

[আমি আমার প্রেম-রাজ্যের প্রিয় সুহৃদ, ঢাকা, হাঁসাড়া নিবাসী শ্রীল শ্রীযুক্ত দাদা কালীহর দাসবসু ভক্তি সাগর মহাশয়ের নিকট মনের সন্দেহ নিবৃত্তির জন্য কয়েকটী প্রশ্ন করিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর ভক্তি সিদ্ধান্ত মূলক, এবং ভক্তজনের আস্বাদ্য। সাধু সজ্জনের প্রীত্যর্থে সেই উপাদেয় উত্তর রত্নগুলি প্রশ্নসহ ক্রমে "ভক্তির" শ্রীঅঙ্গে পরাইয়া দিতেছি। শ্রীবিজয় নারায়ণ আচার্য্য।]

১ম প্রশ্ন। কৃষ্ণলীলা অপেক্ষা গৌরলীলা আমার অতি মধুর লাগে কেন? ইহাতে আমার কোন অপরাধ হয় কি না?

উত্তর। কৃষ্ণলীলা অপেক্ষা গৌরলীলা মধুর লাগে, বেশ লাগুক্। অপরাধের কথা এতে কিছু নাই। কৃষ্ণলীলা এখনও আস্বাদন হয় নাই। আস্বাদন হইলে মধুর লাগিবে।

কৃষ্ণলীলা মধুর বলিয়াই গৌরলীলা মধুর। তুমি যে গৌরলীলার মাধুরী চাখিতেছ, উহা কৃষ্ণলীলারই মাধুরী। এই গৌরলীলায় ডুবিতে ডুবিতে দেহ ভেদ স্ফূর্ত্তি পাইবে। মধু সিন্ধুর সবই মধুর। এখনও মধুর, ডুবিতে ডুবিতে শেষেও যুগল মধুর !!

কহারও গৌরলীলার গৌরমূর্ত্তি এত স্ফূর্ত্তি পায় যে, সে যুগল রাধা গোবিন্দ লীলার ভাবের বিষয় ভুলিয়া যায়। তোমার সে দশা। মূল কথা তুমি সেই ব্রজের ভাবেই আছ।

গৌর মূর্ত্তিতে যখন নীল + পীত দুটী স্ফূর্ত্তি পায় তখন পাকা হইল। তখন সখী সমাজ খুলিয়া যায়। সখী সমাজ মধ্যে নিজকে দেখিলেই জানিবে সেটী তোমারও সখী মূর্ত্তি। রস উথলে। খেদ করিবার কিছু নাই। সব অভেদ তত্ত্ব।

গৌরলীলা সহজ মধুর, কৃষ্ণলীলা নিগূঢ় মধুর। সুতরাং রসের গাঢ়তা বেশী। কৃষ্ণলীলা, গৌরলীলা প্রকাশ লীলা। জীবে চাখাইতে, প্রকাশ বা তরল লীলায় মন সহজেই বেশী মজে; গৌরলীলার এই পর্য্যন্ত ইতি।

তোমার কালীহর।

২য় প্রশ্ন। পুরাণাদি পাঠে কি সাধু সজ্জনের মুখে শুনিয়া নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি শ্রীধাম সকলের যে একটী মনোমুগ্ধকর অপ্রাকৃত প্রতিকৃতি হৃদয় পটে অপনা আপনি অঙ্কিত হইয়া পড়ে, প্রত্যক্ষ দর্শনে সেই কল্পিত ধামের তুলনায় যথার্থ ধামটী অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়। তখন দালান, কোঠা, বাজার, বন্দর দেখিয়া লোকের মুখে বৈষয়িক কথা বার্ত্তা শুনিয়া মন কেমন হইয়া উঠে। মনে হয়, হায় কি হইল! না আসিয়া ভাল ছিলাম, আসিয়া আমার বুকে আঁকা সাধের শ্রীধামটী হারাইয়া গেলাম। এবার শ্রীধাম নবদ্বীপে গিয়া আমার এইদশা ঘটিয়াছে। ইহার কারণ কি?

উত্তর। যে, যে অবস্থা বা পদ প্রাপ্তির জন্য আকুল, তাহা পাইলে আকুলতা থাকে না। তখন জীব সেই পদের অধিকারী হয়। সুতরাং এটী তার উন্নতাবস্থা।

তুমি নবদ্বীপের নিম্নে ছিলে, উঠিবার জন্য আসিয়াছিলে ; যখন উঠিলে, তখন তুমি নবদ্বীপের একজন। তখন অপর কোন ভাল জিনিষের জন্য তথায় —করিবে।*

আগে ব্রহ্ম জ্যোতিতে কত আনন্দ হইত,—এখন সেই জ্যোতির অবস্থা তিক্ত বোধ হয়। এ যে উন্নতি। সুতরাং আগে যত মিঠে বোধ হয়, সে অবস্থায় পড়ছিলে তত মিঠে লাগে না। তখন নব লালসায় বিভোর হয়। 'পুর্ব্বাবস্থা অর্থাৎ ধামে আগমনটার মধ্যে তত মধুরতা থাকেনা। অনুরাগের ধর্ম্ম নব নব লালসা স্ফুর্ত্তি।

প্রত্যক্ষ ভাবে ধামের দালান কোঠা সব চিন্ময় বোধ হয়। অর্থাৎ প্রকৃত ধাম যদি দর্শন হয়,—তবে অন্যরূপ দালান কোঠাময় প্রাকৃত ধামের মধ্যেই চিন্ময় একটা ধাম অনুভূত হয়।

তা, যদি না হইয়া থাকে, - তবে দুর্ভাগ্য বটে। আমি কিন্তু নবদ্বীপের দালান, কোঠা, মাটী, সুর্‌কি, পশু, পক্ষি মধুময় দেখি। তাঁদের বড়ই ভাল লাগে! তোমার দাদা এমন হলো, উহার কারণ এই,—তুমি শ্রীমূর্ত্তির সেবকগণের প্রতি একটু চটেছ। সাবধান! সাবধান!!

শ্রী বিজয় নারায়ণ আচার্য্য।

সুখ-নিষ্পত্তি

—:০:—

জীবের লক্ষ্য কি ?—সুখ!

সুখী কে ? যে নিজের জন্য ভাবেনা।

সে কি করে ? সে সর্ব্ববিষয়ে শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করে।

তাহার জীবন রক্ষা হয় কেমন ? , শ্রীভগবান্ তাঁহার জন্য ব্যস্ত থাকেন।

*—কি করিবে, বুঝা গেল না। অবোধ্য স্থলে এইরূপ রেখা পাত থাকিবে।

স্বভাব তখন তার অনুকূল হয়। অভাব অভাবনীয়রূপে পূর্ণ হয়। কারণ তাহাতে সর্ব্বত্র সাম্যাবস্থার উদয় হয়। সাম্যে স্থিরোভাব ঘটে।

দুঃখ কি? নিজের জন্য চিন্তা।

কি উপায়ে নির্ভরতায় সিদ্ধ হওয়া যায়? প্রাণের বলে।

প্রাণের বলের মূল কি? ব্রহ্মচর্য্য।

ব্রহ্মচর্য্যের মৌলিক ধর্ম্ম কি? যোষিত সঙ্গ পরিবর্জ্জন।

যোষিত সঙ্গ ত্যাগের অব্যবহিত পরিণাম কি? সর্ব্বেন্দ্রিয়ের পূর্ণবিকাশ।

ইন্দ্রিয়গ্রামের পূর্ণবিকাশের ফল কি? ইন্দ্রিয়গণের পরিপক্ক জন্য অমৃতভাব।

অমৃতভাব কি? চিত্ত সত্ত্বাশ্রয়ে বাস করিলেই অমৃতভাব হয়।

সত্ত্বের আশ্রয় কি? শুদ্ধসত্ত্ব ভগবান্। উনি সত্ত্বরূপ মাখন খাইতে সদা আনাগোনা করেন। সত্ত্বপ্রবণ চিত্তকে উনি বিশেষরূপ আকর্ষণ করেন বলিয়া উঁহার নাম কৃষ্ণ। সত্ত্বসুধাস্নাত জীব আকৃষ্ট ও বিমুগ্ধ হইয়া প্রাণ মন সর্ব্বস্ব কৃষ্ণে অর্পণ করিয়া ফেলে। এই আত্মসমর্পণে আরম্ভ বা আভাসকে নির্ভরতা বলা যায়। পূর্ণনির্ভরতার নাম আত্মসমর্পণ।

আত্মসমর্পণের পরিণাম কি? উদ্দেশ্য হইতে প্রাপ্তি।

এই অভীষ্ট প্রাপ্ত বস্তু কিরূপ? নিত্য সুখময়।

তবে গৃহীর সুখলাভের আশা কি? গৃহী বলিতে বিবাহিত বুঝায়। বিহিত স্ত্রীসঙ্গে ব্রহ্মচর্য্যের হানি অতি অল্পই ঘটে। কাম প্রবর্ত্তিত স্ত্রী সঙ্গই যোষিত সঙ্গ বলিয়া নিন্দিত। কেবল পুত্র প্রয়োজনে স্ত্রী সঙ্গ বিহিত, কিন্তু পুত্র প্রয়োজন মনে করিয়া স্ত্রী সঙ্গসঙ্কল্পের বিদ্যমানতা বশতঃ যোষিত সঙ্গ বলিয়া গণ্য হইবে।

উহার মর্ম্ম কি? মর্ম্ম যোগিজনাধিগম্য। কেননা সন্তানোৎপত্তির নিয়ন্ত্রিত কাল উপস্থিত হইলেই স্ত্রীতে স্বামী চিত্ত অনিবার্য্যরূপে প্রধাবিতে হয়। এই সূক্ষ্মসত্য কামাসক্ত ব্যক্তির হৃদ্বোধ হওয়া সুদূরপরাহত। সদাচারপরায়ণ পুরুষ ও নারী সহজেই ইহা অনুভব করিতে পারিবেন। ইহাই প্রকৃতি ধর্ম্ম। তদিতর ক্রিয়া ব্যভিচার বা বিকৃতি মধ্যে গণ্য। সুতরাং যথার্থ মনুষ্যের গৃহধর্ম্মেও ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাঘাত বড় ঘটেনা। স্বভাবের নিয়ম সম্যক্‌রূপে অনুসরণ করার নাম শাস্ত্রগত যুক্তবৈরাগ্য।

অবিবাহিতের পক্ষে সুখ কি তবে সহজলভ্য? তা বটে।

তবে বিবাহপ্রথা কেন? বিবাহ প্রথা প্রচলন দুর্ব্বলের মনুষ্যত্ব বজায় রাখিবার জন্য। তেজীয়ান্ পুরুষ বিবাহ করেন না।

দুর্ব্বলতা কি? চিত্তের অব্যবস্থিততা।

উহা কিসে? ইন্দ্রিয়ের রুগ্নতা নিবন্ধন।

ইন্দ্রিয়ের রোগ কি? তরঙ্গায়িতাবস্থা।

দুর্ব্বলতা বিবাহের প্রয়োজন ঘটায় ইহা কিরূপ? নিবৃত্তি মার্গে হাটা বড়ই বিক্রমের কার্য্য। সহস্রে দুই এক জন পারে। তদ্ভিন্ন সকলেই প্রবৃত্তির ধাক্কায় প্রবাহিত হয়। জগতে ধীর কে জান? যিনি অনূঢ় জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন। "অনঢ় জীবনের নির্ম্মলতা রক্ষা না পাইলে, অনূঢ় জীবনের তাৎপর্য্য ও গৌরব থাকেনা। বিবাহ না করিয়াও যিনি নির্ম্মল স্বভাব তাঁহাকেই অনূঢ় বলা যায়। পোকে খেকো কাচা আঁব আমাদের সর্ব্বনাশ শুধু "বিবাহ, বিবাহ" করিয়া।

এরূপ সবল ব্যক্তি কেহ হইয়াছেন যাঁহার নাম বলিয়া দিতে পারেন? হাঁ পারি বৈকি? ভীষ্ম। পিতার সুখ সাধ্যার্থে ভীষ্ম কিরূপ স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন, ভাবিয়া দেখ। তিনি এক কথায় নিজের বিবাহটি পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছিলেন। ভীষ্মের বীরত্ব কাহিনী বোধ হয় সবে পাঠ করিয়াছেন। "ভীষ্ম' নাম করিতেই যেন তাঁহাকে কোন একটা স্থির, ধীর, অটল পর্ব্বত বলিয়া বোধ হয়।

অনেকে বলেন, বিবাহ না করিলে মানুষ তৈয়ের হয়না, এ সম্বন্ধে আপনার মত কি? গার্হস্থ্যে মানুষ তৈয়ের হয়, তা ঠিক্—অর্থাৎ দুর্ব্বল চিত্ত জীব তৈয়ের হয়; কিন্তু কেন, ভীষ্মের ন্যায় তৈয়েরী আর কোন মনুষ্যের জীবনী পাঠ করেছ? আয়ুঃ, বিদ্যা, যশ, কীর্ত্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও বীরত্বে সেকালে তিনি অগ্রণী ছিলেন। তিনি কি অতৈয়ারী পুরুষ ছিলেন? তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিলেও অত্যুক্তি হয়না।

শ্রীকৃষ্ণ বোধহয় ভীষ্ম চেয়ে সবল ছিলেন; তবে তিনি এতগুলি বিবাহ করিলেন কেন? কৃষ্ণ ভীষ্মাপেক্ষা অনন্তগুণে তেজস্বী ও বলীয়ান্। তাঁহার পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়া ছেলে খেলা নয়। প্রথমতঃ ভাবুন, ঈশ্বরের সহিত জীবের তুলনা অসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণে বহুবিবাহ ভ্রমাত্মক। যেহেতুক, শ্রীকৃষ্ণ

বহুমূর্ত্তি হইয়া দ্বারকান্তঃপুরে বিহার করিয়াছেন। সুতরাং স্বীকার করুন তিনি একাধিক বিবাহ করেন নাই। তাঁহার বিবাহ মায়িক ধর্ম্ম প্রেরিত নহে। উহা কেবল জীব শিক্ষার উদ্দেশ্যে। তিনি স্বয়ং দ্বারকানগরে গার্হস্থ্য পত্তন করিয়া গৃহধর্ম্ম কিরূপ, কেমনে সংসাধন করিতে হয়, তাহাও কেবল আদর্শ মাত্র স্থাপন করিয়া নিরাশ্রয় অনুত্তম গার্হস্থ্য পথ জগৎ সমক্ষে খুলিয়া দিয়াছেন। পক্ষান্তরে কুটুম্বিতা দ্বারা মধুরপ্রেম বিলাইয়া গিয়াছেন। আমাদের মত লোকে পরার্থে একটা কপর্দ্দক পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে কাতর হয় একটা কুটুম্ব মরিয়া গেলে কুক্কুরবৎ কাঁদিয়া বক্ষ বিদীর্ণ করে আর কিনা শ্রীকৃষ্ণ ভারতের সর্ব্বলোক হিতার্থে নিজ অগণ্য পুত্রপৌত্র যার উপাদান এমন বংশটাকে নিজেই নিপাত করিলেন। এহেন কৃষ্ণের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সমালোচনা ভাল আমাদিগের পক্ষে মানায় না।

সনাতন ঋষিশাস্ত্র অনূঢ়তা বা ব্রহ্মচর্য্যের অনবদ্য ফল। সরস রসাল প্রেম ভক্তি শাস্ত্রতত্ত্বাবলী একান্তপ্রবাসী রূপসনাতন প্রভৃতি বৈষ্ণবগুরুগণের উদ্গারিত। বিবাহিত পুরুষাপেক্ষা অবিবাহিত পুরুষের পরার্থে অনুষ্ঠান সুবিধা সমধিক পরিদৃষ্ট হয়। ভারতের সূত্র শৈথিল্যের মৌলিক নিয়ন্তর দরিদ্রতায় বিয়ে। অর্থের সংকুলান নাই, অথচ যে উদ্বাহ, তাহা উদ্বন্ধন তুল্য। অর্থাভাব বিবাহিতের সংসার বিষজ্বালার প্রকোপ মাত্রা এতদূর বিবর্দ্ধিত করে যে তাহার চিত্ত কাননটা এককালে বিদগ্ধ হইয়া যায়, আর সহানুভূতি ও প্রীতির লতা ও কুসুমগুলির কোনই অস্তিত্ব থাকে না।—পরার্থে প্রাণ কাঁদেনা। কারণ নিজার্থরূপ ভস্মের চাপায় ঐ সকল বৃক্ষলতার বীজ পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। সন্তান সন্ততি ক্রমে উহার পরিণাম ভয়াবহ হইয়া দাঁড়ায়। বিবাহ করিতে হইলে, বিবাহের যোগ্যতা লাভ করা আগে চাহি। দেখুন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কি শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি জ্ঞান ভক্তিতত্ত্ব বিষয়ে পূর্ণপুরুষ লোকগুরু। আমাদের মধ্যে বিবাহান্তে কাহারো হাতে খড়ি হয়। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন তিনি বিবাহকালে কেমন একজন জ্ঞান বৈরাগ্যাধার নিষ্কাম পুরুষ ছিলেন। বস্তুতঃ বৈরাগ্যের অঙ্কুর উৎপন্ন হইলে পর বিবাহ করা যাইতে পারে, কারণ তাহ'লে পত্নিতে তত্টা অভিনিবেশ জন্মে না।

পূর্ব্বকালে চন্দ্রবংশেও বাল্যবিবাহের দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয়। ষোড়শ বর্ষে অভিমন্যু জীবন লীলা শেষ করেন। তখন তাঁহার পত্নী উত্তরা অন্তর্ব্বতী ছিলেন এ সম্বন্ধে

আপনি কি মিমাংসা করেন ?—বাল্য বিবাহের গুণাগুণ নির্ণয় এস্থলে আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু তবু একটু বলিয়া রাখি যে বাল্যবিবাহ প্রথাসমীচীন নয়। তাহা শ্রীমহাভারত ইঙ্গিতে বুঝাইলেন।—উত্তরার ঐ গর্ভে যে সন্তান জন্মে তাঁহার নাম পরিক্ষিৎ। "পরিক্ষিৎ"এর বৌৎপত্তিকতা দ্বারা সুন্দর সিদ্ধান্ত সংলব্ধ হয়। কুরুপাণ্ডবের গুণ গরিমা ও বংশ ইহাতে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। শাস্ত্র সঙ্কেতে লোকসমাজে এস্থলে বাল্যপরিণয়ের বিষফলপ্রসূতা বুঝাইয়া দিয়াছেন। অভিমন্যু বালক হইলেও জ্ঞানে গুণে বিভূষিত ছিলেন। মুখ্যকথা এই যে স্ত্রী পরিজন পরিপালনাক্ষম কি দরিদ্র ছিলেন না। পরিবারের ভরণপোষনে তাঁহাকে ঘামাইতে হয় নাই। যাহাদের ঘামাইতে হয়, ক্ষয় পাইতে হয়, তাহাদের বিবাহসূত্রবন্ধন অসঙ্গত বলিলে দোষ হয় না। এমন দরিদ্র পুরুষ নিজেও অশান্তি উপদ্রবের দারুণ বহ্নিতে দগ্ধ হয়, এবং আর একটা অবলাকেও সারাটা জীবন জ্বালায়। সে এমন অবসর ও সুবিধা পায়না যে পেটের দায়ের উপরে পরের জন্য একটু খাটিবে। তাহার সুখ কোথায় ?

পরার্থের অর্থ কি ?—"পর" শব্দে অন্য ও ঈশ্বর বুঝায়। প্রতিবেশীর হিতার্থে কি ঈশ্বরের নামগুণ লীলা মহিমা প্রচারার্থে খাটা পরার্থতা। অন্যের জন্য হাটা খাটা কর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি সূত্রে ঈশ্বর-সেবায় দাঁড়ায়। অতএব পরার্থতা সর্ব্বসুখ নিদান।

স্বার্থ—কাম, পরার্থ—প্রেম। কামই দুঃখের আকর, প্রেমই একমাত্র সুখের মূলিভূত। টাকার ধনী ও বিবাহিত দরিদ্র পরার্থ পরম দেবতার কৃপালাভে প্রায়ই বঞ্চিত। যদি পায়, তা অন্য কোন গুণবিশেষের গুণে বলিতে হইবে।

তেজ ধারণে বৃত্তি নিচয়ের বিকাশ হয়, সর্ব্ববৃত্তি বিকাশে বৃত্তিচয়ের সাম্য ঘটে। তদসাম্যে স্বভাবের বিকৃতি ঘটে। আমরা পরের দোষগুণ সমালোচনা করিয়া থাকি। অনন্তগুণ বিভেদ যাহা আমরা দেখিতে পাই, সবই অসাম্যঘটিত। প্রত্যেক মানুষে আমরা রাশি রাশি দোষ, রাশি রাশি গুণ দেখিতে পাই, এসব ইন্দ্রিয় বৃত্তিগণের অপরিনতির ফল। ইন্দ্রিয় বৃত্তি নিচয়ের বিকাশ ও পক্কতা সাধিত হইলে তাহাদের সামবায়িক সাম্যফলে তখন মানব চরিত্র এক অপূর্ব্ব অমৃত ভাব ধারণ করে। ইন্দ্রিয় বৃত্তির পূর্ণবিকাশের ফলস্বরূপ এতাদৃশ অবস্থার নামই ভক্তিমার্গের নিরোধ। সাম্যে চিত্ত দোষগুণ পরিশূণ্য হয়।

তখন মানব কেমন হয়?—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

এই গুণ চিন্তামণি চতুষ্টয় অন্য গুণ স্বর্ণখনি প্রসব করে। সুতরাং মানব সুনীচ, সহিষ্ণু, মানদ হইয়া সিদ্ধকাম হয়। এতদবস্থাযুক্ত মানব পরার্থপরতায় বিভোর থাকেন। মানব অপরাধ নির্মুক্ত থাকে, সুতরাং রসনাতে উচ্চারিত শ্রীভগবন্নাম অফুরন্ত সুধামৃতের উৎস খুলে। যাঁহাদের বৃত্তিগুলি পরিপুষ্ট ও পরিস্ফুট তাঁহারাই স্বভাবতঃ নম্র ও বিনীত স্বভাব হয় এবং তাহারাই জগতে ভাবুক ও রসিক হইয়া রসাস্বাদ করে। অস্ফুটবৃত্ত মানব প্রায়ই খিঠ খিটে চঞ্চল রুষ্ট হঠকারী ও দাম্ভিক হয়। ইঞ্জিনের একাঙ্গ বিকৃত হইলেই সমষ্টি কলের গতি ও ক্রিয়া অবস্থান্তর ও কালান্তর প্রাপ্ত হয়। রেতঃ সঞ্চয়ই এবম্বিধ বিকাশ সাধনের হেতু।—শেষ সিদ্ধান্ত এই যে।—

"নিরপরাধে কৃষ্ণ নাম লইলে প্রেমোদয় হয়—উহা বিশ্বোদার পরার্থপ্রীতি। এই প্রীতির পক্কফল—সুখনিষ্পত্তি বা রসসম্ভোগ।"

শ্রীকালীবর দাস বসু ভক্তিসাগর।

গীতিকা।

—:০:—

হ'লনা হ'লনা, শ্রীহরি সাধনা,
না মিটিল মনোবাসনা।
প্রেমানন্দ ধাম শ্রীগোবিন্দ নাম
প্রাণ ভ'রে ডাকা হ'লনা॥
বিরলে বসিয়ে যদি একচিতে,
শ্রীহরির নাম চাইরে জপিতে,

কপালের দোষে, কোথা হ'তে এসে,
হৃদে জুটে নানা ভাবনা।
চিন্তার অনলে এ পাপ পরাণী,
পুড়িতেছে হায় দিবস যামিনী,
একি চমৎকার, তবুত আমার
সংসার মমতা গেলনা।
পরম দয়াল শ্রীহরি কৃপায়,
পাইয়ে দুর্লভ এ মানব-কায়
রিপুর বশেতে হারানু হেলায়,
এখন, অনুতাপে প্রাণ বাঁচেনা।
দীর্ঘকাল ধরি এ ঘোর যাতনা,
পরাণে যে আর সহেনা সহেনা,
কেবা দিবে বলে, কার কাছে গেলে,
আমার, ঘুচিবে মরম বেদনা।
করুণাসাগর হে শচীকুমার,
তোমাবিনে পাপীর কেবা লয় ভার,
মনোদুঃখ দূর কর অভাগার,
বিতরিয়ে বিন্দু করুণা॥

দীন—শ্রীশশিভূষণ সরকার।

শ্রীবৃন্দাবন ভ্রমণ।

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে প্রথম উচ্ছ্বাস।)

বৃন্দাবন রম্যস্থান, দিব্য চিন্তামণি ধাম, রতন মন্দির সুশোভিত।
বেষ্টীত কালিন্দী নীরে, রাজ হংস কেলী করে, কুবলয় কনক উৎপল॥

আজ আমরা পিতৃ-পুণ্য ফলে সেই মধুময় বৃন্দাবনে। বাস্তবিকই ইহা পরম রম্যস্থানই বটে। এই মধুর রসধামের সমস্তই মধুর।

শ্রিয় কান্তাঃ কান্তঃ পরম পুরুষঃ কল্প তরবো।
দ্রুমা ভূমি চিন্তামণি গণময়ী তোয়মমৃতম্ ॥
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী।
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপিতে ॥

এখানকার ব্রজদেবীগণ সকলেই লক্ষ্মী, পরম পুরুষ রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এক মাত্র নায়ক, এখানকার বৃক্ষরাজি সমস্তই কল্পতরু, ভূমি চিন্তামণি রত্নময়ী, এখানকার শ্রীযমুনার বারী সাক্ষাৎ অমৃত, ব্রজবাসিগণের কথা সঙ্গীতের ন্যায় সুমিষ্ট, গমন অতি মনোহর যেন নৃত্যভঙ্গী; মোহন মুরলী সকলের প্রিয় সহচরীর ন্যায় মনহরণ করিতে থাকে, চিদানন্দ পরমজ্যোতি সকলের আস্বাদনীয় তাহাই এখানে প্রকট ভাবে বিদ্যমান। ব্রজ গোপীগণের কৃপা হইলে তবে এই সর্ব্বানন্দ রসধাম বৃন্দাবন দর্শন মিলে।

চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমণ্ডল, তন্মধ্যে "চতুর্যোজন বিস্তারম্ নানাকুণ্ড সমন্বিতম্ দ্বাত্রিংশৎ বনসম্বিতম্ মুরলী কল কূজিতম্ মধুরম্।" আবার এই ৩২টী বন মধ্যে দ্বাদশ বনই শ্রেষ্ঠ লীলাস্থান, শ্রীবৃন্দাবন তাহারই অন্যতম। তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণলীলাস্থলী, সেই খানেই মধুর বংশীবট, তথায় যমুনা পুলিনে নিকুঞ্জলীলা মহা রাসস্থলী পুলিন বন। এই খানেই কেশীদৈত্যকে বিনাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীযমুনায় হস্ত প্রক্ষালন করেন, তাই ইহার নাম কেশীঘাট। আজ কাল মধুর বৃন্দাবনের আর সে মধুর বনশোভা নাই এখন মাধুর্য্য আচ্ছাদিত হইয়া ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। আসল যে বৃন্দাবন তাহা এখন বেশ জাঁকাল সহর। সে নিভৃত মঞ্জু কুঞ্জের মধুময় নিভৃত ভাব নাই, এখন গাড়ী ঘোড়া লোক লস্করের কোলাহলে মাধুর্য্যময় কুঞ্জানন্দ এখন বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে ধর্ম্ম পিপাসা ক্রমে ঐশ্বর্য্যমদের বিক্রমে পড়িয়া মধুর নিকুঞ্জকাননকে অট্টালিকাময় মহাকলরব পূর্ণ সহর করিয়া তুলিয়াছে। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে যে সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিতে আইসেন তখন শ্রীবৃন্দাবন গুপ্তভাবেই ছিলেন কিন্তু তখনকার গুপ্তভাবের মধ্যেও মাধুর্য্য পূর্ণমাত্রায় বজায় ছিল, তখন স্বচ্ছন্দ বনজাত বৃক্ষলতাদি সেবিত দুর্গম অরণ্য মধ্যে মধুর লীলাস্থলীগুলি

প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিলেন। অনাদি শ্রীবিগ্রহগুলিও জঙ্গলাকীর্ণ মৃত্তিকা গর্ভে জননেত্রের অগোচর হইয়া ছিলেন। মহা মহিমাময়ী শ্রীরাধাকুণ্ড ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়া অজ্ঞাত হইয়া পড়িয়া ছিলেন কিন্তু তখনকার গুপ্ত ভাবের মধ্যে কোনরূপ বিকৃতি ছিলনা কেবল মনের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া ছিলেনমাত্র এখনকার প্রচ্ছন্ন ভাব অতি ভীষণ। এখন একেবারে সে মধুর ভাবের বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে, কহিনুর কাঁচের আবরণে আবৃত হইয়া কাঁচের মনোহারী সজ্জের মধ্যে বেমালুম্ মিশিয়া গিয়াছে কাল প্রভাবে সে পবিত্র অতি মধুর শান্তভাব অতি দূরে চলিয়া গিয়াছে তাহা খুজিয়া মিলাও দুর্লভ। পাশ্চত্য শিক্ষা ও সভ্যতার আলোকে মধুর বৃন্দাবন ধামীগণের চোখ মুখ বেশী ফুটিয়া যাইতেছে, কলিকাতা সহরের ন্যায় জুয়াচোর বাটপাড় জুটিয়াছে, মারামারী গালাগালির অভাব নাই কালক্রমে স্বচ্ছন্দ মামলা মোকর্দ্দমা ঢুকিয়াছে, রাধারাণীর মত আর এখন কুঞ্জে রেজিষ্টারী হয় না। যেখানে একসময়ে চতুর সেখরের খত লিখিত হইয়াছিল আর যুগান্তরে মায় সুদ তাহার ঋণ পরিশোধ হইয়াছিল যেখানে স্বয়ং শিরোমণিকে লিখিতে হইয়াছিল—

ইত্যাদি কীর্ত্তি গুণ সমুদ্রং সং সাধু শ্রীরাধা।
সহদারস্য চরিতস্য পুরাহ মন সাধা॥
তস্য খাতক হরি নায়ক বসতি ব্রজপুরি।
কস্য কর্জ্জ খতং পত্রমিদং লিখিলাম সুকুমারি॥
ইহার লভ্য পাইবা ভব্য বাঞ্ছা তিন করিয়া।
সুদ সমেত শোধ করিব সকল কলিযুগ ভরিয়া॥
এই করারে রাই তোমারে খত দিলাম লিখি।
ললিতা বিশাখা মঞ্জুরী আদি রহল ইহাতে সাক্ষী॥

আজ সেইখানে রেজিষ্টারী আফিস বসিয়াছে, পুলিসের লম্বা রেগুলেশন লাঠী দেখা দিয়াছে। উকিল মোক্তার ও যথেষ্ঠ জুটিয়াছে। যেখানে মঞ্জু কুঞ্জ ছিল সেই-খানে প্রকাণ্ড অট্টালিকা উঠেছে, রাসস্থলীকে এখন অট্টালিকায় ঘেরিয়াছে সে বংশীবট এখন আর প্রকৃতি সুন্দরীর বিহার ভূমি নাই, বৃন্দারাণীর স্বহস্তে সজ্জিত পুষ্প কেশর রঞ্জিত নাই এখন সেখানেও অট্টালিকা উঠিয়াছে। ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের চিরবিরোধী। ঐশ্বর্য্য যতই সুবিধা পাইতেছে ততই মাধুর্য্যকে চাপিয়া মারিতেছে।

এখানে ধর্ম্ম পিপাসার সূত্র ধরিয়া ঐশ্বর্য্য নিজ প্রতিপত্তি পূর্ণভাবে জাহির করিয়া বসিয়াছে। দ্বিতল ত্রিতল চতুর্তল প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকায় শ্রীবৃন্দারণ্য পরিপূর্ণ সমগ্র ভারতে অতুল ঐশ্বর্য্য যেন সম্মিলিত হইয়া মাধুর্য্যকে চাপিয়া ধরিয়াছে। যত রাজা মহারাজা শেঠী মহাজন সকলেই ধর্ম্মপিপাসু সাজিয়া প্রথমে শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন এখন তাঁহাদের কৃপায় শ্রীবৃন্দাবন-মাধুরী সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। দেওয়াল দিয়া ঘেরিয়া না রাখিলে এতদিন নিধুবন নিকুঞ্জবনের চিহ্নমাত্রও দেখা যাইত না মধুর কেশর কুঞ্জের আর চিহ্নমাত্র নাই পরম রমণীয় মাধুর্য্যের শেষলীলা ভূমি শ্রীরাসস্থলীকে এখন তুঙ্গ হর্ম্ম্যরাজিতে ঘেরিয়াছে। শ্রীবৃন্দারাণীর স্বহস্তে সজ্জিত মধুর বংশীবট এখন আর বিলাস স্থান নাই এখন অর্থোপার্জ্জনের ক্রীড়াভূমি হইয়াছে বিষয় ভোগ সুখ বিলাসের ক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবন নহে, কিন্তু কালমাহাত্ম্যে তাহা পূর্ণ মাত্রায় প্রবেশ করিয়াছে। তাই ভজনশীল প্রশান্ত সাধু বৈষ্ণবেরা দূরে অতিদূরে সরিয়া বনমধ্যে গুহামধ্যে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন।

রেলগাড়ী হইতে নামিতেই শেঠের অত্যুচ্চ মন্দির ও সোণার তালগাছ দেখিয়াই লোকের চমক লাগিয়া যায় কড় কড় করিয়া নহবৎ বাজিতেছে, তাই শুনিয়া সকল যাত্রী সেইদিকেই ছুটিতে থাকে। সঙ্গমরমর্ম্মর প্রস্তর শোভিত খুব জাঁকাল মন্দিরের জমকাল গল্প শুনিয়া যাত্রীর মন তাহাই দেখিবার জন্য ছট্ ফট্ করিতে থাকে, কাজেই শ্রীবৃন্দবন ধামে পা দিতেই যাত্রী ঐশ্বর্য্য মধ্যে যাইয়া পড়েন। বৃন্দাবন মাধুরী খুজিয়া বাহির করিবার তাঁহার আর অকাঙ্ক্ষা জন্মেনা, নিভৃত নিকুঞ্জ বিলাস দেখিবার প্রয়াস জন্মিবার অবসরও ঘটেনা। কেবল চতুর পাণ্ডার হাতে পড়িয়া মাত্র ছুটাছুটি সার হয়, অর্থব্যয় আর লৌকিক ও ব্যবহারিক ক্রিয়া কাণ্ড করিয়া যথেষ্ট পুণ্য সঞ্চিত হইল মনে করিয়া কৃতার্থ হয়েন এবং উদরাময় কফ কাশিতে ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়া অশান্তি ও নিরানন্দের ভার লইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন, আর তাঁর সঙ্গে আইসে কতকগুলি ঐশ্বর্য্যের লক্ষ্য আর কতকগুলি খেলানা ও ছবি।

কিন্তু তাই বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে শ্রীবৃন্দাবন-মাধুরী আর নাই বা তাহা জনমের গোচর হয়েন না। কালপ্রভাবে তাহা ঐশ্বর্য্য সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া সাধারণ চর্ম্মচক্ষুর অগোচর হইলেও সর্ব্বদা ভগবৎ কৃপাঞ্জন বিচ্ছুরিত

ভক্ত নয়নের গোচরীভূত হইয়া থাকেন* ভক্তেরা, তাই বলেন যে যোগমায়া বৃন্দারাণী কৃপায় শ্রীধাম দর্শন হইলে লালসান্বিত হইয়া ব্রজরস-ভাবিত ভক্তের অনুগত হইয়া শ্রীশ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর কৃপা প্রার্থনা করিলে তখনই নিখিল মাধুর্য্য লইয়া সুখময় শ্রীবৃন্দাবন সাধকের নয়ন পথে উদিত হইবেন। তখনই শ্রীজয়দেব কবি ভণিত শ্রীবৃন্দাবন-শোভা সন্দর্শন করিয়া সাধক কৃতার্থ হইবেন।

ললিত লবঙ্গ লতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে।
মধুকর-নিকর করম্বিত কোকিল কূজিত-কুঞ্জ কুটীরে॥
বিহরতি-হরি রিহ সরস বসন্তে।
নৃত্যতি যুবতি জনেন সম সখি বিরহি জনস্য দুরন্তে॥
শিশিরক অন্তরে বসন্ত-সময়।
বৃন্দাবন সুখ-শোভা কহনে না যায়॥
ললিত লবঙ্গ লতা তাহার মিলনে।
কেমন মলয় বায়ু বহে অনুক্ষণে॥
মধুকর নিকর বেষ্টিত সব ঠাঁই।
কোকিল কূজিত কুঞ্জ কুটীর সদাই॥
তাহাতে রসিক কৃষ্ণ যুবতীর সঙ্গে।
বিহার করয়ে আর নৃত্য করে রঙ্গে॥
সরস বসন্তে কৃষ্ণ করিছে বিহার।
মূর্ত্তিমান হইয়াছেন সাক্ষাৎ শৃঙ্গার॥

ক্রমশঃ—

শ্রীবামা চরণ বসু।

*মহাদার্শনিক গোস্বামীপাদ শ্রীজীব বলিতেছেন "যে ভক্ত দিবানিশি সংযতচিত্ত হইয়া ভগবানের নাম মন্ত্র জপ করেন তিনি নিশ্চয়ই গোপবেশধর হরিকে দর্শন করেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই

অহর্নিশং জপেন্মন্ত্রং মন্ত্রী নিয়ত মানসঃ।
স পশ্যতি নসন্দেহো গোপরূপ ধরং হরিম্॥"

"পাগলামী"।

—:o:—

সবাই আমায় ঠাট্টা করে। বলে সাধু হ'য়েছেরে সাধু হ'য়েছে। আমি আমার রাধাশ্যামের যুগলমূর্ত্তি মণ্ডপ হইতে শোবার ঘরে এনেছি কিনা তাইতে আমায় এ ঠাট্টা। আমি পূজা ক'র্‌তে জানিনে, তবু আন্‌লাম; কেন আন্‌লাম! ঐ মূর্ত্তি আমার বড় পছন্দ হ'য়েছে। বড় ভাল লাগে। তাই ঐ মৃন্ময়ী মূর্ত্তি শোবার ঘরে আনিয়াছি। মণ্ডপে থাকিলে দূরে থাকে তাই হাতের কাছে চোখের সম্মুখে আনিয়াছি। উদ্দেশ্য যখন ঘরে আসিব, যখন ঘরে থাকিব, তখন দেখিব। ঐ মূর্ত্তির মত একখানা জীবন্ত মূর্ত্তি পাইব ততদূর দূরাশা করিয়া নহে। কেবল মূর্ত্তিখানা মনে রাখিব, অষ্ট প্রহর দেখিব, এই দারিদ্র্য দুঃখ পীড়িত, এই ভক্তি শ্রদ্ধা হীন হৃদয়ে শান্তি পাইব এই আশায়। বামন হইয়া চাঁদ ধরিব এ আশায় নহে। প্রাণ দেখ্‌তে চায়, মন কাঁদে সেই জন্য আনিয়াছি. সবাই বলে তুই পূজা জানিসনে। আরে! না জান্‌লেম! জানলেকি আর ঐ মনোহরা মূর্ত্তিকে বাহিরে থাকৃতে দিতেম! বুক চিরে দেখাতাম কোথায় রাখ্‌তে হয়! তোরা কি দেখ্‌তিস্? সে দেখ্‌তো আর আমি দেখ্‌তাম। বুকের মধ্যে প্রাণের মধ্যে রেখে 'হরি' 'হরি' ব'লে নেচে নেচে বেড়াতেম। তা যে হবেনারে। এই দেখ্‌না আমি কে! আমি ত আমি নয় মস্ত একটা অহঙ্কার, মনটা দেখ্‌ছিস মস্ত একটা জোচ্চোর, চোখটা দেখ্‌চিস্ বড্ড লম্পট, মুখটা দেখ্‌চিস্ নর্দ্দমা! ভর্ ভর্ ভর্ ভর্ ক'রে আবর্জ্জনা বেরোচ্চে, সে নাম নেবেন যে নামে চির শান্তি পাবে যে নামে ভব বন্ধন মোচন হবে যে নাম চিরানন্দ ধাম সে নাম নেবে না! যাক্ মৃন্ময়ী মূর্ত্তি আন্‌লাম কেন! যদি সংসার তাড়নে দরিদ্রতার ভীষণ নিষ্পীড়নে নামটী ভুলিয়া যাই তাই এনেছি; ঐরূপটী দেখি ঐ ভাবটী দেখি বড় দুঃখে বড় শান্তি আসে, তাই এনেছি। বুড়ো (তালুকদার দীননাথ নন্দী) বলে কিনা মণ্ডপে রাখ, সেই খানেই ব'স, দশজনে এসে বসুক, হরিনামও হ'ক, তা হ'লেই ত হ'ল! আরে যা, হরিনাম ত

হ'ল; আমি যে উঠিতে বসিতে, হাসিতে খেলিতে যাইতে আসিতে দেখিতে চাই, মণ্ডপে থাকিলে তা আমার হয় কৈ? এও তো বেশ হ'চ্ছে। এখানেও ত সকলেই দেখ্‌তে পারে। আমারও সাধ কতকটা পূর্ণ হয়। এই ত ছোঁড়ারা এখনি গাইল। আহা কি মধুর! বালকের মুখে হরিনাম বড়ই মধুর। তুমিও গাও আমিও গাই তুমিও নাচ আমিও নাচি। এই ত ভালকথা! মণ্ডপে কন? মণ্ডপ কোথায়? মণ্ডপে যে চর্ম্মচটিকার আবাস হইয়াছে! তাদিগে যদি দূর ক'র্‌তে পারি তবে মণ্ডপে লইব। বাপ্‌রে বাপ্‌! কি ভয়ানক অত্যাচার! ছয়টা এঁড়ে তেড়ে তেড়ে হয়রাণ ক'রে দিলে! ভাল পথ দিয়ে আর যেতে দেয় না। তাড়া করে ত ভাল পথ আট্‌কে রেখে কাঁটা পথ দিয়ে তাড়িয়ে নেয়। একটা প্রাণী আমি ছয় ছয়টা জানোয়ার আমার পাছে! আমায় মেরে ফেল্‌লে গো, মেরে ফেল্‌লে! ভাগাড়ে ডুবিয়ে দিলে, সরোবরে ডুব্‌তে দিলে না। জোর ক'রে ডুব গেলে, শিঙের গুঁতায় ভাসিয়ে তোলে। আবার মনের সঙ্গে সাট ক'রেছে। বাপ্‌রে বাপ্‌! বড়ই দুৰ্দ্ধর্ষ প্রতাপ! "তাতেই ত এনে, রেখেছি ওই কোণে, চেরে দুনয়নে, মনটী যদি টানে, তখন কার তেজ কত বুঝ্‌বে আপন মনে!" হরি হরি বল মন হরি হরি বল।

বৈষ্ণব দাসানুদাস

সতীশচন্দ্র নাগ।

পাগল মানুষের কথা।

—:•:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

প্রঃ। ছদ্ম বেশ যাহার তিনি কি প্রকাশিত হইতে চান? অথচ বলিতেছেন "যে নরবেশকে প্রকাশিত না করে সে বৈষ্ণব নহে।" ইহা কিরূপ?

উঃ। মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও ভক্তবৃন্দ সকলেই ছদ্মবেশী ছিলেন, তথাচ জীবের দ্বারে নাম সংকীর্ত্তন প্রচার করিয়া কলিহত জীবকে উদ্ধার করিয়া

ছিলেন। ইহাতে অপূর্ব্ব করুণা প্রকাশ করিয়াছেন।

"এমন শচীর নন্দন বিনে।
প্রেম আর নাম অতি অদ্ভুত গত হইত কার মনে॥
শ্রীকৃষ্ণ নামের স্বগুণ মহিমা কেবা জানাইত আর।
বৃন্দা বিপিনের মহামধুরিম প্রবেশ ছিল বা কার॥
ব্রজে যে বিলাস রাস মহারাস প্রেম পরকীয়া তত্ত্ব।
গোপীর মহিমা ব্যভিচারী সীমা কার গতি ছিলনা এত॥
ধন্য, কলি ধন্য, নিতাই চৈতন্য পরম করুণা করি।
বিধি অগোচর, যে প্রেম বিকার, প্রকাশে জগৎ ভরি॥
উত্তম অধম কিছুনা বাছিল, যাচিয়ে যাচিয়ে কোল॥
কহে প্রেমানন্দ, এমন গৌরাঙ্গ অন্তর ধরিয়া দোল॥"

প্রঃ। রাধা কৃষ্ণের প্রকট লীলা কি নিত্য নহে? এবং সকাম লীলাই কি নিত্য?

উঃ। প্রকট, অপ্রকট, সমুদায়ই নিত্য লীলা। যাহা সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাই অনিত্য. আত্মা অবিনশ্বর নিত্য, জীবের দেহে আত্ম বুদ্ধিই, ভ্রম।

প্রঃ। শ্রীমূর্ত্তি কি কবি বা ভক্তের কল্পিত মাত্র? অনুমানে উহার পূজা হইলে শ্রীমূর্ত্তির নিত্যত্ব থাকিবে কিকরিয়া?

উঃ। শ্রীভগবান জীবকে পরিত্রাণ জন্য যুগ অনুযায়ী মূর্ত্তি ধারণ করেন। প্রভুপাদ সনাতন গোস্বামী প্রভৃতিকে সাক্ষাৎরূপে দর্শন দিয়া স্বয়ং সেবা প্রকাশ করিয়াছেন; সাধু সঙ্গ ভিন্ন শ্রীমূর্ত্তি পূজায় কাহারও অধিকার নাই, তজ্জন্য সেবা অপরাধ ঘটিতেছে।

প্রঃ। নিত্য লীলায় শ্রীভগবানের রাঙ্গাপাদু'খানির সুধারস আপনি কিরূপ আস্বাদন করিয়াছেন, কিরূপ সে সৌন্দর্য্য তাহা একটু প্রকাশিত করিয়া পিপাসা দূর করুন।

উঃ। সাধ্য মত জানাইয়াছি, বুঝিতে পারেন নাই। "উলুকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ" চিত্ত মার্জ্জন হইলে ক্রমে শান্তি পাইবেন ও আস্বাদন বুঝিবেন। "এই গুপ্ত ভাবসিন্ধু, ব্রহ্মা না পান এক বিন্দু, হেন ধন বিলালেন সংসারে, ভাব শাবল্যে রাধার উক্তি, লীলাশুকে হয় স্ফূর্ত্তি উন্মাদের সামর্থ্যে।

সেই শ্লোকের করেন অর্থ, তার অর্থ মনুষ্য লোকের কোন প্রকার বুঝিবার সাধ্য নাই, তবে কিছু দিন সাধুর সঙ্গ করিতে থাকিলে বুঝিতে ও অনুভব করিতে পারিবেন।

প্রঃ। ,'অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়। কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥" আপনি একজন সেই ভাগ্যবান পুরুষ। আরও দুই একজন ভাগ্যবান আছেন কিনা? এভারতেও অন্যান্য স্থানে এরূপ ভাগ্যবান ক'জন আছেন?

উঃ। পৃথিবীতে ভাগ্যবান অনেক ভক্ত নানারূপে লীলা করিতেছেন তাঁহাদের গতি বিধি বুঝিবার জন্য জগতে কেহ চেষ্টা করেন না অসত্যকে সত্য জ্ঞান করাই জগতের ধর্ম্ম, তজ্জন্য তাঁহারা প্রকাশ দেন না, আমি না জানালে কি প্রকারে জানিতেন? আপনারা যখন সত্য পথে চলিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইবেন, ভক্ত শূন্য হইলে এজগৎ থাকিত না। অশ্বত্থামা, হনুমান, বিভিষণ, বালি, ব্যাস, কৃপাচার্য্য, পরশুরাম প্রভৃতি অমরগণ এবং অনেক সিদ্ধ মহর্ষি বর্ত্তমান থাকিয়া ছদ্ম বেশে জগতের কার্য্য কলাপ সর্ব্বদৃষ্টি করিতেছেন; দেশবাসীগণ যে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন তাহা তাঁহারা সকলেই দেখিতেছেন দেব দৈত্য গন্ধর্ব্বলোক প্রভৃতি সকলেই দেখিতেছেন কেবল অজ্ঞান জীবগুলিই জানিতে পারিতেছেন না।

প্রঃ। প্রকৃত ভক্ত কে? ভক্ত ও বৈষ্ণবে পার্থক্য কি আছে?

উঃ। যিনি মহাপ্রভুর চরণে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত ভক্ত ভক্ত ও বৈষ্ণব, একই প্রকার, যেমন দ্বিজ ও বিপ্র।

প্রঃ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব কাহারা?

উঃ। যাঁহাদের শ্রীগৌরাঙ্গে বিশ্বাস আছে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মানেন, তাঁহারাই।

প্রঃ। শুদ্ধ ভারতবাসী ছাড়া অন্য কোন দেশের লোক গৌড়ীয় বৈষ্ণব হইতে পারেন কি না?

উঃ। পৃথিবীর সমুদায় মনুষ্য পশু পক্ষী পর্য্যন্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব হইতে পারেন।

প্রঃ। শ্রীভগবানের পাদ পদ্ম আশ্রয় না করিয়া একেবারে মধুর রস আস্বাদন করা যায় কি? এইরূপ অধিকারী কয় জন? জগতে মধুর রসের ছড়াছড়ি হইলে তাহার পরিণাম কিরূপ হয়?

উঃ। সাধুসঙ্গ ব্যতীত কোন প্রকার রস আস্বাদন হয় না।

ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুঁহে করয়ে মিলন।
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥

শ্রীচৈঃ চঃ আদিলীলা ৪র্থ পরিঃ।

দাস্য, সখ্য, বাৎসাল্য ও মধুর চারি ভাবের ভক্ত আছেন। যিনি যে ভাবের লোক, তিনি নিজ ভাব অনুযায়ী সেই ভাবের রস আস্বাদন করিতে থাকেন। কেবল মধুর রসের পাত্র জগতে অতি দুর্লভ প্রকট লীলা সময়ে সাড়েতিন জন পাত্র ছিলেন; দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ভাবেও প্রেম হয়। তাহাতে প্রকৃতির সহ কোন ক্রিয়া নাই; কেবল সংকীর্ত্তন হইতে প্রেম উৎপন্ন হইবে, তাহার পর ভাব অনুযায়ী গতি হইবে।

প্রঃ। বংশী স্বরটা কি? শ্রীকৃষ্ণ কোথায় থাকিয়া কি ভাবে বংশী বাদন করিতেছেন? কবে কিপ্রকারে, আমরা ঐ ধ্বনি শুনিতে পাইব? আপনি সর্ব্বদা সেই ধ্বনি শুনিতেছেন; উহা কিপ্রকার, একটু প্রকাশ করিয়া বলুন।

উঃ। শ্রীবৃন্দাবন অপ্রাকৃত ধাম, নিত্যপর ব্যোম, শব্দ-ব্রহ্মের অতীত যমুনা তীরে কেলিকদম্ব মূলে অনাদি অনন্ত কাল বংশী বাদন করিয়া ভক্ত সঙ্গে লীলা করিতেছেন। মায়াতীত হইলে চিত্তপটে সেই শব্দের প্রতিধ্বনি অনুভব করিতে পারেন।

প্রাণায়াম দ্বারা চিত্তবৃত্তি রোধ করিয়া যোগীগণ তাহার আভাস পান মাত্র প্রেম ভিন্ন পূর্ণরূপ জানিবার সাধ্য নাই।

বংশী ছিদ্র আকাশে, তার গুণ শব্দে পৈশে,
ধ্বনিরূপে পাইয়া পরিণামে।
সে ধ্বনি চৌদিকে যায়, অণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠে যায়,
জগতের বলে পৈশে কাণে॥
সবা মাতোয়াল করি, বলাৎকারে আনি ধরি,
বিশেষতঃ যুবতীরগণে।

ধ্বনি বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত,
পতি কোল হইতে টানি আনে।"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্য লীলা, ২১ পরিঃ।

প্রঃ। ২৪ প্রহরের উৎপত্তি কখন হইতে হইল? রাধা-নাম কি সকলিই করিতে পারে?

উঃ। ২৪ প্রহর কোন শাস্ত্রে নাই, উহা সঙ্কল্পিত কাম্য কর্ম্ম। ভক্ত সমগ্র জীবন ভগবানের নাম সংকীর্ত্তন করিবেন, উহা নিত্য কর্ম্মে, প্রতিদিন সাধ্য ও অবকাশ মত সংকীর্ত্তন করিতে হয়, মুসলমানগণ প্রত্যহ পাঁচ ওক্ত নামাজ করে, তার মধ্যে শুক্রবারে গৃহ কার্য্য বন্ধ করিয়া সমস্ত দিন নামাজ ও কোরাণ পাঠ করে, খ্রীষ্টানগণ প্রত্যহ নিয়মিত উপাসনা করে, শনি ও রবিবারে সর্ব্বক্ষণ করে, বৈষ্ণবগণও সেইরূপ প্রত্যহ সাধ্যমত স্মরণ কীর্ত্তন করিবেন। বৈষ্ণবের আবির্ভাব তিরোভাব প্রভুর জন্ম লীলা প্রভৃতি শুভ দিনে সংসারের সমুদায় কার্য্য বন্ধ করিয়া ভক্তগণ একত্র হইয়া হরিনাম সংকীর্ত্তন ও পুরাণ পাঠ করিবেন, ইহারই অপভ্রংশ হইতে ২৪ প্রহরের সৃষ্টি হইয়াছে। মায়াতীত ভিন্ন রাধা নামে অধিকার হয় না, নির্গুণ নিত্যানন্দময়ী আহ্লাদিনীকে, আত্ম খণ্ড কারীর, ধ্যান বা ধারণা করিবার শক্তি নাই।

প্রঃ। নিতাই গৌর নাম যে ভাবেই করা হউক্, তাহাতে কি অপরাধ নাই? তবে, আবার নিরপরাধ হইয়া নাম করিবার উপদেশ কেন?

উঃ। নিতাই গৌর নামে কেবল পাপী ও মহাপাপীগণেরই অধিকার; পাপী নিজ পাপ স্মরণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে নিতাই গৌর আমার অপরাধের বিচার না করিয়া অভয় ও প্রেমদান করেন। কোটী জন্ম কৃত মহা-পাপ মুহূর্ত্ত মধ্যে ধ্বংস করেন, করুণাময় অবতার এমন দয়াল অবতার, আর কখনও হয় নাই, হবে না; কিন্তু ভারতবর্ষে পাপী অতি বিরল। ডোম্, বাগ্দী মুচী প্রভৃতি জাতির মধ্যেও কেহ কেহ ব্রাহ্মণ হইয়া ইহাদিগকে পুণ্যবান করিয়াছে। যে জাতির ব্রাহ্মণ বা কোন পুণ্য কর্ম্ম নাই, সে জাতি, যে ভাবেই নাম করুক্ না, নামের গুণে আকৃষ্ট হইবেই।

প্রঃ। আপনি ইতঃপূর্ব্বে লিখিয়া ছিলেন ভিক্ষা দানে আমার দেবালয়টী রক্ষা না করিলে আত্মহত্যা দ্বারা এ জীবন বিসর্জ্জন দিব।" ইহা কি প্রকৃত

ভক্তের কথা? আত্মহত্যা মহাপাপ। কেমন করিয়া একথা বলিলেন। আইন অনুসারে ইহা দণ্ডনীয়।

উঃ। জীবরাজ্য ও শিবরাজ্যে বিপরীত গতি, পাত্রবিশেষে বিষ অমৃত এবং অমৃত বিষ হয়, যে প্রকার গাঁজা সিদ্ধি জীবের ঘৃণিত, শিবের আদরণীয়; গুরু নিন্দা শ্রবণে স্বয়ং সতী দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভক্তগণ কি প্রকার যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন দেখিবেন। প্রভুপাদ সনাতন গোঁস্বামী রথ চক্রে দেহ ত্যাগ করিতে উৎসুক হইয়াছিলেন প্রভু মুরারী গুপ্ত একখানি নূতন কাটারী গড়াইয়া দেহ নাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। প্রভুপাদ রঘুনাথ দাস, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত হইতে পতিত হইয়া দেহ ত্যাগে উদ্যত হইয়াছিলেন। ছোট হরিদাস প্রয়াগে আত্ম-হত্যা করিয়াছেন, স্বয়ং মহাপ্রভু, অদ্বৈত প্রভুর প্রতি দণ্ড দিবার জন্য গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়ায় হরিদাস ও নিত্যানন্দ প্রভু, তাঁহাকে তুলিয়া নন্দন আচার্য্যের গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন। আমি অর্থ উপায় জন্য ঐপ্রকার লিখি নাই, লীলা অন্তর্দ্ধান হইবে বলিয়া এবং আপনাদিগের সংসারাশক্তি ছেদন উদ্দেশ্যে, অন্তরঙ্গ ভক্তের নিকট লিখিয়াছি, আমি হিতাহিত জ্ঞান শূণ্য পাগল, আইন জ্ঞান নাই, যাহা আইন বিরূদ্ধ, তাহা আপনারা বিবেচনা করিয়া প্রকাশ করিবেন।

প্রঃ। আপনি লিখিয়াছেন "আমি দিনের বেলায় আপনাদের সহিত তর্ক যুদ্ধ করিতাম এবং রাত্রিকালে রাসলীলা করিতাম।" ইহা কিরূপ?

উঃ। "রাধা ভাব দ্যুতি সুবলিতং নৌমীকৃষ্ণ স্বরূপম।" শ্রীরাধার ভাব স্যায় আপনি করি অঙ্গীকার।" মহাপ্রভুর লীলায় গোপীগণ পুরুষ দেহ ধারণ করিয়া আসিয়া ছিলেন বৃন্দাবন লীলার সহায় ললিতা, বিশাখা, প্রভু স্বরূপ গোস্বামী ও প্রভু রামানন্দ রায়। মহাপ্রভু দিবাভাগে জগন্নাথ দর্শন এবং ভক্ত সঙ্গে সংকীর্ত্তন করিতেন, রাত্রিকালে রামানন্দ সহ রস আস্বাদন করিতেন। আত্মায় ও পরমাত্মায় রমণই রাস লীলা; নির্জ্জনে স্মরণ মনন করিলেই পূর্ণানন্দ হয়। পুরুষার্থ ত্যাগ করিয়া প্রকৃতি দেহ প্রাপ্ত হইলে দেখিতে পাইবেন, ভগবান সর্ব্বক্ষণ চরাচর জগতের আত্মায় রমণ করিতেছেন; তখন রাঙ্গা পা দু'খানির পূর্ণরস আস্বাদনে, মনুষ্যজন্ম কৃতার্থ জ্ঞান করিবেন এই দরিদ্রকে প্রকৃত বন্ধু বলিয়া জানিবেন এবং শিবরাজ্য দেখিয়া সমুদায় সংশয় হইতে উত্তীর্ণ হইবেন।

শিবরাজ্য সবই বিপরীত, প্রেমের গতি কুটীল এখানে হিংসা নাই, সর্প ময়ূর, সিংহ, গরু এক স্থানে বাস করে, স্ত্রী পুরুষের কোন বিকার নাই; সকলেই আত্মানন্দে পরিপূর্ণ, সেখানে অন্ধকার নাই, রাত্রি নাই, সর্ব্বক্ষণ কোটী সূর্য্য উদয়, সকলই আনন্দময়; সে আনন্দের এক কণা বর্ণনা করিবার শক্তি বা তুলনার সামগ্রী পৃথিবীতে নাই। ক্রমশঃ—

শ্রীরসিকলাল দে।

বৈষ্ণব লক্ষণ।

—:০:—

শ্রীভগবানুবাচ।

অহং প্রাণা বৈষ্ণবানাং মম প্রাণাশ্চ বৈষ্ণবাঃ।
তানেব দ্বেষ্টি যো মূঢ়ো মমাত্মনাং স হিংসকঃ॥
পুত্রান্ পৌত্রান্ কলত্রাংশ্চ রাজলক্ষ্মীং বিধায়চ।
ধ্যায়ন্তে সন্ততং যে মাং কোমে তেভ্যঃ পরঃপ্রিয়ঃ॥
পরা ভক্তানুমে প্রাণা ন চ লক্ষ্মীন শঙ্কর।
ন ভারতী ন চ ব্রহ্মা ন দুর্গা ন গণেশ্বর॥
ন ব্রহ্মা ন বেদাশ্চ ন বেদ জননী সুরা।
ন গোপী ন চ গোপাল ন রাধা প্রাণতঃ প্রিয়া॥

(ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ)

অর্থাৎ শ্রীভগবান বলিতেছেন, আমি বৈষ্ণবগণের প্রাণ এবং বৈষ্ণবগণও আমার প্রাণ। যে মূঢ় ব্যক্তি, বৈষ্ণবগণের প্রতি দ্বেষ করে সে আমার প্রাণ হিংসক। পুত্র, পৌত্র, স্ত্রী ও ঐশ্বর্য্যাদিতে পরিবেষ্টিত হইয়াও যে ব্যক্তি সর্ব্বদা আমার ধ্যানে রত, তাঁহা অপেক্ষা আমার কে প্রিয় হইতে পারেন? তাঁহারাই আমার প্রাণতুল্য প্রিয়। লক্ষ্মী, শিব, ভারতী, ব্রহ্মা, দুর্গা, গণপতি, বেদ সকল, বেদমাতা, দেবগণ, গোপীগণ, ব্রজ গোপালগণ, এমনকি প্রাণপ্রিয়া শ্রীরাধিকাও সেরূপ প্রিয় নহেন। শ্রীভগবান আবার বলিতেছেন—

প্রভবোঽহস্তু সর্বেষামীশ্বরঃ পরিপালকঃ।
তথাপি ন স্বতন্ত্রোঽহং ভক্তাধীনো দিবানিশম্॥

গোলোকে বাথ বৈকুণ্ঠে দ্বিভুজশ্চ চতুর্ভুজম্।
রূপমাত্রমিদং সর্ব্বং প্রাণা মে ভক্ত সন্নিধৌ॥ (ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ)

অর্থাৎ আমি সকলের ঈশ্বর ও পরিপালক হইলেও ভক্তগণের নিকট স্বাধীন নহি—দিবানিশি ভক্তগণের অধীন। গোলোকে ও বৈকুণ্ঠে দ্বিভুজে ও চতুর্ভুজে বিরাজ করি বটে কিন্তু সে সকল আমার রূপ মাত্র, আমার প্রাণ ভক্তগণের নিকটেই থাকে।

আহা! এহেন ভাগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবগণ কতই যে সুলক্ষণে ও সদগুণে বিভুষিত, তাঁহার ইয়ত্তা কে করিবে বল? শাস্ত্র বলেন—

বৈষ্ণবানাং লক্ষণানি কল্প কোটি শতৈরপি। (পাদ্মে)

অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের লক্ষণ শত কল্প কোটী—অনন্ত। বৈষ্ণবগণ ভুবন-মঙ্গল ও বিষ্ণু সদৃশ জগৎ পুজ্য। তাঁহাদের দর্শনে, স্মরণে ও স্পর্শনে মহামহাপাপের ধ্বংস হয়। বৈষ্ণবপদ, দেবদুর্লভ বস্তু। কিন্তু লোক দেখানি বাহ্যিক তিলকাদি বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণ করতঃ জপের মালা হাতে করিয়া বেড়াইলেই বৈষ্ণব হওয়া যায়না—সম্যক প্রকারে না হইলেও বৈষ্ণবে অন্ততঃ কিছু বৈষ্ণব লক্ষণ থাকা আবশ্যক। বিষ্ঠা পূর্ণ পাত্রে পটবস্ত্র আচ্ছাদিত করিলেও তাহা যেমন পবিত্র হয় না,—অপবিত্রই থাকে তদ্রূপ বৈষ্ণবগণের অন্তরে পবিত্রতা না থাকিলে বা তাঁহাদের জপের মালা তদ্গত চিত্তে ঈশ্বরারাধনা না হইয়া কপটাচার অর্থাৎ কোন দুরভিসন্ধি অথবা লোকের নিকট প্রশংসা লাভের জন্য হইলে তাহারা কদাচ বৈষ্ণব পদবাচ্য হইতে পারেনা বরং এই শ্রেণীর পাপাচারীগণ বৈষ্ণব নামের কলঙ্ক স্বরূপ—ইহঁদের অসদাচরণেই আজকাল বৈষ্ণব নাম শ্রবণেই অনেকের মনে কেমন যেন একটা অশ্রদ্ধা ভাব আসিয়া জুটে—হইবার কথাও বটে কারণ এবম্বিধ নাম-বলে পাপে প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণকে শাস্ত্রে মহা অপরাধী ও নারকী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ক্রমশঃ দীনাতিদীন—শ্রীমঙ্গলাপ্রসাদ গুহ পাত্র।

সম্পাদকীয়।

—:০:—

করুণাসিন্ধু শ্রীভগবানের অপার করুণা বলে আজ ১০ বৎসর যাবৎ ক্ষুদ্র ভক্তি পত্রিকা খানি নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া একভাবে চলিয়া আসিতেছেন। পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ পণ্ডিত দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন দাদা মহাশয় স্বর্গীয় হওয়া অবধি পূজনীয় প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বিশেষ যত্ন সহকারে উক্ত পত্রিকার পরিদর্শনের ভার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়া আসিতেছেন। আজ আমরা আরও আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে আগামী ভাদ্রমাস হইতে কলিকাতা "ভাগবত ধর্ম্মমণ্ডলের আচার্য্য" প্রভুগণের দ্বারা বিশেষ ভাবে পরিদর্শিত হইয়া ভক্তি আপনাদিগকে আরও নতন নতন ভাব নূতন নতন উপদেশাদি প্রদানে যত্ন করিবেন। ভাগবত ধর্ম্মমণ্ডলের এইরূপ নিস্বার্থ ত্যাগ স্বীকারের জন্য আমরা—কেবল আমরা কেন সমস্ত গ্রাহকমণ্ডলীই উক্ত ধর্ম্মমণ্ডলের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

আগামী সংখ্যা হইতে যাহাতে ভক্তি খানি দিনদিন উক্ত ধর্ম্মমণ্ডলের আচার্য্য প্রভুগণের কৃপায় উন্নতীর উচ্চতর সোপানে আরোহণে সমর্থ হন, তজ্জন্য উক্ত ধর্ম্মমণ্ডলের সুযোগ্য সম্পাদক আমাদিগের পরম হিতাকাজ্ক্ষী প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ গোস্বামী দাদা মহাশয়ও বিশেষ যত্ন করিতেছেন। আমরা ক্ষুদ্র তাঁহার এই মহৎ ত্যাগস্বীকারের প্রতিদান দিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ, তবে যে সামান্য ভক্তি পত্রিকা খানির জন্য তিনি এত দূর করিতেছেন সেই ভক্তি পত্রিকার এক মাত্র আশ্রয় দাতা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরণ কমলে তাঁহার অটুট ভক্তি বিশ্বাস চিরকাল থাকুক এবং সেই ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের কৃপায় সেই প্রেম ভক্তি ধনে ধনী হইয়া আমাদিগের ন্যায় কলিকলুষিত জীবের মঙ্গলের জন্য সেই ধন অকাতরে বিতরণ করিতে সমর্থ হউন ইহাই আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা।

বিনীত—সম্পাদক।

জীবে দয়া।

—:০:—

মঙ্গলাচরণম্।

আনন্দং নির্ম্মলং শান্তং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্।
নিত্যং শুদ্ধং দ্বন্দ্বাতীতং গুরুং ব্রহ্মংনমাম্যহং ॥১॥
চতুষ্পাদো ভবান্ বেদস্ত্রিশৃঙ্গশ্চ ত্রিলোচনঃ।
সপ্তহস্ত স্ত্রিবন্ধশ্চ বৃষরূপ নমোঽস্তুতে ॥২॥
ত্বয়াহীনা বয়ং দেব সর্ব্ব উন্মার্গ বর্ত্তিনঃ।
সন্মার্গং যচ্ছ মূঢানাং ত্বহিনঃ পরমাগতিঃ ॥৩॥
মানসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহু মানয়ন্।
ঈশ্বরো জীব কলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥৪॥*

যিনি আনন্দ স্বরূপ, নির্ম্মল, শান্ত, নির্ব্বিকার নিঞ্জন, সত্য, শুদ্ধ, দ্বন্দ্বাতীত অর্থাৎ সুখ দুঃখাদি মানবোচিত বন্ধন মুক্ত সেই পরমব্রহ্ম স্বরূপ শ্রীগুরুদেবকে আমি নমস্কার করি ॥১॥

হে ব্রহ্মাত্মজ সনাতন ধর্ম্মদেব! আপনি চতুষ্পাদ, ত্রিশৃঙ্গ, ত্রিলোচন, আপনি সপ্ত হস্ত পরিমিত দেহবিশিষ্ট ত্রিশিখ এবং বৃষরূপী আপনাকে নমস্কার করি ॥২॥

হে দেব! আপনা ব্যতীত আমাদিগের সকলকেই কুপথগামী হইতে হয়, হে প্রভো! আমরা একান্ত মূঢ় ভাবাপন্ন ক্ষুদ্র জীব; আমাদিগকে দয়া করিয়া সৎপথ প্রদান করুন ॥৩॥

পশুপক্ষী মৎস্য ও মানবাদি নিখিল জীবের মধ্যে ভগবান শ্রীহরি অংশ রূপে বিদ্যমান থাকায় সর্ব্ব প্রকার জীবকেই বহুমানের সহিত প্রণাম করিবে ॥৪

* ২—৩ শ্লোক বরাহপুরাণ ২২অ: ২৪—২৫ শ্লোক। ৪র্থ শ্লোক ভাগবত ৩।২৯।৩৪।

প্রথম-স্তবক।

(তথাহি বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ১।৩৩—৪৩ শ্লোক);—

ধর্ম্মঃ সনাতনঃ সর্ব্বৈঃ সেবনীয়ঃ সদামুনে।
ধর্ম্ম এব পরো বন্ধু পিতা মাতা পিতামহঃ ॥১॥

ধর্ম্ম গুরুঃ সত্য একো ধর্ম্ম এব পরাগতিঃ।
ধর্ম্ম আত্ম্য ক্রিয়া ধর্ম্ম স্তীর্থানি ধর্ম্ম এবহি ॥২॥

ধর্ম্মো ধনং সর্ব্বদেবো ধর্ম্ম এব ন সংশয়ঃ।
ধর্ম্মঃ সম্পদ্ বিপদ্ ধর্ম্মরাহিত্যং ব্যর্থ জীবনম্ ॥৩॥

সদসং কর্ম্মণাং দ্রষ্টা ধর্ম্ম এব সনাতনঃ।
ধর্ম্মো মতিঃ পরোলাভস্তস্য হ্যপচয়োন্যথা ॥৪॥

সা চাতুরী চাতুরী যা ধর্ম্ম রক্ষা করী ভবেৎ।
সহস্রোপদ্রবৈর্যুক্তো যো ন ধর্ম্মং জহাতি হি।
সধীর উচ্যতে সদ্ভিধর্ম্মহা আত্মহা মতঃ ॥৫॥

ভগবান ব্যাসদেব কহিলেন, হে মুনে! সকলেরই নিয়ত সনাতন ধর্ম্মের সেবা করা কর্ত্তব্য। যে হেতু ধর্ম্মই জীবের পরম বন্ধু, ধর্ম্মই পিতা মাতা এবং ধর্ম্মই পিতামহ স্বরূপ ॥১॥ ধর্ম্মই গুরু, ধর্ম্মই সত্য, ধর্ম্মই পরমাগতি, ধর্ম্মই জীবের আত্মা, ধর্ম্মই সৎক্রিয়া এবং ধর্ম্মই যাবতীয় তীর্থ স্বরূপ ॥২॥ ধর্ম্মই জীবের পরম ধন, ধর্ম্মই দেবতা, ধর্ম্মই সম্পত্তি, ধর্ম্ম হীনতাই বিপত্তি এবং ধর্ম্ম হীনের জীবনই বৃথা ॥৩॥ সনাতন ধর্ম্মই সৎ এবং অসৎ কর্ম্মের সাক্ষী স্বরূপ, ধর্ম্ম বুদ্ধিই পরম লাভ এবং ধর্ম্ম বুদ্ধির অভাবই সম্পূর্ণ ক্ষতি ॥৪॥ যে চাতুরী হইতে ধর্ম্ম রক্ষা হয় সেই চাতুরীই প্রকৃত চাতুরী এবং সহস্র সহস্র বিপদে পতিত হইয়াও যে ব্যক্তি ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করেন, সজ্জনেরা তাঁহাকেই ধীর বলেন পরন্তু ধর্ম্ম পরিত্যাগী লোককেই আত্মঘাতী বলিয়া জানিতে হইবে ॥৫॥

ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে সুতঃ।
ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে গেহং ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে ধনম্
ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে দেহো ধর্ম্মার্থে সুস্থিরা মহী ॥৬॥

ধর্ম্মার্থে যষতীন্দ্রোঽপি ধর্ম্মার্থে তপতে রবিঃ।
ধর্ম্মার্থে বহতে বায়ু ধর্ম্মার্থেঽগ্নি র্জ্জ্বলত্যসৌ ॥৭॥
ধর্ম্মার্থানি পুরাণানি ধার্ম্মিকঃ পূজ্যতেহ মরৈঃ ॥ ৮॥
অধার্ম্মিক মুখং দৃষ্ট্বা পশ্যেৎ সূর্য্যং সদা নরঃ ॥৯॥
ধার্ম্মিকো যত্র তৎতীর্থং সদেশো নিরুপদ্রবঃ।
মাধর্ম্মে রমতাৎ বুদ্ধির্যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ ॥১০॥
ধর্ম্মশ্চতুষ্পাৎ সম্পুর্ণো বৃষরূপ ধরশ্চরম্।
পাতি লোকা নিমান্ মূর্ত্ত স্তস্মৈ ধর্ম্মায় বৈ নমঃ ॥১১॥
মৃতং শরীর মুৎ সৃজ্য কাষ্ঠ লোষ্ট্র সমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্ম স্তমনু গচ্ছতি ॥১২॥

(মনু ৪।২৪১)

ধর্ম্মের জন্যই ভার্য্যা গ্রহণ, ধর্ম্মের জন্যই পুত্রোৎপাদন, ধর্ম্মের জন্যই গৃহ নির্ম্মাণ এবং ধর্ম্মের জন্যই ধনোপার্জ্জন, ধর্ম্মের জন্যই দেহ ধারণ এবং ধর্ম্মের প্রভাবেই পৃথিবী অবস্থিতা রহিয়াছেন ॥৬॥ ইন্দ্রের আধিপত্য, সূর্য্যের উত্তাপ প্রদান, বায়ুর প্রবহন, এবং অগ্নির প্রজ্জ্বলন এ সমস্তই ধর্ম্মের প্রভাব ॥৭॥ পুরাণ শাস্ত্রসকলও ধর্ম্মের জন্য, দেবতাগণও ধার্ম্মিক জনের পূজা করেন; মানবগণ অধার্ম্মিক ব্যক্তির মুখ দেখিলে সূর্য্য দর্শন করিয়া পবিত্র হইবে ॥৮॥৯॥ যে স্থানে ধার্ম্মিক ব্যক্তির বসতি, তাহা তীর্থ স্বরূপ এবং সে স্থান নিরুপদ্রব অর্থাৎ শান্তিময়। অতএব বুদ্ধি যেন কখনও অধর্ম্ম করিতে অগ্রসর না হয়; কেননা "যতোধর্ম্ম স্ততোজয়" অর্থাৎ যেখানে বা যাহার নিকট ধর্ম্মের মর্য্যাদা অক্ষুন্ন থাকে সেই স্থান বা সেই ব্যক্তি সর্ব্ব প্রকারেই জয়যুক্ত হন ॥১০॥ সনাতন ধর্ম্ম সম্পূর্ণ চতুষ্পাদ, তিনি পবিত্র বৃষ রূপ ধারণ করতঃ লোক মধ্যে বিচরণ পূর্ব্বক বিশ্ব রক্ষা করিতেছেন। অতএব আমরা সেই সনাতন ধর্ম্মদেবকে নমস্কার করি ॥১১॥ শব দেহ বা মৃত শরীর কাষ্ঠ ও লোষ্ট্রের (মৃত খণ্ডের) ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া থাকে এবং সেই চরম কালে বান্ধবেরাও চলিয়া যায়, কিন্তু একমাত্র সনাতন ধর্ম্মই পরলোকে জীবের সহায় হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

তথাহি (পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড) ;—

পাত্রে দানং মতি কৃষ্ণে মাতা পিতাশ্চপূজনম্।
শ্রদ্ধাবলির্গবং গ্রাসঃ ষড়্‌বিধং ধর্ম্ম লক্ষণম্ ॥ ১৩ ॥

তথাহি (পদ্মপুরাণ ভূমি খণ্ড) ;—

ব্রহ্মচর্য্যেন সত্যেন তপস্যা চ প্রবর্ত্তস্তে।
দানেন নিয়মে নাপি ক্ষমাশৌচেন বল্লভ ॥ ১৪ ॥

অহিংসায়া সুশান্ত্যাচ অস্তেয়ে নাপি বর্ত্ততে।
এভির্দর্শভিরঙ্গৈস্ত ধর্ম্মমেব প্রসূচয়েৎ ॥ ১৫ ॥

তথাহি (মৎসা পুরাণম্);—

অদ্রোহশ্চাপ্য লোভশ্চ দমো ভূত দয়া তপঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং ততঃ সত্য মনুক্রোশঃ ক্ষমা ধৃতিঃ ॥ ১৬ ॥

তথাহি (বৃহধর্ম্ম পুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ১ম অঃ ১০ শ্লোক) ;—

সত্য দয়া তথাশান্তিরহিংসা চেতি কীর্ত্তিতাঃ।
ধর্ম্মস্যাবয়বাস্তাত চত্বারঃ পূর্ণতাং গতাঃ ॥ ১৭ ॥

সৎপাত্রে দান, শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি, পিতা মাতার প্রতি ভক্তি, শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস, বলিঅন্ন প্রদান বা ভূত যজ্ঞ * এবং গোগ্রাস দান এই ছয়টি ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া কথিত ॥ ১৩ ॥ ব্রহ্মচর্য্য, সত্য বাক্য কথন, তপস্যা, দান নিয়ম, † ক্ষমা, শৌচ, অহিংসা, শান্তি এবং অস্তেয় ‡ এই দশটি ধর্ম্মের অঙ্গ জানিবে ॥ ১৪—১৫ ॥ পরোপকার, অলোভ, দম, $ প্রাণিগণে দয়া, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, প্রীতি ক্ষমা এবং ধৃতি § এই কয়েকটি ধর্ম্মের মূল বা আদি কারণ ॥ ১৬ ॥

---

* ভূত যজ্ঞ—পঞ্চ মহাযজ্ঞান্তর্গত, প্রাণি ভোজ্যদান।

† নিয়ম—অক্রোধ, তপস্যা, গুরুশুশ্রূষা, শৌচ, আহারলাঘব এবং অপ্রমাদ ইত্যাদি।

‡ অস্তেয়—চুরি না করা।

$ দম—ইন্দ্রিয় নিগ্রহ।

§ ধৃতি—ধৈর্য্য বা সহিষ্ণুতা।

তথাহি (পাদ্মে স্বর্গখণ্ডে ১৫। ৭০ শ্লোক) ;--

অহিংসা পরমো ধর্ম্মোহ্যহিংসৈব পরংতপঃ।

অহিংসা পরমং দানমিত্যাহু র্মুনয়ঃ সদা ॥ ১৮ ॥

তথাহি (মহাভারতে) ;—

অহিংসা লক্ষণোধর্ম্মা হিংসা চাধর্ম্ম লক্ষণ। ১৯

তথাহি (বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ, পূর্ব্বখণ্ড ২য় অং ১১—১২ শ্লোক) ;—

অহিংসা ত্বাসন জয়ঃ পরপীড়া বিসর্জ্জনম্।

শ্রদ্ধা চা তিথি সেবাচ শান্তরূপ প্রদর্শণম্ ॥২০॥

আত্মীয়তা চ সর্ব্বত্র আত্মবুদ্ধি পরাত্মসু।

ইতি নানাবিধাঃ প্রোক্তা অহিংসেতি মহামুনে ॥২১॥

সত্য, দয়া, শান্তি এবং অহিংসা এই চারিটি পদ দ্বারা সনাতন ধর্ম্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন * ॥ ১৭ ॥ অহিংসা পরম ধর্ম্ম, অহিংসা পরম তপস্যা, এবং অহিংসা রূপী পবিত্র কার্য্যকেই মুনিগণ পরমদান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥ স্থূলতঃ সর্ব্বপ্রকার অহিংসাই ধর্ম্মের লক্ষণ এবং হিংসাকেই অধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ১৯॥

---

* সত্য—মিথ্যা কথা পরিত্যাগ, অঙ্গীকার পালন, প্রিয়বাক্য কথন, গুরু-সেবা, দৃঢ় ব্রত আস্তিক্য, সুধীসঙ্গ, মাতা পিতার সন্তোষ সাধন, কায়িক বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ শৌচ, লজ্জা, অকৃপণতা, এবং অকপটতা এই দ্বাদশ প্রকার সত্যের লক্ষণ জানিবে।

দয়া—পরোপকার, ঈষৎ হাস্যযুক্ত বাক্য, বিনয় নম্রতা এবং সমদর্শিতা এই ছয় প্রকার দয়ার লক্ষণ জানিতে হইবে।

শান্তি—পরনিন্দাদি পরিত্যাগ, অল্পেই সন্তোষ হওয়া, ইন্দ্রিয় সংযম, সঙ্গত্যাগ, মৌন, দেবার্চ্চনা, নিত্যক্রিয়া সাধন, ভয় হীনতা, গাম্ভীর্য্য, স্থির চিত্ততা, কোমলতা, সর্ব্বত্র অনাসক্ততা, দৃঢ় চিত্ততা, অকার্য্য বিবর্জ্জন, মানাপমানে সমজ্ঞান, পরগুণের প্রশংসা, ব্রহ্মচর্য্য, ধৈর্য্য, ক্ষমা, আতিথ্য, জপ, হোম, তীর্থসেবা, পূজনীয়ের পূজা, মাৎসর্য্য হীনতা, বন্ধমোক্ষ জ্ঞান, সন্ন্যাস ভাবনা, দুঃখ সহিষ্ণুতা অদৈন্য এবং অমূর্খতা এই ত্রিংশ গুণের নাম শান্তি।

অহিংসার লক্ষণ সম্বন্ধে ভগবান ব্যাসদেব আরও বলিয়াছেন যে;—ইন্দ্রিয়-জয়, পরপীড়া বর্জ্জন, ধর্ম্মে বিশ্বাস, অতিথি সেবা, শান্তভাব, সর্ব্বত্র অন্তরঙ্গতা এবং অপর জনেও আপনার ন্যায় বোধ করা, এইরূপ অহিংসা লক্ষণ বহু প্রকার জানিবে॥২০—২১॥

মহাশান্তি ও পরম করুণার আকর স্বরূপা জগজ্জননী দুর্গা জীবের প্রতি দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক ছাগ মেষাদি বলিদান প্রিয় আপন সন্তানগণের "অহিংসা পরমধর্ম্ম" প্রাপ্তির জন্য লোকশঙ্কর ভগবান শঙ্করের নিকট "জীবানুগ্রহ" নামক যে, গুহ্য তত্ত্ব বলিয়াছিলেন, সেই শান্তিমাখা আখ্যানের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বকই এই "জীবেদয়া" প্রবন্ধ প্রকটিত হইল। ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায় বিশেষতঃ বলিদান প্রিয় পার্ব্বতীর প্রিয় পুত্রগণ দয়া প্রকাশে ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ ও মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলে, এ জ্ঞান-দরিদ্র ব্রাহ্মণাধমের পরিশ্রম সফল হইতে পারে। পরিশেষে সহৃদয় পাঠক ভ্রাতৃগণের নিকট বিনীত নিবেদন এই তাঁহারা যেন মদীয় লিপি ক্রটী এবং অন্যবিধ অপরাধগুলিও মার্জ্জনা করিয়া পাঠ করেন।

বলিদান প্রিয় দেবী-ভক্তগণ যে সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমানের বলে অথবা সহ-জাত সংস্কারের অভিমানে ছাগাদি পশুর প্রাণ বিনাশ পূর্ব্বক জীব নিস্তারিণী মহামায়া দুর্গার তৃপ্তিসাধনে যত্নপর হইতেছেন, সেই প্রমাণ বাহুল্যের সংক্ষিপ্ত সার ও দেবী দাক্ষায়ণীর শ্রীমুখ বিনিসৃতা সুধাময়ী বাক্যাবলী * এবং ভাগবতাদি অন্যান্য শাস্ত্র বর্ণিত "সর্ব্ব প্রকার হিংসা ত্যাগ" † সম্বন্ধীয় প্রধান সকল অনন্য মনে পাঠ করিলে, আশা করা যায় তাহাদিগের বৈধ হিংসা উদ্দীপিত চিত্ত প্রকোষ্ঠে "অহিংসা পরম ধর্ম্মরূপ" অশ্বত্থ বনস্পতির সুশীতল শান্তি ছায়া নিপতিত হইতে পারে। ভাই পাঠকগণ! তোমরা যদি কর্ম্ম বা বাসনা সমষ্টির আকর মনকে সংসার কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্ঠিত উক্ত বনস্পতির শান্তি ছায়ায় পাঠাইতে পার; তাহা হইলে অচিরেই যথার্থ সুহৃদ

---

*, জীবে দয়া নামক এই প্রবন্ধটি মৎ প্রণীত "শক্তি তত্ত্বামৃত" নামক গ্রন্থের "জীবানুগ্রহ নামক" অধ্যায়ের ব্যাখ্যা মাত্র।

† সর্ব্ব প্রকার হিংসা বৈধ ও অবৈধ হিংসা।

জ্ঞানানন্দ ও প্রকৃত জননী ভক্তি দেবীর কৃপায় কৃপাপারাবার ব্রহ্মানন্দ জ্যোতি জগদীশের অমৃতময় মহানন্দির লাভ করতঃ ষট তরঙ্গময় ভবসিন্ধুর দায় মুক্ত হইতে সমর্থ হইবে।

আপনারা কালিকাদি তামসিক পুরাণ ও কতকগুলি অজাত শ্মশ্রুতন্ত্রের প্রমাণ বা মন্ত্র মালায় বিভূষিত যে সমস্ত মানবকে অজ মহিষাদির প্রাণোপহার দ্বারা পরমেশ্বরীর পূজা করিতে দেখিতেছেন আমিও ভাই! দুঃখের সহিত যথাশক্তি সংক্ষিপ্তভাবে সেই মালার তীক্ষ্ণগন্ধ কুসুম সমূহ তন্ত্র ও পুরাণ গ্রন্থ হইতে একে একে উন্মোচন পূর্ব্বক ব্যাখ্যা চন্দনে অভিষিক্ত করিয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি, "অপ্রতিষ্ঠ তটের" কঠিন পদতল প্রহারে এ জ্ঞান-দুর্ব্বলকে অযথা প্রহার না করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিরপেক্ষ কমণীয় করতল অগ্রসর করতঃ গ্রহণ করিলে চির চরিতার্থ হইতে পারি। ভ্রাতৃগণ! কালি-কাদি পুরাণ সূতার গাঁথা ফুলগুলি এই ;—

ছাগত্বং বলিরূপেণ মম ভাগ্যাদুপস্থিতঃ।
প্রণমামি ততঃ সর্ব্ব রূপিণং বলি রূপিণং ॥২২
যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
অতস্ত্বাং ঘাতয়িষ্যামি তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ ॥২৩
পশুযোনি প্রসূতোঽসি পূজা হোমাদি কর্ম্মসু।
তুষ্টা ভবতু সা দেবী সরক্ত নিশিতৈস্তব ॥২৪॥
চণ্ডিকা প্রীতিদানেন দাতুরাপদ বিনাশনঃ।
চামুণ্ডা বলিরূপায় বলে! তুভ্যং নমোনমঃ ॥২৫॥

(কালিকা পুরাণ ৬৬ অধ্যায়।)

হে ছাগ! তুমি আমার সৌভাগ্য ক্রমে বলিরূপ ধারণ পূর্ব্বক অগ্র উপস্থিত হইয়াছ, একারণ সর্ব্বরূপধারী বলিরূপী তোমাকে প্রণাম করি ॥২২॥ স্বয়ং ব্রহ্মা যজ্ঞের নিমিত্ত পশু সকল সৃজন করিয়াছেন, সেই যজ্ঞের জন্যই আবার আমি তোমাকে বধ করিতেছি, যেহেতু যজ্ঞার্থে যে বধ তাহা অবধতুল্য ॥২৩॥ হে বলে! পূজা এবং হোমাদি কার্য্য সম্পন্ন করার জন্যই তুমি পশু যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। অতএব তোমার শোণিত পানে দেবী অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিবেন ॥২৪॥ তুমি চণ্ডিকার সন্তোষ উৎপাদন পূর্ব্বক দাতার আপদ

বিনাশ কর, হে বলে! তুমি চামুণ্ডার বলিরূপ ধারণ করিয়াছ আমি তোমাকে নমস্কার করি ॥২৫॥

বলিং যেচ প্রযচ্ছন্তি সর্ব্বভূত বিনাশনং।

তেষান্তু তুষ্যতে দেবী যাবৎ কল্পান্ত শঙ্করম্ ॥২৬॥ দেবী পুরাণ।

যাহারা সর্ব্ব প্রাণি বিনাশের কারণীভূত ছাগাদি পশু বলিদান করে, শঙ্কর কল্প পর্য্যন্ত দেবী তাহাদের প্রতি প্রসন্না থাকেন ॥২৭॥

এই প্রকার রজস্তমগুণের বিকারোৎপন্ন পশুবধরূপ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি মার্গে অগ্রসর হইবার উপযুক্ত উপদেশাবলী রাজসিক পুরাণে কিঞ্চিৎ কম থাকিলেও কালিকাদি তামসিক পুরাণও অধিকাংশ আধুনিক তন্ত্রেই ইহার বিশেষ বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগবতাদি সাত্বিক পুরাণ সংহিতায় বৈধ হিংসা বা ছাগাদি পশু বলি যার পর নাই গর্হিত ও নিন্দনীয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যে সমস্ত বলিপ্রিয় মানব ঐ সংস্কৃত বচন সকলকে শিববাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে বহু বিনয় বাক্যে বলিতেছি যে ইহা শিব বাক্য হইলেও তাঁহার তমোগুণ বা সাক্ষাৎ কালাদি রুদ্ররূপী * রৌদ্র ও ভয়ানকাদি রসময় সংহার মূর্ত্তির দক্ষিণ দিকজাত অঘোর নামক বদনোৎপন্ন অভিচার বাক্য ব্যতিরেকে আর কি বলা যাইতে পারে? কারণ যাঁহার নাম হইতেছে "শিব" অর্থাৎ নিখিল বিশ্বের কুশল; সেই পবিত্র শুভঙ্করের বদন হইতে ছাগ মেষাদি নিরীহ তৃণভোজী জীবের অশিব জনক আদেশ প্রচার কখনই সম্ভব নহে। মদীয় চিত্ত গুহার অন্তস্থল হইতে কে যেন চীৎকার করিয়া অবিরত বলিতেছেন যে "শিবের মুখে কখনই অশিব বাক্য নিসৃত" হইতে পারে না ইহা সম্পূর্ণ মোহ! পূর্ণতম মহামোহ! ভাই পাঠক বৃন্দ! অশিবরাশি বিনাশী সর্ব্বাশীষকারী জ্ঞানময় শিবের এবং শিব নামের মহামহিমা, নিতান্ত জ্ঞানহীন আমি কি বলিতে পারি? সৃষ্টি প্রকরণে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ শিব মহিমা, যাহা বলিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ শ্রবণ করুন;—

* নির্গুণ কৃষ্ণ দেহে গুণময় বিষ্ণু যেমন অসুর সংহারাদি লীলাবতার সম্বন্ধীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন; এই "কালাগ্নিরুদ্র" ও পরম মঙ্গলময় নির্গুণ শিবদেহে প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া, কিম্বা কার্য্য বিশেষে পৃথক ভাবে সংহারাদি কার্য্যের যথেষ্ট উপদেশ, অনুমোদন এবং গোপন করিয়া থাকেন।

তথাহি (ব্রং বৈং পুং ব্রহ্মখণ্ড ৬। ২৭—৫৩ শ্লোক:—

শিবেতি শব্দ মুচ্চার্য্য প্রাণং ত্যজতি যো নরঃ।
কোটী জন্মার্জ্জিতাৎ পাপান্মুক্তো মুক্তিং প্রয়তি সঃ॥ ২৭॥
শিবংকল্যাণ বচনং কল্যাণং মুক্তি বাচকম্।
যতস্তৎ প্রভবত্তেন সশিবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ২৮॥
বিচ্ছেদে ধন বন্ধুনাং নিমগ্ন শোক সাগরে।
শিবেতি শব্দমুচ্চার্য্য লভেৎ সর্ব্বশিবং নরঃ॥ ২৯॥
পাপঘ্নে বর্ত্ততে শিশ্চ বশ্চ মুক্তি প্রদেতথা।
পাপঘ্নো মোক্ষদোনৃণাং শিবস্তেন প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৩০॥
শিবেতি চ শিবং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে।
কোটী জন্মার্জ্জিতং পাপং তস্য নশ্যতি নিশ্চিতং॥ ৩১॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রাণ ত্যাগ কালে "শিব" এই শব্দ একবার মাত্র উচ্চারণ করে, সে ব্যক্তি কোটি জন্মার্জ্জিত পাপরাশি হইতে অনায়াসে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। ২৭॥ "শিব" এই শব্দ কল্যাণ বাচক এবং কল্যাণ শব্দ মুক্তি বাচক সুতরাং শিব কৃপায় জীব মুক্তিপায় বলিয়াই তাহার নাম শিব হইয়াছে॥ ২৮॥

মানবগণ ধন ও বন্ধুজনের বিরহ জনিত শোকনীরে নিমগ্ন হইয়া যদি পরম স্বস্ত্যয়ন শিব শব্দ কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ লাভে সমর্থ হইবে॥ ২৯॥ "শি" শব্দ পাপ নাশক এবং "ব" শব্দ মুক্তি দায়ক; এ কারণ জীবের পাপ নাশক ও মুক্তিদায়ক মহাদেবকেই শিব শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন॥ ৩০॥ যে ব্যক্তির বাক্য মুখে "শিব" এই মঙ্গল বাচক শব্দ উচ্চারিত হয়, নিশ্চই তাঁহার কোটিজন্ম সঞ্চিত পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩১॥ শিবলিঙ্গেও স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্তঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।" "মায়া বাদ মসচ্ছাস্ত্রং" ইত্যাদি পদ্মপুরাণীয় শ্রুতিদ্বয় প্রমাণের দ্বারা আমরা এইরূপ মহাদেবের অলৌকিক কার্য্যপ্রণালী অবগত হইয়া থাকি॥ "কালাগ্নি রুদ্র" যে সংহারকারী শিব তাহা পাঠকদিগের নিঃসন্দেহে জানিতে হইলে "ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ব্রহ্মখণ্ড ৮ অং ১৯ শ্লোক এবং স্বয়ং শিব যে সত্ত্বগুণময় বিগ্রহ বা নির্গুণ মূর্ত্তি তাহাও ঐ অধ্যায়ের ২০ শ্লোক পাঠে জানিতে পারিবেন।

'অঘোর' নামক সাক্ষাৎ মহাকাল সদৃশ শিববদনের বিষয় জানিতে হইলে পাঠকগণ কুলার্ণব নির্ব্বাণ তন্ত্র এবং দেবীপুরাণ পাঠ করিবেন।

তথাহি (বৃহৎকূর্ম্মপুরাণ মধ্যখণ্ড ২৭ অং ৫৭—৬৪ শ্লোক)

শিবলিঙ্গেহপি সর্ব্বেষাং দেবানাং পূজনভবেৎ।
সর্ব্বলোকময়ে যস্মাৎ শিবশক্তীবিভু প্রভু ॥৩২॥
বরং প্রাণ পরিত্যাগ শ্ছেদনং শিরসোহপিবা।
নত্বসম্পূজ্য ভুঞ্জীত ভগবন্তং ত্রিলোচনম্ ॥৩৩॥
প্রত্যহং স্বনুকুর্ব্বীত শিবলিঙ্গ প্রপূজনম্
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ স্ত্রীশূদশ্চান্যজোহপিচ।
পরাঙ্মুখঃ শিবার্চ্চায়াং যোহর্চ্চয়েদ্দেবতাগণম্।৩৪
বিফলং তস্য তৎসর্ব্বংযথৌষধ মমন্ত্রিতম্।
পরাঙ্মুখঃ শিবার্চ্চায়াং যোভুঙ্‌ক্তে মু জলাদিকম্
অন্নংবিষ্ঠা পয়োমূত্রং মুখ তস্য ন দৃশ্যতে ॥৩৫॥
গুরুঃ স্বয়ং শিবঃ সাক্ষাদ্ গুরু পত্নী চ পার্ব্বতী।
তাবনভ্যর্চ্চ্য যোভুঙ্‌ক্তে মুখ তস্য ন দৃশ্যতে ॥৩৬॥
শিবঃ সাক্ষাৎ পিতাদেবঃ পার্ব্বতী জননী শিবা।
তৌন পূজ্যতু যোভুঙ্‌ক্তে মুখংতস্য ন দৃশ্যতে ॥৩৭॥
শিবং নাভ্যর্চ্চ্য যস্যস্ত উভে ভোজন কর্ম্মণি।
স এব শূকরঃ প্রাচ মনুষ্য রূপতাং গতঃ ॥৩৮॥

দেবতা সকলেরপূজা করিবে, কারণ শিব এবং শক্তি উভয়েই সর্ব্বলোকময় ও প্রভুরও প্রভুতুল্য ॥৩২॥ যদি তাহাতে মস্তক ছিন্ন হয়, তাহাও স্বীকার্য্য তথাপি ভগবান্ ত্রিলোচন শিবের পূজা না করিয়া মানব মাত্রেই ভোজন করিবেনা ॥৩৩॥ প্রত্যহই শিবের পূজা করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী অথবা অপর কোন নীচ জাতিও যদি শিবপূজায় বিমুখ হইয়া অন্য দেবতার পূজাকরে, তাহার সেই সমস্ত পূজা অমন্ত্র পূতঃ ঔষধের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া থাকে, শিবপূজা বিমুখ যে জল পান করে তাহা মূত্র তুল্য এবং যে অন্ন ভোজন করে তাহা বিষ্ঠা সদৃশ হইয়া থাকে। এমন কি তাহার মুখ দর্শন করাও পাপ ॥৩৪।৩৫॥ শিবই জীবের সাক্ষাৎ গুরু এবং পার্ব্বতী গুরু পত্নী

তুল্য, সুতরাং পার্ব্বতী ও শিবের পূজা না করিয়া যে ভোজন করে তাহার মুখ দর্শন করাও নিষেধ ॥ ৩৬ ॥ শিবই জীবগণের প্রকৃত পিতৃদেব এবং শ্রীশ্রীপার্ব্বতী মহাদেবী জীবজগতের যথার্থ জননী, এই কারণ তাঁহাদের অর্চনা না করিয়া যে নরাধম ভোজন করে, তাহার মুখ দর্শন করিতে নাই ॥ ৩৭॥ শিব পূজা না করিয়া যাহারা দুইবেলা ভোজনকরে, তাহাদিগকে মানবাকার বিট্‌বরাহ বা পাপাত্মা কুক্কুর বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ৮॥

তথাহি (কল্কি পুং ১ম অংশ ৩। ১৮ (শ্লোক) :—

স্থিতৌ বিষ্ণুঃ সর্ব্বজিষ্ণু সুরাত্মা লোকান সাধূন ধর্ম্মসেতুন্ বিভর্ষি।
ব্রহ্মাদ্যংশে যোঽভিমানী গুণাত্মা শব্দাদ্যঙ্গৈস্তং পরেশ নমামি ॥১৯॥

অর্থাৎ যিনি নিখিল জগতের রক্ষার জন্য সর্ব্বজয়ী দেবাত্মা বিষ্ণুরূপে ধর্ম্ম সেতু (বাঁধ) স্বরূপ সাধু মানবদিগকে পালন করিতেছেন, যিনি শব্দাদিরূপে গুণাত্মা হইয়া ও ব্রহ্মভাবাবলম্বন করিয়াছেন, অদ্য আমি সেই পরমেশ শিবকে নমস্কার করি ॥১৯॥

এই জন্যই বলিতে বাধ্য হইতেছি—যথার্থ বৈষ্ণব বিগ্রহ পরম মঙ্গলময় শিবের শ্রীমুখে জীবের প্রাণান্তকর এরূপ অকরুণ বাক্য বা একান্ত কঠোর বাক্য কখনই নিঃসৃত হইতে পারেনা, যদি এরূপ হইয়াই থাকে, তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই সর্ব্ব সংহারকারী সেই "কালাগ্নি রুদ্রের" আবেশ জনক শিবের দক্ষিণ দিক্‌জাত রৌদ্র রসময় "অঘোর" নামক বদনোৎপন্ন সম্পূর্ণ অভিচার বাক্য ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। শিবের তামস বিগ্রহ "কালাগ্নি রুদ্রের" প্রলয়প্রদ নির্দয় বাক্যোপদেশে বাধ্য হইয়া যাহারা যজ্ঞার্থ পশু বধকে অবধ তুল্য মনে করিয়া থাকে, তদর্থে স্বর্গ সাম্রাজ্যকে যাহারা দেবী রাণী ভবানীর নিকট "জায়গীর" মনে করিয়া থাকে এবং পশু হিংসারূপ মহাবিমানে—বা বায়ুযানে উত্থিত হইয়া আনন্দে অধীর গাছেলানো গোচ্ছর হইয়া পড়িতেছে; ভাই পাঠকবৃন্দ! তাহাদের পরিণাম ফল যে নিতান্তই নিরানন্দময় বা সংসার নিরয় স্বরূপ; তাহা এই জীবেশ্বরার পঞ্চম স্তবক অর্থাৎ বৈধ হিংসা প্রকরণ পাঠে যথোচিত অবগত হইতে পারিবেন।

শিবের সর্ব্বপ্রকার সর্ব্বসময়ের ও সর্ব্বাবস্থার বাক্যই যদি জীব জগতের স্বীকার যোগ্য হইতে পারিত বা কুশলজনক হইত, তাহা হইলে তৎকৃত

উড্ডীশ, ক্রিয়োড্ডিশ এবং ডামর বৃহড্ডামরাদি তন্ত্রে মারণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ ও উচ্চাটন প্রভৃতি যেসকল অশুভ অভিচার কার্য্যের উপদেশ রহিয়াছে তাহাও ত তাহাহইলে আমাদিগকে অকুণ্ঠিত ভাবে গ্রহণ বা প্রতিপালন করিতে হয়? অতএব হে পাঠকবৃন্দ! শিবকথিত প্রোক্ত উড্ডিশাদি অধম তামসিক তন্ত্র এবং কালিকাদি তামসিক পুরাণ উপপুরাণ বর্ণিত অভিচার মূলক আদেশগুলি পালন করিতে গেলে প্রাণি জগতকে এককালীন উৎসন্নের শেষ যবনিকায় আবৃত করিতে হয়না কি? এইজন্যই বলিতেছি, ঐ সকল অভিচার বা পশুবলি বিষয়ক আদেশগুলি কখনই শিববাক্য নয়। তবে যদি ঐ অশিববাক্যা-বলিকে কেহ শিববাক্যই বলিতে চান বা বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে শিবের সাময়িক রূপবিশেষে সম্পূর্ণ অধম তমোগুণের অধিদেবতা "কালাগ্নি রুদ্রের" নিঃসংশয় নৃসংসতাময় বাক্য ব্যতীত আর কিছুই নয়। পাঠক! শুধু আমরাই যে এইরূপ মত প্রকাশ করিতেছি তাহা নহে। যেহেতু শান্তিকামী পণ্ডিত অথবা যথার্থ তত্ত্ব জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রেরই উহা অভিমত বলিয়া জানিবেন এবং বিশ্বস্থ হইবেন। শিববাক্য তদ্বিধ চূড়ান্ত অশিবত্বে পরিণত হওয়ায় শিবের মুখে জীবের ভাগ্যে এরূপ অশিব বাক্য আসিয়া সংঘটিত হইল কেন, এই চিন্তায় ব্যাকুলেন্দ্রিয়, বিশিষ্ট জ্ঞানীগণেরা অনন্যোপায় হইয়া উহাকে সর্ব্বথা পরিত্যজ্য মনে করিয়াছেন।

এস্থলে পাঠকদিগের ভিতর বিদ্যাসিক তর্কসাগর যাহারা আছেন তাঁহারা বলিতে পারেন যে, "মহাত্মা বেদব্যাসও ত কোন কোন পুরাণে বৈধহিংসা বা যজ্ঞার্থ পশু হননকে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া অনুমোদন করিয়াছেন।" একথায় আমাদের বক্তব্য এই যে, দেশ কাল এবং ব্যক্তি ভেদে অথবা বিষয় বিশেষে বার্সি বা ব্যাসবাক্যও গ্রাহ্য কি ত্যজ্য হইতে পারে। ব্যাসে ও শিবে কোনই পার্থক্য নাই, শিব বাক্যই যথাকালে ব্যাস মুখে পুরাণাকারে প্রকাশিত হয়। শিব ও ব্যাসের নাম দিয়া তন্ত্র বা পুরাণ লিখিতে অনেক মৎস্যমাংসাশী পারদর্শী হওয়ায়ই এই সর্ব্বনাশের মূল। ব্যাস ভগবান্ বিষ্ণুর, লীলাবতার এবং শিব তাঁহার গুণাবতার, কাজেই জগৎ পাতা বিষ্ণু ভগবান্ কর্ত্তৃক জীবের অশিব ব্যাপার সংঘটিত (বাক্যে কি কার্য্যে), হইতেই পারেনা পারিলে তিনি কেমন জগৎপাতা আর কেমনই বা জীবের শান্তি প্রদাতা?

আদি গুরু দেবাদিদেব মহাদেবই সাঙ্গ বেদের বা শাস্ত্র সমূহের প্রণেতা। বেদব্যাস কেবল বেদের সংহিতা রচয়িতা বা বেদের সংক্ষেপ কর্ত্তা। শিক্ষিত এবং ধর্ম্মপ্রাণ পাঠকবর্গের উচিত কৃপার উপর উপযুক্ত নির্ভর করিয়া এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, যথার্থ বেদব্যাসের মণিময় পবিত্র বাক্য মালার মাঝে মাঝে ইদানীংকালের ব্যাস বাবাজীর দল 'মেকি মণি কাঞ্চন" * প্রভৃতি অনেক অমূল্য অপদার্থ নিক্ষেপ করত তন্ত্র পুরাণগুলিকে যথেষ্ট রঙ ফলানো করিয়াছেন। শশাঙ্ক শেখর শিব নির্গুণ হইয়াও জীব জগতের অবস্থানুরূপে গুণময় দেহ ধারণ করত "কালাগ্নিরুদ্র" প্রভৃতি শুভাশুভ যখন যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন তখন আবার সেইরূপই বাক্য বলিয়াছেন অথবা তদনুযায়ী কার্য্যই নির্ব্বাহিত করিয়াছেন এবং সুর, অসুর, মানব ও দানবাদি জীব জাত ও আবশ্যক মত স্ব স্ব রুচি বা বাসনা অনুসারে তাহাই আবার গ্রহণ করিয়াছেন। মহাদেব যেমন ত্রিগুণময় বিগ্রহ এদিকে দেবাসুরাদি মানব দানবাদি জীব জন্তুও তেমনি সত্ত্ব রজাদি ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি দ্বারা নিরত নিয়ন্ত্রিত ও সর্ব্বথা পরিচালিত যেহেতু "ভিন্নরুচির্হিলোকাঃ।" আর্য্য শাস্ত্র সকল পাঠে বেশ জানিতে পারা যায় শিব একান্তই "আশুতোষ"—একান্তই "সর্ব্ব সাধন সন্তুষ্ট" অথবা সুরবরতরু সদৃশ অভীষ্টদাতা ও মহাবদান্য তিনি রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বৃকাসুরের প্রতি আশুসন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় এবং ত্রৈলোক্যের আশু অমঙ্গলকর যে সকল বরবাক্য প্রদান করিয়াছিলেন, পাঠক মহাত্মাদিগের অনেকেই তাহা ভাগবতাদি পাঠে জ্ঞাত আছেন। এমতাবস্থায় সেই শিব প্রকৃতি সম্পন্ন ভগবান বেদব্যাস স্বেচ্ছা প্রণোদিতে মানবাদি প্রাণির প্রতি যথেষ্ট প্রসন্ন বা অনুগ্রহবান না থাকিবেন কেন? ভ্রাতাগণ! যাথার্থ বেদব্যাস বেদবিস্তার, বেদান্ত বেদাঙ্গ এবং যোগ সূত্রাবলির সঙ্কলন, মহাভারত এবং অষ্টবিধ পুরাণ সংহিতা সমূহের প্রণয়ন করিয়াও যখন দেখিলেন, দুষ্পারণীয় এই শাস্ত্র সাগর মন্থন ও গ্রন্থন করিয়াও তাঁহার চিত্তে

---

* মেকি—ঝুটা, কৃত্রিম ইত্যাদি অর্থ বোধক। অনেকেরই বিশ্বাস আদিগুরু শিব বা বেদব্যাস রচিত শাস্ত্রে স্বার্থপর বিদ্যানবগের কৃত মনগড়া অনেক শ্লোক প্রক্ষিপ্ত, প্রাচীন শাস্ত্রে অপ্রাচীন দোষ দুষ্ট হইয়াছে। অতএব আসল নকল বড় সহজ নয় পাঠক!

বিন্দু মাত্রও শান্তি সুধার সংযোগ হয় নাই, বরং তদ্বিপরিতই ঘটিয়াছে, অর্থাৎ মহা ঘণিভূত অতি ঘোর অশান্তি সিকতারাশি যুগপৎ আসিয়া তাঁহার চিত্ত সাম্রাজ্যকে ভীষণ তম ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। হায়! তিনি তখন যারপর নাই উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বন বনান্তর, পর্ব্বত পর্ব্বতান্তর এবং তীর্থ তীর্থান্তরাদি ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই অপূর্ব্ব ঘটনায় লোক পিতামহ ব্রহ্মার সেই সত্যময় চিত্ত রাজ্যকেও যখন অশান্তি কুজ্‌ঝটিকায় যৎকিঞ্চিৎ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, তখন সেই পরম সত্যজ্যোতি চতুর্ম্মুখ পুতচিত্তে শ্রীমন্‌ নারদকে অনতিবিলম্বেই ব্যাসের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পিতামহ প্রেরিত দেবর্ষি প্রবর নারদ বেদব্যাসের সেই দুরন্ত অশান্তি ব্যাধির মূল নিদান তখন তদীয় শান্তিরস ময় বিশুদ্ধ শুভ্র বুদ্ধি দ্বারা সম্যক্‌ উপলব্ধি করত ব্রহ্মাদেশে ভববিরিঞ্চি প্রভৃতির পরম উপাস্য চতুশ্লোকী ভাগবত সংহিতা *" তাঁহার (বেদব্যাসের) পবিত্র রসনা আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বলিয়া দেন যে, আপনি এখন হইতে অতীব সাবধানতার সহিত হিংসাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি মার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ সত্ত্ব বা উত্তম সাত্ত্বিক গুণের আদর করত ভগবদ্‌ বিগ্রহ সদৃশ পরম পবিত্র তমা শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত সংহিতা † রচনা করুন, আপনি এই চতুশ্লোক ভাগবতী গ্রন্থকে ভগবদ্‌ বিষ্ণু তেজ এবং স্বয়ং বিষ্ণু বিগ্রহ বলিয়াই মনে করিবেন। অধিকন্তু এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের আধার পরাশক্তি ভগবতী দুর্গা এবং ইহাঁর আবরণ পরাৎপর শ্রীমন্‌ শিব। ভগবদভিপ্রায়ে জীবের পরম দুর্ল্লভ ভাগবত বা ভগবদ্‌ বিগ্রহ

---

* শ্রীমদ্ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধ দ্রষ্টব্য।

† বেদব্যাস ইত্যগ্রে যে সকল গ্রন্থ রচনা করেন তাহার কোন খানিই বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক নয়। মহাভারতাদি গ্রন্থে হিংসা প্রতিহিংসার যথেষ্ট প্রশ্রয় পাইয়াছে; ব্যাসচিত্তে এতাধিক অশান্তি বা শাস্ত্র প্রণয়ন পিপাসা নিবৃত্তি না হওয়ার কারণ ইহাই কেবল! মূল চারিশ্লোক অবলম্বনে বেদব্যাস ১৮০০০ শ্লোকে ভাগবত সংহিতা রচনা করেন। ভাগবত রূপক হইলেও বেদান্তের রূপক, ঔপন্যাসিক রূপক নয়। বেদান্তের সহিত ভাগবতের বিষয় মিলাইয়া না পড়িলে ভাগবত পড়ার ফল সম্পূর্ণ হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। তবে এখন সেরূপ গুরু কচিৎ দৃষ্ট হয়।

আপনার রসনা যন্ত্রে অসি প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া অতীব প্রেমানন্দ সহকারে নিবেদন করিতেছি যে, নিবৃত্তি মার্গে সর্ব্বথা লক্ষ রাখিয়া বিস্তার ক্রমে ইহার প্রণয়ন, অনুশীলন এবং অধ্যাপনাদি দ্বারা অচিরেই আপনার সেই মহা অশান্তিময় আধি বা মানসিক পীড়া হইতে পরিত্রাণ লাভ করত চিরশান্তি প্রাপ্ত হইবেন। মহাত্মন্! এই গ্রন্থই ভবিষ্যতে নিখিল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বা মধ্যস্থরূপে পরিগৃহীত হইবে। এই ভাগবত গ্রন্থই পবিত্র গ্রন্থ জগতে শাস্ত্র সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন, হে পরাশর নন্দন। আপনাকে অধিক আর কি বলিব, উপাসনা জগতে এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থমহারাজাই শুদ্ধ সত্ত্ব গুণময়অনপায়িনী ভক্তিধন বিতরণ করিয়া আদর্শ এবং শীর্ষস্থান অধিকার করিবেন।

ভাই পাঠকবৃন্দ! সত্য ত্রেতাদি যুগগত মানব নিচয়ের অর্থাৎ জীব প্রকৃতির রুচি বা প্রবৃত্তিকে সম্যক্ লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্র ও তন্ত্র সকল রচিত হইয়া থাকে। এই দুর্ব্বল ও দুর্বিসহ কলিযুগে মানবমণ্ডলীর ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি এবং অর্থনীতি সকল যে কি প্রকার হওয়া কর্ত্তব্য সে বিষয়েত আমরা অনেকেই অনভিজ্ঞ, সুতরাং দেশকাল পাত্রগত প্রোক্ত ধর্ম্ম ও বিষয়ের সামঞ্জস্য রক্ষণে আমরা যারপরই নাই উদাসীন; পাঠক! আমরা বই লেখার একটানা স্রোতে পড়িয়া কোথায় ভাসিয়া যাইতেছি সে বিষয়ে লক্ষ্য বা বিবেচনা করিবার পর্য্যন্ত সময় পাইতেছিনা, এরূপ বইতে জগতের অপকার ভিন্ন উপকার করিতে পারি না। দেশ কাল পাত্রগত প্রাকৃতিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক কতকগুলি কৃত্রিম মহাদেব কৃত্রিম বেদব্যাসের তন্ত্র পুরাণেই দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে শুধু এই কারণে সনাতন আর্য্যধর্ম্ম দ্বেষ ও ঈর্ষা পরিপূর্ণ এক কিম্ভূত কিমাকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাবণের বেদ অভিজ্ঞতার ন্যায় কতগুলি মদ্যপায়ী বা মাংসাশী, মহাদেবের ও বেদব্যাসের নাম দিয়া আর্য্য শাস্ত্রের পরম পবিত্রতার ধ্বংশ করিয়া দিয়াছে। তারপর মদ্যখুরী, মাংসখুরী, গাঁজাখুরী, মৎস্যখুরী ও কামখুরী, 'এই পঞ্চখুরীতে পরিপূর্ণ ২।৷০ খানা তন্ত্রও যে তাহারা রচনা না করিয়াছে তাহা নহে। ভাই ধর্ম্মপ্রাণ পাঠক মণ্ডলী! এ সময়ে আসল নকল চেনা বড় দায়? যে "অহিংসা পরমধর্ম্ম" সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের মূল বা জীবন স্বরূপ; হায়! সেই পবিত্র বিশুদ্ধ ধর্ম্ম কিনা আজ অগণিত অপ্রমাণিত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ হুতাশনে "শ্মশানানলদগ্ধোঽসি পরিত্যক্তোঽসি বান্ধবৈঃ" হইয়া

তাঁহি মধুসূদন শব্দে চীৎকার করিতেছেন, আশ্রয়াভাবে উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে উন্মত্তের ন্যায় দৌড়িয়া বেড়াইতেছেন।

সর্ব্বদা এইটি দেখিতে হইবে যে, দেশ কাল পাত্রের মহা পরিবর্ত্তনে জাগতিক অবস্থা যখন যেরূপ ঘটে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ-বিষয়ক শাস্ত্র বিধিরও অবশ্য তদনুরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক। এরূপ না হইলেই বিশ্বকরণে ব্যভিচার প্রবেশ করে এবং মহা প্রকৃতি, আকাশাদি মহাভূত নিচয়ের তন্মাত্র যোগে প্রাণি জগৎকে একেবারে সোজা উৎসন্নের পথে নিক্ষেপণ করিয়া থাকেন। পাঠক! এ বিচার বুঝিবার লোকাভাব, এ প্রাকৃতিক বিচারের পরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার লোকাভাব এমন কি জ্ঞানাভাব পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে। অজ্ঞের ন্যায় যাহা বলিলাম সহৃদয় পাঠকবর্গ অবশ্য বারেক উহার সূক্ষ্ম কারণ বীজেরদিকে একবার মননশীল অথবা বিচারশীল হইবেন। এ যাবৎকালত যখন অনেক ভায়াই নাটক নবেলে কোল রাখিয়া কালাতিপাত করিয়াছেন, তখন এই অজ্ঞের আব্দারে কিঞ্চিৎ সময় খরচ করিবেন কি?

দেখুন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে ফল পর্ণ ভোজী বনৌকস ব্রাহ্মণ জাতীয় ঋষিগণ প্রাণি জগতের শ্রেয়ঃ সাধন ব্রতে ব্রতীছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকের প্রকৃতি অনুযায়ী বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ, গীতা, ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্ম শাস্ত্রনিচয় রচনা না করিয়া অর্থাৎ প্রকৃতি পুঞ্জের উপস্থিত অবস্থানুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতেন এবং রাজশক্তি সাহায্যে প্রাণি জগৎকে উচ্ছৃঙ্খল নামক খর্ব্ব শিরোমণি উন্মত্তের শাসন বা কুমন্ত্রণা হইতে রক্ষা বিধান করিতেন। ভ্রাতাগণ! শুদ্ধ এই কারণেই কেবল বেদের সঙ্গে বেদের, দর্শনের সঙ্গে দর্শনের, স্মৃতির সঙ্গে স্মৃতির এবং পুরাণের সঙ্গে পুরাণের ন্যূনাধিক বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইতেছে; শাস্ত্র-বিরোধ বিষয়ে একটু মনোযোগ করিলেই বুঝিতে পারিবেন ইহার প্রকৃত কারণ কি? ফলে উপস্থিত কলিযুগকে কলিযুগ না বলিয়া "শাস্ত্র সঙ্কট যুগও" বলা যাইতে পারে। পাঠক! এযুগে আসল নকল চেনা বড়ই কঠিন, বিশেষ সেরূপ অনুসন্ধানেরও একান্ত অভাব। উপস্থিত শাস্ত্র সঙ্কট যুগের কোনও এক বুড়ো ঋষি বলিয়া ফেলিলেন, "এটি বৈদিক যুগ নয় পৌরাণিকযুগ"; হয়তো তাঁহার কথার দম সরিতে না সরিতেই আবার দু'চারি ঋষি কনৌগ্রাকীহুরে বলিয়া উঠিলেন, "রাখুন মহাশয়! আপনার পুণ্যাহ বচনেই পুরাভ্রম বা গোড়ায়